উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত
জাগ্রত
প্রাপ্য
বরান্‌
নিবোধত

উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন
কলিকাতা-৭০০ ~ ০০৩

৭৭তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা
মাঘ, ১৩৮১

উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৭৭তম বর্ষ

(মাঘ, ১৩৮১ হইতে পৌষ, ১৩৮২ ; ইংরেজী : ১৯৭৫)

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'

সম্পাদক

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

সংযুক্ত সম্পাদক

স্বামী ধ্যানানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০-০০৩

বার্ষিক মূল্য ১২.০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়ের ট্রাস্টীগণের পক্ষে
স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত এবং
১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০-০০৩ হইতে প্রকাশিত।

দিব্য বাণী

ভূরম্ভাংস্যনলোঽনিলোঽম্বরমহ-
র্নাথো হিমাংশুঃ পুমান্
ইত্যাভাতি চরাচরাত্মকমিদং
যস্যৈব মূর্ত্যষ্টকম্ ।
নান্যৎ কিঞ্চন বিদ্যতে বিমৃশতাং
যস্মাৎ পরস্মাদ্ বিভো-
স্তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং
শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥

—শংকরাচার্য : দক্ষিণামূর্তিস্তোত্র, ৯

পৃথ্বী অগ্নি জল আকাশ অনিল
নিশানাথ জীব দিনমণি—
এই অষ্টরূপে বিশ্বচরাচরে
প্রকাশিত রয়েছেন যিনি,
বিবেকিগণের কাছে সে পরম
বিভু ছাড়া কিছু নাই আর ;
সেই গুরুরূপী দক্ষিণামূর্তিরে
ভক্তিভরে করি নমস্কার ।

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের নববর্ষ ও 'প্রস্তাবনা'

বঙ্গভারতীর মাধ্যমে যুগোপযোগী আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ভাবধারা প্রচার করিয়া জনজীবনকে সঞ্জীবিত করিবার যে বিমূর্ত কল্যাণেচ্ছা সত্য-সংকল্প সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের অন্তরে সমুদিত হইয়াছিল, তাহারই মূর্তরূপ 'উদ্বোধন'-পত্রিকা। ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১লা মাঘ তাহার শুভাবির্ভাব। তাহার পর ৭৬ বৎসর অতীত হইয়াছে এবং এই মাঘে পত্রিকাটি ৭৭তম বর্ষে পদার্পণ করিতেছে। এই সুদীর্ঘ সময়ে ভারত তথা পৃথিবীতে রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বহুবিধ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 'উদ্বোধন'-পত্রিকা এই সকল পরিবর্তনের মধ্য দিয়া শ্রীভগবানের অসীম কৃপায় স্বামীজী-নির্দেশিত অপরিবর্তনীয় লক্ষ্যাভিমুখে অবিকম্পিত ধীর পদে অগ্রসর হইয়াছে। তাহার এই দীর্ঘযাত্রাপথ জয়যুক্ত করিতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল অসংখ্য ব্যক্তি অকুণ্ঠ সহযোগিতা করিয়াছেন। নব বর্ষের প্রারম্ভে আমরা তাঁহাদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি এবং বর্তমান লেখক-লেখিকা গ্রাহক-গ্রাহিকা পাঠক-পাঠিকা পৃষ্ঠপোষক শুভানুধ্যায়ী ও সংশ্লিষ্ট সকলকেই আমাদের আন্তরিক প্রীতি-শুভেচ্ছা-অভিনন্দন জানাই। প্রার্থনা করি, মঙ্গলময়ের আশীর্বাদে সকলের সুখ শান্তি সমৃদ্ধি শ্রীবৃদ্ধি—সর্বতোমুখী কল্যাণ হউক।

'উদ্বোধনে'র ঐতিহ্য অনুযায়ী বর্ষারম্ভে বিশেষভাবে স্মরণ করি এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মহাপ্রাণ মহামানব স্বামীজীকে। স্মরণ করি, প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত 'প্রস্তাবনা'—তাঁহার শ্রীকর-অঙ্কিত সেই বিজয়তিলক, যাহা 'উদ্বোধন'-কপালফলকে চিরশোভমান। 'প্রস্তাবনা'র কিছু অংশ আমরা এখানে আলোচনা করিতেছি।

স্বামীজী লিখিয়াছেন: 'চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।' রজোগুণের লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন: 'ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হাতে দুই-তিনটা আংটি। বাড়ীর আসবাব খুব ফিটফাট। দেয়ালে কুইনের ছবি, রাজপুত্রের ছবি, কোন বড় মানুষের ছবি। বাড়ীটি চুনকাম করা, যেন কোনখানে একটু দাগ নাই। নানারকমের ভাল পোষাক।' রজোগুণের সম্পর্কে তিনি বহুবার বলিয়াছেন: 'রজোগুণ না গেলে শুদ্ধ সত্ত্ব না এলে, ভগবানেতে মন স্থির হয় না। রজঃ তমোগুণে ঈশ্বর থেকে তফাৎ করে, রজোগুণে সংসারে বদ্ধ করে' ইত্যাদি।

সুতরাং প্রশ্ন জাগে: জীবকে যিনি মুক্তি দিতে জন্ম লইলেন, জীবের মুক্তির পথের দিশারী যিনি—আদেহান্ত যিনি মুক্তির বার্তা শুনাইয়া গেলেন, সেই জীবপরিত্রাতা স্বামী বিবেকানন্দ কি যে রজোগুণ জীবকে সংসারে বদ্ধ করে, তাহাই বরণ করিতে নির্দেশ দিতেছেন?

গীতায় বলা হইয়াছে: 'রজসস্তু ফলং দুঃখম্।' জীবকে ত্রিবিধ দুঃখের হস্ত হইতে আত্যন্তিক নিষ্কৃতি দিবার জন্যই যাঁহার পুণ্যাবির্ভাব, সেই জীবদুঃখহারী স্বামীজী কি জীবকে দুঃখের জালে আবদ্ধ হইবার জন্য রজোগুণী হইতে উপদেশ দিয়া গেলেন?

এই প্রশ্নের উত্তর এতই স্পষ্ট যে, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। প্রয়োজন শুধু পরিশীলিত বুদ্ধি লইয়া স্বামীজীর কথার গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উহার প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয় করা।

প্রয়োজন—স্বামীজী এই প্রসঙ্গে অন্যত্রও কি কি বলিয়াছেন, তাহা বিশ্লেষণাত্মিকা দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অনুধাবন করা। নতুবা 'উল্টা সমঝলি রাম' হইতে বাধ্য—যাহার কিছু কিছু পরিচয়ও দুর্ভাগ্যক্রমে ইতিমধ্যেই পাওয়া যাইতেছে।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-গ্রন্থের প্রারম্ভেই 'ধর্ম' বলিতে স্বামীজী যাহা বুঝাইয়াছেন—'ধর্ম হচ্ছে কার্যমূলক। ধার্মিকের লক্ষণ হচ্ছে সদা কার্যশীলতা'—এখানেও সেই ক্রিয়াশীলতার কথাই বলিয়াছেন। অর্থাৎ আপাদমস্তক শিরায় শিরায় রজোগুণ-সমন্বিত হওয়ার অর্থ হইতেছে আকেশ আনখাগ্র ধার্মিক হওয়া।

শোকমোহাচ্ছন্ন নিরুৎসাহ নিরুদ্যম অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রসমরাঙ্গণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন : ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে / ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ। — হে অর্জুন, কাপুরুষতা আশ্রয় করিও না, ইহা তোমার শোভা পায় না। হে অরিন্দম, হৃদয়ের এই তুচ্ছ দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া উত্থিত হও। স্বামীজী আলমবাজার মঠে গীতাব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন : এই একটি শ্লোক পড়িলেই সমগ্র গীতাপাঠের ফল পাওয়া যায়, কারণ এই শ্লোকের মধ্যেই গীতার সমগ্র ভাব নিহিত।' এই শ্লোকে নিষ্ক্রিয় অর্জুনকে সক্রিয় হইবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যে-রজোগুণের পরিণাম অবশ্যম্ভাবী দুঃখ, সেই রজোগুণী হইতে বলা হয় নাই। কর্মযোগী হওয়ার অর্থ রজোগুণী হওয়া নহে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় সখা অর্জুনকে কর্মযোগী হইতে— 'সাত্ত্বিক কর্তা' হইতেই বারংবার নির্দেশ দিয়াছেন। ধৈর্য- ও উৎসাহ-সমন্বিত, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে নির্বিকার, নিরহঙ্কার কর্তা হইতে বলিয়াছেন। স্বামীজীর অভিপ্রায়ও তাহাই। 'ধার্মিক হও', 'কর্মযোগী হও', 'সাত্ত্বিক কর্তা হও'— এই সকল নির্দেশ সমানার্থক এবং স্বামীজী এই নির্দেশই 'প্রস্তাবনা'য় দিয়াছেন। গীতায় উক্ত রাজসিক বা তামসিক কর্তাকে আদর্শরূপে তিনি কখনও উপস্থাপিত করেন নাই। তিনি বলিতেন,—আধ্যাত্মিকতার সহিত কর্মহীনতার কোনও অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই। গীতাতেও বলা হইয়াছে, পরম জ্ঞানীর, পরম ভক্তের একটি লক্ষণ—তিনি 'দক্ষ'। 'চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ' —অর্থাৎ, চাই এইরূপ 'দক্ষ' মানুষ।

'প্রস্তাবনা'য় স্বামীজী লিখিয়াছেন : "এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা 'উদ্বোধনে'র জীবনোদ্দেশ্য।" 'দুই শক্তি' হইতেছে প্রাচ্যের শক্তি ও পাশ্চাত্যের শক্তি—ভারতের 'সত্ত্বধারা' এবং পাশ্চাত্যের 'বীর্যতরঙ্গ'। এই স্থলেও স্বামীজী—'ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব' বলিয়া 'তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণপ্রবাহ প্রতিবাহিত' করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। ইহার ব্যাখ্যাও আমরা পূর্বে যাহা বলিয়াছি, তদনুসারেই করিতে হইবে। যে-রজোগুণপ্রবাহে মানুষ 'কামেপ্সু' হয়, 'সাহঙ্কার' হয়, 'হর্ষশোকান্বিত' হিংসাত্মক' ও 'অশুচি' হয়, তাহা যে অবশ্যই বর্জনীয়, সেকথা বলা বাহুল্যমাত্র। স্বামীজী ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রহ্মতেজের সম্মিলনের কথা বলিতেন। এখানেও সেই কথাই বলিয়াছেন।

আর্যসভ্যতার প্রথম অরুণোদয়ে বৈদিক ঋষির কণ্ঠোচ্চারিত— 'আ নো ভদ্রাঃ ক্রতবো যন্তু বিশ্বতঃ'—এই উদার উদাত্ত প্রার্থনামন্ত্র ইতিহাসের সকল নীরবতা ভেদ করিয়া আজও অন্তরের অন্তরে অনুরণিত হইয়া আমাদের উদ্বুদ্ধ করিতেছে। বিশ্বের সর্বত্র হইতে শুভ চিন্তারাশি আমাদের নিকট আসিতে থাকুক—ইহাই উল্লিখিত বেদমন্ত্রের তাৎপর্য। 'উদ্বোধনে'র প্রস্তাবনায় এই বৈদিক মন্ত্রেরই প্রতিধ্বনি দেখি : 'আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য

কিরণ।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী যাহা ঘটিতেছে সেই নিষ্ঠুর সত্যকেও অনাবৃত করিয়াছেন : 'দেশ-দেশান্তর হইতে··· বিদ্যুদ্বেগে নানাবিধ ভাব—রীতিনীতি দেশমধ্যে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। অমৃত আসিতেছে সঙ্গে সঙ্গে গরলও আসিতেছে।' অদম্য উৎসাহ, অদ্ভুত কর্মকুশলতা, অপূর্ব অধ্যবসায়, অমিত বীর্য, অটল ধৈর্য, অবিচলিত আত্মনির্ভরতা—এই অমৃতধারা আসিতেছে সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিত্যনব-ভোগবিলাস-প্রবণতা, ইহকালসর্বস্বতা, 'ক্রোধকোলাহল, রুধিরপাতাদি' —এই সকল গরলও আসিতেছে। এইজন্য স্বামীজী 'প্রস্তাবনা'য় বারংবার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল তরঙ্গে আমাদের যুগযুগসঞ্চিত সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক রত্নরাজি ভাসিয়া যাইতে পারে বিজাতীয় ভাবের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা 'ইতোনষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ' হইয়া পড়িতে পারি এবং সেইজন্য আমাদের সাবধান করিয়া দিতেছেন যে, আমরা যেন পৈতৃক সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখি, সর্বসাধারণকে তাহাদের পিতৃধন সম্বন্ধে সদা সচেতন করিতে প্রয়াস পাই এবং সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীকচিত্তে সকল দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিতে পারি। পূর্বসূরী স্বামীজীর এই বাণীরই প্রতিধ্বনি পাই উত্তরসাধক গান্ধীজীর নিম্নলিখিত উক্তিতে: 'I do not want my house to be walled on all sides and my windows stuffed. I want the cultures of all lands to be blown about my house as freely as possible; but I refuse to be blown off my feet by any.' —আমি চাই না আমার গৃহখানি সব দিক দিয়া প্রাচীর-বেষ্টিত থাকে এবং আমার গৃহের বাতায়ন-গুলি রুদ্ধ থাকে। আমি চাই সকল দেশের সংস্কৃতি যতদূর সম্ভব অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যে আমার গৃহের চারিধারে প্রবাহিত হোক। কিন্তু যে ভূমিতে আমি দণ্ডায়মান, কোনও সংস্কৃতি-প্রবাহেই সেখান হইতে উৎখাত হইতে আমি নারাজ।

কিন্তু কয়টি মানুষ গান্ধীজী হয়? কয়টি মানুষ অক্ষরে অক্ষরে স্বামীজীর আদেশ 'তুমিও কটি-মাত্রবস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ'—পালন করিতে পারে? তাই স্বামীজীর ঐ সাবধান-বাণীর প্রয়োজনীয়তা ৭৬ বৎসর পূর্বেও যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। হয়তো বা বলা যায়, সে বাণীর প্রয়োজনীয়তা আজ আরও অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণ সম্পর্কে আমরা কিছু বক্তব্য উপস্থাপিত করিতেছি।

বর্তমান যুগ বিশ্বমনস্কতার যুগ। বিশ্ব-ইতিহাস বিশ্ব-রাজনীতি বিশ্ব-অর্থনীতি বিশ্বরাষ্ট্র বিশ্বসংস্কৃতি বিশ্ব-সভ্যতা বিশ্ব-ধর্ম বিশ্বনাগরিকত্ব বিশ্বপ্রেম ইত্যাদি শব্দ আজ আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত-প্রতি-ধ্বনিত হইয়া অহরহ আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে। শব্দগুলি অবশ্যই শ্রবণমধুর, কিন্তু কোন্ ক্ষেত্রে না নিয়ে কতটা কাজ হইতেছে তাহা বিতর্কিত বিষয়। তবে 'কালোহ্যয়ং নিরবধি-র্বিপুলা চ পৃথ্বী'— ভবিষ্যতে একদিন না একদিন বিশ্ব 'একনীড়' হইবেই, ক্রান্তদর্শী স্বামীজীর বাণী হইতেই উহা আমরা জানিতে পারি এবং বিশ্বাসও করি। কিন্তু কথাটা ইহাই যে, নিজেদের হিম্মত বুঝিয়া কাজে নামিতে হয়। অন্যথা, 'অনবেক্ষ্য চ পৌরুষং মোহাদ্ আরভ্যতে কর্ম যৎ তৎ তামসম্ উচ্যতে'— গীতার এই কথা অনুসারে উহা তামস কর্মে পরিণত হয়। স্বামীজী বলিয়াছেন: 'এক হাত লাফাতে পার না, লঙ্কা পার হবে!' কথায় বলে, হেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরতে চায়! 'প্রস্তাবনা'য় স্বামীজী লিখিয়াছেন: 'যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ; বিদ্যা

কেবল কতিপয় পুস্তক-কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিত-চর্বণে··· সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই ?'

সুতরাং বড় বড় কথার আবরণে যে 'চর্বিত-চর্বণ' রহিয়াছে, তাহার দ্বারা কোনও মহৎ কাজ হইবে না। নিজেদের যোগ্য আধারে পরিবর্তিত করিতে হইবে। পাশ্চাত্যের নিকট হইতে আমাদের বহু জিনিস শিখিবার আছে। অনুকরণে ফল হইবে না। সজাগ দৃষ্টি দিয়া দেখিতে হইবে তাহারা কি করিতেছে। 'প্রস্তাবনা'য় স্বামীজী লিখিয়াছেন: 'ইউরোপ-আমেরিকা যবনদিগের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান, আধুনিক ভারতবাসী আর্য-কুলের গৌরব নহেন।' স্বামীজীর কথা যে কতদূর সত্য, তাহা পাশ্চাত্য জাতিসমূহের অদ্ভুত অধ্যবসায় ও অপূর্ব কর্মকুশলতা দেখিলেই এবং ভারতবাসীর বর্তমান নিষ্প্রভপ্রায় আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে তাকাইলেই বুঝিতে পারা যায়। 'প্রস্তাবনা'য় স্বামীজী চিন্তাশীলতাকে আর্যজাতির বৈশিষ্ট্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমানে আর্যবংশধরগণের স্বাধীন চিন্তার একান্তই অভাব ঘটিয়াছে। পক্ষান্তরে প্রাচীন গ্রীসের ছাত্রেরা আজ শুধু 'দৃঢ় স্নায়ুপেশীসমন্বিত,' 'অটল-অধ্যবসায়-সহায়', 'অপূর্ব ক্রিয়াশীল'ই নহে, চিন্তাশীলতায় পর্যন্ত বর্তমান ভারতবাসীকে ছাড়াইয়া গিয়াছে, বলিয়া মনে হয়— অন্ততঃ গড়পড়তা হিসাবে তো বটেই।

পাশ্চাত্যের চিন্তানায়কদের নিকট হইতে ভারতবাসীদের আজ মননশীলতার পাঠ গ্রহণ করিতে হইতেছে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে! কারণ, মননশীলতাই তো ভারতীয়দের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। 'তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি পশুপক্ষিণঃ / স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি'— গাছপালাও বাঁচিয়া থাকে, পশুপক্ষীরাও বাঁচিয়া থাকে, কিন্তু তিনিই যথার্থ বাঁচিয়া থাকেন, যাঁহার মন মননের দ্বারা জীবিত থাকে— ইহাই ভারতের শাশ্বত মর্মবাণী। ভারত-বর্ষ ধ্যানী। পাশ্চাত্যের নিকট হইতে সে কার্য-কুশলতাই শিখিবে— মনের অতলে নিমগ্ন হইবার কৌশল, ধারণা, ধ্যান, সমাধি নহে। 'প্রস্তাবনা'য় স্বামীজী লিখিয়াছেন: 'ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আধুনিক ভারতবাসীতেও অন্তর্নিহিত পৈতৃক শক্তি বিদ্যমান। যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহার পুনঃস্ফুরণ হইবে।'

সুতরাং আজ সর্বাগ্রে প্রয়োজন, আমাদের অন্তর্নিহিত মহাশক্তিকে জাগ্রত করিয়া নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তির সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করা। বিশ্ব-মনস্ক হইবার পূর্বে আজ কঠোপনিষদ্-উক্ত সেই 'সমনস্কঃ সদা শুচিঃ' হইয়া 'বিজ্ঞানবান্' হইতে হইবে। আগে 'সমনস্ক' না হইয়াই অতিমাত্রায় বিশ্বমনস্ক হইবার দুরাগ্রহে আজ দেশে মহা সংকট উপস্থিত। আর্যসন্তান আজ 'অমনস্কঃ সদা অশুচিঃ'— 'অবিজ্ঞানবান্'। এইজন্যই আমরা পূর্বে মন্তব্য করিয়াছি যে, স্বামীজীর সাবধান-বাণীর প্রয়োজনীয়তা ৭৬ বৎসর পূর্বে যাহা ছিল, তদপেক্ষা বর্তমানে সম্ভবতঃ অধিকতর।

মনে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত সেই সাধুদ্বয়ের উপাখ্যান। একজন সাধু শহরে আসিয়া বাড়ি দোকান বাজার ইত্যাদি দেখিতেছিলেন, এমন সময়ে অপর একজন সাধুর সহিত দেখা হইল। দ্বিতীয় সাধুটি প্রশ্ন করিলেন: তুমি হাঁ ক'রে শহর দেখছ— তল্পীতল্পা কোথায়? প্রথম সাধুটি উত্তর দিলেন: আগে আমি বাসা পাকড়ে, তল্পী-তল্পা রেখে, ঘরে চাবি দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়েছি — এখন শহরে রং দেখে বেড়াচ্ছি।

আগে 'বাসা পাকড়ে' নিশ্চিন্ত হইয়া, তবেই 'শহরের রং' দেখিয়া বেড়াইতে হয়। 'তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ / অন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ'— সেই অদ্বিতীয় আত্মাকেই জানো, অন্য,

কথা পরিত্যাগ করো, অমৃতত্বের ইহাই উপায়। 'যো বা এতদ্ অক্ষরং গার্গি অবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ'—হে গার্গি, যে কেহ এই অবিনাশী পুরুষকে না জানিয়া ইহলোক ত্যাগ করে, সে দুর্ভাগা। 'ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যম্ অস্তি, ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ' — এই জীবনেই যদি আত্মজ্ঞান লাভ হয়, তবেই কৃতকৃত্যতা, অন্যথা মহা বিপর্যয়। 'ইজ্যাচারদমাহিংসাদানস্বাধ্যায়কর্মণাম্ / অয়ং তু পরমো ধর্মো যদ্ যোগেনাত্মদর্শনম্'—যাগযজ্ঞ আচার-অনুষ্ঠান ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অহিংসা দান স্বাধ্যায়— এই সকল কর্ম ধর্ম, কিন্তু পরম ধর্ম হইতেছে যোগের দ্বারা আত্মদর্শন।

এই আত্মদর্শন, অক্ষর পুরুষকে জানা, আত্মজ্ঞান— ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত 'বাসা পাকড়ানো।' স্বীকার করি, এই 'বাসা পাকড়ানো' সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। তথাপি সর্বাগ্রে মহত্তম আদর্শকে কুণ্ঠাহীন চিত্তে মানা প্রয়োজন। বোধির স্তরে যদি সেই আদর্শকে বাস্তবায়িত করিতে না পারা যায়, তো বুদ্ধির স্তরে তাহার মহিমা অনুভব করিতে বাধা কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন— যে ব্যক্তি লবণের হিসাব করিতে পারে, সে চিনিরও হিসাব করিতে পারে। যে-বুদ্ধি সহায়ে আমরা জড়বিজ্ঞানে পারদর্শী হইয়া গর্ব অনুভব করি, সেই বুদ্ধি সহায়েই গীতা ভাগবত উপনিষদের তত্ত্বেরও পরোক্ষ জ্ঞান অনায়াসেই লাভ করিতে পারি। 'প্রস্তাবনা'য় স্বামীজী স্বহস্তে লিখিয়া গিয়াছেন, 'ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত' এবং অসংখ্যবার বলিয়া গিয়াছেন, পাশ্চাত্য জগৎ তৃষিত নয়নে ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদের দিকে চাহিয়া আছে। ভোগক্লান্ত অশান্ত পিপাসার্ত পাশ্চাত্য জগৎ ভারতের শান্তিবারির জন্য উদগ্র হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। এই পরিস্থিতিতে অপরোক্ষ জ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দিলেও, আমরা যদি নারদ-সনৎকুমার গার্গী-মৈত্রেয়ী মনু-যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির নাম পর্যন্ত না জানি— আর্যশাস্ত্রের সহিত পরিচিতই না হই তাহা হইলে তদপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে ! 'ভিক্ষুকের কবে বল সুখ ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল ?'— ভিক্ষুকবেশে পাশ্চাত্যের পদতলে বসিয়া ভৌতিক বিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণ করিতে গৌরব কোথায় ?

সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, আমরা ঋষিদের বংশধর। পাশ্চাত্য জগতের নিকট ভারতের সত্ত্ব-ধারা পৌঁছাইয়া দেওয়া আমাদেরই বিধিনির্দিষ্ট মহান্ দায়িত্ব। আর বর্তমান অবস্থায় রজোগুণ অর্থাৎ মহোৎসাহপূর্ণ ক্রিয়াশীলতা অবলম্বনে তামসিকতা কাটাইবার এবং সেই সঙ্গে আমাদের 'উত্তরাধিকার' অন্তর্নিহিত সত্ত্বগুণের বিকাশ সাধন করিবার আন্তরিক প্রচেষ্টাই সে দায়িত্ব পালনের উপযোগী হইবার উপায়।

"মনের তিন রকম গতি—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। তমোগুণে আলস্য, জড়তা, অহং ইত্যাদি বাড়ে। রজোগুণে ভাল খাব, ভাল থাকব, বাইরের পাঁচটা কাজ করব ইত্যাদি ভাব। আর সত্ত্বগুণে ঈশ্বরের নামগুণগান, ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, প্রেম— এই সব সদাই মনে জাগ্রত হয়। মনের যে এই গতি আছে, তা অতি সত্য। এ আমরা পদে পদে দেখতে পাই।"

—স্বামী ব্রহ্মানন্দ

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

স্তোত্র-রচয়িতা ঃ শংকরাচার্য

টীকাকার ঃ স্বয়ংপ্রকাশ-যতি ; টীকার নাম ঃ হরিতত্ত্বমুক্তাবলী

অনুবাদক ঃ স্বামী ধীরেশানন্দ

টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ ঃ

নিত্যং নিজানন্দসদদ্বিতীয়ং
শুদ্ধং বিভুং সত্যমতিস্বতন্ত্রম্।
সূক্ষ্মং নিরস্তাখিলদৃশ্যমীশং
প্রত্যঞ্চমাত্মানমহং ভজামি ॥ ১

শংকরং শংকরাচার্যং কেশবং বাদরায়ণম্ ।
সূত্রভাষ্যকৃতৌ বন্দে ভগবন্তৌ পুনঃ পুনঃ॥ ২

অনুবাদ ঃ নিত্য (সর্বপরিচ্ছেদরহিত), নিজানন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় সত্তা, শুদ্ধ (অবিদ্যাকামাদি-শূন্য), বিভু (ব্যাপক অথবা উপাধিযোগে বিবিধরূপধারী), সত্য (ত্রিকালাবাধিত), অতি স্বাধীন (স্বয়ং সত্তা ও প্রকাশবান্), সূক্ষ্ম (অশুদ্ধবুদ্ধির অগম্য) সর্বদৃশ্যপ্রপঞ্চবিবর্জিত, সকলের অন্তর্যামী, প্রত্যগাত্মাকে আমি ভজনা করি অর্থাৎ স্বাভিন্নরূপে চিন্তন করি। ১

শ্রীশংকরের অবতার ভাষ্যকার ভগবান্ শ্রীশংকরাচার্য ও শ্রীবিষ্ণুর অবতার (ব্রহ্ম-) সূত্রকার ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ বেদব্যাসকে পুনঃ পুনঃ বন্দনা করি। ২

টীকা ঃ সত্যজ্ঞানানন্দাত্মকম্ অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মৈব শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানমায়োপাধিকং সদ্ ঈশ্বরভাবং মলিনসত্ত্বপ্রধানাবিদ্যোপাধিকং সদ্ জীবভাবং চ জগাম। "জীবেশাবাভাসেন করোতি মায়া চাবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতি" ইতি তাপনীয়ে শ্রবণাৎ। তত্র মায়া-প্রতিবিম্ব ঈশ্বরঃ। তাং মায়াং বশীকৃত্য সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তিশ্চ জীবানাং সর্বেষাম্ অভ্যুদয়াপবর্গার্থং সংকল্পমাত্রেণৈব লীলয়া জগতঃ সর্গস্থিতিপ্রলয়ান্ আচরতি। তত্র যে জীবাঃ স্বাজ্ঞারূপশ্রুতিস্মৃত্যুক্তমার্গানতিলঙ্ঘনেন স্বাত্মানং ভজন্তে তেষাম্ অনুগ্রহায় উপাসনার্থং শঙ্খচক্রগদাশূলমৃগপরশুধরং নীলোৎপল-কালমেঘ-পূর্ণচন্দ্র-স্ফটিকসমানবর্ণম্ আনন্দঘনং সর্বাঙ্গসুন্দরং মূর্তিদ্বয়ং শুদ্ধসত্ত্বময়ং বহুলীলাস্পদং বিষ্ণুশংকরাখ্যং স এব জগ্রাহ। তচ্চ মূর্তিদ্বয়ং বৈকুণ্ঠকৈলাসাদিষু ভক্তানাং হৃদয়ে চ নিত্যং সন্নিহিতং বর্ততে।

অনুবাদ ঃ সত্য-জ্ঞান-আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মই শুদ্ধসত্ত্বগুণপ্রধান-মায়োপাধিক হইয়া ঈশ্বরভাব ও মলিনসত্ত্বগুণপ্রধান-অবিদ্যা-উপাধিযোগে জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাপনীয় উপনিষদে (নৃসিংহ-উত্তরতাপনীয় উপনিষদের নবম খণ্ড দ্রষ্টব্য) এইরূপ উক্ত হইয়াছে—মূল প্রকৃতি (মায়া ও অবিদ্যাতে) চিদাভাস দ্বারা ঈশ্বর- ও জীব ভাব নির্মাণ করিয়া থাকে এবং উহাই (প্রকৃতিই) মায়া ও অবিদ্যা নিজেই হয়।

মায়াতে চেতনের যে প্রতিবিম্ব (চিদাভাস) তাহাই ঈশ্বর। সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি ঈশ্বর সেই মায়াকে বশীভূত করিয়া সকল জীবের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের জন্য লীলাপূর্বক স্বকীয় সংকল্পমাত্র-দ্বারাই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন। এই জগতে যে জীবগণ ঈশ্বরের আজ্ঞারূপ শ্রুতি ও স্মৃতি কথিত মার্গ উল্লঙ্ঘন না করিয়া ঈশ্বরের ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত উপাসনার জন্য তিনিই নীলকমল ও কালমেঘতুল্য এবং পূর্ণচন্দ্র- ও স্ফটিক-সম বর্ণবিশিষ্ট, আনন্দঘন, শুদ্ধসত্তময়, বিবিধ লীলার আস্পদ, সর্বাঙ্গসুন্দর বিষ্ণু ও শংকর নামধেয় মূর্তিযুগল ধারণ করিয়াছেন। উক্ত মূর্তিদ্বয় বৈকুণ্ঠ ও কৈলাসাদি স্থানে এবং ভক্তগণের হৃদয়ে সদা সম্যক্ নিহিত আছে। [ক্রমশঃ]

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র*

[মিসেস্ ওলি বুলকে লিখিত] স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো
১৮ই মে, ১৯০০

মা,

আপনার ও জো'র পত্রের জন্য ধন্যবাদ। আবার আমার ব্যাধির এক আশঙ্কাজনক পুনরাক্রমণ হয়েছিল— এবং এবারে আরোগ্যলাভের প্রচেষ্টায় আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, আমার সকল ব্যাধিই স্নায়বিক দুর্বলতাজনিত। আমি ২, ৩ বৎসরের জন্য বিশ্রাম চাই— আর তার মধ্যে কাজ বিন্দুমাত্রও থাকবে না। আমি সেভিয়ারদের সঙ্গে হিমালয়ে বিশ্রাম নেব।

শ্রীমতী সেভিয়ার আমাকে বাড়ীর জন্য ৬০০০্ টাকা দিয়েছিলেন, তা আমার খুড়িমা, খুড়তুতো ভাই [?] প্রভৃতিদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। বাড়ী কেনার জন্য সেই ৫০০০্ টাকা মঠের তহবিল থেকে ধার নেওয়া হয়েছিল। আমার খুড়তুতো ভাই [?]-এর জন্য টাকা পাঠানো বন্ধ করো না, সারদানন্দ এর বিরুদ্ধে যাই বলুক না কেন। অবশ্য, সে কি বলে তা আমি জানি না।

গঙ্গাতীরে একটি ছোট বাড়ীর ইচ্ছা আমি বহুদিন ত্যাগ করেছি—কারণ আমার টাকা নেই।

কিন্তু, কলকাতায় ও লেগেটদের কাছে আমার কিছু আছে এবং আপনি যদি আরো এক হাজার দেন, তাহলে আমার ব্যক্তিগত খরচের জন্য একটি তহবিল হবে ; কারণ, আপনি জানেন, আমি নিজের ব্যক্তিগত খরচের জন্য বা মায়ের জন্য কখনও মঠের টাকা নিইনি। ছোট বাড়ীটির পরিকল্পনা ত্যাগ করার কথা সারদানন্দকে আপনি নিজের তরফ থেকেই লিখবেন। সম্পূর্ণ সেরে

* মেরী লুই বার্কের Swami Vivekananda, His Second Visit to the West ; New Discoveries গ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত পত্রগুলির অন্তর্ভুক্ত দুইটি পত্রের অনুবাদ।—সঃ

ওঠার আগে আগামী কয়েক সপ্তাহ আর কোন পত্রাদি লিখছি না। এখন থেকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আশা করছি, সেরে উঠব।—ব্যাধির পুনরাক্রমণটি ছিল সাংঘাতিক। একজন ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে আছি, আর সেই আমার সর্বপ্রকার যত্ন নিচ্ছে।

'জো'কে বোলো, শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন মানুষের কাছে ঘুরে বেড়ানোর কাজও সন্ন্যাসীর জন্য নয়। কারণ সন্ন্যাসীর জন্য হচ্ছে নিঃসঙ্গতা এবং এমন নির্জনতা যে, সে কদাচিৎ মানুষের মুখ দেখতে পায়।

আমি তার জন্য এখন উপযুক্ত হয়েছি, অন্ততঃ শরীরের দিক থেকে— যদি অবসর গ্রহণ করতে না পারি তবে, প্রকৃতি আমাকে তা করতে বাধ্য করবে। জাগতিক বিষয়গুলির এত সুষ্ঠু ব্যবস্থা আপনি করছেন বলে অসংখ্য ধন্যবাদ।

আপনি ও জো আমার প্রীতি জানবেন।

আপনার সন্তান
বিবেকানন্দ

১৭১০ ওক স্ট্রীট
স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো, ক্যালি
C/o ডাঃ লোগান, এম্. ডি.
[১৯শে (?) মে, ১৯০০]

প্রিয় অভেদানন্দ,

বেদান্ত সোসাইটির নূতন বাড়ীটির কথা জেনে খুব আনন্দিত হলাম। যেমন পরিস্থিতি দাঁড়াচ্ছে আমাকে এখান থেকে অগত্যা সরাসরি নিউ ইয়র্কে যেতে হবে—কোথাও না থেমে। কিন্তু যেতে যেতে আরো দু-তিন সপ্তাহ লেগে যাবে মনে হচ্ছে। পরিস্থিতি এত দ্রুত বদলাচ্ছে যে, আমার পরিকল্পনা পাল্টে এখানে কয়েকদিন না থেমে যেতে পারছি না।

আমি এইদিককার সমুদ্রতীরবর্তী স্থানগুলি চট্ করে দেখে যাবার জন্যে তোমাদের একজনকে সঙ্গে পাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করছি—এ অঞ্চল বেদান্ত-প্রচারের বিরাট ক্ষেত্র।

আমার সব বই পোশাকাদি তোমার বাড়ীতে এনে রেখো—আমি শীঘ্র আসছি। শ্রীমতী ক্রেনকে আমার প্রীতি দিও। সে কি এখনও কাবাব আর গরম জল খেয়েই বেঁচে আছে? কুমারী ওয়াল্ডো ও শ্রীমতী কুল্স্টন কর্মযোগের নূতন সংস্করণ প্রকাশনের জন্য লিখেছে। কুমারী ওয়াল্ডোকে আমি এবিষয়ে সব লিখেছি। বই বিক্রি বাবদ যে টাকা হাতে আছে তা খরচ করা উচিত বৈকি।

তুমি আমার বই ও পোশাকাদি সেখানে সব ঠিক আছে দেখছ ত? সেগুলো বোস্টনে শ্রীমতী বুলের কাছে ছিল।

ভালবাসা জেনো— **বিবেকানন্দ**

বিবেকানন্দ-জয়াষ্টকম্

অধ্যাপক শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়তু জয়তু শশ্বদ্ বীরচূড়ামণি র্বৈ
সকল-মনুজ-পঙ্ক-ক্লেশহারী বিবেকঃ।
বিজিতনিখিলমোহো ব্রহ্মবিজ্ঞাননিষ্ঠ-
স্ত্রিভুবনমণিদীপো ভাস্বরোঽসৌ নরেন্দ্রঃ॥ ১

জয়তু জয়তু শশ্বত্ত্যাগিচূড়ামণি র্বৈ
দলিতকনককামো গীতবাদিত্রশূরঃ।
অখিলসুগুণশালী কোষমুক্তাসিধারঃ
প্রতিভটকুলভীতি র্বজ্রনির্ঘোষকারী॥ ২

জয়তু জয়তু শশ্বন্ন্যাসিচূড়ামণি র্বৈ
ত্রিগুণগলিতরূপো নির্বিকল্পো যতীন্দ্রঃ।
বিদিতপরমহংসো বিশ্বধর্মপ্রতীকঃ
কৃতযুগপথিকৃদ্যো দাবসংঘাধিকর্তা॥ ৩

জয়তু জয়তু শশ্বজ্ জ্ঞানিচূড়ামণি র্বৈ
পরিণতগুরুভাবো ব্রহ্মচার্যূর্ধ্বরেতাঃ।
সুগতবহুলতন্ত্রো রামকৃষ্ণৈকসারো
নবযুগবরনেতা বিশ্বধর্মাধ্বদীপঃ॥ ৪

জয়তু জয়তু শশ্বদ্বাগ্মিচূড়ামণি র্বৈ
হৃতমলিনমতবাদো নির্জিতাশেষদুর্ধীঃ।
প্রথিতনৃমণিমান্যঃ পশ্চিমোর্বীপ্রচারী
ত্বশরণগলদশ্রুঃ প্রেমভূমিপ্রতিষ্ঠঃ॥ ৫

জয়তু জয়তু শশ্বৎ কর্মিচূড়ামণি র্বৈ
পরমসুকৃতবর্ষী ধর্মসংজ্ঞাবিকাশী
নরকুলশুভকারী বেদবেদান্তবেত্তা
কমলনয়নবক্ত্রো দেবদেবপ্রভাবঃ॥ ৬

জয়তু জয়তু শশ্বদ্ ভক্তচূড়ামণি র্বৈ
বিধিহরিহর-বন্দ্য-শ্রীমহাকালিকেষ্টঃ।
অকরুণজনশাস্তা মূর্তরুদ্রোঽবতীর্ণ-
স্ত্রবনতসুসহায়ঃ সারদাত্যন্তভারঃ ॥ ৭

জয়তু জয়তু শশ্বদ্ যোগিচূড়ামণি র্বৈ
ধৃতচরমসমাধির্নির্বিকল্পপ্রলীনঃ।
নিভৃতগিরিবিহারী জীবদুঃখাসহিষ্ণু-
র্গতজলনিধিপারো ভারতশ্রীর্জয়িষ্ণুঃ ॥ ৮

আচার্যায় প্রভুগুণবতে জীবদুঃখান্তকায়
ব্রহ্মজ্ঞায় শ্রুতিরসভুজে ব্রহ্মবিজ্ঞানদাত্রে।
নির্মায়ায় ভ্রমকুলভিদে ধ্যানসিদ্ধায় ভূয়ে
ভক্ত্যাকীর্ণং স্তবনকুসুমং শ্রীনরেন্দ্রায় বৌষট্ ॥

স্বামী বিবেকানন্দের উপনিষদ্-চিন্তা

স্বামী মুমুক্ষানন্দ

বেদান্তের প্রচারক বলিয়া স্বামীজীর খ্যাতি সুবিদিত। বেদান্ত বলিতে মূলতঃ উপনিষদ্‌কে বুঝায়। ব্রহ্মসূত্র ও গীতা অথবা ইহাদের উপর লিখিত ভাষ্য-টীকা-টিপ্পনী বেদান্তদর্শনের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইহাদের স্বাধীন প্রামাণ্য নাই—উপনিষদ্-নিহিত তত্ত্ব প্রণালীবদ্ধ করে বলিয়া অথবা ঐ তত্ত্বের ব্যাখ্যাতা বলিয়া এইগুলির প্রামাণ্য।

স্বামীজীর গ্রন্থাবলীর পাঠকমাত্রেই স্বীকার করিবেন, উপনিষদ্ স্বামীজীর চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে—তিনি নিজে বলেন, 'আমি কেবলমাত্র উপনিষদ্ হইতেই প্রামাণ্যস্বরূপ উদ্ধৃতি দিই'—"If you look, you will find that I have never quoted anything but the Upanisads." কিন্তু স্বামীজী উপনিষদ্-বাক্যের উদ্ধৃতিমাত্র করেন নাই। উহার ভাবগুলিকে তিনি বর্তমান জগতের বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাপ্রণালীর সহিত বিস্ময়করভাবে সুবিন্যস্ত করিয়া আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন। বড় বড় ভাষ্যপাঠে উপনিষদের যে-মর্ম ধরা যায় না—স্বামীজীর গ্রন্থপাঠে তাহা অত্যন্ত হৃদয়-গ্রাহিভাবে এযুগের পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট করে।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার যুগে মানুষ পুরাণ, আখ্যায়িকা বা রূপকের ভাষায় সীমাবদ্ধ ধর্মের দ্বারা তুষ্ট নয়। যাহা যুক্তিবিচারসহ, বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যসমূহের অবিরোধী তাহা সে গ্রহণ করিতে পারে। বেদান্ত তাই আগামী

দিনের যুক্তিবাদী মানুষের ধর্ম হইবে। বেদান্তের মূল উপনিষদে। যুগধর্মের প্রবর্তনে উপনিষদের ভূমিকা তাই গুরুত্বপূর্ণ।

উপনিষদে ঈশ্বর আত্মা জন্মান্তর কর্মফলবাদ প্রভৃতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সকলে একমত হইলেও উপনিষদ্ ঠিক কি প্রকার দার্শনিক মতবাদের পোষকতা করিতেছেন ইহা লইয়া এতদিন মতদ্বৈধ ছিল। কেহ বলেন, অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন ও অনুভবের উপায় নির্ণয়— ইহাই উপনিষদের লক্ষ্য। কেহ বলেন, উপনিষদে জীব ও ব্রহ্মের অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ (বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ) স্থাপিত হইয়াছে। অপরে বলেন, জীব ও ব্রহ্মের পার্থক্য (দ্বৈতবাদ) প্রদর্শনই উপনিষদের লক্ষ্য। উপনিষদে উক্ত ঈশ্বর বা মুক্তি সম্বন্ধেও অনুরূপভাবে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ বিদ্যমান। বস্তুতঃ ভারতে অধিকাংশ সম্প্রদায় উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও এক সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা অন্যের সহিত মিলে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন, উপলব্ধি ও উপদেশের আলোকে স্বামীজী এই বিভিন্ন মত ও ব্যাখ্যার সমন্বয়সূত্র এবং সঙ্গে সঙ্গে উপনিষদের মর্ম আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া দাবি করেন।

স্বামীজী বলেন যে, উপনিষদ্ দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত সব প্রকার বাদের কথাই বলিতেছেন। কিন্তু তাই বলিয়া উপনিষৎ পরস্পর-বিরোধী মত পোষণ করেন না। সূর্যের যদি তিনটি ফটো লওয়া হয়— একটি ভূপৃষ্ঠ হইতে, একটি ভূতল হইতে কয়েক হাজার মাইল ঊর্ধ্বে হইতে এবং তৃতীয়টি আরও ঊর্ধ্বস্থ কোন স্থল হইতে, তবে দেখা যাইবে তিনটি ফটোর মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও বৈসাদৃশ্য যথেষ্ট; তিনটি ফটোই ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু কোনও ফটোকেই মিথ্যা বলা চলে না। প্রত্যেকটি ফটোই সত্য— তবে আপেক্ষিক সত্য। প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টি অধিকতর সত্য, তৃতীয়টি তদপেক্ষা অধিকতর সত্য। স্বামীজীর মতে সূর্যের বিভিন্ন ফটোগ্রাফের ন্যায় তিনটি মতবাদই সত্য। স্থূলদর্শী প্রবর্তক সাধক দেখেন, জগৎ-পালক ঈশ্বর সৃষ্টির বাহিরে কোথাও অবস্থান করিতেছেন। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সাধক অন্তরের গভীরে ডুবিয়া দেখেন, ঈশ্বর জগতের বাহিরে কোথাও নাই— তিনি অন্তর্যামিরূপে তাঁহার নিজেরই অন্তরে নিত্যবিরাজিত— জগতের প্রতি অণুপরমাণুতে তাঁহার সত্তা অনুস্যূত। অন্তরের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া সাধকের সর্বশেষ অবস্থায় অনুভূতি হয়— তিনি ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। বস্তুতঃ ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত দ্বিতীয় সত্তা কিছুই নাই। চরম সত্য এই অদ্বৈত— অপরগুলি আপেক্ষিক সত্য। সুতরাং তিন মতবাদই সত্য— তবে তাহারা একটি ক্রম-পরম্পরায় বিন্যস্ত— এইটুকুই বুঝিলে বিবাদের কোন কারণ থাকিবে না এবং উপনিষদ্ কেন সকল মতবাদেরই সমর্থনসূচক বাক্য বলিতেছেন সে-রহস্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইবে।[১] এইটুকু না বুঝার ফলেই উপনিষদের ভাষ্যকারগণ মনে করিতেন যে, উপনিষদের সকল অংশ একটিমাত্র মতবাদের কথা বলিতেছেন। সেই কারণে এক সম্প্রদায় যেমন দ্বৈতবাদের বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সমর্থনসূচক বাক্যকে বিকৃতার্থ করিয়া অদ্বৈতপর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অন্য সম্প্রদায় তেমনি অদ্বৈতজ্ঞাপক উপনিষদের সম্পূর্ণ

১ "আমার ক্ষুদ্রজ্ঞানে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, উহারা পরস্পর পরস্পরের বিরোধী নহে। আমাদের ষড়্‌দর্শন যেমন মহান্ তত্ত্বসমূহের ক্রমবিকাশমাত্র, আরম্ভ অতি মৃদুধ্বনিতে—শেষে অদ্বৈতের বজ্রনির্ঘোষে পরিণতি. এই রূপই পূর্বোক্ত তিনটি মতেও আমরা দেখিতে পাই, মনুষ্যমন উচ্চ হইতে উচ্চতর আদর্শের দিকে অগ্রসর হইয়াছে—অবশেষে সমুদয়ই অদ্বৈতবাদের সেই অদ্ভুত একত্বে পর্যবসিত হইয়াছে।"

দ্বৈতপর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপনিষদ্ বাক্যগুলির মধ্যে এইভাবে সামঞ্জস্যের আবিষ্কার,—ভগিনী নিবেদিতা বলেন— ইহা স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দুধর্মের প্রতি নবীন অবদান।[২] স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, তিনি আবার ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ-পদপ্রান্তেই লাভ করিয়াছিলেন।[৩]

উপনিষদের যে-শিক্ষা স্বামীজীকে সর্বাপেক্ষা মুগ্ধ করিয়াছে— যাহার কথা তিনি উদাত্ত কণ্ঠে পৃথিবীময় ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন তাহা হইল মানব-দেবত্ববাদ (Divine nature of man)। স্বামীজী বলেন, উপনিষদ্ হইতে যত মতবাদ, যত সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছে তাহারা সকলেই এই বিষয়ে একমত যে, মানবাত্মার মধ্যে অখণ্ড পবিত্রতা, জ্ঞান ও শক্তি— এক কথায় একটি পরিপূর্ণ দেবস্বভাব— প্রথম হইতেই সর্বদা বিদ্যমান। দেহ মন বুদ্ধির মালিন্যবশতঃ সেই দেবস্বভাব সাময়িকভাবে আবৃত বা সঙ্কুচিত থাকিতে পারে, কিন্তু কখনও বিনষ্ট হইতে পারে না। মানুষ অজ্ঞতাহেতু যত পাপ করুক না কেন, তাহার নৈতিক অধোগতি যতই মারাত্মক হউক না কেন— এমন দিন অবশ্যই আসিবে যখন সে অন্তরের প্রেরণায় আত্মোপলব্ধির পথে যাত্রা করিবে এবং ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে নিজ দেবস্বভাবের পূর্ণ বিকাশ সাধন করিবে।

উপনিষদের এই শিক্ষা স্বামী বিবেকানন্দের নিকট বুদ্ধিগম্য তত্ত্বমাত্র নয়— সাধনানুভূত সত্য। শুভ্র কাচের মধ্য দিয়া আলমারির মধ্যকার সকল জিনিস যেমন দেখা যায়, তিনি যে জীবের মধ্যে সত্যশিবসুন্দরকে তেমন স্পষ্টভাবে অপরোক্ষ করিতেন। সেই সত্যশিবসুন্দর স্বরূপটিকে অপরোক্ষ করিতেন বলিয়াই তো তিনি এমন বজ্রনির্ঘোষে, এমন সুগভীর প্রত্যয়ের সহিত মানবাত্মার মহিমার জয়গান করিয়া গিয়াছেন। অন্তরে শৌর্যবীর্যাদি দৈবগুণরাজির অক্ষয় ভাণ্ডার— জীব তাহা ভুলিয়া, আপনার অমূল্য অক্ষয় সম্পদ অস্বীকার করিয়া নিজেকে 'দুর্বল', 'পাপী' বলিয়া মোহাবিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে— এ দৃশ্য স্বামীজীকে নিরন্তর মর্মপীড়া দান করিত। জাতি-বর্ণনির্বিশেষে মানুষকে সম্পূর্ণ সচেতন করা— ইহাই তাঁহার জীবনব্রত বলিয়া তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, স্বামীজী তাঁহার বিভিন্ন ভাষণে বা রচনায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্ব-তত্ত্বটি সকল ধর্মের একটি প্রধান আলম্বন। কোন কোন ধর্মে এই তত্ত্বটি অত্যন্ত সহজসরল ভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিবৃত। কোথাও বা ইহা রূপক আখ্যায়িকার দ্বারা আবৃত মাত্র।[৪]

স্বামীজী আরও ঘোষণা করেন যে, উপনিষদের এই তত্ত্বটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অবশ্যই

---

২ "It must never be forgotten that it was the Swami Vivekananda who while proclaiming the sovereignty of the Advaita Philosophy.. also added to Hinduism the doctrine that Dvaita, Visishtadvaita and Advaita are but three phases or stages in a single development of which the last-named constitutes the goal."—Sister Nivedita : Introduction to the Complete Works of Swami Vivekananda.

৩ "আমি ঈশ্বরকৃপায় এমন এক ব্যক্তির পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম, যাঁহার সমগ্র জীবনই উপনিষদের মহাসমন্বয়রূপ এতদ্বিধ ব্যাখ্যাস্বরূপ—যাঁহার উপদেশ অপেক্ষা জীবন সহস্রগুণে উপনিষদের জীবন্ত ভাষ্যরূপ।"—ভারতে বিবেকানন্দ : সর্বাবয়ব বেদান্ত

৪ Complete Works of Swami Vivekananda. Vol. I. Lecture on 'Soul, God and Religion'.

প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সর্বশক্তিমান আত্মায় বিশ্বাসী হইয়া মানুষকে 'অভীঃ'— নির্ভয় হইতে হইবে। 'আমি দুর্বল' 'আমি পাপী'— এইরূপ আত্মঘাতী ভ্রমজাল সিংহের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তাহাকে আত্মশক্তিতে, আত্মমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। 'দুর্বল', 'দুর্বল', 'পাপী', 'পাপী' বলিয়া চিৎকার করিলে 'পাপ' 'দুর্বলতা' কিছু দূর হইবে না। অন্তরের তেজবীর্য প্রবল প্রেমের আকরের সহিত যুক্ত হইলেই নিমেষে 'পাপ' 'দুর্বলতা' চলিয়া যাইবে। আর সেই আকরের সহিত যুক্ত হইবার উপায়ই হইল উহা আমাতে আছে, উহা আমার স্বরূপ, ইহা বিশ্বাস করা।[৫]

উপনিষদ্ স্বামীজীর এত প্রিয়, কারণ উপনিষদ্ মানবের দেবত্বকে অত্যন্ত সোজাসুজিভাবে ও প্রাঞ্জল ভাষায় ঘোষণা করিতেছে— এমন গম্ভীর এমন মহত্বব্যঞ্জক ভাষায় প্রকাশ করিতেছে যে, সে ভাষা জগতের যে কোন সাহিত্যের, শ্রেষ্ঠ কাব্যের সমমর্যাদা দাবি করিতে পারে।

> ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
> নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
> তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বম্
> তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥ (কঠঃ)

ইত্যাদি স্থলে নেতিবাচক শব্দ প্রয়োগেই যেমন গভীরভাবে আত্মার মহিমা সূচিত হইয়াছে অথবা "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" মন্ত্রে অথবা নচিকেতা উপাখ্যানে যেভাবে হৃদয়গ্রাহী রূপক ব্যবহৃত হইয়াছে— স্বামীজী বিমুগ্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করেন তাহার তুল্য অপূর্ব কাব্য, অনবদ্য রূপক আর কোথায় পাওয়া যাইবে।[৬]

উপনিষদুক্ত আত্মার মহিমায় বিশ্বাসী হওয়া ও 'অভীঃ' হওয়ার শিক্ষা আজ বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষকে গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের শারীরিক মানসিক নৈতিক সর্বপ্রকার দুর্বলতা দূরীকরণের জন্য উপনিষদের এই প্রাণপ্রদ শিক্ষার আবশ্যকতা সর্বাধিক। উপনিষদের শিক্ষানুযায়ী যিনি আত্মচিন্তা করিবেন, যে কর্মক্ষেত্রেই থাকুন না কেন, তিনি নিজের ও সমাজের হিতসাধন করিতে সমর্থ হইবেন। সর্বশক্তিমান আত্মা বলিয়া নিজেকে সর্বদা চিন্তা করিলে একজন বিদ্যার্থী আরো ভালো বিদ্যার্থী হইবেন, শিক্ষক আরও ভালো শিক্ষক হইবেন, একজন মুচি উৎকৃষ্টতররূপে জুতা মেরামত করিতে পারিবেন। স্বামীজী নির্দেশ দিয়াছেন— এই ভাবে উপনিষদের তত্ত্বকে দৈনন্দিন জীবনের প্রতিপদক্ষেপে প্রয়োগ করিতে হইবে— বনের বেদান্তকে ঘরে আনিতে হইবে।

স্বামীজী দেখাইয়াছেন, বেদান্ততত্ত্বের সহিত ব্যবহারিক জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এই ভারতবর্ষে নূতন কিছু নয়। কেননা মহাকর্মতৎপর ক্ষত্রিয়গণও ছিলেন উপনিষদের তত্ত্বসমূহের আবিষ্কারক ও বেত্তা। আর উপনিষদের শ্রেষ্ঠ

---

৫ "উপনিষদসমূহ শক্তির বৃহৎ আকরস্বরূপ। উপনিষদ্ যে শক্তিসঞ্চারে সমর্থ, তাহাতে উহা সমগ্র জগৎকে তেজস্বী করিতে পারে। উহার দ্বারা সমগ্র জগৎকে পুনরুজ্জীবিত এবং শক্তি ও বীর্যশালী করিতে পারা যায়।"

"মানব কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করে, মানবের দুর্বলতা কি নাই? উপনিষদ্ বলেন, আছে বটে, কিন্তু অধিকতর দুর্বলতা দ্বারা কি এই দুর্বলতা দূর হইবে? ময়লা দিয়া কি ময়লা দূর হইবে?.. জগতের সাহিত্যের মধ্যে কেবল ইহাতেই 'অভীঃ'—'ভয়শূন্য' এই শব্দ বার বার ব্যবহৃত হইয়াছে—আর কোন শাস্ত্রে ঈশ্বর বা মানবের প্রতি 'অভীঃ'—'ভয়শূন্য' এই বিশেষণ প্রযুক্ত হয় নাই।"

— ভারতে বিবেকানন্দ : ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা

৬ তদেব।

ভাষ্য যে গীতা— তাহার পটভূমিকাও দেখিতেছি একটি কর্মচঞ্চল রণক্ষেত্র, তাহার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় এই আদর্শের প্রকাশ— "তীব্র কর্মের মধ্যে আত্মার সীমাহীন প্রশান্তি অনুভব।" (বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড : কর্মজীবনে বেদান্ত, পৃষ্ঠা ২২০)। তবে আমাদের যতদূর জানা আছে তাহাতে মনে হয়, উপনিষৎ-তত্ত্বকে শিক্ষায়, সাহিত্যে, শিল্পে, সমাজসংস্কারে এক কথায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বামীজী যেমন ভাবে প্রয়োগ করিবার কৌশল ও পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন তেমনটি অন্যত্র কোথাও দেখা যায় না।

স্বামীজী বলেন, "জগৎ আমাদের উপনিষদ্ হইতে আর এক মহান্ উপদেশ লাভ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে— সমগ্র জগতের অখণ্ডত্ব।"[৭] বিজ্ঞান কেবলমাত্র জড়জগতের একত্বভাবটা আবিষ্কার করিয়াছে— বেদান্তের চরম একত্বে উপনীত হইতে বিলম্ব আছে। কিন্তু ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে আমরা ঐ একত্বের অভিমুখী হইতেছি। "আন্তর্জাতিক সংহতি! আন্তর্জাতিক সংঘ! আন্তর্জাতিক বিধান! ইহাই আজকালকার মূলমন্ত্রস্বরূপ! সকলের ভিতর একত্বভাব কিরূপ বিস্তৃত হইতেছে ইহাই তাহার প্রমাণ।"[৮]

জগৎ যে ধীরে ধীরে উপনিষদের— "জীবাত্মা স্বভাবতঃ পূর্ণ" এই মতবাদের দিকেও আমাদের অলক্ষ্যে অগ্রসর হইতেছে, সেদিকে স্বামীজী অঙ্গুলি-সংকেত করিয়াছেন। "পূর্বে সবই স্বভাবতই মন্দ বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রথা ছিল," কিন্তু যতই দিন যাইতেছে ততই "কি শিক্ষা-প্রণালীতে, কি অপরাধিগণের শাস্তিবিধানে, কি উন্মত্ত-চিকিৎসায়" সর্বত্র মানুষ স্বভাবতঃ ভাল, কেবল আগন্তুক কারণে সেই 'ভাল'টি চাপা পড়িয়া আছে— এই মতবাদ সর্বত্র গৃহীত হইতেছে।" "এখন কারাগারকে সংশোধনাগার বলা হয়।" এইরূপে "জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে— প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরেই ঈশ্বরত্ব বর্তমান— এই ভারতীয় ভাব ভারতেতর অন্যান্য দেশে পর্যন্ত নানাভাবে ব্যক্ত হইতেছে।"[৯]

ভারতবাসীকে উপনিষদ্-চর্চা বিশেষভাবে করিতে হইবে, কেননা, উপনিষদ্ ভারতীয় চিন্তাজগৎকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। উপনিষদ্‌কে না বুঝিলে ভারতের চিন্তারাজিকে বোঝা যাইবে না। বৈদিক হিন্দুধর্মের ত কথাই নাই— জৈন ও বৌদ্ধধর্মও উপনিষদের ভাবধারাই গৌণভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। বুদ্ধদেব যে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন— স্বামীজীর সুস্পষ্ট অভিমত, তাহাও উপনিষদের ধর্ম— "যে ধর্ম উপনিষদে জাতিবিশেষে বদ্ধ হইয়াছিল বুদ্ধদেব তাহারই দ্বার ভাঙ্গিয়া সরল কথায়, চলিত ভাষায় খুব ছড়াইয়াছিলেন"।[১০]

আবার হিন্দুজাতির পুনর্জাগরণে উপনিষদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্বামীজী বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম বহু শাখাপ্রশাখা-সমন্বিত — বহুপ্রকার আপাতবিরোধী মত পথ ও আচারে আচ্ছন্ন। এই হিন্দুধর্মের ঐক্য জানিতে হইলে উপনিষৎ পাঠ একান্ত আবশ্যক। কেননা সকল সম্প্রদায় উপনিষদের প্রামাণ্য একবাক্যে স্বীকার করেন। নিজেদের মত অনুসারে তাঁহারা উপনিষদের যে ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন তাহাই

---

৭ তদেব।

৮ তদেব।

৯ তদেব।

১০ পত্রাবলী ১ম ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ৪৩

তাঁহাদের সম্প্রদায়ের ভিত্তি। ব্যাখ্যা বিভিন্ন হইলেও উপনিষদের প্রামাণ্যে দ্বিমত কাহারও নাই। আর এই বিভিন্ন ব্যাখ্যার সমন্বয় কিভাবে সম্ভব স্বামীজীর মতানুসারে তাহা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি।

উপনিষদের সহিত স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি অন্যান্য হিন্দুধর্মশাস্ত্রের সম্বন্ধ সুস্পষ্টভাবে জানা আবশ্যক। স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রের লক্ষ্য উপনিষৎ-তত্ত্ব সাধারণের নিকট সহজবোধ্যভাবে প্রচার করা এবং উপনিষদের তত্ত্ব অনুসারে সামাজিক রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান নির্ণয় করা, প্রবর্তন করা। দেশ-কাল-পাত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল রীতিনীতি আচার-অনুষ্ঠানের কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়াছে ও হইবে—উপনিষদের সহিত সামঞ্জস্য অব্যাহত রাখিয়া যুগে যুগে নূতন স্মৃতি রচিত হইবে। স্মৃতিপুরাণাদির প্রামাণ্য ততক্ষণ, যতক্ষণ তাহারা শ্রুতি বিশেষতঃ উপনিষদ্‌কে মানিয়া চলে। উপনিষদের প্রামাণ্য চিরকাল, কেননা ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতি উপনিষদ্ বর্ণিত তত্ত্ব দেশকালের গণ্ডীর উর্ধ্বে। সাধারণ অনেক আচার-অনুষ্ঠান— যেগুলি এককালে হয়ত প্রয়োজনীয় ছিল, কিন্তু বর্তমানে অচল ও অগ্রগতির প্রতিবন্ধক— একটু লঙ্ঘিত হইলে বা উঠিয়া গেলে গোঁড়া পণ্ডিতগণ হতাশ্বাস হন—মনে করেন হিন্দুধর্ম সমূলে উৎখাত হইল। স্বামীজী বলেন, এইরূপ মনোভাব নিতান্তই প্রমাদপূর্ণ। উপনিষদ্‌ভিত্তিক ধর্মের মূল তত্ত্বসমূহ নিরাবরণ রাখিলে তুচ্ছ তুচ্ছ গ্রাম্য-আচার, লোকাচার বা স্ত্রী-আচারের শত পরিবর্তনেও হিন্দুধর্মের কোনও ক্ষতি হইবে না, বরং যুগোপযোগী ঐরূপ পরিবর্তনের দ্বারা উহা প্রাণচাঞ্চল্যে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। ইতিহাসই প্রমাণ করে, দেশাচার লোকাচারের এইরূপ বহু বহু পরিবর্তন সত্ত্বেও হিন্দুধর্ম টিকিয়া থাকিতে পারিয়াছে।

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি যাহাতে স্বচ্ছ হয় সেইজন্য স্বামীজী উপনিষদ্-চর্চার উপর এত গুরুত্ব প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কোমলমতি বালক-বালিকাদের ছোটবেলা হইতে উপনিষদ্ ও তাহার ভাষ্যস্বরূপ গীতা পাঠ না করাইয়া "বামাচারতন্ত্র রূপ—ভয়ানক জিনিস" তাহাদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইতেছে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী অতিশয় মর্মাহত হইয়াছিলেন। কলিকাতায় বক্তৃতামঞ্চে তিনি সমাজের অভিভাবকস্থানীয়দের তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন— "তাহাদের (বালক-বালিকাদের) নিকট হইতে সেগুলি কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে প্রকৃত শাস্ত্র—বেদ উপনিষদ্ গীতা— পড়িতে দাও।"[১১]

মরজীবনের শেষদিনটিতে পর্যন্ত স্বামীজী শিষ্যদের লইয়া বেদ অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন — ভাষ্যাদির উপর ততটা নির্ভর না করিয়া স্বাধীনভাবে প্রত্যেক মন্ত্রের উপর গভীরভাবে চিন্তা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এবং ঐদিন অপরাহ্ণেও বেদবিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে গুরুভ্রাতা স্বামী প্রেমানন্দের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন। গুরুভ্রাতা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—"বেদপাঠে কি উপকার হবে?" স্বামীজী সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ উত্তর দিলেন— "আর কিছু না হোক কুসংস্কারগুলো তো দূর হবে।"

---

১১ ভারতে বিবেকানন্দ : সর্বাবয়ব বেদান্ত

অদ্বৈতবেদান্তে ভক্তির স্থান

স্বামী স্মরণানন্দ

দ্বৈতং মোহায় বোধাৎ প্রাগ্ জাতে বোধে মনীষয়া।
ভক্ত্যর্থং কল্পিতং দ্বৈতমদ্বৈতাদপি সুন্দরম্॥ —মধুসূদন সরস্বতী

জ্ঞানোদয়ের পূর্বে দ্বৈত ভ্রান্তির কারণ; কিন্তু মনীষা সহায়ে জ্ঞানোদয়ের পরে ভক্তির জন্য কল্পিত দ্বৈত অদ্বৈত অপেক্ষাও সুন্দর।

ভূমিকা:

সাধারণ একটা ধারণা, বলতে গেলে ভুল ধারণা এই যে, অদ্বৈতবেদান্ত ভক্তিমার্গের বিরোধী। এর চাইতে অসত্য আর কিছু হতে পারে না, কারণ অদ্বৈতবেদান্ত প্রকৃতপক্ষে কোন অধ্যাত্মমার্গেরই বিরোধী নয়। গৌড়পাদ বলেছেন: দ্বৈতবাদিগণই আপন আপন বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্তে দৃঢ় নিশ্চিত হয়ে পরস্পর বিরোধ করে থাকেন, কিন্তু তাদের সঙ্গে অদ্বৈতপক্ষের কোনও বিরোধ নাই। (মাণ্ডূক্য কারিকা, ৩।১৭)

অনেক একনিষ্ঠ অদ্বৈতবাদী, এমনকি অদ্বৈত-শিরোমণি শ্রীশংকরও পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁরা ভক্তিপথ অনুসরণ করেছিলেন, কারণ তাঁরা 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'-রূপ অদ্বৈতসিদ্ধান্তের সঙ্গে ভক্তিযোগ-সম্মত সিদ্ধান্তের কোন বিরোধ দেখতে পাননি।

নানা পথ দিয়ে চরম উপলব্ধিতে পৌঁছানো যায়। তাদের মধ্যে ভক্তিমার্গকে লক্ষ্যে উপনীত হবার অন্যতম বিশেষ কার্যকরী পদ্ধতি বলে সকল ধর্মই স্বীকার করেছেন, এমনকি অদ্বৈতবাদীরাও।

ভক্তিমার্গ মানবমনের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করে, তা হ'ল: বাহ্য বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ। জন্মাবধি মানুষ বিষয়ের প্রতি আসক্ত বা বিরক্ত। যা কিছু প্রীতিপ্রদ ও সুন্দর তা তাকে আকর্ষণ করে। ভেতরের একটা শূন্যতাকে পূর্ণ করতে চাওয়ার অন্তর্লীন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে এই আকর্ষণের মূল নিহিত, যদিও তাকে সে সব সময়ে পরিষ্কারভাবে বোঝে না। আমরা মনে করি, যদি আমরা এটা না ওটা পাই, তবে সম্পূর্ণ সুখী হব। এই পাবার আকাঙ্ক্ষা প্রায়ই জড়বস্তু সম্পর্কিত। কিন্তু মানুষের প্রতি—পতি পত্নী সন্তান বন্ধু বান্ধব প্রভৃতির প্রতি মানুষের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ তা প্রবলতর।

ভক্তিমার্গ এই স্বাভাবিক আকর্ষণকে ঊর্ধ্বায়িত করতে চায়—একটা নৈর্ব্যক্তিক সত্তার অভিমুখে—ঈশ্বরের দিকে তার মোড় ফিরিয়ে দিতে চায়, যদিও তা নৈর্ব্যক্তিক ভাবে নয়; অর্থাৎ মনকে কোনও মূর্তিতে, কোনও ইষ্টদেবতাতে একাগ্র করে দিয়ে। এই ইষ্টদেব, এই সগুণ সাকার ঈশ্বর মানবমনের ধারণাগ্রাহ্য সকল মহৎ গুণরাশির আধার। নৈর্ব্যক্তিক কোন কিছুকে ভালবাসা সত্যিই খুব কঠিন। কোনও ব্যক্তি বা বস্তু যা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভূত হয়নি, মানুষ তাকে ভালবাসবে কি করে? এ কারণেই মূর্তির প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। এমন কি যে সব ধর্ম মূর্তি-মাধ্যমের বিরোধী তাদের অনুবর্তীরাও প্রার্থনাকালে অজ্ঞানিতভাবেই কোন না কোন প্রতীকের সহায়তা গ্রহণ করে থাকে।

অদ্বৈতবেদান্ত এই মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে—মনকে ধীরে ধীরে ইষ্টধ্যানে প্রলুব্ধ করে ভেতরে গুটিয়ে নিয়ে এসে অন্তর্জ্যোতি উপলব্ধি করতে এবং তাতে লীন হতে ভক্তির এই মাধ্যমকে মেনে নিয়েছে। অতএব ভক্তিপথ

জ্ঞানপথের বিরোধী নয়, বরং পরিপূরক। ভক্তি জ্ঞানে পর্যবসিত হয় এবং জ্ঞান ভক্তিতে; এবং চরমে জ্ঞান ও ভক্তির পার্থক্য বিলুপ্ত হয়। কারণ, চরম উপলব্ধিতে যা সৎ তাই চিৎ আর যা চিৎ তাই আনন্দ, যা ভক্তির লক্ষ্য।

জ্ঞান ও ভক্তির এরূপ মধুর মিলন কিরূপে দৃঢ়ভাবে অদ্বৈতবেদান্তের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা লাভ করল সে-বিষয়ে আমরা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

বেদ ও উপনিষদে ভক্তি :

বৈদিকযুগে আর্যগণ ইন্দ্র বরুণ বায়ু অগ্নি প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতার কাছে প্রার্থনা করতেন কাম্য বিষয় পাবার জন্য বা নানাবিধ অশুভ থেকে মুক্ত হবার জন্য। পরবর্তী কালে এই প্রার্থনাগুলি ঐ দেবগণের প্রসন্নতা লাভের জন্য পুরোপুরি প্রণালীবদ্ধ পূজা নিবেদন ও যজ্ঞরূপে ক্রমবিকশিত হয়ে উঠল। কিন্তু এসবই ছিল সকাম যাগযজ্ঞ। অনেক পরে ভাগবত ধর্মে ও অন্যান্য দ্বৈতভাবধারার ঐতিহ্যে যে নিষ্কাম অহৈতুকী ভক্তি— ঈশ্বরের প্রতি পরমপ্রেমে বিকশিত হয়ে উঠেছিল তা'থেকে এই সব যাগযজ্ঞ ছিল বহুদূরে। তবু কখনও কখনও আমরা কিছু কিছু বৈদিক স্তবের সাক্ষাৎ পাই, যেখানে ঈশ্বরের মহিমা কীর্তিত হয়েছে, প্রতিদানে কিছু চাওয়া হয়নি। যেমন,— 'হে প্রিয়মেধগণ, তোমরা অর্চনা কর— বিশেষরূপে অর্চনা কর। বালকেরাও অর্চনা করুক। দৃঢ় পুরস্বরূপ তাঁকে অর্চনা কর। গর্ গর্ (বাদ্য) বাদিত হচ্ছে, গোধা ও জ্যা চতুর্দিকে শব্দ করছে। আমাদেরও স্তবগান ঈশ্বরাভিমুখে উর্ধ্বায়িত হোক।' (ঋগ্বেদ ৮৬৯।১০-৯ —ভাবানুবাদ)। 'অন্তরে আমার শুভ সঙ্কল্প-সমূহ সমুদিত হচ্ছে, ভক্তিভাবরাশি স্ফূর্তি পাচ্ছে, সকল দিকে তা বিকীর্ণ হচ্ছে। এদের ছাড়া সান্ত্বনাপ্রদ আর কি আছে! আমার সকল কামনা দেবতাদেরই অভিমুখে বাঁধা রয়েছে।' (ঐ, ১০।৬৪।২, ঐ)।

এই সব যাগযজ্ঞ ও স্তবের পরিবর্তে অচিরকাল-মধ্যে দেখা দিল নানারকমের সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক উপাসনা যার মাধ্যমে ধ্যাতা ধ্যেয়বস্তুর সঙ্গে একাত্ম হতে সচেষ্ট হতেন। বৈদিক সূক্ত-সাহিত্যে এবং উপনিষদেও ঋষিদের অনুভবগুলি মূর্তরূপ পেয়েছে। সেগুলো অতি উচ্চ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক সত্যের বাঙ্ময় প্রকাশ। প্রধান উপনিষদ্‌গুলিতে 'ভক্তি' শব্দটি প্রায় অনুল্লেখিত— শ্বেতাশ্বতর ছাড়া। শ্বেতাশ্বতরে আছে :

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ৬।২৩

—ঈশ্বরের প্রতি যাঁর পরাভক্তি, এবং ঈশ্বরের প্রতি যেমন গুরুর প্রতিও সেইরকম ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার কাছেই উপনিষদে উক্ত এই সব বিষয় প্রকাশিত হয়। মুণ্ডক উপনিষদে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে দুটি পাখির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে— একটি পর্যায়ক্রমে মিষ্ট ও কটু ফল খাচ্ছে আর অপরটি কিছুই খাচ্ছে না— শুধু আপন মহিমায় মগ্ন হয়ে আছে। নীচের শাখার পাখিটি ক্রমাগত উপরের পাখিটিকে দেখছে আর তারই মত দুঃখ থেকে মুক্ত হতে চাইছে। এর তাৎপর্য এই যে, পরমাত্মার নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানের দ্বারাই জীব তাঁর সঙ্গে মিলে এক হয়ে যেতে পারে। একথা মনে রাখা দরকার, উচ্চতর স্তরের ভক্তিতে নানা রকমের আচার অনুষ্ঠানের চেয়ে প্রিয়তমের অবাধ স্মরণই বড় কথা। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ একে আত্মার স্বকীয় স্বরূপের প্রতি অনুরাগ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। কারণ, আত্মা সর্বব্যাপী : 'ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্ম-নস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি···'— পতির জন্যই যে পতি (পত্নীর) প্রিয় হন তা নয়; (পত্নীর) আপনার আত্মার জন্যই পতি প্রিয় হন।' ইত্যাদি (বৃহঃ উঃ ২।৪।৫)।

অতএব যদিও আমরা বেদ-উপনিষদে ভক্তির

বীজ দেখতে পাই, তবু ঈশ্বরের জন্মই ঈশ্বরকে ভালবাসা— এই পরিপূর্ণ মহিমায় প্রকাশিত হ'তে সেই ভক্তির বীজকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বর্ধিত হতে হয়েছিল। অবশ্য বৈষ্ণব শাক্ত বা শৈব শ্রেণীতে বিভক্ত উপনিষদ্‌গুলিতে ভক্তির কথা প্রচুর রয়েছে, কিন্তু ঐগুলি প্রধান উপনিষদ্‌সমূহের সমকালীন কি না এ-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। [ক্রমশঃ]

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও ইংরেজীভাষা

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

বাংলাভাষার ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব দু'জনেই প্রাণবেগসঞ্চারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়। শ্রীচৈতন্যদেবের নিজস্ব বাক্‌ভঙ্গী আজ অনুমানসাপেক্ষ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ক্ষেত্রে আমাদের অশেষ সৌভাগ্যবশতঃ শ্রীম এবং অন্যান্য রামকৃষ্ণ-পার্ষদবৃন্দের দ্বারা তাঁর বাক্‌ভঙ্গী অনেক পরিমাণে সুরক্ষিত। এদিক থেকে যাঁরা ভাষাশাস্ত্রী তাঁরা সেযুগের আঞ্চলিক কথ্যভাসা-সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহে শ্রীরামকৃষ্ণবাণীকে মূল্যবান উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষাভঙ্গিমার একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবো। সমকালীন ইংরেজী শিক্ষিতদের সংস্পর্শে এসে প্রায় শতবর্ষের ইংরেজশাসনের ফলে আমাদের কথাবার্তায় আলাপচারীতে যে সব ইংরেজী শব্দ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল তা এই মহামানবের ভাষাকেও কিছু প্রভাবিত করেছিল। বাংলা শব্দভাণ্ডারের বৈচিত্র্যের দিক থেকে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথোপকথনে ব্যবহৃত ইংরেজী শব্দপ্রসঙ্গে পাঠকের কৌতূহল উদ্রেক করতে ইচ্ছুক।

প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা ভালো যে, মেকলের উদ্যোগে এবং তদানীন্তন ভারতশাসক উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের অনুমোদনে আমাদের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজীর একছত্র আধিপত্য স্থির হয় ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে। আর ১৮৩৬-এ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব কামারপুকুরের দরিদ্র ব্রাহ্মণকুটিরে। তাঁর পুথিগত বিদ্যার পরিধিতে আর যাই হোক ইংরেজী শিক্ষার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আর সব বিদ্যার মতো, ইংরেজী শব্দের ক্ষেত্রেও তিনি "শুনেছেন" অনেক। সেকালের ইস্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী পড়ুয়ার দল তাঁর দক্ষিণেশ্বরের ঘরটিতে অনেককাল থেকেই যাতায়াত করতো। তরুণ বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুদিন কলকাতায় থেকেছেন এবং তারপর অদূরে দক্ষিণেশ্বর থেকে প্রায়ই কলকাতায় যাতায়াত করতেন। সুতরাং তাঁর সদাজাগ্রত কৌতূহলী মন ও শ্রবণ সেকালের ইংরেজীশিক্ষিতদের ধরনধারন কথাবার্তা ভাবভঙ্গী ভালোভাবেই লক্ষ্য করেছিল। তাছাড়া যে সময়ে তাঁর আলাপচারী ও উপদেশাবলী বাংলা ও ইংরেজী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে থাকে, সে সময় এই ইংরেজীশিক্ষিতের দলই তাঁর প্রধান শ্রোতা এবং সেই শ্রোতাদের ভাব ও প্রকাশের অনুরূপ শব্দ ব্যবহারও তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। শ্রোতার মানসিক স্তর ও পরিবেশ অনুযায়ী আলাপনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিস্ময়কর দক্ষতার অজস্র নিদর্শন 'কথামৃতে'র পাতায় পাতায়।

আরো একটি কথা এই সঙ্গে বলে রাখা ভালো। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইংরেজীশব্দ ব্যবহার করেছিলেন, এ আমাদের কৌতূহলী মনের অন্বেষণজাত আলোচনা। কিন্তু তাঁর সাধনা, আদর্শ, উপলব্ধি

ইংরেজীভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে কেশবচন্দ্র বিবেকানন্দ অভেদানন্দ ম্যাক্সমূলর নিবেদিতা ক্রীষ্টোফার ঈশারুড -- এমনি নানাজনের লেখনী-মাধ্যমে। স্বামীজীর কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়— "ভাষা ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান, ভাষা পরে।" —কথাটি অবশ্য বাংলাভাষা-প্রসঙ্গে। কিন্তু সব ভাষার ক্ষেত্রেই এ কথা স্মরণীয়। ইংরেজীভাষায় যে সুবিশাল শ্রীরামকৃষ্ণসাহিত্য গড়ে উঠেছে, তার মূলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপলব্ধিময় জগৎ। সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজনের কথা মনে রেখেই আপাততঃ আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্যবহৃত ইংরেজী শব্দপ্রসঙ্গে বক্তব্য সীমাবদ্ধ করি।

সর্বভাবের সমন্বয়কারী শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের শেষ ইংরেজী বৎসরটিতে (১৮৮৬) তিনি কাশীপুরে অধ্যাত্ম-অনুভূতির ক্ষেত্রে সমবেত ভক্তমণ্ডলীর কাছে 'কল্পতরু'-রূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন। সেই থেকে পয়লা জানুআরি বাংলাদেশের বিশেষ একটি পুণ্যদিন— কেবলমাত্র ইংরেজী নববর্ষ বলেই স্মরণীয় নয়। হয়তো এই ঘটনা নিতান্ত আকস্মিক যোগাযোগ নয়, এরই মাধ্যমে পাশ্চাত্য-জগতের সঙ্গে আমাদের বাঙালী প্রাণের চিরন্তন হৃদয়সম্বন্ধ ঘটে গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথোপকথনে ইংরেজী শব্দ ব্যবহারের স্মিতহাস্যময় সৌজন্য-সূচক শব্দ ব্যবহারটি সর্বাগ্রে স্মরণ করি— "Thank you" (থ্যাঙ্ক য়ু)— ধন্যবাদ! পাশ্চাত্য আদবকায়দার এই রীতিটি আমাদের দেশে শুধুমাত্র নম্র ভঙ্গিমায় আত্মপ্রকাশ করে। যারা এখন ধন্যবাদ বলি কথায় কথায়, তারা না জেনেই পাশ্চাত্যরীতির অনুকরণ করি। এ যেমন ব্যক্তিগত ধন্যবাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য— তেমনি প্রযোজ্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদের ক্ষেত্রেও। যিনি আত্মীয়তম তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া [illegible] কিছুই না দেওয়া সেকথাটি অনুকরণের মোহে ভুলে যাই। তবু মাঝে মাঝে এই মৌখিক স্বীকৃতিরও মূল্য আছে বই কি! সভ্যতার শ্রেষ্ঠ রীতিনীতি কোনো দেশ বা সমাজেই আবদ্ধ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও সেকালের ইংরেজীশিক্ষিতদের 'থ্যাঙ্ক য়ু' কথাটির সুপ্রয়োগের দ্বারা সেকথার প্রমাণ রেখেছেন।

১৮৮৩-র ১৯শে অগস্ট। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘরটির উত্তরপূবের বারান্দায় বসে নরেন্দ্রনাথ ও হাজরামশাই তত্ত্বালোচনায় রত। ঘরের মধ্যে ভক্তদের সঙ্গে প্রসঙ্গ ত্যাগ করে হঠাৎ ঠাকুর ওই বারান্দায় চলে এলেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — কি গো! তোমাদের কি সব কথা হচ্ছে?

নরেন্দ্র (সহাস্যে)— আমাদের কত কি কথা হচ্ছে— 'লম্বা' 'লম্বা' কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)— কিন্তু শুদ্ধজ্ঞান আর শুদ্ধাভক্তি এক। শুদ্ধজ্ঞান যেখানে শুদ্ধাভক্তিও সেইখানেই নিয়ে যায়। ভক্তিপথ বেশ সহজ পথ।

নরেন্দ্র— 'আর কাজ নাই জ্ঞানবিচারে, দে মা পাগল করে।' (মাষ্টারের প্রতি) দেখুন, হ্যামিল্‌টন্‌-এ পড়লুম— লিখেছেন, 'A learned ignorance is the end of Philosophy and the beginning of Religion.'

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)— এর মানে কি গা?

নরেন্দ্র— ফিলসফি (দর্শনশাস্ত্র) পড়া শেষ হলে মানুষটা পণ্ডিতমূর্খ হয়ে দাঁড়ায়, তখন ধর্ম ধর্ম করে। তখন ধর্মের আরম্ভ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)— Thank you! Thank you! (হাস্য)" (কথামৃত, ১ম ভাগ)।

হ্যামিল্টনের উক্তির স্পষ্ট প্রত্যক্ষরূপ তখন নরেন্দ্রনাথে মূর্ত। বহু জিজ্ঞাসার সমুদ্র পার হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণপদপ্রান্তে তাঁর যথার্থ অধ্যাত্মজীবন শুরু হয়েছে। আর নরেন্দ্রনাথ যে এমন কথা

অন্তর থেকে উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন, সে কথা জেনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরমপ্রসন্নতার আনন্দরূপ ওই 'Thank you'— উচ্চারণে।

অবশ্য 'কথামৃতে' বিধৃত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আলাপচারীতে কালানুক্রমিকভাবে দেখলে এর আগে সুরেন্দ্রের আত্মীয় কৃতবিদ্য বৈদ্যনাথের সঙ্গে আলাপপ্রসঙ্গেও 'Thank you'-র ব্যবহারটি লক্ষণীয়। সেদিন (১৫ই এপ্রিল, ১৮৮৩) কথা-প্রসঙ্গে বৈদ্যনাথকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন— "তর্ক করা ভাল নয়, আপনি কি বলো ?

বৈদ্যনাথ— আজ্ঞে হাঁ, তর্ক করা ভাবটি জ্ঞান হলে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ— Thank you (সকলের হাস্য) তোমার হবে !"

এ দুই ক্ষেত্রেই শ্রোতার অন্তরে সত্যগ্রহণের উন্মুখতাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভিনন্দনমূলক ধন্যবাদের কারণ, কিন্তু প্রয়োগের দিক থেকেও সৌজন্য ও সহৃদয়তার বিশিষ্ট প্রয়োগ। তবে ভাব-ব্যঞ্জনায় প্রথম উদাহরণটিই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে সমধিক স্মরণীয়। ইংরেজীশিক্ষিত লোকদের শ্রীরামকৃষ্ণদেব কখনো কখনো English-man (ইংলিশম্যান) বলতেন— যেমন দেখি কথামৃতের দ্বিতীয় খণ্ডে। "মণি ঠাকুরের কাছে প্রায় দুই বৎসর আসিতেছেন। তিনি ইংরাজী পড়েছেন। ঠাকুর তাঁহাকে কখন কখন ইংলিশ-ম্যান বলিতেন।" (৯ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩)।

এই ইংরেজীনবীশদের মধ্যে কেউ তিনটে পাস (Pass) কেউ আড়াইটে। বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষা প্রবর্তিত হবার পর পাস করা বিদ্যার তকমা তখন সামাজিক মর্যাদা বা চাকুরিপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে। পাস করা বিদ্বান সন্তানদের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যেমন অনুরাগ, তেমনি অনুরাগ পরীক্ষায় ফেল করা ভক্তের প্রতি। একান্ত স্নেহের বাবুরাম প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করেছে শুনে বলছেন— "ভালই তো, ও পাশমুক্ত হল। যার যটা পাস তার তটা পাশ।" পরীক্ষা পাস যে আর এক দিক থেকে সংসারপাশ হয়ে দেখা দেয়, সে কথাটি এই ত্যাগিশ্রেষ্ঠের বাণীতেই আমরা মনে রাখতে পারি।

সেকালের ইংরেজীপড়ুয়াদের বোলচাল দেখে অভ্যস্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপমায়ও এদের কথা এসে পড়েছে। মানবজীবনে সঙ্গগুণের প্রভাব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একদিন ব্রাহ্মভক্তদের বলছেন— "মন নিয়ে কথা। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মন যে রঙে ছোপাবে সেই রঙে ছুপবে।··· দেখ না, যদি একটু ইংরাজী পড, তো অমনি মুখে ইংরাজী কথা এসে পড়ে। ফুট-ফাট, ইট-মিট (সকলের হাস্য)। আবার পায়ে বুট জুতা, শিস্ দিয়ে গান করা— এই সব এসে জুটবে। ··" (কথামৃত, ১ম ভাগ : ২১শে অক্টোবর, ১৮৮২)।

অল্প কথার আঁচড়ে সেকালের ইংরেজী-শিক্ষাভিমানীদের ধরনধারন সুন্দর ফুটেছে, একটু অদলবদল করে নিলে একালের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। সেকালের বাবুদের ঈশ্বরপ্রীতিতেও বিলিতি ঢঙ্-মাখানো। বিষয়ীদের ক্ষণকালের ঈশ্বরচিন্তার উপমায় তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব এক আশ্চর্য জীবন্ত ছবি এঁকেছেন— "···'যেমন কোন ফিট্‌বাবু, পান চিবুতে চিবুতে, ছিক হাতে করে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে একটি ফুল তুলে বন্ধুকে বলে,— ঈশ্বর কি বিউটিফুল (beautiful, সুন্দর) ফুল করেছেন।' (কথামৃত, ১ম ভাগ)। এক্ষেত্রে ফিট্‌বাবুর ফিট্ এসেছে ইংরেজী Fit থেকে। বাংলায় অলঙ্কার শব্দযোগে তা হয়েছে ফিট্ কাট, আর সমাসবদ্ধ হয়ে ফিট্‌বাবু। ভাষাতত্ত্বের বিচারে একে বলে জোড়কলম শব্দ। লক্ষণীয়, ফিট্‌বাবুর বর্ণনার সঙ্গে, ছিক (লাঠি) হাতে, বিউটিফুল (সুন্দর) ফুল দেখার বর্ণনায় তিনটি ইংরেজী শব্দ ব্যবহৃত।

জগৎসত্যকে যিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন, তাঁর কাছে সুখদুঃখ ভালোমন্দ সবই অনন্ত ইচ্ছাময়ের অভিব্যক্তি। বাজিকর আর বাজিকরের খেলা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টিতে—"বাজিকরই সত্য। তাঁর খেলা সব অনিত্য—স্বপ্নের মত।"

বিশ্বসত্যের এই মায়ারূপ যিনি দেখেন, তিনিও সেই বাজিকরেরই সৃষ্টি, তাঁরই ইচ্ছায় দেখছেন। একথাটি বোঝাতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, "…হাজার বাজী ছ্যাখো, তবু তাঁর অণ্ডরে (Under, অধীন)। পালাবার জো নাই, তুমি স্বাধীন নও। তিনি যেমন করান তেমনি করতে হবে। যতক্ষণ একটু আমি থাকে ততক্ষণ সেই আদ্যাশক্তির এলাকা। তাঁর অণ্ডরে— তাঁকে ছাড়িয়ে যাবার যো নেই।" (২০শে জুন, ১৮৮৪ : কথামৃত, ৪র্থ ভাগ)।

সেকালের শিক্ষিতসমাজে স্বাধীন ইচ্ছা (Free will) এবং পরোপকার ও মানবসেবা-মূলক মতবাদগুলির প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই 'Under-এ'—অণ্ডরে শব্দপ্রয়োগটি লক্ষণীয়। বিদ্যাসাগরের অন্তরের সাত্ত্বিক দয়া—সেও ঈশ্বরেরই প্রেরণা। জগতের উপকার যে মানুষে করে না, ঈশ্বরই করেন, সে কথাটি মনে করিয়ে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বসেছিলেন—'তাঁর অণ্ডরে'।

[ক্রমশঃ]

স্বামী বিবেকানন্দের মাতৃভক্তি

শ্রীরাধাচরণ রায়

আমাদের দেশে প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনন্য মাতৃভক্তির খ্যাতি আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট সুবিদিত। তিনি ছিলেন সংসারাশ্রমী, কিন্তু সন্ন্যাসী স্বামীজীর অতুলনীয় মাতৃভক্তি ও মাতৃ-অনুধ্যানের কথা অনেকের নিকট অবিদিত। যৌবনের প্রারম্ভেই স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণাশ্রিত হ'য়ে সংসারের মায়াপাশ ছিন্ন ক'রে, ভোগবাসনা পায়ে ঠেলে, মানবকল্যাণের সুমহান্ ব্রত নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ত্যাগ তিতিক্ষা বৈরাগ্য অতি কঠোর ও সুদৃঢ় ছিল। অজ্ঞ মূর্খ দুর্গত নিপীড়িত সর্বহারা দরিদ্র-নারায়ণের সেবার ভার স্বহস্তে স্বীয় স্কন্ধে তুলে নিয়ে এই বৈদান্তিক সন্ন্যাসী আপন জীবন আহুতি দিয়ে বিশ্বমাঝে এক অত্যুচ্চ আদর্শ স্থাপন ক'রে গেছেন। আহার-নিদ্রায় উদাসীন, অহর্নিশ নিপীড়িত বুভুক্ষু ও রোগার্ত নরনারীর দুঃখমোচনে তৎপর, নানা কল্যাণকর কর্মে সর্বদা নিমগ্ন থেকেও মহামানব বিবেকানন্দ একদিনের জন্যও তাঁর গর্ভধারিণী ভুবনেশ্বরী দেবীর কথা বিস্মৃত হননি। তাঁর স্নেহময়ী মাতার আদর্শ পূত জীবন তাঁর মহৎ কর্ম সমূহে প্রেরণা যুগিয়েছে—এ কথা তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে বলে গেছেন।

সুদূর আমেরিকা থেকে স্বামীজী তাঁর দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন পরিচালনা সম্পর্কে যেসব গুরুত্বপূর্ণ পত্র দিতেন তাতেও তাঁর জননীদেবীর প্রসঙ্গ দেখতে পাওয়া যায় এবং মায়ের কি কি জিনিসের প্রয়োজন তার খবর নেবার জন্য ঐ সমস্ত পত্রে নির্দেশ থাকতো।

স্বামীজী মাঝে মাঝে বাগবাজারে শ্রীরাম-কৃষ্ণের অনন্য গৃহীভক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের

বাড়ীতে যেতেন। সেখানে গেলে সিমলার পৈতৃক বাসভবনে মায়ের কাছে গিয়ে তাঁকে দর্শন ক'রে আসতেন। যখন মঠে থাকতেন, তখনও মাঝে মাঝে কলকাতায় গিয়ে মাকে দেখা দিয়ে আসতেন। কদাচিৎ ভুবনেশ্বরীদেবী মঠে এসে পুত্রকে দেখে যেতেন। মায়ের কাছে সেই জগদ্বিখ্যাত স্বামীজীকে যেন একটি ছোট শিশুর মতো মনে হ'তো।

স্বামীজী যে তাঁর মায়ের কথা, শত কাজের মধ্যে থেকেও ভাবতেন, তার ভূয়োভূয়ঃ পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৮৯ খ্রীঃ ৪ঠা জুলাই বাগবাজার থেকে কাশীনিবাসী জমিদার প্রমদাদাস মিত্রকে নানা বিষয়ের অবতারণায় পূর্ণ চিঠিতে লিখেছেন —তাঁর মা আর তাঁর দুই ভাইয়ের তখনকার দুরবস্থার কথা। তাঁর পিতৃবিয়োগের পর তাঁদের খুবই অশান্তিজনক পরিস্থিতিতে কাল কাটাতে হয়েছে— এ কথারও উল্লেখ করেছেন : 'ইহাদের অবস্থা পূর্বে অনেক ভাল ছিল, কিন্তু আমার পিতার মৃত্যু পর্যন্ত বড়ই দুঃস্থ, এমন কি কখন কখন উপবাসে দিন যায়। তাহার উপর জ্ঞাতিরা দুর্বল দেখিয়া পৈতৃক বাসভূমি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন; হাইকোর্টে মকদ্দমা করিয়া যদিও সেই পৈতৃক বাটীর অংশ পাইয়াছেন, কিন্তু সর্বস্বান্ত হইয়াছেন।'

অসুস্থ অবস্থায় স্বামীজী কিছুদিন বাগবাজার-নিবাসী বলরাম বসুর বাড়ীতে অবস্থান করে-ছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ আহার-নিদ্রা ভুলে গিয়ে স্বামীজীর শুশ্রূষায় অষ্ট প্রহর লেগে থাকতেন। স্বামীজী কিসে নিরাময় হবেন এই ছিল তখন তাঁর ধ্যান জপ তপ। এই সময় একদিন স্বামীজীর পৈতৃক বাড়ীর এক পুরানো ঝি বলরাম বসুর বাসায় স্বামীজীকে দেখতে এসে বিফল-মনোরথ হয়ে ফিরে যায়। এই দাসীটি স্বামীজীকে পুত্রের মতো দেখতো। স্বামীজী পূর্বরাত্রে রোগযন্ত্রণায় ঘুমাতে পারেননি তাই তন্দ্রাভিভূত হয়েছিলেন। দরদী ব্রহ্মানন্দ ভাবলেন—অযথা রোগীর শান্তির ব্যাঘাত ক'রে কাজ কি?

নিদ্রাভঙ্গের পর স্বামীজী সকল কথা জেনে তক্ষুনি একটি ঠিকা গাড়ী ক'রে রোগজীর্ণ দেহে মাতৃ-সকাশে ছুটলেন। স্বামীজী ভেবেছিলেন, নিশ্চয়ই কোন দরকারে তাঁর মা ঝিকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। পাছে মায়ের কোন অসুবিধা হয়, বা তিনি মনে কোনরূপ ব্যাথা পান এই মনে ক'রেই তিনি অসুস্থ দেহে তাঁর কাছে ছুটে এসেছিলেন— নিজের শরীরের প্রতি মোটেই দৃক্‌পাত করেননি।

গাড়ী থেকে নেমেই স্বামীজী মাকে প্রণাম ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা, তুমি ঝিকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলে কেন?' আশ্চর্য হ'য়ে মা বললেন, 'আমি তো তাকে তোর কাছে পাঠাই-নি। স্বামীজী তখন সেই দাসীকে কাছে ডাকিয়ে এনে জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারলেন যে, সে অন্য কাজে বাগবাজারের দিকে গিয়েছিল— হঠাৎ তার নরেনের কথা মনে পড়ায় সে স্বামীজীকে দেখতে গিয়েছিল। তখন স্বামীজী শান্ত হলেন।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার জনসাধারণের সম্মুখে বক্তৃতা দেবার পর একদিন স্বামীজী বলেছিলেন : 'আমি আর বড় জোর এক বছর আছি। এখন শুধু মাকে গোটাকতক তীর্থ দর্শন করিয়ে আনতে পারলেই আমার কর্তব্য শেষ হয়। তাই চন্দ্রনাথ আর কামাখ্যা যাচ্ছি।'

স্বামীজী অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। তাঁর ভাষণে স্মৃতিশক্তির বিস্ময়কর পরিচয় পাওয়া যেত। তিনি একদিন প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন, তাঁর চেয়ে তাঁর মায়ের স্মৃতিশক্তি আরও প্রখর ছিল। তাঁর বাবা ও মা উভয়েই কৃতী ছিলেন— বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলেন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সঙ্গীতের অনুপ্রেরণা, আর মায়ের নিকট থেকে—ধর্মানুরাগ

ও জীবসেবার বীজমন্ত্র। যেমন আধার তেমনি আধেয়। তিনি কৈশোরেই পিতৃহীন হন। মায়ের প্রতি শ্রদ্ধানুরাগ তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

তিনি প্রায়ই বলতেন: মাকে যে পূজো করতে না পারে, সে কখনই বড় হ'তে পারে না।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে স্বামীজী বোস্টনে ওলি বুলের গৃহে অবস্থান কালে কেম্ব্রিজবাসিনী বিদুষী রমণীগণের নিকট 'ভারতীয় নারীর আদর্শ' সম্পর্কে যে উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষণ দেন, তাতে তাঁর মাতৃভক্তি যেন মূর্তিমতী হয়ে ওঠে। সভায় উপস্থিত নারীগণ বিমুগ্ধ হ'য়ে বিবেকানন্দ-জননী ভুবনেশ্বরীদেবীকে যে পত্র প্রেরণ করেন, তাতে আছে:

"...কয়েক দিন পূর্বে তিনি (স্বামীজী) এখানে ভারতে মাতৃত্বের আদর্শ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে বলেন যে—এখানকার আবালবৃদ্ধবনিতার কল্যাণ তিনি যাহা কিছু করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা কেবল আপনার শ্রীচরণাশীর্বাদে।"

বক্তৃতাশেষে স্বামীজী অতীব শ্রদ্ধাসহকারে স্বীয় জননীর উদ্দেশ্যে হৃদয়ের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করলেন। বললেন, জননীর নিঃস্বার্থ প্রেম ও পূত-চরিত্র উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়াতেই তিনি সন্ন্যাস জীবনের অধিকারী হ'তে পেরেছেন এবং তিনি জীবনে যা কিছু সৎকাজ করেছেন, সমস্তই তাঁর সেই শ্রদ্ধাভাজন জননীর কৃপা-প্রভাবে।

তিনি যেখানেই যেতেন, আবশ্যক হ'লে, মুক্ত-কণ্ঠে স্বীয় গর্ভধারিণীর মাহাত্ম্য-কীর্তন করতেন। তাঁর অদ্ভুত সংযমশক্তি বিষয়ে স্বামীজী বলেছিলেন: আমার মায়ের ন্যায় আর কোন রমণীকে দীর্ঘকাল উপবাস করতে দেখিনি। তিনি একবার এক-টানা চোদ্দ দিন উপবাসে কাটিয়েছিলেন।

১৯০১, ডিসেম্বর মাস। স্বামীজীর দেহ-ত্যাগের সাত মাস আগের কথা। এই সময় স্বামীজীর শরীর পুনঃ পুনঃ অসুস্থ হওয়ায় জননীর ইচ্ছানুসারে তাঁর সঙ্গে কালীঘাটে পূজো দিতে যান। স্বামীজীর বাল্যকালে একবার অসুখ হ'লে জননী মানত করেন যে, অসুখ ভাল হ'লে তিনি পুত্রকে নিয়ে মায়ের পূজো দেবেন। সুদীর্ঘকাল পরে স্বামীজীর জীবনসন্ধ্যায় মায়ের এই কথা মনে পড়ায় তিনি পুত্রকে নিয়ে কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে গিয়েছিলেন—স্বামীজী তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি না ক'রে শিশুর মত মাতৃ-আজ্ঞা পালন করেন। জননীর আদেশ অনুযায়ী কালীঘাটের আদিগঙ্গায় স্নান ক'রে সিক্তবস্ত্রে মন্দিরে যান এবং ভক্তিভরে কালীমাতার পাদপদ্মের সম্মুখে তিনবার গড়াগড়ি দেন এবং সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করেন।

লোকশিক্ষক বিবেকানন্দ

শ্রীঅমিত বসু

বৈজ্ঞানিকদের বিস্ময়কর নব নব আবিষ্কারের ফলশ্রুতি হিসাবে এক ভোগমুখী বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা যখন জন্ম নিচ্ছিল পাশ্চাত্যদেশে, তখন একদিন অকস্মাৎ চিকাগো শহরে ভারতীয় আধ্যাত্মিক মহাশক্তির এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটলো। লোক-শিক্ষক স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বখ্যাতির সূচনা সেদিন থেকেই।

১৮৯৩ সালের চিকাগো ধর্মমহাসভার সেই স্মরণীয় দিনটির চমকপ্রদ বর্ণনা দিয়েছেন New Discoveries এর লেখিকা মেরি লুই বার্ক। তিনি

লিখেছেন ঠিক কি কারণে যে মহাসভার শ্রোতারা স্বামীজীর সম্বোধনের প্রথম কথাগুলি শোনামাত্রই কয়েক মিনিট ধরে উল্লসিত হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করেছিলেন তার ব্যাখ্যা সহজ নয়। সম্ভবতঃ এর আগে কখনো আমেরিকার মানুষ এমন একজনকে দেখেননি যিনি আধ্যাত্মিক সত্য ও শক্তির জীবন্ত প্রতিকৃতি।

বিবেকানন্দ আদর্শ লোকশিক্ষক— সার্থক লোকশিক্ষক। তাঁর এই সার্থকতার উৎস কোথায় ?

এই প্রশ্নের সমাধানে আমরা কথামৃতকারের সাহায্য নিই। চলে যাই ২৭শে অক্টোবর, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে। কেশব সেন ও তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব জাহাজে কোলকাতা চলেছেন। কেশবকে বলছেন: 'আমার কি ভাব জানো? আমি খাই-দাই থাকি, আর সব মা জানে। আমার তিন কথাতে গায়ে কাঁটা বেঁধে। গুরু কর্তা আর বাবা।' শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই কথাতেই যথার্থ লোকশিক্ষকের স্বরূপের পরিচয় আমরা পাই। তিনিই প্রকৃত লোকশিক্ষক, যাঁর গুরু-অভিমান নেই--- যিনি নিঃশেষে জেনেছেন— 'গুরু এক, সচ্চিদানন্দ।' শ্রীরামকৃষ্ণদেব কেশবকে বলে চলেছেন: "লোকশিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। যদি তিনি সাক্ষাৎকার হন আর আদেশ দেন, তা'হলে হতে পারে। নারদ শুকদেবাদির আদেশ হয়েছিল। শঙ্করের আদেশ হয়েছিল। আদেশ না হলে কে তোমার কথা শুনবে? ... আবার মনে মনে আদেশ হলে হয় না। তিনি সত্য সত্যই সাক্ষাৎকার হন আর কথা কন। তখন আদেশ হতে পারে। সে কথার জোর কত! পর্বত টলে যায়। ... লোকশিক্ষা দেবে তার চাপরাস চাই। না হলে হাসির কথা হয়ে পড়ে। আপনারই হয় না, আবার অন্য লোক। কানা কানাকে পথ দেখিয়ে লয়ে যাচ্ছে! ... আদেশ না থাকলে 'আমি লোকশিক্ষা দিচ্ছি' এই অহংকার হয়।"

এরপর আমরা চলে যাই ২৬শে নভেম্বর, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে। বিকেল চারটা। সিঁদুরিয়াপটিতে মণিলাল মল্লিকের বাড়ি। সেখানে উপস্থিত রয়েছেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রেমচাঁদ বড়াল ও অন্যান্য ব্রাহ্ম ভক্তেরা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন 'চিত্তশুদ্ধি লাভ করলে তবে তাঁর কৃপায় তাঁকে দর্শন হয়। দর্শনের পর আদেশ পেলে তবে লোকশিক্ষা দেওয়া যায়। আগে থাকতে লেকচার দেওয়া ভাল নয়।' ১৮৮২ সালের এমনি আর একটি দিনের কথা। নরেন্দ্রনাথ কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। রাত্রে ওখানেই ছিলেন। ভোরবেলা শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে বন্ধুরা সকলে পঞ্চবটীতে ধ্যানে মগ্ন। এমন সময় শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত হ'লেন। উনি বললেন, 'যদি হৃদয়-মন্দিরে মাধব প্রতিষ্ঠা ক'রতে চাও, তাহলে শুধু ভোঁ ভোঁ করে শাঁক ফুকলে কি হবে? আগে চিত্তশুদ্ধি কর ... আগে ডুব দাও। কেউ ডুব দিতে চায় না। সাধন নাই, ভজন নাই, বিবেক বৈরাগ্য নাই, দুই চারটে কথা শিখেই অমনি লেকচার।' ১৮৮৪ সালে পণ্ডিত শশধরকে রথযাত্রার দিন নরেন্দ্রের সামনে বলছেন, 'তুমি লোকের মঙ্গলের জন্য বক্তৃতা ক'রছ তা বেশ। কিন্তু বাবা ভগবানের আদেশ ব্যতিরেকে লোক-শিক্ষা হয় না। ঐ দুদিন লোক তোমার লেকচার শুনবে। তারপর ভুলে যাবে।'

শুধু পাণ্ডিত্য নয় তপস্যার প্রয়োজন। বস্তুতঃ ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতিতে, প্রথমেই ছিল মনঃ-সংযোগ-সাধনা, পরে শাস্ত্রবিচার। যিনি লোকাচার্য হবেন তাঁকে কামনা-বাসনা নিঃশেষে জয় করতে হবে। আবার শুধু ভিতরে নয় বাইরেও ত্যাগের দৃষ্টান্ত দরকার। এই কথা বোঝাতে গিয়ে শ্রীরাম-কৃষ্ণ সেই চিকিৎসক আর তার ঘরে রাখা গুড়ের নাগরির গল্প বলেছেন। অর্থাৎ 'আপনি আচার ধর্ম' অপরে শিখাও। লোকশিক্ষার জন্য তোড়-

জোড় করে বক্তৃতা বা উপদেশের প্রতি অনীহা প্রকাশ করে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে মাষ্টারমশাইকে বলেছিলেন, 'ঢ্যাখোনা, এই বাড়ি ভাড়া হ'য়েছে ব'লে কত রকম ভক্ত আসছে। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বা শশধরের মত সাইনবোর্ড ত হবে না,— অমুক সময় লেকচার হইবে।' এই কাশীপুরের বাড়িতেই একদিন তিনি একটি কাগজে লিখেছিলেন, 'নরেন্দ্র শিক্ষে দিবে।' অতএব ১৮৯৩ সালে যে বিবেকানন্দের কথা মাত্র পনেরো মিনিট শোনার জন্য চিকাগো ধর্মমহাসভার সহস্র সহস্র শ্রোতা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বহু বক্তার শুষ্ক বক্তৃতা অগ্রাহ্য করে অপেক্ষা করে থাকতেন, তিনি ছিলেন জগতে লোকশিক্ষার জন্য ঈশ্বরের আদিষ্ট পুরুষ। লোকে কেন তাঁর কথা শুনতে আসে, নিজেদের লালিত ধর্মবিশ্বাস, পরিচিত উপদেষ্টাদের উপেক্ষা করে কিসের টানে জ্ঞানী গুণী ও সাধারণ মানুষ স্বামীজীর সভায় ভীড় করতেন, তার কারণ খুঁজে না পেয়ে খ্রীষ্টান মিশনারিদের কেউ কেউ এ সন্দেহ প্রকাশ্যে ঘোষণাও করেছিলেন যে, এই হিন্দু সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই সহস্র সহস্র নরনারীকে এমনকি বিজ্ঞ ব্যক্তিদের 'গুণ' করেছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর স্বাভাবিক প্রজ্ঞাবলে দেখেছিলেন সেই মহাশক্তির অঙ্কুর। তিনি বলেছিলেন, 'নরেন্দ্র যখন প্রথম এলো, ময়লা একখানা চাদর গায়ে, কিন্তু চোখ মুখ দেখে বোধ হ'ল ভিতরে কিছু আছে। যখন আসতো একঘর লোক; তবু ওর পানে চেয়েই কথা কইতাম। ও বলতো, এদের সঙ্গে কথা কন, তবে কইতাম। ভোলানাথ বল্লে, একটা কায়েতের ছেলের জন্যে মশাই আপনার এরূপ করা উচিত নয়। মোটা বামুন একদিন হাত জোড় ক'রে বল্লে, মশাই ওর সামান্য পড়াশুনা, ওর জন্যে আপনি এত অধীর কেন হন?' কিন্তু বলরাম বসুর বাড়িতে কথায় কথায় শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'এত ভক্ত আসছে, ওর মত একটিও নাই। ... নরেন্দ্র কিছুর বশ নয়। আসক্তি ইন্দ্রিয়সুখের বশ নয়।' আর একদিন মাষ্টারমশাই ভবনাথ প্রভৃতিকে নরেন্দ্রকে দেখিয়ে বলছেন, 'এই ছেলেটিকে দেখেছ এখানে একরকম। দুরন্ত ছেলে বাবার কাছে যখন বসে যেমন জুজুটি, আবার চাঁদনিতে যখন খেলে তখন আর এক মূর্তি। এরা নিত্যসিদ্ধের থাক। ... এরা সংসারে আসে জীবশিক্ষার জন্য।' দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রনাথ যেন বাবার কাছে জুজুটি। আর 'New Discoveries'-এ উল্লেখিত নরেন্দ্রনাথ যেন চাঁদনীতে খেলছেন। সে এক বিশ্ব-বিজয়ী মূর্তি। এ শুধু পাণ্ডিত্যের শক্তি নয়। যুক্তি দিয়ে বাজিমাৎ নয়। কঠোর তপস্যার দ্বারা বিবেক বৈরাগ্য লাভ ক'রে যিনি হৃদয়-মন্দিরে মাধবকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন, এ তাঁর পক্ষেই সম্ভব।

পণ্ডিত শশধরকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'যদি আদেশ হ'য়ে থাকে তাহ'লে লোকশিক্ষায় দোষ নাই। আদেশ পেয়ে যদি কেউ লোকশিক্ষা দেয় তাকে কেউ হারাতে পারে না। বাগ্‌বাদিনীর কাছ থেকে যদি একটি কিরণ আসে তাহলে এমন শক্তি হয় যে, বড় বড় পণ্ডিতগুলো কেঁচোর মত হ'য়ে যায়।' এখানে লোকশিক্ষকের যে উদাহরণ তিনি রেখেছিলেন সে শুকদেব, শঙ্কর প্রভৃতির। তৎক্ষণাৎ 'New Discoveries'-এর পাতায় Mrs. Fincke-র স্মৃতিচারণ মনে পড়ে। কানেকটিকাটে সেদিনের সন্ধ্যায় একঘর বোম্বাই পণ্ডিত যখন আস্তিন গুটিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে তর্কে রত তখন ঘরের এককোণে বসে Mrs. Fincke সন্ত্রস্ত। অথচ ফল দাঁড়াল অপ্রত্যাশিত। তিনি লিখেছেন, 'I cannot tell, I only know that I felt triumphant with him.' সেদিন স্বামীজীকে দেখে তাঁর একটি কথাই মনে হয়েছিল— 'He personified power'। আর

তাঁর নিজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞ ব্যক্তিদের দেখে মনে হয়েছিল তাঁরা কতকগুলি সংকীর্ণ মত আঁকড়ে রয়েছেন— 'Wise in their conceit.' এই কথা পড়ামাত্র 'কথামৃতে' ফিরে যেতে ইচ্ছা করে, যেখানে তর্করত ডাক্তার সরকারকে দেখিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে বলছেন, 'তুই বলনা, একে বুঝিয়ে দে না।' কখনো মাষ্টারমশাই ও নরেন্দ্রকে বলছেন, 'তোমরা দুজনে ইংরাজীতে কথা কও ও বিচার করো আমি শুনব'। কখনো গিরিশকে বলছেন, 'তুমি একবার নরেন্দ্রের সঙ্গে বিচার ক'রে দেখো সে কি বলে।' যখন জনৈক ভক্ত বলছেন, 'এ সব মিছে তর্কে কি হবে?' শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্ত-ভাবে বলছেন, 'না না ওর একটা মানে আছে।' লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন: 'ঠাকুর তাঁহার অলৌকিক অন্তর্দৃষ্টিসহায়ে প্রথম সাক্ষাৎ হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন · যে কার্যে শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ সহায়তা করিবার জন্যই শ্রীযুত নরেন্দ্র জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছেন ···। তিনি নরেন্দ্রনাথকে উক্ত সুমহান্ জীবনোদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী যন্ত্রস্বরূপে গঠিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।'

একদিকে উদাসীন প্রাচ্যে বৈরাগ্যের ছদ্মবেশে তামসিক জড়তা আর এক দিকে ভোগলিপ্সায় রত পাশ্চাত্যের আত্মদর্শনহীন বিকার— এমনই এক সময় স্বামীজী জগৎকে দিলেন এক নতুন জীবনবেদ। এ সত্য তিনি আহরণ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মহাজীবন থেকে। 'His life', স্বামীজী লিখেছিলেন, 'is the living commentary on the vedas of all nations!' শিষ্য আলাসিঙ্গাকে তিনি লিখেছিলেন, 'I have a truth to teach, I, the child of God. And he that gave me the truth will send me fellow workers from the earth's bravest and best.' ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে স্বামীজী বললেন 'বেদান্তের সেই সিংহ গর্জন ক'রে উঠুক। কি হিন্দু কি বৌদ্ধ কি জৈন যে মহান ঐতিহ্যের সন্তান আমরা— আসুন আমাদের ধর্মের সেই মূল সত্যের উপর দাঁড়িয়ে বলি— আমরা জন্মহীন মৃত্যুহীন সর্বব্যাপী আদি-অন্তহীন সেই জ্যোতির্ময় সত্তার অংশ।' আমেরিকায় 'রিজ্‌লি ম্যানরে' থাকাকালীন মিস্ ম্যাকলাউড মিসেস বুল্-কে লিখেছিলেন: স্বামীজী বলছেন, 'জীবনে চরিত্র ব্যতীত কি আছে? চরমতম প্রয়োজনের মুহূর্তে আমাদের একাই দাঁড়াতে হয়— চরিত্রের বিকাশ উপেক্ষা করে বুদ্ধ খৃষ্টের অন্ধ অনুকরণে ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই।' পৃথিবীর মহান শিক্ষাগুরুদের মধ্যে এমন লড়াকু আর চোখে পড়ে না। কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণার্জুনকে যেন আবার দেখেছে জগৎ—দক্ষিণেশ্বরে। অর্জুনের সেই নবলব্ধ আত্মপ্রত্যয় ও দিব্য-চেতনাই বিবেকানন্দ-প্রচারিত নতুন জীবন-দর্শনের মূল কথা। ভগিনী নিবেদিতাকে তিনি বলেছিলেন, 'Yes! the older I grow, the more everything seems to me to lie in manliness. This is my new gospel.' দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার শ্রোতাদের জন্য স্বামীজীর শেষ কথাগুলির অন্যতম কথা ছিল— 'Struggle God-ward. Light must come.' মেরি হেল্‌কে স্বামীজী লিখেছিলেন, 'Liberty— Mukti— is all my religion.' উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ায় বিভিন্ন বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, 'Realise yourself. That is all there is to do. Know yourself as you are— infinite spirit. That is practical religion. Everything else is impractical, for everything else will vanish. That alone will never vanish. It is eternal.' এই মুক্তি কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক নয়। বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় নিজেকে উৎসর্গ

করতে হবে। জনৈক শিষ্যাকে (Mrs. Hansbrough) তিনি বলেছিলেন, 'আমাকে বোধহয় আবার জন্মাতে হবে কেননা আমি মানুষকে ভালবেসে ফেলেছি।' মানব-প্রেমিক এই মহান লোকশিক্ষকের কাছেই পথহারা বর্তমান জগৎ পাবে তার পথের নিশানা। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে সেই হবে ভারতবর্ষের নবতম অবদান।

বালকস্বভাব বিবেকানন্দ

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতাকে একটি পত্রে লিখেছিলেন: 'শ্রেষ্ঠ নেতা তিনিই যিনি শিশুর মতো অন্যের উপর প্রভুত্ব করেন। শিশুকে আপাততঃ অন্যের উপর নির্ভরশীল বলে মনে হলেও, সে-ই সমগ্র বাড়ির রাজা।' স্বামীজী নিজেই এই উক্তির প্রোজ্জ্বলতম দৃষ্টান্তসমূহের অন্যতম। শিশুর মতোই তিনি অন্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতেন। তাই তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ নেতা।

যুগাচার্য বীর সন্ন্যাসী, প্রভঞ্জন-রূপ-হিন্দু (Cyclonic Hindu) বিবেকানন্দ, তীক্ষ্ণধী, প্রত্যুৎপন্নমতি, শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও উচ্চতম আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞাবান্ বিবেকানন্দ, জাগতিক বিষয়ে কিন্তু শিশুর ন্যায় সরল ও পরমুখাপেক্ষী।

উপনিষদে বলা হয়েছে, জ্ঞানী ব্যক্তি বালকবৎ বিচরণ করবেন। জ্ঞানীর প্রতি কোনও বিধি প্রযুক্ত হতে পারে না ব'লে, উপনিষদের এই উক্তির অর্থ: জ্ঞানী ব্যক্তি বালকবৎ বিচরণ করেন। স্বামীজী ছিলেন মহান্ ধর্মপ্রচারক, সুপ্রসিদ্ধ বক্তা, বিশ্বের মহত্তম আচার্যগণের অন্যতম। কিন্তু উপনিষদের বাণীর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর পঞ্চমবর্ষীয় বালকবৎ স্বভাবও অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। আমরা পত্র-পত্রিকা ও ব্যক্তিবিশেষের মন্তব্য থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে এবং কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ ক'রে স্বামীজীর এই বালকস্বভাবের পরিচয় দিতে চেষ্টা করবো। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বেশী উদ্ধৃতি দেওয়া বা ঘটনার সন্নিবেশ করা অবশ্য একেবারেই সম্ভব নয়।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই স্বামীজী মর্ত্য-লীলা সংবরণ করলে মিসেস ব্লজেট মিস ম্যাকলাউডকে যে পত্র লেখেন তাতে স্বামীজীর এই দিকটা বেশ ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি লেখেন, 'যদিও আমি স্বামীজীকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার বেশী সুযোগ পাইনি, তবুও তাঁর শিশুসুলভ ভাব আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁর এই ভাবটি প্রতিটি সৎস্বভাবা রমণীর সহজাত মাতৃত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ...এই মহাজ্ঞানী ব্যক্তিকে সামান্য সামান্য বিষয়ে তোমাকে সাহায্য করতে হ'ত।'

স্বামীজী সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন: '...Wearing that look of mingled gentleness and loftiness, that one sees on the faces of those who live much in meditation, that look, perhaps, that Raphael has painted for us on the brow of the Sistine Child.'— ... সেই একাধারে শান্ত ও উচ্চ ভাবের চাহনি, যা দেখা যায় তাদেরি মধ্যে যারা বেশী সময় ধ্যানস্থ হয়ে থাকেন, সেই চাহনি, বোধ হয়, যা র‍্যাফেল আমাদের জন্য ভ্যাটিকানের প্রার্থনাগৃহে শিশু যীশুর ললাটে এঁকেছেন।

আমেরিকাতে পত্রিকায় নানা মন্তব্য শেষে লেখে, '… And we saw him leaving us after that one week of knowing him, with the fear that clutches the heart when a beloved, gifted passionate child forces forth unconscious, in an untried world.' — … *সেই একটি ছোট সপ্তাহের পরিচয়ের পরে* আমরা তাঁকে আমাদের ছেড়ে যেতে দেখলাম, মনে হ'ল যেন প্রতিভাবান উত্তেজনাশীল প্রাণের দুলাল অনবধানতায় অপরিচিত জগতে সের হচ্ছে সুতরাং সকলেরই প্রাণে ভয় হ'ল।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মমহাসভার পরেই বোস্টন ইভনিং ট্রান্সপোর্ট লেখে, 'তিনি যদি মাত্র মঞ্চ পার হয়ে যান তবেই হাততালি পড়ে; এবং বহু সহস্র ব্যক্তির এই বিশেষ প্রশংসা তিনি শিশুসুলভ সন্তোষের সহিতই গ্রহণ করেন, কিন্তু তাতে অহংকারের লেশমাত্রও নেই।'

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুন অ্যানিস্কোয়াম থেকে মিসেস ব্যাগলী তাঁর এক বন্ধুকে লেখেন, '… তিনি একজন শক্তিমান্ মহানুভব মানুষ,— যিনি ঈশ্বরের সাথে চলেন। তিনি শিশুর ন্যায় সরল ও বিশ্বাস-প্রবণ।'

'লণ্ডনে ভারতীয় যোগী' এই আখ্যায় ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেট লিখেছিল, '… পাগড়ী (মঠাধ্যক্ষের টুপীর ন্যায়) ও প্রশান্ত কিন্তু সদয় মুখাবয়ব স্বামী বিবেকানন্দের চেহারাকে লক্ষণীয় করেছে। … তাঁর মুখ শিশুর ন্যায় উদ্ভাসিত হয়— মুখখানি এত সরল, অকপট ও সদ্ভাবপূর্ণ।'

আমেরিকায় হাত দিয়ে খাওয়া অসভ্যতা মনে করা হয়। কিন্তু স্বামীজীর সাথে যাদের অন্তরঙ্গতা ছিল তারা তাঁকে ইচ্ছামত চলতে দিত। তারা বুঝতো সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর হৃদয় সভ্যতার নাগপাশে বদ্ধ থাকতে বড়ই অস্বস্তি বোধ করে। তাই তিনি হাতে খেলেও তারা কোনও ত্রুটি ধরত না। বন্ধন, তা যে রকমেরই হোক না কেন, স্বামীজীর মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় অন্তর সহ্য করতে পারতো না। জামাকাপড় সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। কলার, বুটজুতা দস্তানা ইত্যাদি ঘরে ঢোকা মাত্র খুলে ফেলে দিতে পারলেই স্বামীজী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচতেন, মনে হ'ত।

মিসেস ব্লজেটের পূর্বোল্লিখিত চিঠির এক অংশে আছে: তিনি বক্তৃতা শেষ ক'রেই শ্রোতাদের কাছ থেকে জোর ক'রে চলে আসতে বাধ্য হতেন,—এত আগ্রহে শ্রোতারা তাঁকে ঘিরে থাকতো—এবং স্কুল থেকে ছুটি পাওয়া বালকের মত রান্নাঘরে ছুটে যেতেন, 'এখন আমরা রান্না করবো' এই ব'লে। অবিলম্বে সদা হিসেবী ও সজাগদৃষ্টি 'জো' এসে দুষ্টুকে থালাবাসনের ভিতরে ভাল পোশাক-পরা অবস্থায় আবিষ্কার ক'রে পোশাক বদল ক'রে গৃহের পোশাক পরে নেবার জন্য তিরস্কার করতো।

হেল-দম্পতি শিশুর ন্যায় সরল এই ভারতীয় সন্ন্যাসীকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করতেন। এই সন্তানের বহু অদ্ভুত খেয়ালের অত্যাচারও নীরবে সহ্য করতেন। তুষারাবৃত হ্রদে স্কেটিং (Skating) করা দেখে স্বামীজীর স্কেটিং করার সখ হ'ল, কিন্তু প্রথমতঃ কিছুটা অভ্যাসের প্রয়োজন। ঠিক হ'ল হেল-গৃহের হলঘরই অভ্যাসের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। হলঘরে কার্পেট পাতা ছিল— তা তো ছিঁড়ে গেলই, তার উপর ঘরের আসবাবপত্রও সব ভেঙ্গে চুরমার।

আবার আবদার করার নমুনাও ছিল অতি চমৎকার। কারও সাধ্য ছিল না তাঁর আবদার পূরণ না ক'রে পারে। ইউরোপ ভ্রমণে গিয়ে জেনিভা প্রদর্শনীতে বেলুন দেখে বেলুন চড়বেন, বায়না ধরলেন। শ্রীমতী সেভিয়ার মনে করলেন, বেলুন চড়া নিরাপদ নয় এবং নিষেধ করলেন।

কিন্তু নিষেধ শোনে কে ? সূর্যাস্তের আগে বেলুন আকাশে উঠবে না— অধীর আগ্রহে প্রশ্নের পর প্রশ্ন, 'এখনও কি সময় হয় নি ?' শেষ পর্যন্ত নিজে তো উঠলেনই, এমন কি শ্রীমতী সেভিয়ারকেও সঙ্গে নিলেন, তবে শান্তি !

ঘরের কার্পেটের প্রতি লক্ষ্য না রেখে নিজের চটিজুতোর গোড়ালিতেই পাইপ ঝাড়া তাঁর অভ্যাস ছিল। আবার ফুঁ দিয়ে পাইপ পরিষ্কার করতেন। কোনও ভদ্রলোক দেখা করতে এসে দেখে অবিন্যস্ত চুল, পোশাকপরিচ্ছদও তদ্রূপ, কিন্তু স্বামীজীর লক্ষ্যই নেই, অসঙ্কোচে আলাপাদি চালিয়ে গেলেন।

আবার বিদেশীর আদব-কায়দা আইন-কানুন জানবার কি কৌতূহল ! সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করার সময় ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা কার প্রথম যাওয়া কর্তব্য, প্রশ্ন কচ্ছেন।

মায়াবতীর পথে স্বামী বিরজানন্দের একদিন স্বামীজীকে খেতে দিতে বেশ দেরী হয়ে যায়। খাবার পরিবেশন করলে স্বামীজী বলেন, 'খাব না, নিয়ে যা'। বিরজানন্দের স্বামীজীর স্বভাব সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছু সময় পরে স্বামীজী খেতে সুরু ক'রে বল্লেন, 'কেন এত চটেছিনুম এখন বুঝেছি, খুব খিদে পেয়েছিল !'

চকোলেট আইসক্রীম ছিল স্বামীজীর খুব প্রিয়, যেমন সাধারণ বালক-বালিকার দেখা যায়। খাবার টেবিল থেকে উঠে যাচ্ছেন সকলের আগে, হঠাৎ কেউ বললো, 'স্বামীজী উঠছেন কেন, আইসক্রীম আছে।' অমনি অধীর আগ্রহে উৎসুক নয়নে আইসক্রীমের অপেক্ষায় তিনি টেবিলে বসলেন, যতক্ষণ না আইসক্রীম দেওয়া হ'ল।

সপ্তর্ষির 'নর'-ঋষি ও শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র ব্রজের রাখাল— স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ— মঠে তাঁদের পোষা পশুপাখির এবং তরিতরকারি ও ফুলের বাগানের এলাকা স্থির ক'রে নিলেন। স্বামীজীর পোষা পশুপাখি মহারাজের বাগানের এলাকায় প্রায়ই ঢুকে পড়তো আর উভয়ের মধ্যে বালকোচিত তুমুল কলহ উপস্থিত হ'ত। মঠের অন্য সাধু সন্ন্যাসীরা ব্যাপার দেখে আমোদ উপভোগ করতেন।

একজন মাদ্রাজী ভক্ত আমেরিকাতে স্বামীজীকে এক শিশি চাটনি পাঠায়। ঐ শিশিটি তাঁর মূল্যবান সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হ'ত। আর যখনই রান্না করার সুযোগ উপস্থিত হ'ত, দেখা যেতো, জামার দুই পকেট থেকে অনেক ছোট ছোট পুরিয়া বের কচ্ছেন, তাতে যাবতীয় মশলা। এই মশলার পুরিয়া দুই পকেটেই থাকতো এবং ভারতবর্ষ থেকে আমদানী করা হ'ত। রান্নায় এত বেশী ঝাল মশলা ব্যবহার করতেন যে, পাশ্চাত্যদের নিকট বড়ই ঝাল বোধ হ'ত। আর ঘরের যত বাসনপত্র সবই নোংরা হ'ত এবং পরে ধোয়ার দরকার হ'ত। সম্বরা দেওয়া তাঁর এক প্রিয় অভ্যাস ছিল, কিন্তু পাশ্চাত্য রমণীদের তাতে চোখ জ্বালা করতো। তাই তিনি সম্বরার আগে বলতেন, 'Here comes grandpa ; ladies are invited to leave'—দাদু আসছেন, ভদ্রমহোদয়াগণকে স্থান ত্যাগ করতে আমন্ত্রণ জানান হচ্ছে।

প্রিয় শিষ্য কালীকৃষ্ণকে (স্বামী বিরজানন্দ) ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিলেন। বল্লেন, 'ঘোড়া চড়া শিখিয়ে দিই তোকে, খুব সোজা।' ঘোড়ায় চড়িয়ে দিয়ে নিজেও একটিতে চড়ে যেই ঘোড়াকে চাবুক মারা, দুটি ঘোড়াই ছুটতে সুরু করে, আর ঘোড়ায় চড়া বেশ রপ্ত না থাকায় কালীকৃষ্ণ মহারাজ ঘোড়ার ঘাড় ধ'রে কোন মতে আত্মরক্ষা করায় শেষরক্ষা !

আর এক বালসুলভ অভ্যাস ছিল এই বীর সন্ন্যাসীর। তিনি গল্প শুনতে ভালবাসতেন।

যখন বাণী প্রচারে মানসিক ও শারীরিক অবসাদ ঘটতো, তখন আবোল তাবোল বলায় খুব উৎসাহ ও আমোদ পেতেন। 'পাঞ্চ' বা ঐরূপ কোনও হাস্য-কৌতুকের পত্রিকা নিয়ে বসতেন এবং এমন হাসতেন যে তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তো।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে স্বামীজী যখন অ্যানিস্কোয়ামে মিসেস ব্যাগলীর অতিথি ছিলেন, তখন অন্য অতিথি মিসেস ব্রীড স্বামীজীর সাথে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। এই মহিলার স্বামীই প্রথম স্বামীজীকে স্লেজে (Sledge) চড়ান। স্বামীজী এই মহিলাকে গল্প বলতে অনুরোধ করতেন। কয়েকটি গল্প, যা শুনে স্বামীজী খুব আনন্দ লাভ করতেন, ঐ ভদ্র-মহিলা স্মরণে রেখেছিলেন এবং পরে ভগিনী নিবেদিতাকেও লিখে জানিয়েছিলেন :

এক চীনা শুকরের মাংস চুরি করে ধরা পড়ে। বিচারক বলেন যে, চীনারা শুয়রের মাংস খায় না, এই তাঁর ধারণা ; চীনা উত্তরে বলে : 'Me Melikan, sir, me steal, me eat blandy, me eat polk, me eat everything.'— আমি এখন আমেরিকান মশাই, আমি চুরি করি, ব্রাণ্ডি খাই, শুয়রের মাংস খাই, আমি সব খাই। মিসেস ব্রীড স্বামীজীকে বহুবার স্বগত বলতে শুনেছেন, 'Me Melikan, sir.'

স্বামীজী কখনও রেড ইণ্ডিয়ানদের গল্প শুনতে শ্রান্ত হতেন না। উক্ত মহিলা তিন বৎসর কানাডাতে রেড ইণ্ডিয়ানদের জন্য 'সংরক্ষিত স্থানে' বাস করেছিলেন। তাঁর কথিত নিম্নোক্ত গল্পটি স্বামীজীকে বিশেষ আনন্দ দিত :

একজন রেড ইণ্ডিয়ানের স্ত্রী সদ্য মরে যাওয়ায় শবাধারের জন্য পেরেক নিতে সে পাদরীর বাড়ি আসে। সেখানে রাঁধুনীকে দেখে সে জিজ্ঞাসা করে যে, রাঁধুনী তাকে বিয়ে করবে কিনা। এতে রাঁধুনী খায় চটে আর বিরক্তি প্রকাশ করে তখন সেই রেড ইণ্ডিয়ান বলে, 'দুদিন পরে দেখা যাবে।' পরের রবিবার সে সেজেগুজে এসে বাড়ির সদর দরজায় বসলো। টুপীতে বাহাদুরি ক'রে পালক গুঁজেছে, মাথায় এত তেল মেখেছে যে গাল দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ছিল। ব্যাপার দেখে সকলেই খুব কৌতুক বোধ করে।

এই সময় স্বামীজীর চিত্র তৈয়ার করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ছবির কাজ কতটা এগিয়েছে দেখতে চিত্রকরের দোকানে স্বামীজীকে নিয়ে যাওয়া হয়। দোকানে প্রবেশ ক'রে দেখা গেল স্বামীজীর চিত্রের গাল বেয়ে কতকটা তেল পড়ছে। এই দেখেই স্বামীজী ব'লে ওঠেন, 'রাঁধুনীকে বিয়ে করার প্রস্তুতি হচ্ছে।'

কিন্তু যে দুটি গল্প তিনি সবচেয়ে বেশী পছন্দ করতেন, ও যা শুনে তিনি হাসির ঢেউ উঠাতেন, তা নীচে দেওয়া হ'ল :

নরখাদকদের এক দ্বীপে এক নূতন খ্রীষ্টান ধর্মযাজক এসে স্থানীয় সর্দারের কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আচ্ছা, আমার পূর্ববর্তীকে কিরূপ মনে হয়েছে, আপনার ?' সর্দার ঠোঁট চেটে উত্তর করলে, 'আ-হা, খু-উ-ব চ-ম-ৎ-কা-র।'

এক কৃষ্ণকায় প্রচারক চিৎকার ক'রে ব'লে যাচ্ছে, 'দেখ, ঈশ্বর আদমকে বানাচ্ছিলেন, এবং কাদা দিয়ে বানাচ্ছিলেন, যখন তৈরী হ'ল তখন তাকে বেড়ার উপর শুকুতে দিলেন। এবং পরে —'। এক বিজ্ঞ শ্রোতা হঠাৎ চিৎকার ক'রে উঠলো, 'দাঁড়ান পাদরী মশায়, বেড়া কি বলছেন ? ওটা আবার এল কোত্থেকে ? -- কে বানালো ?' প্রচারক কড়া জবাব দিলেন, 'দেখ, স্যাম জোনস্, শোন। তুমি এসব বেয়াড়া প্রশ্ন জিজ্ঞেস করো না। তুমি দেখছি সমস্ত ধর্মতত্ত্বই ধ্বংস করে দেবে।'

মিসেস ফান্কির লিখিত স্বামীজীর স্মৃতিকথা

থেকে আমরা জানতে পারি সেই একই কথা—স্বামীজী সহস্রদ্বীপোদ্যানে উক্ত শিষ্যাকে মজার মজার গল্প বলতে বলছেন আর তিনিও নানা রকমের গল্প ব'লে যেন একটি শ্রান্ত বালকের ক্লান্তি দূর ক'রে দিচ্ছেন। তিনি লিখেছেন: স্বামীজীকে দেখলে মনে হয় যেন ঠিক একটি বালক এবং আচরণেও ছিলেন তিনি তাই।

স্বামীজী ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে যখন মিসেস ব্লজেটের গৃহে ছিলেন তখন মিসেস ব্লজেট তাঁকে একটি গল্প বলেছিলেন। এই গল্পের শেষ কথাটি প্রায়ই ব'লে স্বামীজী বালকের মতো হাসতেন ও আনন্দ করতেন:

একজন আসামীকে ফাঁসি দেবার জন্য গাড়ি ক'রে বাজারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ফাঁসি দেখার জন্য অগণিত জনতা ধাক্কাধাক্কি ক'রে চলেছে বাজারের দিকে। তা দেখে গাড়ি থেকে আসামী বল্লে, 'ধীরে সুস্থে যাও, ধাক্কাধাক্কি করার কোনও প্রয়োজন নেই, কারণ আমি না পৌঁছলে তামাসা সুরু হবে না।' বক্তৃতায় যেতে দেরী হ'লে স্বামীজী বলতেন, 'আমি না গেলে তামাসা সুরু হবে না।'

কয়েকজন নীলনাসিক (Blue-nosed) নীচ-মনা খ্রীষ্টান পাদরী কয়েকটি অসৎ যুবতীকে অর্থ-লোভে বশীভূত ক'রে স্বামীজীকে প্রলোভিত করতে প্ররোচিত করে। শিশুর ন্যায় সরল ও তুষারশুভ্র পবিত্র এই ব্যক্তির সম্মুখে আসামাত্রই তারা সম্পূর্ণরূপে সৎভাবে প্রভাবিত হয় এবং নিজেরাই নিরস্ত হ'য়ে ফিরে যায়। দুষ্টা রমণীও শিশুর সারল্য ও নিষ্কলুষতার প্রভাবে নীচতা ভুলে যায়।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী যখন লণ্ডনে ছিলেন, তখনকার একদিনের ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শী মহেন্দ্রনাথ দত্ত:

'একদিন স্বামীজী বেশ প্রফুল্ল— আনন্দে যেন বিভোর। একেবারে বালকের মত সরল ভাবে আনন্দ-মগন।... লেকচার টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়া স্বামীজী আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন. তাঁহার এই বালকোচিত আচরণে সকলেই বিস্ময়ে ও আনন্দে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল—'রাজযোগ' বক্তৃতাকালে ইনিই অতি গম্ভীরভাবে গভীর তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে স্তম্ভিত করেন!'

স্বামীজীর ইংলণ্ডে সাইকেল শিক্ষার ঘটনাও সুন্দর বালসুলভ চপলতার দৃষ্টান্ত। মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন যে, বিলাতে একদিন স্বামীজীর মন খুব প্রফুল্ল ছিল। বেলা চারটার সময়ে তাঁকে ও সারদানন্দকে ব'লে বসলেন, 'চ, সকলে মিলে স্যমুখের মাঠে গিয়ে বাইক চড়ি।' মিস মূলারের মালী একটা বাইক মাঠে পৌঁছে দিয়ে একটু দূরে একটা বেড়াতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। প্রথম স্বামীজী বাইকে চড়ে বসলেন, সারদানন্দজী ও মহেন্দ্রবাবু বাইকটি সামলাতে লাগলেন। তারপর স্বামীজী সারদানন্দ মহারাজকে বল্লেন, 'তুই চড়, শেখ্ না, দিনকতক চেষ্টা করলে অভ্যাস হ'য়ে যাবে।' সারদানন্দজী অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাঁর স্থূল বপু নিয়ে বাইকে উঠে বসলে, তাঁকে সামলানো দায়। মালী কিন্তু কারবার দেখে দাঁড়িয়ে হাসছিল। স্বামীজী মালীকে হাসতে দেখে কৌতুক বোধ করেন ও বলেন 'আরে হাস্ করছিস্ ক্যান?' পরে স্বামীজী নিজেই আবার চড়ে বসলেন। মেজাজ খুশিতে ভরা— গুণ গুণ ক'রে গান ধরলেন:

'সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।
ভাসল তরী সকালবেলা, ভাবিলাম এ জলখেলা
মধুর বহিছে সমীর ভেসে যাব রঙ্গে'

এবং সারদানন্দজীর সঙ্গে হাসি তামাসা করতে লাগলেন— যেন বাল্যকালেই ফিরে গেছেন, সেই ক্রীড়ামোদী কৌতুকপ্রিয় বালক নরেন্দ্রনাথই হয়ে গেছেন!

[ক্রমশঃ]

সমালোচনা

বিজিজ্ঞাসা : মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ। প্রকাশক : শ্রীজগদীশ্বর পাল, ১০ গ্যালিফ স্ট্রীট, কলিকাতা ৩। (১৩৮১), পৃষ্ঠা ১৩৬+৮, মূল্য পাঁচ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে তন্ত্রবিষয়ক ৩৬টি মূল প্রশ্নের এবং সূর্যবিজ্ঞান-সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। উত্তর দিয়াছেন তন্ত্রশাস্ত্রে পরিনিষ্ণাত মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়। প্রশ্ন করিয়াছেন বিজিজ্ঞাসু সর্বশ্রী হেমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জগদীশ্বর পাল, ও বারীন্দ্রনাথ চৌধুরী। গ্রন্থখানির একটি সুপাঠ্য ভূমিকা লিখিয়াছেন ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়।

তন্ত্রের দার্শনিক তত্ত্ব সহজবোধ্য নহে। সুতরাং দুরূহ বিষয়সমূহের উপর প্রচুর আলোকসম্পাত করা সত্ত্বেও গ্রন্থখানি সকলেরই উপভোগ্য হইবে বলিয়া মনে হয় না। যাঁহারা তন্ত্রশাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিরত আছেন অথবা যাঁহাদের তন্ত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহারা এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই। বিদগ্ধ গ্রন্থকারের তন্ত্রসম্বন্ধীয় অন্য দুইটি গ্রন্থ 'তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত' এবং 'তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রের দিগ্‌দর্শন'-এর সহিত তুলনামূলকভাবে বর্তমান গ্রন্থটি অধ্যয়ন করিলে তন্ত্রের দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে সুষ্ঠু ধারণা হওয়া স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশিত। এই সকল গ্রন্থের পুনঃ পুনঃ পাঠ ও মননের দ্বারাই মনীষী গ্রন্থকারের চিন্তাধারার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্যলাভ করিতে পারা সম্ভব।

গ্রন্থটিতে সূচীপত্র না থাকায় এক নজরে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কোন ধারণা হয় না। এই জাতীয় পরিভাষাপ্রচুর গ্রন্থের শেষে একটি নির্ঘণ্ট থাকাও বিশেষ বাঞ্ছনীয়; ক্রমবর্ধমান শিক্ষাপরিধি ও কর্মব্যস্ত বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র লেখক অধ্যাপক গবেষক— সকলেরই পক্ষে উহার উপযোগিতা অনস্বীকার্য।

চতুর্থ মূল প্রশ্নটি হইতেছে : 'ভ্রূমধ্যে জ্যোতি চিন্তার প্রয়োজন কি ?' দ্বাবিংশতিতম মূল প্রশ্নটিও তাহাই, যদিও উহার আলোচনায় একটি নূতন গৌণ প্রশ্ন ও তাহার উত্তর সন্নিবেশিত হইয়াছে। ফলতঃ চতুর্থ প্রশ্ন ও তাহার উত্তর (পৃষ্ঠা ১২-১৩) পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। অল্পস্বল্প পুনরাবৃত্তি অন্যত্রও পাওয়া যায় (পৃষ্ঠা ৭২-৭৩ দ্রষ্টব্য)।

বিংশতিতম মূল প্রশ্নটির উত্তরে প্রথমেই বলা হইয়াছে : 'গায়ত্রী বলিতে আমি এখানে ব্রহ্ম-গায়ত্রী লক্ষ্য করিতেছি গায়ত্রীতে তিনটি অংশ আছে— বিদ্মহে, ধীমহি, প্রচোদয়াৎ।' উদ্দিষ্ট ব্রহ্মগায়ত্রীতে 'বিদ্মহে'-পদ কোথায় ও কিভাবে আছে, তাহা পরিষ্কার করা হয় নাই--- সম্ভবতঃ অনুচ্ছেদটির সম্পাদনাতে কিছু ত্রুটি ঘটিয়াছে।

বর্ণাশুদ্ধি একেবারেই যে নাই, তাহা নহে, তবে বিরল। প্রশ্নগুলির বিন্যাসে কোনও সুচিন্তিত ক্রম বা ধারা অবলম্বন করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাত্ত্বিক, সাধনসংক্রান্ত ও বিবিধ— এই তিন পর্যায়ে প্রশ্নগুলি সুবিন্যস্ত করা হইলে ভাল হইত।

সম্পাদনার এই সকল সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি অবশ্য গ্রন্থখানির বাহিরের আবরণকেই স্পর্শ করিয়াছে, উহার আন্তর সম্পদকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। ছাপা ও কাগজ ভাল। আমরা আশা করিব প্রত্যেক গ্রন্থাগারে এই মূল্যবান গ্রন্থটি যোগ্য মর্যাদায় সংরক্ষিত হইবে এবং তন্ত্রানুসন্ধিৎসু-মাত্রেই ইহা সংগ্রহ করিতে উৎসাহী হইবেন।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব

বেলুড় মঠে গত শনিবার ১৯শে পৌষ, ১৩৮১, শ্রীশ্রীমা সারদামণিদেবীর ১২২তম শুভ জন্মতিথি যথাযোগ্য পূজা হোম ভজন আলোচনাদির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। প্রত্যূষে শ্রীশ্রীঠাকুরের মঙ্গলারতির পর শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে মঙ্গলারতি বেদপাঠ ও ভজনাদি হয় এবং দুপুরে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে বিশেষ পূজার পর প্রায় ২০,০০০ ভক্ত প্রসাদ ধারণ করেন। অপরাহ্নে মঠ-প্রাঙ্গণে আয়োজিত ধর্মসভায় বক্তৃতা করেন শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী (বাংলায়), স্বামী বুধানন্দ (ইংরাজীতে) ও সভাপতি স্বামী ভূতেশানন্দ (বাংলায়)। অধ্যাপক চক্রবর্তী বলেন: মায়ের সন্ন্যাসী সন্তান মহারাজবৃন্দ, মাতৃমণ্ডলী, প্রীতি-ভাজন তরুণ ও কিশোরবৃন্দ! আপনাদের সঙ্গে সমপ্রাণ হয়ে মা সারদাদেবী ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের চরণে আমার কোটি সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। মায়ের কথা বলতে এসে সপ্তশতীতে মায়ের কথা মনে পড়ল মহিষাসুর বধ হয়েছেন, দেবতারা স্তব করছেন, মা খুশি হয়েছেন। বললেন: আমি খুশি, বর চাও। তার উত্তরে দেবতারা বললেন— আর কি চাইব মা তোমার কাছে—'ভগবত্যা কৃতং সর্বং ন কিঞ্চিদবশিষ্যতে।' তবে বর যদি দিতে চাও, এই করো যেন তোমাকে বারবার স্মরণ করে আমাদের সব আপদ দূর হয়। মা-ই তো সব করে রেখেছেন— আমরা চাইতে জানি না, তাই এলোমেলো চাই। আমাদের কিসে ভাল হবে মা-ই তো তা জানেন— মা পরম ভালটি করে রেখেছেন, মহিষাসুর বধ করে রেখেছেন। মহিষাসুর বধ মানুষের ইতিহাসে বারংবার ঘটেছে। তবে ভিতরের মহিষাসুর বধের প্রয়োজন খুব বেশী। সে মহিষাসুর হচ্ছে আমাদের অভিমান ঐশ্বর্যের অভিমান, নাস্তিকতার অভিমান, পাণ্ডিত্যের অভিমান।

ঠাকুরের কথা অনেক জায়গায় বলার সৌভাগ্য হয়েছে। আজ মায়ের কথা বলতে এসে নিজেকে বিপন্ন মনে করছি— মায়ের কথা কি বলা যায়!— মূক হয়ে যেতে হয়। সেজন্যে 'মূকং করোতি বাচালম্' মূককে বাচাল করেন মা— কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, বাচালং করোতি মূকং— এ অর্থও তো হয়— 'নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে।'

মায়ের কথা না ঠাকুরের কথা— আমাদের সংস্কৃত বৈয়াকরণরা একটি সংকেত দিয়েছেন: 'মাতা চ পিতা চ' একসঙ্গে 'পিতরৌ' করে দিয়েছেন— এর মধ্যে আলাদা করা যাবে না— 'জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ'— মা ও ঠাকুর নিত্যসংপৃক্ত। ঠাকুরকে কি আমরা পেতাম, মা না এলে! মা যদি না আসতেন এবং মা যেভাবে ঠাকুরের পাশে বসেছিলেন, তাঁর সাধনসহায় হয়েছিলেন— তা না হলে ঠাকুরকে কি আমরা পেতাম?

শ্রীমন্ মহাপ্রভুও এই মাতৃতত্ত্ব প্রকট করেছিলেন অপূর্ব লীলায়। তারপর এই মাতৃভাব আমাদের কাব্যে সাহিত্যে সঙ্গীতে মহাপুরুষদের জীবনে নব নব ভাবে রূপায়িত হয়েছে।

সঙ্কটময় জীবনপথে ভয় দুঃখের দিনে আর কোন নাম মনে আসে না— মনে আসে শুধু 'মা'

নাম। আজ সমস্ত প্রাচীন মূল্যবোধ লোপ পেয়ে গিয়েছে— ভয় পেয়ে গিয়েছি আমরা— বিপদ এসেছে— তাই সাক্ষাৎ ভগবতী মা সারদাদেবীকে আজ স্মরণ করতে হবে। বিপদে ভয়ে দুঃখে মায়ের নাম স্মরণ করতে হবে।

মহাপ্রকাশ এ যুগে হল ভাগীরথীকূলে ঠাকুর ও মায়ের লীলায়। যুগসন্ধিক্ষণে ঠাকুরের পাশে মা বসেছিলেন— এঁদের দিকে যদি তাকাই— কোন সমস্যাই থাকে না— সহজ সরল দুটি জীবনের অন্তরালে কত সংকেতই না রয়েছে। 'আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা'— এই চিন্ময়ী মা-ই আমাদের শ্রীশ্রীসারদামণি মা।

স্বামী বুধানন্দ বলেন: এই পবিত্র উৎসব মরসুমে অনেক বিষয়েই আমাদের বলতে বলা হয়, কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে কিছু বলাই হ'ল সব চেয়ে কঠিন— অথচ মধুরতম। মহাশক্তিধর শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানরাও তাঁর বিষয়ে বলতে শঙ্কিত হতেন—স্মরণীয় স্বামী প্রেমানন্দজীর উক্তি: 'শ্রীশ্রীমাকে কে বুঝেছে? কে বুঝতে পারে?' তবু শিবমহিম্নঃ স্তোত্রের প্রথম শ্লোকে পুষ্পদন্ত যা বলেছেন, তারই ভরসায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনব্রত সম্পর্কে আজ কিছু বলবো।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনব্রতের প্রথম ইঙ্গিত আমরা পাই দক্ষিণেশ্বর থেকে আগত সেই কালো কুচকুচে মেয়েটির কথায়। শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী থেকে দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখতে —পথে জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়লে ঐ মেয়েটিই— শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজিতা মা ভবতারিণীই—তাঁর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। তাঁদের দুজনের মধ্যে যে কথাবার্তা হয় তার সুগভীর তাৎপর্য রয়েছে।

শ্রীশ্রীমায়ের নিজের কথা থেকেও আমরা তাঁর জীবনব্রত সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি তিনি বলেছিলেন: ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের ওপর মাতৃভাব ছিল; সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবার রেখে গেছেন।

ঈশ্বরের মাতৃত্ব নানাভাবে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে প্রকাশ পেয়েছে। ঈশ্বরের মাতৃত্ব বলতে আমরা কী বুঝি? বাপ ছেলেকে শাসন করেন মা করেন লালন-পালন পুষ্টিবিধান। বাপ আশ্রয় দেন মা আশ্রয়ও দেন, দেন প্রশ্রয়ও। জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীমাকে পরামর্শ দেন, 'ভক্তদের স্পর্শে যখন কষ্ট হয়, তখন স্পর্শ না করাই উচিত।' শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, 'না, বাবা, আমরা তো ঐ জন্যই এসেছি। আমরা যদি পাপতাপ না নেব, হজম না করব, তবে কে করবে? পাপি-তাপীদের ভার আর কারা সহ্য করবে?' অন্য এক ভক্তকে বলেছিলেন, "যার যার নাম মনে আসে, তাদের জন্য জপ করি। আর যাদের নাম মনে না আসে, তাদের জন্য ঠাকুরকে এই বলে প্রার্থনা করি, 'ঠাকুর আমার অনেক ছেলে অনেক জায়গায় রয়েছে, তাদের নাম আমার মনে হচ্ছে না, তুমি তাদের দেখো, তাদের যাতে কল্যাণ হয়, তাই কোরো।' "—এই ঈশ্বরের মাতৃত্ব। এই দিব্য মাতৃত্ব তিনি সমগ্র বিশ্বে প্রসারিত করেছেন। তাঁর সমদর্শন এত ব্যাপক ছিল যে, তা পাপী ও পুণ্যাত্মাকে এবং স্বদেশ ও বিদেশকে একখোটিতে বেঁধেছিল। 'আমার শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) যেমন ছেলে, এই আমজদও তেমন ছেলে।' বিদেশী বস্ত্র বর্জনের দিনে জনৈক ব্রহ্মচারী বিলিতি বস্ত্র কেনার বিরুদ্ধে কথা বললে মা বলেছিলেন: 'বাবা, তারাও (বিলাতের লোক) তো আমার ছেলে। আমার সকলকে নিয়ে ঘর করতে হয়; আমার কি একরোখা হলে চলে?' জাতীয়তাবোধ যখন চরমে, তখন শ্রীশ্রীমায়ের এই উক্তিটির ভেতর দিয়ে তাঁর উদারতা, ব্যাপক হৃদয়বত্তা, দূরদৃষ্টি ও বিশ্বপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে। বিদেশিনী ভক্ত মহিলা— নিবেদিতা, ওলি বুল, ক্রিষ্টিন ও আরও অনেকে তাঁর কাছে এসে যে আদর-অভ্যর্থনা

পেয়েছেন, তা শুধু নিজেরই মায়ের কাছ থেকে পাওয়া যায়। সে-যুগের নৈষ্ঠিক হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের একজন হয়েও মা স্বামীজীর বিদেশিনী শিষ্যাদের যে সংস্কারমুক্ত হৃদয়ের অসীম উদারতায় গ্রহণ করেছিলেন, তাতে স্বামীজী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। স্বামীজী বুঝেছিলেন : ভারতবর্ষই যেন সমগ্র বিশ্বকে স্বাগত জানাচ্ছে মায়ের এই অভ্যর্থনা সারা জগতের ভাবী আধ্যাত্মিক মহামিলনের প্রতীক। শ্রীশ্রীঠাকুর মাকে বলেছিলেন : 'আমার সব সাদা রঙের ভক্ত আছে, তারা তোমার কাছে আসবে।' আর তাঁরা এসেছিলেনও— আজও আসছেন— ভবিষ্যতেও আসবেন দলে দলে।

শ্রীশ্রীমায়ের শেষ বাণী : 'যদি শান্তি চাও, মা, কারো দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার।'— এটি একটি মন্ত্র, যা তিনি জগৎকে দিয়ে গেছেন। যদি আমরা এই মন্ত্রের গভীর তাৎপর্য ধ্যান করি তবে, আমরা এই মন্ত্র-নিহিত শক্তি উপলব্ধি করবো। আমাদের বর্তমান সভ্যতায় রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি সর্বত্রই দোষ-দৃষ্টি— ভেদ-দৃষ্টি। মা শেখাচ্ছেন সমস্ত জগৎকে আপনার করতে; কেউই পর নয়,—এ-ই মায়ের শেষ উপদেশ। আর এই উপদেশের মধ্যেই নিহিত রয়েছে নতুন মানবসমাজের - নতুন মানবসভ্যতার উন্মেষের বীজ।

শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন : বাবা, যদি জীবনে কখনও বিপাকে পড়ো—নিজেকে অসহায় বোধ করো, তাহলে ভাববে তোমার পেছনে একজন মা আছেন। আমাদের প্রত্যেকেরই পেছনে শ্রীশ্রীমা সর্বদা রয়েছেন। তাঁর পুণ্যাবির্ভাবের এই বিশেষ দিনে প্রার্থনা করি, তাঁর করুণা আমাদের রক্ষাকবচ হোক, সংগ্রাম-বন্ধুর জীবনপথে তাঁর প্রসারিত বরাভয়কর নিরন্তর নিত্যকালের জন্য আমাদের পরম সহায় হোক।

সভাপতির ভাষণে স্বামী ভূতেশানন্দ বলেন : অধ্যাপক চক্রবর্তী ও স্বামী বুধানন্দ এতক্ষণ ধরে শ্রীশ্রীমায়ের বিশাল রূপটি বিস্তৃতভাবে সুন্দর ভাষায় ব্যাখ্যা করে আমাদের চমৎকৃত করেছেন। এই যে মায়ের বিশাল রূপ— এই রূপটি অনুধাবন করবার জিনিস অনেক সাধনায় ফলে হয়তো এ সম্বন্ধে আমাদের কিছুটা ধারণা হওয়া সম্ভব। তবে মায়ের আর একটি দিক আছে : সেটি তাঁর সহজ সরল স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তি। আমরা যখন কোন কারণে ভয় পাই, যখনই কোন কারণে আমরা মনেতে পীড়া বোধ করি— আমাদের মাকে মনে পড়ে; দুঃখের সময় মাকে মনে পড়ে, বিপদের সময় মাকে মনে পড়ে। হ্যাঁ, আনন্দের সময়েও মাকে মনে পড়ে। মানুষের মনের এই যে সহজ সরল আকুতি— এটি যাঁর কাছে পরিপূর্ণ তৃপ্তিলাভ করে, যাঁর দিকে সব মানুষকে আকৃষ্ট করে আমরা তাঁকেই আমাদের মা বলে জানি। আমাদের মায়ের কথাটি বলতে মনে বড় আনন্দ হয়। তিনি শুধু আমাদের মা। এই ভেবেই আমরা পরম তৃপ্তি লাভ করি।

আমাদের সঙ্ঘের গোড়ার দিকে মায়ের ছবি পর্যন্ত বাইরে প্রকাশ করতে দেওয়া হ'ত না। তখন খুব লুকিয়ে রাখা হ'ত। আর মাও আমাদের সব সময়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখতেন, যেমন বলা হয়েছে স্তোত্রে : 'লজ্জাপটাবৃতা'। 'লজ্জাপটাবৃতা' কি জন্যে? — না জগতের মা রূপে আমি নিজেকে প্রকাশ করলে সন্তানদের কাছ থেকে দূরে সরে যাবো, তফাৎ হয়ে যাবো! তাঁর জীবনীতে এ-কথাটি আলোচনা করা হয়েছে : বলা হয়েছে, মা যেন তাঁর জীবনের গোড়ার দিকে বড় সমস্যায় পড়েছিলেন— তিনি দেবীভাবটা প্রকট করবেন কি মানবীভাব। দেবীভাব স্বভাব-

সুলভ— মানবীভাবের জন্ম প্রয়াস করতে হয়। আবরণ উন্মোচন করলে দেবীভাব ; আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখলে তবে মানবীরূপে তাঁকে পাই। তাই যেন মনে হয়, তিনি সব সময় নিজেকে আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখতেন। তাঁর বিশেষ অন্তরঙ্গ বালক-ভক্তদের কাছে ছাড়া তিনি অনবগুণ্ঠিতরূপে কখনও প্রকট হতেন না। নিজেকে ঢেকে রাখতেন। কেন এই ঢেকে রাখা ? এইরূপে ঢেকে যদি না রাখেন—তাহলে তাঁর যে সর্বশক্তির সংহত রূপ, তা আমাদের বিভ্রান্ত করবে— আমাদের তাঁর কাছ থেকে যেন দূরে সরিয়ে রাখবে— তাই তিনি এইভাবে সহজ সরল মাতৃরূপে সকলকে অকর্ষণ করেছেন। বিশেষতঃ যদি কেউ জয়রামবাটীতে যেতেন, গিয়ে দেখতেন : মা ঘর নিকোচ্ছেন, রান্না করছেন, তরকারি কুটছেন, বাসন মাজছেন কলকাতা থেকে ভক্তেরা এসেছে, তাদের জন্যে রাঁধছেন, বাড়ী বাড়ী গিয়ে দুধ সংগ্রহ করছেন— তাদের কি খাওয়াবেন, কোথায় রাখবেন, তার জন্মে ব্যস্ত হচ্ছেন— যেমন সংসারে মা করে থাকেন। মনে রাখতে হবে, যারা মায়ের কাছে গেছে তখন অবধি তাদের এই বুদ্ধি নেই যে, তিনি পরমা প্রকৃতি সর্বশক্তিস্বরূপিণী জগন্মাতা। কারণ তাঁর কাছে গেলে দেখা যেত, তিনি একটি সহজ সরল সাধারণ মানবী মা-রূপেই তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশিত করছেন। যত ভক্ত যেতেন, তাঁরা মাতৃভাবের এই প্রকাশ দেখে মুগ্ধ হতেন, আকৃষ্ট হতেন— বিব্রত বোধ করতেন না। ভয় পেতেন না— সম্ভ্রমবুদ্ধি এসে তাঁদের মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেত না। বড় আপনার করে তারা তাঁকে ধরতে পারতো। এবং এই আপনার করে যদি একবার ধরতে পারা যায় তাহলে ইহকালের পরকালের সব সমস্যার চিরকালের জন্ম সমাধান হয়ে যায়। আমরা এইভাবে মাকে যাতে বুঝতে পারি সহজভাবে, তাই তিনি তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্যকে লুকিয়ে, সমস্ত আভরণ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিরাভরণ—একেবারে সম্পূর্ণ সহজ সরল স্বাভাবিক রূপে মাতৃমূর্তিতে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হচ্ছেন— এমন পোশাক পরে নয়— যাতে মনে হয় যে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লে মায়ের পোশাকটা খারাপ হয়ে যাবে। ঐশ্বর্যের কোন পোশাক নেই, দিব্য বিভূতির কোন বাহ্য আভরণ নেই— শুধু মা— কেবলই মা— আমাদেরই আপন মা— কোন চিন্তাই নেই সেখানে। এই রূপটি ভক্তদের বিশেষ আকর্ষণের জিনিস ছিল। কিন্তু তা বলে মায়ের এই যে মাতৃস্নেহ— এর ভেতরে কোন মোহ ছিল না। এর ভেতরে অন্ধকার ছিল না— এতে বন্ধন এনে দিত না, যে বন্ধনের অর্থ জ্ঞানের আলোক থেকে বঞ্চিত হওয়া। মোহবন্ধন থেকে তিনি আমাদের এর ভেতর দিয়ে মুক্ত করতেন। তাঁর স্নেহ দিয়ে আমাদের আকর্ষণ করে অন্য সব আকর্ষণ থেকে আমাদের সরিয়ে আনতেন। 'ইতররাগ-বিস্মারণং নৃণাম্'— তাঁর এই আকর্ষণ মানুষকে অন্য সব আকর্ষণ ভুলিয়ে দিত। এই যে তাঁর আকর্ষণী শক্তি, এর প্রকাশ এমন স্পষ্টভাবে এমন ব্যাপকভাবে এমন প্রবলরূপে, বোধ হয় জগতে আর কখনও হয়নি। এত স্বাভাবিক এত স্নিগ্ধ এত মধুর অথচ এত বিশাল এত ব্যাপক এত সর্বগ্রাহী যে তা কল্পনাও করা যায় না। স্বামী প্রেমানন্দ এক জায়গায় বলছেন যে, ঠাকুর তবু বেছে বেছে লোক নিতেন, মা কিন্তু যে যাচ্ছে— অবিচারে তাকেই গ্রহণ করছেন আর সমস্ত বিষ হজম করছেন। আমরা আমাদের যা আছে তাই নিয়েই তো যাব— ভেতর যদি বিষে ভরা থাকে তো করব কি ? এ বিষ আমরা কোথায় রাখব ? তিনি আছেন, আমাদের সমস্ত পাপতাপ গ্রহণ করবেন— ক'রে তাঁর কোলে স্থান দেবেন,—

এই অভয়বাণী তাঁর কাছ থেকে ভক্তেরা শুনেছেন। 'আমার সন্তান আমি তাদের মা —আমি কি তাদের ঝেড়ে মুছে সাফ করে নেব না – একি আমারই দায় নয়?' - এই ছিল মায়ের মনের ভাব। মা কি কখনও সন্তানকে ফেলে দিতে পারেন? সন্তানের ভালমন্দ কাজের বিচার নেই কিছু। অহেতুনা নো দয়সে সদোষান্'— আমরা দোষ-দুষ্ট যতই হই না কেন, তিনি আমাদের দয়া করছেন, অশেষ করুণা করছেন নির্বিচারে—যোগ্যাযোগ্য পাত্র বিচার না করে। এই আমাদের বিশেষ ভরসা— অভয়স্বরূপিণী মা রয়েছেন। মা নাম শুনলে ভয় দূর হয়ে যায়। মা আমাদের সব ভয় দূর করুন, সকল অশান্তি থেকে মুক্ত করুন, আমাদের সব সময় তাঁর স্নেহময় শ্রীকরে ঘিরে রাখুন— তাঁর শ্রীপাদপদ্মে চিরকালের জন্য স্থান দিন। তাহলেই আমাদের জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা। কাজেই মায়ের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে এ-কথাই বলি— 'মা, আমরা যেন বুঝি, তুমি সর্বদাই আমাদের।'

শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে (বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে) গত ১৯শে পৌষ ১৩৮ , ইং ৪ঠা জানুয়ারি ১৯৭৫, শনিবার, শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবীর ১২২তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি উষাকীর্তন ভজন বিশেষ পূজা হোম শ্রীশ্রীচণ্ডী পারায়ণ প্রসাদ বিতরণ ও লীলাকীর্তন-কালীকীর্তনাদি হয়। সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি টা পর্যন্ত অবিশ্রান্ত ভক্তগণের আগমনে ও পূজা পাঠ ভজন প্রার্থনায় এক দিব্য পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছিল। সমগ্র দিনে ফল মিষ্টি খিচুড়ি প্রসাদ প্রায় ১২,০০০ লোককে দেওয়া হইয়াছিল। এতদুপলক্ষ্যে নূতন বাড়ীর হলঘরে সকাল ৬-৩০ মিনিট হইতে ভজনাদি হয়। পূর্বাহ্নে ইচ্ছাময়ী কালীকীর্তন সম্প্রদায় কর্তৃক কালীকীর্তনের পর স্বামী অমলানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী পাঠ ও আলোচনা করেন এবং রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের ছাত্র ও শিক্ষকগণ সম্মিলিতভাবে কীর্তনাদি করেন। সন্ধ্যায় নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্রগণ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন লীলাগীতির মাধ্যমে পরিবেশন করে। শ্রীশ্রীমায়ের বাটীর হল ঘরটিতেও অনুরূপভাবে ভজন আলোচনাদি চলে।

কল্পতরু উৎসব

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে গত লা জানুআরি, ১৯৭৫ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কল্পতরু উৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাড়ম্বরে আনন্দময় পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষ্যে ১লা, ৩রা ও ৫ই জানুআরিও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সূচী থাকায় অগণিত ভক্তের সমাবেশ ঘটে এবং বিপুলাকার উৎসবটি সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

১লা মঙ্গলারতির পর পূজা হোম ভোগরাগাদি হয়, প্যাণ্ডেলে সকাল ৭টা হইতে বেদগান সঙ্গীতাঞ্জলি শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি লোকগীতি কালীকীর্তন প্রভৃতি পরিবেশন করেন বিভিন্ন শিল্পিবৃন্দ। গীতা কথামৃত ও ভাগবত পাঠ এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী দেবানন্দ, স্বামী চিন্ময়ানন্দ, স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ প্রভৃতি। অপরাহ্ণে ধর্মসভা ও রামায়ণ-কীর্তন হয়। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী ভূতেশানন্দ। বক্তা ছিলেন স্বামী বুধানন্দ, স্বামী অমৃতত্বানন্দ ও অধ্যাপক নীরদবরণ চক্রবর্তী। রামায়ণ গান করেন শ্রীবিশ্বনাথ গাঙ্গুলী। বেদগান ও সঙ্গীতাঞ্জলিতে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী ভূপেন চক্রবর্তী, জগবন্ধু চক্রবর্তী ও রামকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দ। রামকৃষ্ণ-লীলাগীতি পরিবেশন করেন শ্রী নাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

২রা উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করেন স্বামী স্বানন্দ

ধর্মসঙ্গীত, স্তোত্র ও ভক্তিগীতিতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীপ্রণব মুখার্জী ও ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখার্জী। অপরাহ্নে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, বক্তা ছিলেন স্বামী মুমুক্ষানন্দ, স্বামী শিবময়ানন্দ ও শ্রীযশোদাকান্ত রায়। পরে শ্রীকানাইলাল সরকার পদাবলী কীর্তন করেন।

৩রা অপরাহ্নে স্বামী সমানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ ও আলোচনা করেন। রামায়ণ-গান করেন শ্রীদ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধ্যায় পদাবলী কীর্তন করেন শ্রীগৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪ই মধ্যাহ্নে শ্রীপ্রভাত কুমার ঘোষের সঙ্গীতের পর মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায়। অপরাহ্নে হাওড়া সমাজ কর্তৃক "নীলাচল-লীলা" কীর্তনাভিনয় হয়।

১লা ২২।২৩ হাজার ভক্তের সমাবেশ হয়। হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ পান প্রায় ১৫ হাজার ভক্ত। প্রায় ২০ হাজার ভক্তের সমাগম হয় ৪ই জানুয়ারি।

রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৭৩-৭৪ সালের কার্যবিবরণী।

(১০ই নভেম্বর ১৯৭৪ বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের ৬৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় পঠিত **গভর্নিং বডির** প্রতিবেদনের বঙ্গানুবাদ)

"বন্ধুগণ, রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৭৩-৭৪ সালের কার্যবিবরণী উপস্থাপিত করিতে যাইয়া আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আমাদের প্রণাম নিবেদন করিতেছি। তাঁহারই করুণায় ধর্ম, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক বিবিধ কর্মের ক্ষেত্রে ভারতের তথা ভারতবহির্ভূত দেশের জনগণের সার্থক সেবায় মিশন আরও একটি বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। কোন কোন স্থানে বিভিন্ন কারণে যদিও আমাদের কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তথাপি আলোচ্য বৎসরটি ছিল মোটামুটিভাবে শান্তিপূর্ণ। ঔষধপত্র, খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহের মূল্যবৃদ্ধি ও অপ্রাপ্তি আর্থিক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল এবং প্রায় প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় আমাদের বেগ পাইতে হইয়াছিল। অধিকন্তু, নূতন রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিস্তারের ফলে সাধারণ মানুষের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সাবলীল পরিচালনায় বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল— কর্মিগণের পক্ষ হইতে বেতন বৃদ্ধির ও প্রশাসনে অন্তর্ভুক্তির দাবি, হাসপাতালের রোগিগণ ও আবাসিক ছাত্রগণের পক্ষ হইতে আরও ভাল খাদ্য ও সুযোগ-সুবিধার জন্য চাপসৃষ্টি এবং এই ধরনের অন্যান্য ব্যাপার সময়ে সময়ে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কারণ হইয়াছিল। কলিকাতার ইনস্টিটিউট অব কালচার, বেলুড় ও বেলঘরিয়ার পলিটেকনিক, রাঁচির যক্ষ্মা হাসপাতাল এবং কোয়াম্বাতুরের বিদ্যালয় উক্ত বিষয়ের কয়েকটি উদাহরণ। আমাদের পুনরুদ্বোধিত বাংলাদেশস্থিত কেন্দ্রগুলিকে স্বনির্ভর হইতে এবং স্থানীয় জনতার নিকট তাহাদের অস্তিত্বকে ফলপ্রদ করিতে বহু জটিল বাধার বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। হাঙ্গামাগুলি এখনও দূরীভূত হয় নাই এবং আমরা জানিনা ঘটনাচক্র কি রূপ পরিগ্রহ করিবে অথবা কি নূতন পরিস্থিতি আসন্ন। তথাপি শ্রীগুরু মহারাজের প্রতি বিশ্বাস এবং আত্মপ্রত্যয় সহায়ে আমরা সাহস ও অকপটতার সহিত

কাজ চালাইয়া যাইব এবং তিনি আমাদিগকে সাহায্য করিবেন, যেমন তিনি সর্বদাই করিয়া আসিয়াছেন।

উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

আলোচ্য বর্ষে রাঁচি, মোরাবাদীর 'দিব্যায়নে'র তিনতলা হোস্টেল-ভবনটি সম্পূর্ণ হয় ও উহার উদ্বোধন করা হয়। স্বর্গত সামশের সিং-এর উইলের শর্তানুসারে কিষণপুরে বর্তমান আশ্রমের পাশে দাতব্য চিকিৎসালয় সহ মিশনের একটি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

সদস্য ও কর্মকর্তৃগণ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত আমাদের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট, স্বামী ওঙ্কারানন্দজী ও পরিচালক-মণ্ডলীর প্রবীণ সদস্য, স্বামী শান্তানন্দজীর দেহত্যাগ ঘটনা নথিভুক্ত করিতেছি। স্বামী ওঙ্কারানন্দজীর মহাপ্রয়াণে মিশন একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও অভিজ্ঞ সন্ন্যাসীকে হারাইয়াছে. যাঁহার পথনির্দেশনা ও উপদেশ ছিল মহামূল্যবান্। আধ্যাত্মিক গুণাবলীর জন্য স্বামী শান্তানন্দজী আমাদের গভীর শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং তাঁহার এই অধ্যাত্মসম্পদ ছিল সঙ্ঘের পক্ষে শক্তির উৎস। অন্যান্য কর্মকর্তৃগণ পূর্ব বৎসরের মতই ছিলেন।

এই বর্ষে সর্বস্বামী হিরণ্ময়ানন্দ, বন্দনানন্দ, আত্মস্থানন্দ ও গীতানন্দ পরিচালক-মণ্ডলীর সদস্য হইয়াছেন।

১৯৭৩-৭৪ সালে মিশন ১০ জন সন্ন্যাসী এবং ৭ জন গৃহী সদস্যকে হারাইয়াছে। এই বৎসরের শেষে মিশনের সন্ন্যাসী ও গৃহী সদস্য ছিলেন যথাক্রমে ৩৬২ ও ৩৬০ জন।

কেন্দ্রসমূহ ও কার্যাবলী

১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে বেলুড় মঠস্থিত প্রধান কার্যালয় ব্যতীত মিশনের ৭৫টি শাখাকেন্দ্র ছিল, তন্মধ্যে ৭টি বাংলাদেশে, ব্রহ্মদেশ, ফ্রান্স, ফিজি, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা ও মরিসাসে ১টি করিয়া এবং অবশিষ্ট ৬২টি ভারতে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, রামকৃষ্ণ মঠের প্রধান কার্যালয় ব্যতীত ভারতে ও বহির্ভারতে মোট ৬৫টি মঠকেন্দ্র আছে এবং উহাদের বিস্তারিত কার্যবিবরণী এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কর্তৃক আচরিত ও উপস্থাপিত এবং স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও স্বীয় জীবনে প্রদর্শিত বেদান্ত-ভিত্তিক নিষ্কাম সেবাই ছিল মিশনের কর্মক্ষেত্র। এই সেবাপ্রচেষ্টাকে মোটামুটি পাঁচটি বিভাগে ভাগ করা যায়—(১) ত্রাণ, (২) চিকিৎসা (৩) শিক্ষা, (৪) সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবের প্রচার এবং (৫) গ্রামাঞ্চলে ও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে কার্য।

ত্রাণকার্য: বাংলাদেশে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজটি ১৯৭২ সালের ফেব্রুআরিতে আরম্ভ হইয়া আলোচ্য বর্ষেও অব্যাহত থাকে। কাজের ধারা ছিল—বাড়ি তৈরী করানো, নলকূপ বসানো, খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদি বিতরণ, চিকিৎসা বিষয়ক সাহায্য দান ইত্যাদি। মিশন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বাগেরহাট, বরিশাল, দিনাজপুর, ফরিদপুর এবং শ্রীহট্টে অবস্থিত মঠ ও মিশনের কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে এই কাজটি পরিচালিত করে। মোট ৭,৬৪,৩২৬ টাকা ব্যয়ে ৭৭,৯২২টি পরিবারের প্রায় ৩,০২,৪২৯ জন নানাধরনের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রায় ৩৪,১৮,০০০ টাকা মূল্যের নানাবিধ সামগ্রী অভাবগ্রস্ত লোকদের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে।

ভারতেও নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে যে বিভিন্ন ধরনের ত্রাণকার্য করা হয় তাহাতে মোট ৪,৩১,৫২৮ টাকা ব্যয় হয় এবং ২৩,৯১০টি পরিবারের প্রায় ৮৮,২৩০ জন সাহায্য লাভ করেন:

(ক) বন্যাত্রাণ—(১) কাঁথি ও রহড়া আশ্রম কর্তৃক মেদিনীপুর জেলায়, (২) সারদাপীঠ কর্তৃক ত্রিপুরাপ্রদেশে, (৩) পুরী মিশন কর্তৃক পুরীতে।

(খ) খরাত্রাণ- বোম্বে আশ্রম কর্তৃক মহারাষ্ট্রে।

(গ) চিকিৎসাবিষয়ক ত্রাণকার্য—বোম্বে আশ্রম কর্তৃক আদিবাসিগণের মধ্যে।

এতদ্ব্যতীত ব্যাঙ্গালোর এবং রাজকোট মঠ-কেন্দ্র দুইটি খরা- ও খাদ্যাভাব-ত্রাণকার্য পরিচালনা করে।

শাখাকেন্দ্রগুলি যে স্বকীয় অঞ্চলে দরিদ্রদের নগদ অর্থ ও দ্রব্যাদি নিয়মিত সাহায্যরূপে দান করিয়াছে, তাহা এখানে উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বেলুড় মঠস্থিত প্রধান কার্যালয় হইতেও মূল্যবান কার্য করা হইয়াছে— ৫৪,৩১৯ টাকা ব্যয়ে ৭১টি পরিবার ও ৩৯৬ জন ছাত্রকে নিয়মিত এবং ১১৭টি পরিবার ও ২৮৮ জন ছাত্রকে সাময়িক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে ও ১৫৪টি পোশাক, ৫টি আলোয়ান, ৬০টি কম্বল ও ১৫২টি ধুতি ও শাড়ী বিতরণ করা হইয়াছে।

চিকিৎসা: জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে রোগীদের সেবার জন্য ভারতের অধিকাংশ মিশনকেন্দ্র কতকগুলি ইন্‌ডোর হাসপাতাল ও আউট্‌ডোর ডিসপেন্‌সরি পরিচালনা করে। আলোচ্য বর্ষে মিশনের ৮টি হাসপাতালের ১,২৮২টি ইন্‌ডোর শয্যায় ২৮,৪৬৬ জন এবং ৪৯টি আউট্‌ডোর ডিসপেন্‌সরিতে ৩১,৬৪,৭০২ জন রোগী চিকিৎসিত হন। রাঁচি হাসপাতালে এবং নিউদিল্লীস্থিত করলবাগের পর্যবেক্ষণ-শয্যাগুলিতে শুধু যক্ষ্মা রোগীদের পরিচর্যা করা হয়। কলিকাতার সেবাপ্রতিষ্ঠান অন্যান্য বিভাগ ছাড়াও একটি শুশ্রূষা- ও ধাত্রীবিদ্যা-শিক্ষণ শিক্ষালয় যথারীতি পরিচালনা করিয়াছে। ইহাতে 'সাহায্যকারী' ও 'সাধারণ' এই দুই শাখাতে মোট শিক্ষার্থিনীদের সংখ্যা ছিল ২০৩।

মঠকেন্দ্রগুলির ৩৩২ শয্যাসমন্বিত ৫টি ইন্‌ডোর হাসপাতালে ১২,৪১৬ জন এবং ১৪টি আউট্‌ডোর ডিসপেন্‌সরিতে ৪,৫০,৮২৬ জন রোগী চিকিৎসিত হন ও প্রায় ৩০ জন শুশ্রূষাকারিণী শিক্ষা লাভ করেন।

শিক্ষা: আলোচ্য বর্ষে মিশন পরিচালনা করিয়াছে: ৫টি সাধারণ কলেজ, ২টি বি. টি. কলেজ, ১টি স্নাতকোত্তর বেসিক ট্রেনিং কলেজ, ১টি জুনিয়ার বেসিক্ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ১টি বেসিক্ ট্রেনিং স্কুল, ১টি শারীরশিক্ষা কলেজ, ১টি গ্রামীণ উচ্চতর শিক্ষা কলেজ, ১টি কৃষিবিদ্যালয়, ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, ৮টি জুনিয়ার টেকনিক্যাল ও শিল্পবিদ্যালয়, ৭২টি বিদ্যার্থি-ভবন, ছাত্রাবাস ও অনাথাশ্রম, ৩৫টি বহুমুখী উচ্চতর মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৩৩টি অন্যান্য স্তরের বিদ্যালয়, প্রাপ্তবয়স্কদের ৫৯টি শিক্ষাকেন্দ্র বা কমিউনিটি সেণ্টার, অন্ধ বালকদের ১টি শিক্ষানিকেতন, ২টি বাণিজ্য-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১টি ভাষাশিক্ষা বিদ্যালয় এবং ১টি মানবিক ও আন্তঃসাংস্কৃতিক অধ্যয়নাগার। এই সকল প্রতিষ্ঠানে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৬৯,১৩২; তন্মধ্যে ৬৯,৩৯৭ জন ছাত্র এবং ১৯,৭৩৫ জন ছাত্রী।

মঠকেন্দ্র-পরিচালিত ২২টি বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসের মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল, ৬,১৪০।

সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবপ্রচার:

এই কর্মবিভাগে বহুসংখ্যক গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, সাময়িক প্রদর্শনী জনসাধারণের জন্য উৎসবাদি, চলচ্চিত্র ও ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নের সাহায্যে চিত্রপ্রদর্শন, নিয়মিত ক্লাস, বক্তৃতা ও সেমিনারগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কয়েকটি কেন্দ্রের প্রকাশন-বিভাগের কথাও

উল্লেখযোগ্য। এই সম্পর্কে কলিকাতা ইনস্টিটিউট অব কালচার বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বহুসংখ্যক বৃহৎ পুস্তক প্রকাশন-কেন্দ্র ও মন্দিরসমূহের পরিচালনার দ্বারা এবং বক্তৃতা ও আলোচনাদির ব্যবস্থা করিয়া মঠকেন্দ্রগুলি যে প্রচার ও প্রকাশনার কার্য করিতেছে আমরা এই স্থলে তাহা অন্তর্ভুক্ত করি নাই।

গ্রামে এবং উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে সেবাকার্য

স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা অনুসারে মিশন তাহার সীমিত সঙ্গতি- ও লোকশক্তি-সহায়ে ভারতের বিভিন্ন অংশের গ্রাম ও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে দরিদ্র ও অনুন্নতদের মধ্যে সেবাকার্য চালাইয়া আসিতেছে। মিশনের চিকিৎসা- ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও অনগ্রসর লোকের সেবা করা হয়। একের পর এক ক্ষিপ্রগতিতে পরিচালিত ত্রাণকার্যসমূহ দুঃস্থ ও অনুন্নত জনগণের সাহায্যার্থেই করা হয় এবং বার্ষিক অনুষ্ঠানগুলি সহস্র সহস্র লোককে জীবনের যে উচ্চতর ভাব ও আদর্শসমূহের সংস্পর্শে আনে তাহা দুঃখ কষ্ট ও বিপর্যয়ের মধ্যে তাহাদের খুব কাজে লাগে। গ্রামাঞ্চলে সেবাকার্যের কথায় বলা যায় যে, কমপক্ষে দশটি বৃহৎ কেন্দ্র গ্রাম ও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে অবস্থিত। এইগুলির ও শহরাঞ্চলে অবস্থিত অন্যান্য কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে গ্রামবাসী ও অনুন্নত ব্যক্তিদের জন্য পরিচালিত হয়: ১৪৮টি বিদ্যালয়, তন্মধ্যে ৮টি বহুমুখী, ৪টি মাধ্যমিক, ৪৪টি সিনিয়র বেসিক, জুনিয়র বেসিক, উচ্চ প্রাথমিক ও মধ্য ইংরাজী, ৯৬টি নিম্ন প্রাথমিক এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ৪৬টি সাক্ষর- ও কমিউনিটি-কেন্দ্র; ১৭টি দাতব্য চিকিৎসালয়; ২৫টি গ্রন্থাগার, তন্মধ্যে ৩টি ভ্রাম্যমাণ; ১০৩টি দুগ্ধ-বিতরণ কেন্দ্র; ৭টি চলচ্চিত্রের ইউনিট; ৪টি কারিগরি শিক্ষণ-কেন্দ্র; ১টি গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক-শিক্ষণ-কেন্দ্র ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত ৬টি ভ্রাম্যমাণ ডিসপেন্সরি—১,২২,২৫৭ জন রোগীর চিকিৎসা করিয়াছে। রাঁচি আশ্রম পরিচালিত আবাসিক যুব-প্রতিষ্ঠান 'দিব্যায়ন' কৃষি, হাঁস-মুরগী পালন, দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন, ইত্যাদি শিক্ষণ-প্রকল্প এবং অন্যান্য নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসূচীর মাধ্যমে উপজাতিদের মধ্যে প্রশংসনীয় সেবাকার্য করিয়াছে। গ্রামীণ যুবকদের আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি শিক্ষা দিবার জন্য নরেন্দ্রপুরেও একটি কেন্দ্র আছে। শিলচর আশ্রম কুকী, মিজো ও অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে বহুবিধ জনহিতকর কার্য করিয়াছে। মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জি কেন্দ্র এবং অরুণাচল প্রদেশের আলং (সিয়াং) ও নরোত্তম-নগর (তিরাপ) কেন্দ্র শিক্ষামূলক সাংস্কৃতিক ও চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় কার্যাদি করিয়া আসিতেছে এবং এই কারণে উক্ত কেন্দ্রগুলি উপজাতীয় অধিবাসি-গণের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে। রায়পুরস্থিত পঞ্চাখতিরাজ শিক্ষণ-কেন্দ্র এবং নরেন্দ্রপুরের গ্রাম-পর্যায় কর্মি-শিক্ষণ কেন্দ্রের (Village Level Workers Training Centre) উল্লেখ এইখানে করা যাইতে পারে।

বিদেশে প্রচারকার্য

ব্রহ্মদেশ, শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর, ফিজি ও মরি-সাসের মিশন কেন্দ্রসমূহ যথাবৎ শিক্ষামূলক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সেবাকার্য করিতেছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, ইংলণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ডস্থিত ১৫টি মঠকেন্দ্রও অনুরূপ কার্য করিতেছে।

বাংলাদেশে ১০টি মঠ ও মিশন কেন্দ্র আছে। তন্মধ্যে ঢাকা, দিনাজপুর, বাগেরহাট ও শ্রীহট্ট কেন্দ্র নিয়মিত পূজা ও প্রচার কার্য ব্যতীত পাঠাগার, ছাত্রাবাস, ও দাতব্য চিকিৎসালয়

পরিচালনা করে। অন্যান্য কেন্দ্রগুলিও তাহাদের সামর্থ্য অনুযায়ী স্বল্পপরিসরে জনহিতকর কার্য করে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, প্রায় সকল কেন্দ্রই ত্রাণকার্য করিতেছে।

উপসংহার

বন্ধুগণ, উপস্থাপিত বিবরণী হইতে ইহা স্পষ্ট যে, যদিও বাধাবিঘ্ন ছিল তথাপি সর্বশক্তিমানের করুণায় মিশনের কার্যাবলী দক্ষতা ও সার্থকতার সহিত পরিচালিত হইয়াছে। সরকার ও জনসাধারণের সক্রিয় সহানুভূতি ও সাহায্যে এবং আপনাদের সহৃদয় সহযোগিতায় ইহা সম্পন্ন হইয়াছে। এইজন্য আমরা হার্দিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদ আমাদের সকলের উপর বর্ষিত হউক।"

দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত আমরা পাঁচজন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ সংবাদ জানাইতেছি :

স্বামী মুক্তিদানন্দ গত ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৭৪, সন্ধ্যা ৬.৪৫ মিনিটে বারাণসী সেবাশ্রমে ৭২ বৎসর বয়সে বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা ও অন্যান্য ব্যাধিতে দেহত্যাগ করেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দজী মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন ও ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা কেন্দ্রে যোগদান করেন। ১৯২৯ সালে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের নিকট তিনি সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। ঢাকা এবং বেলুড় মঠ ছাড়াও তিনি সোনারগাঁ এবং বারাণসী সেবাশ্রমে কাজ করেন। বিগত ২০ বৎসর কাল যাবৎ তিনি বারাণসী সেবাশ্রমে অবসর জীবন যাপন করিতেছিলেন।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ গত ১৯শে ডিসেম্বর সকাল ৭.৩৫ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ৬৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি ফুসফুসের ক্যান্সার রোগে ভুগিতেছিলেন। শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের নিকট তিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়া ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকুড়া কেন্দ্রে যোগদান করেন। ১৯৫৭ সালে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের নিকট তিনি সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হিসাবে তিনি বাঁকুড়া ডিস্পেন্সরিতে সেবাকার্য করিতেন।

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ গত ২০শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ৮৩ বৎসর বয়সে ফুসফুসের ক্যান্সার ও অন্যান্য বার্ধক্যজনিত ব্যাধিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বিগত কয়েক মাস যাবৎ তিনি অসুস্থ হইয়া চিকিৎসার্থে বেলুড় মঠে ছিলেন। অবস্থা জটিল হওয়ায় প্রায় দুইমাস পূর্বে তাঁহাকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভরতি করানো হয়। দেহত্যাগের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে চিকিৎসকগণ দৃঢ় নিশ্চিত হন যে, তাঁহার ফুসফুসে ক্যান্সার রোগ হইয়াছে এবং যথোচিত চিকিৎসা সত্ত্বেও তাঁহার দেহান্ত ঘটে। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন ও ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠে যোগদান করেন। ১৯২৩ সালে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট তিনি সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। তৎকালীন পূর্ববঙ্গে সোনারগাঁ সেবাশ্রমের তিনি প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন এবং পরে ক্রমান্বয়ে ঢাকা, বোম্বে এবং বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ হিসাবে সংঘ-সেবা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের শতবর্ষ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে তাঁহার ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মিশন পরিচালিত বহুবিধ ত্রাণমূলক সেবাকার্যে তিনি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯৪৭ সালে তিনি বেলুড় মঠের ট্রাস্টি ও রামকৃষ্ণ মিশন গভর্নিং বডির সদস্যরূপে বৃত হন।

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ গত ২১শে ডিসেম্বর সন্ধ্যারাত্রিকের কিছু পরে বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমে ৭৪ বৎসর বয়সে ব্রোনাকি থ্রম্বসিসে দেহত্যাগ করেন। তিনি শ্রীমৎ সারদানন্দজী মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন ও ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠে যোগ দেন। ১৯২৪ সালে স্বীয় গুরুর নিকট হইতেই তিনি সন্ন্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হন। বেলুড় মঠ, বরানগর, মায়াবতী এবং বারাণসী সেবাশ্রমে তিনি কর্মী ছিলেন। বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমে থাকাকালীন তিনি শঙ্করাচার্যকৃত শারীরকভাষ্যের প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ ও 'ভাবদীপিকা' নামক বিস্তারিত বাংলা টীকা রচনা করেন। বিশালকায় এই গ্রন্থ বেদান্তদর্শনে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ও প্রীতির নিদর্শন।

স্বামী অসঙ্গানন্দ গত ২৭শে ডিসেম্বর বিকাল ৫.০৩ মিনিটে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ৭৬ বৎসর বয়সে হৃদ্‌যন্ত্রের অক্ষমতাহেতু দেহত্যাগ করেন। বেলুড় মঠে গত কয়েক মাস যাবৎ তিনি নানাবিধ ব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের নিকট তিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন ও ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে কনখল সেবাশ্রমে যোগদান করেন। ১৯২৩ সালে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট তিনি সন্ন্যাস দীক্ষা লাভ করেন। তিনি বেলুড় মঠ ও মাদ্রাজ মঠের কর্মী ছিলেন এবং কলম্বো, ভুবনেশ্বর ও শ্রীনগর কেন্দ্রের প্রধান হিসাবে সংঘ-সেবা করিয়াছিলেন। তিনি কিছুকালের জন্য কার্যকরী সমিতির সদস্যও ছিলেন।

ইঁহাদের দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

খিদিরপুর স্কুলবিজ্ঞান কর্তৃক গত ২৩শে ডিসেম্বর শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজীর এবং ২৫শে ডিসেম্বর ভগবান যীশুর আবির্ভাব উৎসব পরম নিষ্ঠার সহিত পালিত হয়। শ্রীনবীন্দ্রনাথ বসু অনুষ্ঠানদ্বয় পরিচালনা করেন এবং 'ভগবান যীশু ও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ' বিষয়ে সারগর্ভ ভাষণ দেন।

তেজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম কর্তৃক প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীশ্রীকালীপূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় ও অন্যান্য ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। রাত্রে ও পরদিন প্রাতে বহু ভক্ত নরনারীকে প্রসাদ দেওয়া হয়। উল্লেখযোগ্য যে, সেবাশ্রমের সেবকবৃন্দ এই বৎসর শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার আয়োজন না করিয়া পূজার মাসে অর্থ ও দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া আসামের বন্যাত্রাণে সহায়তা করে।

১লা জানুআরি ১৯৭৫, সেবাশ্রম প্রাঙ্গণে কল্পতরু উৎসব পালিত হয়। প্রত্যুষে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত ও ভজন, পূর্বাহ্নে বিশেষ পূজা, হোম ও প্রসাদ বিতরণ এবং অপরাহ্নে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।

৪ঠা জানুআরি সেবাশ্রমে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সারদাদেবীর শুভ জন্মতিথি উৎসব পালিত হয়। প্রত্যুষে মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের গান এবং পরে অন্যান্য ভজন, বিশেষ পূজা ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ হয়। দ্বিপ্রহরে প্রায় এক হাজার ভক্ত নরনারী প্রসাদ পান। অপরাহ্নে ধর্মসভায় বিভিন্ন বক্তা শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

[পুনর্মুদ্রণ]

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ।] ১৫ই আষাঢ়। (১৩০৬ সাল) [১২শ সংখ্যা।]

কারিষ্টু।

(বাবু কিরণচন্দ্র দত্ত লিখিত।)

[পূর্বানুবৃত্তি]

সে বলিল, তাহার খাজানা বাকী পড়িয়াছে, উপস্থিত সতের ফ্রাঙ্ক তাহার ঋণ। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে উহা নিশ্চয়ই পরিশোধ করিতে হইবে। না পারিলে পরবর্তী নির্ব্বাচনে তাহার সদস্য পদ অনিশ্চিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। সেই নিমিত্ত, দৃষ্টিহীনতাবশতঃ কৃষিকর্ম্মে অপারগ হইলেও সারাদিন জোঁক ধরিয়া থাকে। যদিও তাহার দুই চারিটি এমন বন্ধু আছেন, যাহারা তাহাকে সাহায্য করিতে পারেন, কিন্তু সে এমনই স্বাধীনচেতা, যে না খাইয়া মরিবে সেও ভাল, তথাপি কাহারও নিকট অর্থসাহায্য গ্রহণ করিবে না। আরও বলিল, পিরটির অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার ধর্ম্মপিতা।

এই সকল কথা শুনিয়া মথিলীনের কোমল হৃদয় দয়ায় গলিয়া গেল, সে ভাবিল, কল্য এই স্বাধীন কৃষকের যে ক্ষতি করিয়াছি, তাহার প্রতিকার বিশেষ আবশ্যক। তাহাকে যদি সে সতের ফ্রাঙ্ক দান করে, সে কখনই লইবে না। বার বার তিনবার মথিলীন করযোড়ে আকাশের দিকে চাহিয়া প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, "কতগুলি জোঁক পাইলে তোমার ঋণ পরিশোধ হইবে?"

"প্রায় তিনশত আবশ্যক। যদি আমার পা যুবার ন্যায় সরস থাকিত, তাহা হইলে প্রতিদিন আমি পঞ্চাশটি জোঁক ধরিতে পারিতাম।"

বালিকা বুঝিল, তিনশত সে তিনমাসেও ধরিতে পারিবে না। কোন না কোন উপায়ে কারিষ্টুকে উক্ত কার্য্যে সাহায্য করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে উপায় স্থির হইল। পরদুঃখকাতরা মথিলীন আনন্দে উৎফুল্ল হইল, তাহার আঁখিদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কম্পিতহস্তে ধীরে ধীরে জুতা খুলিয়া ফেলিল। একবার এদিক একবার ওদিক চাহিয়া মোজা জোড়াটি খুলিয়া রাখিল। সে ভাবিল, "অন্ধ কারিষ্টু ব্যতীত এখানে আর কেহ নাই।" মথিলীন জানিত না যে, সেই অখিল-সংসারপরিব্যাপ্ত পরমপিতা পরমেশ্বরের চিরমুক্ত চক্ষু তাহার অলৌকিক কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছে। চিরদিন সুখের ক্রোড়ে পালিতা, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী মথিলীন—সেই অপূর্ব্বচরিত্রা মথিলীন আপনার সুকোমল পদযুগল নিঃশব্দে জলের মধ্যে জোঁক ধরিবার জন্য ডুবাইয়া দিল। অতি সাবধানে কারিষ্টুর সাহায্যের জন্য বরফের ন্যায় শীতল জলে পা ডুবাইয়া

বসিল। কিছুতেই বৃদ্ধকে জানিতে দিল না। এইভাবে অল্পক্ষণ থাকিবামাত্র সত্য সত্যই শোণিত-লোলুপ জোঁকসকল বালিকার সুকোমল পদে দংশন আরম্ভ করিতে লাগিল। প্রথমে মথিলীনের বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সে তাহাতে বিচলিত হইল না। পরোপকাররূপমহাব্রত যাহার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে, সে কি আপনার কষ্টে বিচলিত হয়? স্বার্থত্যাগই তাহার প্রধান অবলম্বন। দেখ জগৎবাসী! তোমাদের সেই চঞ্চলা অসহনশীলা 'পাগলী মথি' আজ কি করিতেছে! আজ সে কত ধীরা! আজ সে কত সহনশীলা! একবার দেখ! চক্ষু সার্থক হইবে। এ দৃশ্য দেখিবার এ দৃশ্য দেখাইবার। কাল কারিষ্টুর সহিত বিদ্রূপ করিয়া তাহার যে অনিষ্ট করিয়াছিল; আজ তাহার কিরূপ প্রতিকার করিতে বসিয়াছে। প্রতিকারের জন্য আজ মথিলীন যে মহাব্রত ধারণ করিয়াছে, কয়জন এজগতে তাহা পারেন; যাহারা মথিলীনের ন্যায় অল্পবয়স্কা হইয়া আপনার শরীরের শোণিত দিয়া স্বকৃত সামান্য অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেন, তাঁহারাই এজগতে মান্যার্হ—সাধারণের অনুকরণীয় আদর্শ। ধন্য মথিলীন! তুমিই ধন্য! আর মাতঃ বসুন্ধরে! তুমিও ধন্য! যখন মথিলীনের ন্যায় দেবীচরিত্রা মানবকন্যা হৃদয়ে ধারণ করিয়াছ।

এই ভাবে বসিয়া থাকিয়া মথিলীন একে একে দুতিন ঘণ্টার মধ্যে ৩০।৩৫টী জোঁক ধরিয়া দিল। কিন্তু প্রত্যেকবারেই কারিষ্টুকে ছলনা করিল। কোন বারে বলিল, "জোঁক জলের উপর ভাসিতেছিল, ধরিলাম," কোন বারে বা "তোমার বৃদ্ধাবস্থাপ্রযুক্ত পা এরূপ অসাড় হইয়াছে যে, জোঁক দংশন করিয়া পলাইতেছে, তুমি জানিতে পারিতেছ না, এই দেখ ধরিলাম", ইত্যাদি বলিয়া জোঁক ধরিয়া দিল। বৃদ্ধ কারিষ্টু অতগুলিন জোঁক একদিনে পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইল। কিন্তু 'পাগলী মথির' আনন্দের সীমা নাই। পৃথিবীতে আসিয়া অবধি এমন বিমল আনন্দ সে কখনও উপভোগ করে নাই।

কারিষ্টু বলিল, "এইরূপে ৫।৬ দিন জোঁক সংগ্রহ করিতে পারিলে আমার সব ঋণ পরিশোধ হইবে। তখন আর আমায় পায় কে।"

মথিলীন বলিল, "তাহাই হইবে, তজ্জন্য চিন্তা করিও না।"

এক সপ্তাহ ধরিয়া এই ভাবে জোঁক সংগ্রহ হইতে লাগিল। কারিষ্টু কিছুতেই জানিতে পারে নাই, কি উপায়ে এ কয় দিন এত জোঁক পাইতেছে। তাহার বিশ্বাস ছিল যে, পিরিটি গ্রামের কোন স্ত্রীলোকই আপনার পায়ের ক্ষতি করিয়া আপন শরীরের শোণিত দিয়া এরূপ কার্য্যে ব্রতী হইবে না। তায় আবার মথিলীন পারিসনিবাসিনী জমিদারকন্যা। "এই জোঁক জলের উপরে ভাসিতেছে" ইত্যাদি শুনিয়া কোনরূপ সন্দেহ করিতে পারে নাই।

এই ভাবে জোঁক সংগ্রহ হইতেছিল। একদিন অকস্মাৎ "হায় ভগবান্! আমার পরিবারস্থ কন্যা কিনা জোঁকপুকুরে পা ঝোলাইয়া বসিয়া থাকে!" এই বিস্ময়সূচক শব্দ এক বৃদ্ধার মুখ হইতে ধ্বনিত হইল। মথিলীন পশ্চাতে চাহিয়া দেখে, তাহার খুল্ল-তাত-পত্নী কথা কয়টী বলিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মানা। এদিকে বৃদ্ধ কারিষ্টুও অজ্ঞান হইয়া পুকুরধারে পড়িয়া গেল। সে এতক্ষণে বুঝিতে পারিল, কি উপায়ে জোঁক সংগ্রহ হইয়াছে।

মথিলীন তাহার দরিদ্র বৃদ্ধ কৃষকবন্ধু কারিষ্টুর এই অবস্থা দেখিয়া শোকে অধীরা হইল। খুল্ল-তাত-পত্নীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "হায় খুড়ি মা! তুমি আজ যে কি অনিষ্ট করিলে, তাহা

জানিতে পারিতেছ না। আমি অন্যায় করিলে তুমি আমায় প্রার্থনা-মন্দিরে পাঠাও, অদ্য তোমার প্রার্থনা-মন্দিরে যাইবার সময় উপস্থিত।"

কারিষ্টু পুকুরধারে পতিত। এরূপ নিশ্চলভাবে পতিত, যে মথিলীন মনে করিল, হয়ত বৃদ্ধের ক্ষুদ্র প্রাণ মহাপ্রাণে মিশিয়াছে। সে অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া বৃদ্ধকে উঠাইল। কারিষ্টু তার দৃষ্টিহীন চক্ষু জন্মের মত একবার মেলিল। মথিলীন আপনার স্কন্ধে ভর দিয়া কারিষ্টুকে তাহার বাটীতে লইয়া গেল। তথায় কারিষ্টুর দুইজন বন্ধুর সাহায্যে তাহাকে ধীরে ধীরে শয়ন করাইল। সেই শয়নই তাহার শেষ শয়ন—সেই নিদ্রাই তাহার মহানিদ্রা। হতভাগ্য কারিষ্টু আর জাগিল না—আর উঠিল না। মথিলীন খুল্ল-তাত-পত্নীর নিষেধসত্ত্বেও সেইস্থানে বসিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ভাই কারিষ্টু! তুমি স্বর্গে চলিলে; কিন্তু বন্ধু! তুমি এখনও পিরটি গ্রামের স্বায়ত্ত-শাসন সভার সদস্য থাকিবে। আমি এই স্থানে একখানি বাটী নির্মাণ করাইয়া 'ভোট' সংগ্রহ করিব। 'ভোট' দিয়া তোমাকে পিরটির সহকারী 'মেওর' করিব। আরও শুন, এইস্থানে আমি বিবাহ করিব। বিবাহের সময় তোমাকে 'মেওরে'র পদে অধিষ্ঠিত দেখিয়া আনন্দে নাচিব।" এইরূপে ক্রন্দন করিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইল। তাহার অরুণরাগরঞ্জিত কপোলযুগল হঠাৎ বিমলিন হইল। নতজানু হইয়া ঊর্দ্ধমুখে করজোড়ে সাশ্রুনয়নে মথিলীন তাহার প্রিয় কৃষকবন্ধু বৃদ্ধ কারিষ্টুর স্বর্গগত আত্মার উদ্দেশে প্রার্থনা করিল।

পার্শ্বে কারিষ্টুর মৃত দেহ। মুখে ক্ষীণ হাস্য রেখা লক্ষিত হইতেছে।

—০—

রামকৃষ্ণ মিশন।

ইষ্টার্ সপ্তে উপলক্ষে আমেরিকা নিউইয়র্ক সহরে স্বামী অভেদানন্দের নিকট চারিজন ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। অল্টারটী গেরুয়া কাপড় ও পুষ্প দ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল। ধূপধুনার গন্ধে ঘর আমোদিত হইয়াছিল, সুগন্ধিপুষ্প দ্বারা সজ্জিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে ও প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি করিয়া স্বামী চারিজনকে ব্রহ্মচারী করিয়াছিলেন ও যথাক্রমে শান্তিকাম, সত্যকাম, মুক্তিকাম ও গুরুদাস নাম প্রদান করেন।

স্বামী অভয়ানন্দ সম্প্রতি আমেরিকা শুভযাত্রা করিয়াছেন।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার ৫ ঘটিকার সময় সিস্টার নিবেদিতা নগ্নপদে কালীঘাটের নাটমন্দিরে কালীপূজা সম্বন্ধে এক মনোহারিণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতাশ্রবণে সভাস্থ সকলে চমৎকৃত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। হাল্‌দার মহাশয়েরা ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

১৮৯৮ খৃঃ অব্দের মে হইতে ১৮৯৯ খৃঃ অব্দের এপ্রিল পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদ অনাথাশ্রমের আয় ব্যয়ের বিবরণ।

আয়।

এককালীন সাহায্যকারীগণ—	...	...	৪৮৯।৵ ৫
মাসিক সাহায্যকারীগণ (১৮৯৮ অক্টো হইতে)		...	১৪১॥৵০
বিবিধ	...	...	৯॥ ১৫
			৬৪০৸/০

ব্যয়।

চাল, ডাল প্রভৃতি	...	...	২৩২।৶০
ঔষধাদি	...	...	১০। ১০
আসবাব প্রভৃতি	...	...	৮০৵ ৫
বস্ত্রাদি	...	...	২৪৸৶১৫
বাজে খরচ (যাতায়াত খরচ, মুটেভাড়া ইত্যাদি)		...	২৭৬।৶ ৫
			৬২৪।/ ৫
	উদ্বৃত্ত	...	১৬।৶ ৫
			৬৪০৸/০

আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ অনাথাশ্রমের বাটীনির্ম্মাণ ফণ্ডে এককালীন দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নবাব বাহাদুর মুর্শিদাবাদ জেলা	...	...	২০০৲
মিসেস্ সি. ই. সেভিয়ার, আলমোরা	...	...	১০০৲
সেখ মহম্মদ মনিরুদ্দিন সাহেব, বেলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ		...	৫০৲
হাজী সেখ নকীবদ্দিন সাহেব, দেবকুণ্ড	ঐ	...	২৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু শিবনারায়ণ আগরওয়ালা, বেলডাঙ্গা	ঐ		৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র ঘোষ ঐ	ঐ		৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস আঢ্য ঐ	ঐ		৫৲
পাঁচ টাকার ন্যূন সাহায্যকারীগণ ঐ	ঐ		১০৲
			৪০০৲

আমরা সাহায্যকারীগণকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করি।

———*———

ভগবদ্গীতা

শাঙ্করভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত।)

[২য় অধ্যায়ের ১০ শ্লোকের শেষাংশ হইতে ১৫ শ্লোকের শ্লোকার্ধ পর্যন্ত।—বর্তমান সম্পাদক]

শারীরকসূত্র রামানুজভাষ্যম্।

(পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিতম্।)

[প্রথম সূত্রের মূল ভাষ্যাংশ অনুবাদসহ।—বর্তমান সম্পাদক]

[১ম বর্ষ]　　১লা শ্রাবণ। (১৩০৬)　　[১৩শ সংখ্যা]

শ্রীরামানুজচরিত।

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।)

[দ্বিতীয় অধ্যায়ের কিয়দংশ—বর্তমান সম্পাদক]

ঝালোয়ার দুহিতা।

(কবিবর গিরীশচন্দ্র ঘোষ লিখিত।)

[পূর্বানুবৃত্তি]

পিঙ্গলা উত্তর করে, "তুমি আমার ঋণী বল কেন? অনাথ অবস্থায় তুমি আশ্রয় দিয়াছ, যদি রক্ষা পায়, তুমি জীবনদাতা। ও কথা কেন,—এই গান শোন। এই গানটী তুমি বড় ভালবাস।" সুরদাস গান শুনিতে চায় না। মুগ্ধকারিণী পিঙ্গলার মোহিনী চেষ্টা, বার বার বিফল হইতে লাগিল। পিঙ্গলা অন্তরে অন্তরে বুঝিল, সুরদাস মর্ম্মপীড়িত। বুঝিয়াছিল, সুরদাস তাহাকে ভালবাসে,—কিন্তু প্রতিদানের শক্তি তাহার নাই। এ চিন্তায়, পিঙ্গলার চক্ষে বিরলে জল পড়ে। কিন্তু চুম্বকসূচিকা যেরূপ উত্তর দিক লক্ষ্য করিয়া থাকে—আমোদে, বিষাদে, অন্তরতাপে, পিঙ্গলার মন, সেই রুগ্ন-গৃহের, লক্ষ্যশূন্য দৃষ্টির প্রতি রহিয়াছে! উপায় নাই। মনে মনে বিস্তর চেষ্টা করে, সুরদাসের অকৃত্রিম প্রেমের প্রতিদান দিবে, বিফল চেষ্টা!

ক্রমে সুরদাস আর নিত্য আনাগোনা করে না। যে সময়ে পিঙ্গলার নিকট আসিত, সে সময় হয়ত' কোনও নদীর তীরে, কোনও নিভৃত কুঞ্জে, কোনও জনশূন্য প্রান্তরে, একা বসিয়া থাকে।

হৃদয়াগ্নি দিন দিন প্রবল হইতে লাগিল। একবার পিঙ্গলাকে ঘৃণা করে, একবার কোথাও চলিয়া যাইব—ভাবে, একবার—তিরস্কার করিব মনে করে,—কিছুতেই তৃপ্তি নাই।

সুযোগ পাইয়া পাপ প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে উপদেশ দিতে লাগিল। আর সয় না,—নরহত্যা করিব। সুমতি অনেক নিবারণ করিল, কিন্তু পাপ প্রবৃত্তি প্রবল হইল। ভাবিল, চিকিৎসকের দ্বারায় এই কার্য্য সম্পন্ন করিব। না—পিঙ্গলা জানিবে। দাসী,—না পিঙ্গলা জানিবে। বক্কা, —বিষবশতঃ বক্কা এ কার্য্য করিতে পারে। কণ্টকের দ্বারায় কণ্টক উদ্ধার করি। পিঙ্গলা জানিলে বক্কাকে ঘৃণা করিবে। এক কার্য্যে দুইটি শত্রুনিপাত! কিন্তু বক্কার কোন সংবাদ নাই। হেতো, সেথা, তাড়িখানা, বেশ্যালয়ে সংবাদ লয়; বক্কার কোনও উদ্দেশ নাই।

একদিন বক্কার বেশও ছিন্ন তাড়িখানায় উপস্থিত। তথায় কুৎসিতবেশ, কুৎসিতাবয়ব,

এক ব্যক্তি বসিয়া পান করিতেছে। তাহার নিকট বঙ্কার কথা জিজ্ঞাসা করিল। কুৎসিত ব্যক্তি উত্তর করিল,—"কেন ? বঙ্কাকে কেন ? আমরা কি কোন কাজ পারি না ?" আরক্ত অহিচক্ষু টিপ্ টিপ্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। "কি কাজ, বল না ?"

কতদূর এ ব্যক্তিকে প্রত্যয় করিবে, সুরদাস ভাবিতেছে,— কুৎসিত ব্যক্তি বলিল, "আমার নাম সুজন কসাই। আমি সহরের বাহিরে থাকি। সুজন কসাইকে সবাই জানে। আমি মানুষ, গরু বাছি না।"

সুরদাস কিছু বলিল না, ধীর পদে চলিতে লাগিল। সুজন কসাইও কিছু দূরে, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। মনে মনে ভাবিতেছে, অঙ্কা, বঙ্কা, সুজন কসাইকে যে খোঁজে, তার ভারি কাজ আছে। আমায় বিশ্বাস করিল না, তাই কাজের কথা বলিল না! ভাল—দেখি, মানুষটা কোথা যায় দেখি! ধীরে ধীরে পিঙ্গলার গৃহাভিমুখে সুরদাস চলিল। সুজনও পশ্চাৎ ছাড়িতেছে না! সুরদাস পিঙ্গলার গৃহে পৌছিল।

আশ্চর্য্য হইয়া সুরদাস দেখিল যে, পিঙ্গলার গৃহে, অঙ্কা, বঙ্কা, আর একটী অপরূপ লাবণ্য-বতী পূর্ণযৌবনা রমণী! অমানুষী সৌন্দর্য্য,—মুখের পানে মুখ তুলিয়া চায়, এরূপ লম্পট বিরল। করুণাপূর্ণনেত্রে সুন্দরী রোগীর প্রতি দৃষ্টি করিতেছে। সুন্দরী বলিতে লাগিল, "হে বৈষ্ণব! তুমি আমার প্রতি নির্দ্দয় কেন ? চক্ষু মেলিয়া দেখ, আমি সেই অভাগিনী। তুমি যার আশায় দুর্গম ঝালবনে প্রবেশ করিয়াছিলে, তাহার সঙ্গে আমি কথা কহিয়া আসিয়াছি। তাহার সংবাদ শোন।"

রোগী চক্ষু খুলিল। কথা যেন তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়াছে। মীরাবাইকে চিনিল। রোগী বলিল, "দেবি! অভাগিনীর কি কোন সংবাদ জান ?"

মীরা উত্তর করিল, "জানি! তিনি তোমার জন্যই কালযাপন করিতেছেন।" রোগী উঠিয়া বসিল, গমনোদ্যত, আবার ঝালবনে যাইবে। আবার তাহার প্রণয়িনীর তত্ত্ব লইবে। কিন্তু মীরা নিবারণ করিলেন। এ সকল পিঙ্গলা দেখিতেছে। চক্ষে জল নাই, বদনে রাগ নাই, শ্বাস-রুদ্ধ। যেন প্রস্তর প্রতিমা দাঁড়াইয়া আছে। একটী দীর্ঘশ্বাস পড়িল। পিঙ্গলা মনে করিল, আমার কার্য্য ফুরাইল। যুবা জীবিত, আরোগ্য লাভ করিয়াছে। তবে কি চাই ? হৃদয়ে কোটী কোটী তরঙ্গ উঠিতে লাগিল! সাগরতরঙ্গ নির্ণয় হওয়া সম্ভব, কিন্তু মনস্তরঙ্গ মনই শুনিতে পায় না। কি চাই, কি চাই, অন্তরে এই কোলাহল। তরঙ্গ উঠিতেছে, তরঙ্গ নামিতেছে, মহা কোলাহলে তরঙ্গ বহিতে লাগিল। সে তরঙ্গকোলাহল, কেবল পিঙ্গলা শুনিল, আর কেহ শুনিতে পাইল না।

পাঠক বুঝিয়াছেন, রোগী মন্দাররাজকুমার বীরেন্দ্রসিংহ। রাণাহস্তে পরাজিত হইয়া তিনি আর রাজ্যে ফেরেন নাই। কিশোরীকে দেখিতে তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইল, কিন্তু কি উপায়ে দেখিতে পাইবেন ? ধনুর কথায় জানিতেন যে, মীরাবাইয়ের মন্দিরের পশ্চাতে পথ আছে, তাহাতে ঝালবনে প্রবেশ করা যায়। সেই ঝালবন দিয়া একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত শৃঙ্গে উঠিলে কিশোরীর দর্শন পাইলে পাইতে পারেন।

মীরা বৈষ্ণবী, বৈষ্ণব-সেবায় রত থাকিতেন। বৈষ্ণবকে অদেয় তাহার কিছুই ছিল না, বৈষ্ণবের ভান করিয়া মন্দাররাজকুমার ঝালবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে রাণার

তিরস্কারে তাহাকে পলাইতে দেখিয়াছিলাম,—পথ জানিতেন না, উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন। পরপ্রাতে পিঙ্গলা গৃহে আনিয়াছিল।

গমনোদ্যত বীরেন্দ্রসিংহকে মীরা নিবারণ করায় বীরেন্দ্রসিংহ বলিলেন, "দেবি! কেন নিবারণ করিতেছেন? আমার প্রাণ ব্যাকুল। আমি কিশোরীকে দেখিব। কোথায় দেখা পাইব? যদি কোনও উপায় থাকে, করুন। রুগ্নশয্যায় শুইয়া আমি চারিদিকে কিশোরীকে দেখিতাম, চক্ষু চাহিয়া দেখিতাম, কিশোরী নাই। কে আনাগোনা করে! কত কি দেখিলাম, কিন্তু কিশোরীকে দেখিলাম না। কি করিয়া, কেমন করিয়া তাহার দেখা পাইব?"

মীরা কি প্রবোধ দিবেন ভাবিয়া পান না। কিশোরীর সংবাদে অগ্নিতে হবির ন্যায় প্রেমানল দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। নিরাশ-ধূম উঠিতে লাগিল। সেই ধূমে মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন হইয়া বীরেন্দ্রসিংহ আবার অচেতন হইলেন। মীরা ব্যাকুল হইলেন। অঙ্কা বঙ্কা প্রস্তরের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। পিঙ্গলা উন্মাদিনীর ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিল, "কই! যুবা ত বাঁচিল না।" পশ্চাৎ হইতে সুরদাস বলিল, "আমার কি?" পিঙ্গলা চাহিল, বাঘিনীর ন্যায় সুরদাসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ শান্ত হইল। সুরদাসের চরণে ধরিয়া বলিতে লাগিল, "সুরদাস! তোমায় বিস্তর যন্ত্রণা দিয়াছি। কিন্তু দেখ! আমারও যন্ত্রণা কম নয়। যদি তোমার হৃদয়ে সহানুভূতি থাকে, যদি তুমি আমায় ভালবাস, যদি তোমার ক্রোধ হইয়া থাকে, আপনার অন্তর দিয়া বোঝ, আমিও বিস্তর সহ্য করিতেছি। সুরদাস! উপায় নাই। আমি কি করিব! আমি অবলা! মন ফিরাইবার শক্তি আমি কোথায় পাইব? সুরদাস! আমায় মার্জ্জনা কর! যদি না মার্জ্জনা করিতে পার, যে শাস্তি হয় দাও। কিন্তু তোমার চরণে আমার মিনতি, আমার উপায় নাই!" সুরদাস পা ছাড়াইয়া চলিয়া গেল, বঙ্কা মীরাকে বলিল, "এ বাঁচিবে। সুজন নামে একজন কসাই আছে, সে নানান্ রকম ঔষধ জানে,—সে ঔষধ দিলেই বাঁচিবে।" উন্মাদিনী পিঙ্গলা শুনিবামাত্র বঙ্কার পদতলে পড়িল, "বঙ্কা! আমার সর্ব্বস্ব লও, যদি উপায় থাকে কর।"

বঙ্কা বলিল, "তোর সর্ব্বস্ব চাই না! আমি এক মজার জিনিষ পেয়েছি। এই মাগী আমায় দিয়েছে। তুই নিস্ ত নে! দিলে ফুরোয় না। বল্ হরিবোল!" পাপিনী পিঙ্গলা বলিল,—"হরিবোল!" [ক্রমশঃ]

—*—

অন্নচিন্তা

(১)

বাবু প্রবোধ চন্দ্র দে।।

অন্নের জন্য যে এত চিন্তা হইতেছে, তাহা কোন্ শ্রেণীর লোকের নিমিত্ত, এক্ষণে তাহাই বিচার করা যাউক। ধনীদিগের ঘরে অন্নের কোনই চিন্তা নাই এবং তাঁহাদিগের বিষয় চিন্তা করিবার আমাদিগের কোন কারণ নাই, অধিকারও নাই। মধ্যবিত্ত ও গৃহস্থদিগের মধ্যেই প্রকৃত-পক্ষে অর্থের বিশেষ অনাটন হইয়াছে। দিন দিন বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষা দ্বারা দেশে যত অধিক লোক শিক্ষিত হইতেছে, ততই তাহাদিগের সাংসারিক ক্লেশ বৃদ্ধি পাইতেছে। সুখ, দুঃখ অনুভব ও পরিমাণ করিতে পারাই শিক্ষার অন্যতম গুণ। মানুষ যখন মূর্খ ও বর্ব্বর থাকে, তখন তাহার অভাব অভিযোগ থাকে না,—বিলাসিতার ভাব অনুভব করিবার ক্ষমতা থাকে না, সুতরাং যে অবস্থায় থাকে, তাহাকেই সুখের মনে করে। শিক্ষা লোকের চক্ষু খুলিয়া দেয়, ইতিহাস পাঠে তাহার নিজের অবস্থা বিচার করিতে সক্ষম হয়, কাজেই কিছুতেই,—অন্ততঃ সহজে তাহার আশা অভিলাস পরিতৃপ্ত হয় না। বড় অধিক দিনের কথা নহে, [illegible] বৎসর পূর্ব্বে দেশের যে অবস্থা ছিল, গৃহস্থের সংসারে যেরূপ সচ্ছলতা ছিল, এক্ষণে বোধ করি, তাহার এক চতুর্থাংশও নাই। তাহার কারণ, লোকের এক্ষণে খরচ বাড়িয়াছে, কিন্তু এক শ্রেণীর লোকে বলেন যে, আজকাল যেমন লোকের অভাব বাড়িয়াছে, খরচ-পত্র বাড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি আয়ও বাড়িয়াছে এবং তাহার যুক্তি এই যে তখন লোকে তালতলার চর্ম্ম পাদুকা ব্যবহার করিত, এক্ষণে লোকে তিন চারি টাকার জুতা ব্যবহার করিতেছে, যেখানে বারো আনা মূল্যের একখানি উড়ানিতে কাজ চলিত, আজ সেস্থলে কামিজ কোট চালাইতেছে। লোকের আয় বৃদ্ধি না হইলে এ সকল কোথা হইতে সঙ্কুলিত হয়? কথাটী বড় গুরুতর, সুতরাং তাহা বিশদভাবে বুঝিতে হইবে।

সভ্যতার প্রহেলিকা ভেদ করিতে পারা বড় কঠিন। সভ্যতার দিনে সামাজিক আচার ব্যবহার এতই বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হয় যে, তাহার মোহিনী শক্তির নিকট সহজেই পরাজিত হইতে হয়। স্বচ্ছন্দ ও বিলাস—ধনীদিগের জন্য, কারণ তাঁহারা অর্থ দ্বারা তৎসমুদায়কে সহজে লাভ করিতে পারেন, কিন্তু সেই সচ্ছলতা ও বিলাসিতা কেবল তাঁহাদিগের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে সাধারণের কোনও ক্ষতি হইত না। গৃহস্থ ও মধ্যবিত্তগণ এই সকল সৌভাগ্যবানদিগের সংসর্গে থাকিয়া তাহাদিগকেও সেই সকল আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিতে বাধ্য হইতে হয়। সংসারে নিতান্ত অর্থাভাব থাকিলেও ভদ্রতা ও লৌকিকতার অনুরোধে তাহাদিগকে জনসাধারণের সমকক্ষ হইয়া চলিতে হয়। ভারতবাসী ইজ্জতাভিমানে পূর্ণ, সুতরাং ইজ্জতের দায়ে অনাহারে থাকিতেও কুণ্ঠিত নহে এবং সেই ইজ্জতের জন্যই লোকে এক্ষণে আর তালতলার চটীতে তৃপ্ত নহে, মোটা চাদরের পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত বহুমূল্য সার্ট বা কোট ব্যবহার করিতে পশ্চাৎপদ নহে। [ক্রমশঃ]

দিব্য বাণী

বিনির্ধূতাশেষমনোমলঃ পুমা-
নসঙ্গবিজ্ঞানবিশেষবীর্যবান্।
যদঙ্‌ঘ্রিমূলে কৃতকেতনঃ পুন-
র্ন সংসৃতিং ক্লেশবহাং প্রপদ্যতে ॥
তমেব যূয়ং ভজতাত্মবৃত্তিভি-
র্মনোবচঃকায়গুণৈঃ স্বকর্মভিঃ।
অমায়িনঃ কামদুঘাঙ্‌ঘ্রিপঙ্কজং
যথাধিকারাবসিতার্থসিদ্ধয়ঃ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৪।২১।৩২-৩৩

যাঁর পাদমূল-আশ্রয়ে হয় দূরীভূত মনোমল,
বৈরাগ্যজ বিজ্ঞানে পেয়ে মানসে বিশেষ বল
ক্লেশকর এই সংসারপথে গতায়াত পুনরায়
হয় না জীবের, যাঁর শতধারে প্রবাহিত করুণায়—
চরণকমল কামধেনু যাঁর, অকপটে ভজ তাঁরে
বৃত্তি-অনুগ নিজ কাজ করি অধিকার অনুসারে ;
হও সকলেই সিদ্ধি লভিতে দৃঢ়মতি নিশ্চয়
কায়মনোবাকে কর এ-জীবন ধ্যানস্তুতিসেবাময়।

কথাপ্রসঙ্গে

'সম্পদ তব শ্রীপদ'

(১)

উপনিষদ বলেন : 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্মেতি'— যাঁহা হইতে এই ভূতবর্গ সৃষ্টিকালে জাত হয়, স্থিতিকালে যাঁহার দ্বারা জীবিত থাকে এবং প্রলয়ে যাঁহাতে বিলীন হয়, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছুক হও— তিনিই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। 'যদ্বৈ তৎ সুকৃতং রসো বৈ সঃ'—যিনি স্বয়ংকর্তা ঈশ্বর, তিনি রসস্বরূপই।

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ঈশ্বর স্বীকার করে না। চার্বাকদের তো কথাই নাই! সাংখ্যও অনীশ্বর —যদিও ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যদর্শন যে ঈশ্বরবিরোধী তাহা মানিতে নারাজ। পাতঞ্জল-দর্শনকে সেশ্বর সাংখ্য বলা হয়। পতঞ্জলি বলেন : ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ— অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ, পাপপুণ্য কর্ম, কর্মের ফল ও চিত্তস্থ সংস্কারসমূহের সহিত সম্পর্কলেশশূন্য পুরুষবিশেষই ঈশ্বর। আরও কয়েকটি সূত্রে পতঞ্জলি বলিয়াছেন : ঈশ্বরেই সর্বজ্ঞত্বের পরাকাষ্ঠা, তিনি আদিগুরু, ওঙ্কার তাঁহার বাচক, ইত্যাদি। এই ধরনের মতও আবার প্রচলিত যে মূল পাতঞ্জলসূত্রে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ ছিল না— সামান্য যে-কয়টি সূত্রে ঐ প্রসঙ্গ পাওয়া যায়, তাহা পরবর্তী কালে শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রভাবে সংযোজিত হইয়াছে। বৈশেষিক ও মীমাংসা দর্শন সম্বন্ধেও অনুরূপভাবে বলা হয়, সম্ভবতঃ আদিতে উহারা ঈশ্বর সম্পর্কে উচ্চবাচ্য করে নাই, কিন্তু পরবর্তী কালে ঈশ্বরকে স্থান দিয়াছে। ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরসম্বন্ধে মাত্র তিনটি সূত্রে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু মূল ১২টি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্যের মধ্যে ঈশ্বরের কোনও উল্লেখ নাই! বেদান্তদর্শনের কথা পূর্বেই উপনিষদ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে : জন্মাদ্যস্য যতঃ- এই জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয় যাঁহা হইতে হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। কিন্তু এখানেও ব্যাখ্যাকারদের ব্যাখ্যার গুণে ঈশ্বর সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ধারণার সৃষ্টি হয়। শংকর বলেন : 'তুমি যেরূপ করিবে, তিনি (ঈশ্বর) করাচ্ছেন— কুর্বন্তং হি স কারয়তি।' কি বিপদ! — আমি না করিলে, তিনি করান না! রামানুজাদি ভাষ্যকারেরা আবার উহার বিপরীতই বলেন। তাঁহাদের মতে ঈশ্বরই করান, তাই জীব করিতে পারে— তিনি না করাইলে, জীবের কিছুই করিবার সাধ্য নাই।

(২)

ঈশ্বর সম্বন্ধে এই নানা মুনির নানা মত দেখিয়া মানুষ দিশেহারা হইয়া যায়। ধারণা কিছুই করিতে পারে না। 'কে জানে কালী কেমন? ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন।' তথাপি মানুষ প্রয়োজনের তাগিদেই ঈশ্বরকে অন্বেষণ করে। ঈশ্বরও যুগে যুগে অনন্ত করুণায় নরদেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন, অশেষ দুঃখকষ্ট বরণ করিয়াও পথভ্রান্ত মানুষকে পথ দেখান ও লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দেন। এই 'করুণাঘন' 'আশ্রিত-বাৎসল্যবিবশ' অবতারেরই শ্রীপদ জীবের পরম সম্পদ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন : অবতার না হলে জীবের আকাঙ্ক্ষা পোরে না, ঈশ্বরকে খুঁজতে হলে অবতারের মধ্যেই খুঁজতে হয়; ঈশ্বর যুগে

যুগে অবতীর্ণ হন প্রেমভক্তি শিখাবার জন্য, অবতারকে চিন্তা করলেই ঈশ্বরকে চিন্তা করা হয়, ইত্যাদি।

পরম সত্যকে জানিতে হইলে, ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে, জ্ঞান-ভক্তি লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিতে হইলে, জীবকে অবতারেরই শ্রীপদ আশ্রয় করিতে হইবে— 'সম্পদ তব শ্রীপদ', ইহা নিশ্চিত ধারণা করিতে হইবে। 'At those blessed feet is the freedom of the soul, sought by the Jnanins'— জ্ঞানীরা যে আত্মমুক্তির অন্বেষণ করেন, তাহা অবতারেরই পূত চরণারবিন্দে বর্তমান। 'অভয়পদকমলে প্রেমের বিজলী জ্বলে'— ভক্তেরা যে প্রেমজ্যোতির আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া ছুটিয়া যান— 'অন্তরে লভিয়া নিরুপমা সৌন্দর্যপ্রতিমা'— সেই নয়নাভিরাম স্নিগ্ধ জ্যোতিও অবতারেরই শ্রীপদ হইতে নিত্য বিচ্ছুরিত হয়।

(৩)

জ্ঞান ও ভক্তির তুঙ্গ স্তর হইতে নামিয়া আসি আমরা সদাসন্ত্রস্ত সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে। সাধারণ মানুষ মৃত্যুভয়ে ভীত। সাধারণ মানুষ কেন— শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণেরও মরণভীতি সুপ্রসিদ্ধ। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন: স্বরসবাহী বিদুষোঽপি – জীবনের প্রতি মমতা, মৃত্যুভয় পরোক্ষজ্ঞানী ব্যক্তিতেও স্বাভাবিক সংস্কারবশেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।' 'অভিনিবেশ'-সংজ্ঞক এই পঞ্চম ক্লেশকে দূরীভূত করিতে মহর্ষি প্রকৃতি-পুরুষের বিচারের আশ্রয় লইতে নির্দেশ দিয়াছেন। এই বিচার কিন্তু সকলের সহজসাধ্য নয়। সহজ উপায় হইল: ধারণা করা— 'সম্পদ তব শ্রীপদ।' সদ্যপ্রসূত শিশু কৃষ্ণের শরীরে ভগবদবতারের লক্ষণসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়া জননী দেবকী স্তব করিয়াছিলেন: মর্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্ / লোকান্ সর্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ / ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য / স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি— হে আদিপুরুষ! মরণশীল মানুষ মৃত্যুরূপ-সর্পভয়ে ভীত হইয়া লোকলোকান্তরে পলায়ন করিয়াও নির্ভয় হয় নাই, কিন্তু অবতাররূপী আপনার পাদপদ্ম বিনা চেষ্টায় পাইয়া সে নির্ভয়ে বিশ্রাম করিতেছে কারণ আপনার পাদপদ্মে মৃত্যুর স্থান নাই। স্বামী বিবেকানন্দও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্তবে লিখিয়াছেন: মর্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্মিনাশম— মরণশীল নরলোকে অমৃতস্বরূপ তোমার শ্রীপদ মৃত্যুরূপ তরঙ্গকে নাশ করে।

(৪)

রামভক্ত তুলসীদাস অবতারপুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের স্তব করিতেছেন: ভবসাগরতিতীর্ষু ব্যক্তিগণের নিকট যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম প্লবস্বরূপ সেই সর্বকারণাতীত রামনামধারী ঈশ্বর হরিকে আমি বন্দনা করি। শ্রীরামকৃষ্ণ-বন্দনায় স্বামী বিবেকানন্দ ঐ একই কথা বলিয়াছেন: সম্পদ তব শ্রীপদ, ভব গোষ্পদ-বারি যথায়। জীব রোগ শোক জরা আদি সংসারদুঃখ হইতে পরিত্রাণ কামনা করিয়া 'ভবসাগর-তারণ' অবতারের শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ করে এবং অনায়াসে দুস্তর ভবসাগর পার হইয়া যায়। কিন্তু 'ভব' কতটুকু?— 'যতদূর যতদূর যাও, বুদ্ধিরথে করি আরোহণ / এই সেই সংসার-জলধি দুঃখ সুখ করে আবর্তন।' স্থূল জগৎ স্থূল সুখদুঃখে তরঙ্গায়িত, কিন্তু বাহ্য এই বিশ্ববিকাশের অন্তরালে সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম কতই না ভূমি রহিয়াছে! মন সমাধিপথে যতদূরই যাক না কেন, সংসার-জলধি হইতে পরিত্রাণ নাই - যতক্ষণ পর্যন্ত না মন নির্বিকল্পভূমিতে আরূঢ় হইতেছে। তাই, 'সম্পদ তব শ্রীপদ'— এই উক্তিটি সাধারণ জীবের পক্ষে যেমন সত্য, উচ্চ উচ্চতর উচ্চতম সাধকদের পক্ষেও তেমনি সত্য।

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীমা সারদা দেবীকে এক

সময়ে বলিয়াছিলেন: 'মা, আমার আজকাল সব উড়ে যাচ্ছে— সব দেখছি উড়ে যায়।' তদুত্তরে মা হাসিয়া বলিলেন: 'দেখো দেখো আমাকে কিন্তু উড়িয়ে দিও না!' স্বামীজী বলিলেন: 'মা, তোমাকে উড়িয়ে দিলে থাকি কোথায়? যে-জ্ঞানে গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দেয়, সে তো অজ্ঞান। গুরু-পাদপদ্ম উড়িয়ে দিলে জ্ঞান দাঁড়ায় কোথায়?' যতই খণ্ডনাবস্থা হোক না কেন, অবতারের শ্রীপাদপদ্ম উড়াইয়া দেওয়া যায় না। স্বামীজী তাই লিখিয়াছিলেন: দাস তোমা দোঁহাকার/সশক্তিক নমি তব পদে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী শিবানন্দের মনেও এক সময়ে নির্গুণভাব বিশেষ প্রবল হইয়াছিল। সেই সময়ে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন: ওরে গুরুই সব। তখন শিবানন্দজীর মন পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণচরণে সমাশ্রিত হইল।

যখন লোকোত্তর পুরুষগণও অবতারের শ্রীপাদপদ্ম অবলম্বন করিয়া জীবনাতিপাত করিয়া গিয়াছেন, তখন সর্বসাধারণের পক্ষে যে উহাই সুগম পন্থা, তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

(৫)

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, গৃহে গৃহে, মঠে মন্দিরে নিয়মিতভাবে গাওয়া হয়—'সম্পদ তব শ্রীপদ।' তথাপি ধারণা হয় না। যখন জীবনের কণ্টকময় পথে দুর্যোগ দুর্বিপাক সঙ্কট রোগ শোক জরা মৃত্যুভয় ইত্যাদিতে মন মুহ্যমান হয়, কামকাঞ্চন নামযশে প্রলুব্ধ হয়, তখনই বেশ বোঝা যায়, এতকাল কেবল সং-গীতই হইয়াছে – সুর তাল লয়ে সম্যক্ গীত হইয়াছে, উক্তিটি ধারণা হয় নাই।

ধারণা যদি হইত, তাহা হইলে 'ধ্রুবা স্মৃতি' হইত। অবতারপুরুষ যীশু বলিয়াছিলেন: 'Where your treasure is, there will your heart be also.'— যেখানে তোমার সম্পদ রহিয়াছে, সেখানেই তোমার হৃদয়ও থাকিবে। স্বামী বিবেকানন্দও বলিতেন: 'পাশের ঘরে একতাল সোনা রহিয়াছে, জানিতে পারিলে চোরের চোখে ঘুম থাকিতে পারে না।' আসল কথা, 'সোনার তাল'— এ-বোধই বুদ্ধিতে আরূঢ় হয় না। তাই রামানুজ যে অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি-সন্তানের কথা বলিয়াছেন, অথবা শংকর যে তৈল-ধারাবৎ অজস্র অনন্যচিত্ততার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কোন লক্ষণই দেখা যায় না।

(৬)

কিন্তু ধারণা তো করিতেই হইবে— নতুবা জীবের নিস্তার নাই। জীবোদ্ধারের জন্য অবতার-গণের পুণ্যাবির্ভাব। নিঃসন্দিগ্ধভাবে তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেরই শ্রীপদকে সম্পদ করিতে হইবে এবং ভাবমুখে দেখাইয়াও গিয়াছেন, কিভাবে তাহা করিতে হয়। যীশু বলিলেন: 'Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.'—এসো কে আছো, পরিশ্রান্ত ক্লান্ত ভারা-ক্রান্ত, আমি তোমাদের বিশ্রাম দিব। বলিলেন: 'I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me. If ye had known me, ye should have known my Father also.'— আমিই পথ (উপায়), আমিই সত্য (উপেয়), আমিই (দিব্য) জীবন; আমার সাহায্য ব্যতীত কেহই পিতার (ঈশ্বরের) নিকট আসিতে পারে না। যদি তোমরা আমাকে জানিতে, তাহা হইলে পিতাকেও অবশ্যই জানিতে পারিতে। ভক্তিমতী মেরী ম্যাগডালীন যখন তাঁহার পদদ্বয় ধৌত করিয়া নিজ কেশ দিয়া মুছাইয়া বহুমূল্য সুগন্ধি দ্রব্য লেপন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার জনৈক

শিষ্য ঐ অপব্যয়ের (?) জন্য আপত্তি জানাইলে, যীশু বলিয়াছিলেন : দরিদ্রদের তোমরা চিরকালই পাইবে, কিন্তু আমাকে পাইবে না। ভক্তিমতী মেরীর ভাব— 'সম্পদ তব শ্রীপদ।' এই সুদুর্লভ ভাব ও ভাবোত্থ প্রেমপূর্ণ আচরণকে যীশু ঐ উক্তির দ্বারা সর্বান্তঃকরণে স্বাগত সমর্থন জানাইয়াছিলেন।

নিজেই নন্দনন্দন, তথাপি জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য আপনাতে জীবভাব আরোপ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নন্দনন্দনের নিকট কাতর প্রার্থনা করিতেছেন : 'অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ/কৃপয়া তব পদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়'— হে নন্দনন্দন, দুস্পার ভবসাগরে পতিত দাস আমাকে কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলির তুল্য মনে করো।

অবতারের শ্রীপাদপদ্ম কিভাবে আশ্রয় করিতে হয় শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহা ভক্তগণের সম্মুখে স্বয়ং প্রার্থনা করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। সেই প্রার্থনার করুণ স্বর শ্রবণ করিয়া অনেকেই অশ্রু-সংবরণ করিতে পারেন নাই। শ্রীরামচন্দ্রের নিকট তাঁহার কাতর প্রার্থনা : 'ও রাম! ও রাম! আমি ভজনহীন সাধনহীন জ্ঞানহীন ভক্তিহীন— আমি ক্রিয়াহীন! রাম শরণাগত! ও রাম শরণাগত! দেহসুখ চাইনে রাম! লোকমান্য চাইনে রাম! অষ্টসিদ্ধি চাইনে রাম! শতসিদ্ধি চাইনে রাম! শরণাগত শরণাগত, কেবল এই করো—যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়, রাম! আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই, রাম! ও রাম, শরণাগত!'

আবার শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের দর্শন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন : 'কীর্তন হচ্ছিল—শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ দর্শন করে সমাধিস্থ হলাম। বোধ হ'ল আমার সূক্ষ্মশরীরটা শ্রীকৃষ্ণের পায়ে পায়ে বেড়াচ্ছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রায়ই বলিতেন : ভাগবত ভক্ত ও ভগবান— তিনে এক, একে তিন। দিব্য দর্শনের ফলেই তিনি উহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে বিষ্ণুমন্দিরের দালানে ভাগবত পাঠ শুনিতে শুনিতে তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় মূর্তির দর্শন লাভ করেন। ঐ মূর্তির পাদপদ্ম হইতে একটি জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া প্রথমে ভাগবত-গ্রন্থকে স্পর্শ করিয়া পরে তাঁহার নিজ বক্ষে সংলগ্ন হইয়াছিল। এই সকল দিব্য দর্শনাদির কথা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অবতারপুরুষের শ্রীপাদপদ্মই জীবের সমাশ্রয়ণীয়।

কামারপুকুরের জলমগ্ন রাস্তায় যে-মাছটি শ্রীশ্রীঠাকুরের পায়ে পায়ে কেবলই ঘুরিতেছিল, সেটিকে তিনি মারিতে দেন নাই— বলিয়াছিলেন : 'এটিকে মারিসনে রে, এটি আমার পায়ে পায়ে শরণাগত হয়ে কেমন ঘুরছে। কেউ যদি পারিস তো এটিকে পুকুরে ছেড়ে দিয়ে আয়।' তাহার পর নিজেই সেটিকে পুকুরে ছাড়িয়া দিয়া গৃহে ফিরিয়া বলিয়াছিলেন : 'আহা, কেউ যদি এই রকম শরণাগত হয়, তবেই সে রক্ষা পায়।'

গীতাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই শরণাগতির কথা বারংবার বলিয়াছেন। অর্জুনকে তাঁহার চরম উপদেশ : সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ— ধর্মাধর্ম সব ছেড়ে একমাত্র আমারই শরণ নাও। ধর্মাধর্মের নির্ণয় গীতায় অনেক করা হইয়াছে। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ জানেন যে, কুটিল জীবনপথে মানুষ ঠিক করিতে পারে না— কি করিবে আর কি না করিবে। 'শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ'—কোন্‌টি করণীয়, কোন্‌টি অকরণীয় তদ্বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। ঠিক কথা। কিন্তু জীবন বড় জটিল। মানুষ বড়ই অসহায়। শ্রীকৃষ্ণের ইহা অবিদিত নহে। তাই সর্বশেষে বিশেষভাবে ঐ শরণাগতির উপদেশ—পাপপুণ্য

ছাড়ো, আমারই চরণে শরণ নাও। চণ্ডীদাসের ভাষায়: 'ভালমন্দ নাহি জানি/ ··পাপপুণ্য মম তোমার চরণখানি।' স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়: 'সম্পদ তব শ্রীপদ।'

(৭)

'নান্যা গতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দাৎ'—কৃষ্ণের পাদপদ্ম ভিন্ন অন্য উপায় নাই। এই জাতীয় অসংখ্য উক্তির তাৎপর্য নির্ণয় করিতে হইলে, ঈশ্বরের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সমীকরণ করা প্রয়োজন, যেমন শ্রীকৃষ্ণ গীতায় স্বয়ং বারংবার করিয়াছেন: 'পিতাহম্ অস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ', 'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়/ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব', 'অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে', ইত্যাদি।

অধিকন্তু গীতার 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত' ইত্যাদি উক্তির সহিত শ্রীশ্রীচণ্ডীর 'ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি' ইত্যাদি শ্লোকও তুলনীয়। একই শক্তি ধর্মসংস্থাপনের জন্য রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যীশু চৈতন্য রামকৃষ্ণ ইত্যাদি রূপে অবতীর্ণ। অতীতেও যেমন, ভবিষ্যতেও তেমনই সেই শক্তি ঐ প্রয়োজনেই যুগে যুগে আবির্ভূত হইবেন। সেই শক্তির পর্যায়বাচী নাম—কালী ঈশ্বর সগুণব্রহ্ম ইত্যাদি। অতএব পূর্বতন আচার্যগণের বাক্যসমূহ উদার সার্বভৌম দৃষ্টিভঙ্গি লইয়াই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। নতুবা 'নান্যা গতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দাৎ' ও 'যীশু ভিন্ন মুক্তি নাই' একজাতীয় কথা হইয়া দাঁড়াইবে। 'সম্পদ তব শ্রীপদ'—ইহা সকল অবতারের পক্ষেই সত্য। যাহার যেরূপ রুচি, সে তদনুযায়ী অবতারসমূহের মধ্য হইতে আপন ইষ্ট নির্বাচন করিয়া লইতে পারে। ইহাতে কাহারও ইষ্টাপত্তি থাকিতে পারে না। এই স্বাধীনতাই অধ্যাত্মরাজ্যে সকল অগ্রগতির প্রাণ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কতবার বলিয়াছিলেন: 'যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ।' তথাপি স্বামী বিবেকানন্দ অবতারবাদে সহজে বিশ্বাসী হইবার পাত্র ছিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শেষ অসুখের সময়ে নরেন্দ্রনাথ আপন মনে ভাবিতেছিলেন—এখন এই সঙ্কটকালে, এই নিদারুণ ব্যাধির মধ্যেও যদি তিনি বলেন যে, তিনি ঈশ্বরের অবতার, তবেই উহা বিশ্বাস করিব। শ্রীশ্রীঠাকুর তৎক্ষণাৎ বলিয়াছিলেন: 'যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং এই শরীরে রামকৃষ্ণ।'

পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ আজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে এবং বলে—'সম্পদ তব শ্রীপদ।' কিন্তু উদার স্বামীজী বলিয়া গিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে যে যেভাবে ইচ্ছা, গ্রহণ করিতে পারে—গুরুরূপে মহাপুরুষরূপে বা অবতাররূপে। তিনি নিজে অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অবতারবরিষ্ঠ বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। ঐ উক্তি যুগের প্রয়োজনের দিক হইতে। যে মহাসমন্বয়ের বার্তা শ্রীরামকৃষ্ণদেব অভূতপূর্বভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা এই যুগে বিশেষ প্রয়োজন। আবার কামকাঞ্চনাসক্তি এই যুগে যত প্রবল, পূর্বে কখনও তদ্রূপ হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। তাই অভূতপূর্ব ত্যাগের আদর্শেরও প্রয়োজন ছিল। এই সব দিক হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অবতারবরিষ্ঠ বলা হইয়াছে। 'নির্ধারণ'—অর্থে সমুদয় স্বজাতীয় হইতে গুণাদির দ্বারা পৃথক্‌করণ বুঝাইলেও, অবতারতত্ত্বের আলোকেই 'অবতারবরিষ্ঠ'—এই সমাসবদ্ধ পদটির মর্ম গ্রহণ করা উচিত। ভেদে উহার তাৎপর্য নাই, অভেদেই তাৎপর্য। গুরু যেমন অনেক নন, একজনই, অবতারও তেমনি অনেক নন, একজনই—তিনি ঈশ্বর।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষ্যে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমরা ভক্তিপূত হৃদয়ে এই প্রার্থনা জানাই, আমরা যেন সকল অবতার-

পুরুষের উদ্দেশেই বলিতে পারি—'সম্পদ তব শ্রীপদ।' তাঁহারই প্রদর্শিত পন্থায় আমরা যেন সকলকে উদার সমন্বয়ের ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পারি। অবতারগণের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপের অন্তরালে যে একই পরিপূর্ণ ঈশ্বর নিত্যকাল বিরাজমান, ইহা মনে প্রাণে বিশ্বাস করিয়া সম্প্রদায়সমূহের মধ্য হইতে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও ভেদভাব দূরীভূত করিয়া সদ্ভাব ও সম্প্রীতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে আমরা যেন কায়মনোবাক্যে সচেষ্ট হইতে পারি।

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

অনুবাদক: স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

টীকা: তত্র চ ভগবান্ বিষ্ণুঃ ফলত্যাগপূর্বকং নিরন্তরানুষ্ঠিতবেদানুবচন-যজ্ঞদানতপোভি-বিমলীকৃত-স্বান্তানাং নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকেন তৃণীকৃত-ব্রহ্মলোকাদি-ভোগানাং শমদমাদিমতাং মুমুক্ষূণাং বহুবিধ-স্বনিঃশ্বাসভূত-বেদার্থবিচারাসমর্থানাং পুরুষাণাং মোক্ষসাধনীভূতব্রহ্মাত্মতত্ত্ববোধনায় স্বাংশেন শ্রীভগবদ্-বাদরায়ণরূপেণাবতীর্ণো বহুবিধন্যায়োপেতৈরধ্যায়চতুষ্টয়াত্মকৈ ব্রহ্মসূত্রৈঃ সকলবেদান্তবাক্যানি সংগ্রথয়ামাস। তানি চ সূত্রাণ্যতিগম্ভীরার্থতয়া দুরবগমাভিপ্রায়াণি সন্তি। ইদানীং কলৌ দুষ্টচিত্তৈর্ভেদবাদিভিরভেদবাদিভিশ্চ কৈশ্চিদন্যথান্যথা যোজিতানি পুরুষার্থ-পর্যবসায়ীনি ন বভূবুঃ। অথ ভগবান্ পরমেশ্বরঃ সর্বজ্ঞঃ শংকরঃ করুণয়া লোকানুগ্রহার্থং স্বাংশেন শ্রীসর্বজ্ঞ-ভগবৎপাদ-শংকরাচার্যরূপেণ ব্রহ্মাত্মাংশৈঃ শিষ্যভূতৈঃ সহাবতীর্য ব্রহ্মসূত্র-ব্যাখ্যানরূপ-শ্রীমচ্ছারীরক-ভাষ্যকরণেন সকৃচ্ছ্রবণমাত্রেণাবিদ্যাতিমিরতিরস্কারপটীয়সো মুখ্যাধিকারিণঃ পুরুষধৌরেয়ান্ অন্বজগ্রাহ। অথেদানীং ব্রহ্মসূত্রমীমাংসাসমর্থান্ অলসান্ অনায়াসেন ঝটিতি ব্রহ্মতত্ত্বং সাক্ষাচ্চিকীর্ষতো মন্দাধিকারিণোঽনুগৃহীতুকামঃ শ্রীভগবান্ ভাষ্যকারস্তেষাং ব্রহ্মতত্ত্বং করতল-বিল্বফলীকারয়িতুং জপমাত্রেণ সকলপুরুষার্থসাধকং সর্ববেদান্তসারভূতং শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাত্মকং হরিস্তোত্রম্ আরিপ্সুশ্চিকীর্ষিতং প্রতিজানীতে স্তোষ্যে ইতি।

অনুবাদ: ঐ উভয় দেবগণের মধ্যে ভগবান বিষ্ণু—ফলত্যাগবুদ্ধিপূর্বক নিরন্তর বেদানু-বচন (গুরুর অনুগামী হইয়া বেদপাঠ), যজ্ঞ, দান ও তপঃ অনুষ্ঠানদ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ, নিত্যানিত্য-বস্তুবিচারসহায়ে ব্রহ্মলোকাদির ভোগ্যপদার্থসমূহে তৃণবৎ-তুচ্ছজ্ঞানসম্পন্ন, শমদমাদিমান, নিজের নিঃশ্বাসভূত (অর্থাৎ নিঃশ্বাসতুল্য অপ্রযত্ন-সম্ভূত) বহুবিধ বেদবাক্যার্থের বিচারে অসমর্থ মুমুক্ষু পুরুষগণের মোক্ষসাধন ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব বোধন করাইবার নিমিত্ত (ব্রহ্মাত্মৈক্য-বোধ উৎপন্ন করিবার

জন্য)—স্বকীয় এক অংশে শ্রীভগবান্ বাদরায়ণ- (বেদব্যাস-) রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া বহুবিধ যুক্তি ও দৃষ্টান্তসহ চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্র-গ্রন্থ রচনা করতঃ সর্ববেদান্তবাক্যসমূহ (বেদান্তবাক্য-সমূহের তাৎপর্য) সম্যক্‌রূপে গ্রন্থাকারে প্রকট করিয়াছিলেন। ঐ সূত্রসমূহ অতি গম্ভীর অর্থের দ্যোতক বিধায় উহার যথার্থ অভিপ্রায় (তাৎপর্য) বড়ই দুরবগম্য। বর্তমান কলিযুগে দুষ্টচিত্ত ভেদবাদী ও কোন কোন অভেদবাদিগণ কর্তৃক কদর্থীকৃত হওয়ায় (বিপরীতভাবে যোজিত হওয়ায়) উহা পুরুষার্থ-পর্যবসায়ী হয় না অর্থাৎ মোক্ষসাধন জ্ঞানসম্পাদক হয় না বলিয়া ভগবান পরমেশ্বর সর্বজ্ঞ শঙ্কর করুণাপূর্বক লোকানুগ্রহার্থ স্বকীয় এক অংশে শ্রীসর্বজ্ঞ ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্যরূপে, ব্রহ্মাদি দেবগণের অংশভূত শিষ্যগণসহ অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্মসূত্রব্যাখ্যানরূপ শ্রীমৎ শারীরকভাষ্য রচনাদ্বারা, উহা একবারমাত্র শ্রবণদ্বারাই অবিদ্যাতিমির-নিবৃত্তিকুশল মুখ্যাধিকারী পুরুষপ্রবরদিগকে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। তদনন্তর বর্তমানকালে ব্রহ্মসূত্রার্থমীমাংসা করিতে অসমর্থ, অলস, অনায়াসে শীঘ্র ব্রহ্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার করিতে ইচ্ছুক, মন্দাধিকারিগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য শ্রীভগবান ভাষ্যকার তাহাদিগকে ব্রহ্মতত্ত্ব করতলগত বিল্বফলের ন্যায় প্রত্যক্ষ করাইবার উদ্দেশ্যে কেবল জপ বা আবৃত্তিদ্বারাই সর্বপুরুষার্থসাধক সর্ববেদান্তসারভূত শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাত্মক হরিস্তোত্ররচনা আরম্ভ করিবার ইচ্ছায় চিকীর্ষিত কৃতিবিষয়ক প্রতিজ্ঞা করিতেছেন—'স্তোষ্যে', এই শব্দ দ্বারা।

মূলস্তোত্রম্ :

স্তোষ্যে ভক্ত্যা বিষ্ণুমনাদিং জগদাদিং
যস্মিন্নেতৎসংসৃতিচক্রং ভ্রমতীত্থম্।
যস্মিন্ দৃষ্টে নশ্যতি তৎ সংসৃতিচক্রং
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥ ১

অন্বয় : জগদাদিম্ অনাদিং বিষ্ণুং ভক্ত্যা স্তোষ্যে। যস্মিন্ এতৎ সংসৃতিচক্রম্ ইত্থং ভ্রমতি, যস্মিন্ দৃষ্টে তৎ সংসৃতিচক্রং নশ্যতি, সংসারধ্বান্তবিনাশং তং হরিম্ ঈড়ে। ১

অনুবাদ : জগতের মূলকারণ, অনাদি (কারণহীন) বিষ্ণুকে (ব্যাপক অর্থাৎ ব্রহ্মকে) আমি ভক্তিসহকারে স্তুতি করিব। যাঁহাতে (যে অধিষ্ঠানে) এই (প্রত্যক্ষ অনুভূয়মান) সংসারচক্র এইভাবে (কর্তৃত্বাদিপ্রকারে) আবর্তিত হইয়া থাকে, (শমদমাদিসহ শ্রবণাদির অনুষ্ঠান দ্বারা) যাঁহার সাক্ষাৎকার হইলে সংসারচক্র বিলীন হয়, সংসারের (হেতুভূত) অজ্ঞান-বিনাশক সেই হরিকে (অখণ্ডাকারা বৃত্তিতে আরূঢ় অজ্ঞানবিরোধী চৈতন্যকে) আমি বন্দনা করি।

[ক্রমশঃ]

"হরিই সেব্য, হরিই সেবক,—এই ভাবটি পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ। প্রথমে নেতি নেতি করে, হরিই সত্য আর সব মিথ্যা বলে বোধ হয়। তার পরে সেই দ্যাখে যে, হরিই এই সব হয়েছেন,—ঈশ্বরই মায়া, জীব, জগৎ এই সব হয়েছেন। অনুলোম হয়ে তারপর বিলোম। এইটি পুরাণের মত।" —শ্রীরামকৃষ্ণ

অদ্বৈতবেদান্তে ভক্তির স্থান

স্বামী স্মরণানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ইতিহাস ও পুরাণে ভক্তি

পৌরাণিক যুগে (ইতিহাস-পুরাণের রচনাকালে) ভক্তির ভাবটি পরিপূর্ণতায় বিকশিত হয়ে ওঠে। এখানে সে-বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কারণ তাতে কয়েক খণ্ড গ্রন্থ রচিত হয়ে যাবে। আমরা কেবল এইকালে ভক্তির ভাবটি কিভাবে জ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বিত হয়ে উঠল তা সংক্ষেপে বর্ণনা করবো।

পৌরাণিক যুগ নিয়ে এল অবতারবাদ : ঈশ্বর নিজেকে নররূপে প্রকাশ করেন, এই ধারণা। মানব-বিগ্রহে ভগবানের আবির্ভাবের চরম দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হলেন— শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ। এ-ভাবটি হিন্দুধর্মের—অপর কথায় বেদান্তবাদের—মধ্যে এসেছে প্রাক্‌বৌদ্ধ কি বৌদ্ধোত্তর কালে—সে বিতর্কিত প্রশ্ন। তবে, এ-ভাব প্রাক্‌বৌদ্ধকালে হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবলতর কারণ রামায়ণ ও মহাভারত— এই মহাকাব্যদ্বয়ে কোনও বৌদ্ধপ্রভাব দেখা যায় না।

এই দু'টি মহাকাব্যে আমরা ভক্তিকে সমধিক পরিণত অথচ উপনিষদের জ্ঞানের সঙ্গে সমন্বিত একটি সাধন-পথ হিসেবে পাই। এ কথাটি বিশেষ ক'রে সত্য ভগবদ্গীতার—৭০০ শ্লোকে নিবদ্ধ, মহাভারতের অংশবিশেষ সেই চূড়ান্ত শাস্ত্রের— ক্ষেত্রে। আত্মাই মানুষের অমর সত্তা —এই ঔপনিষদ সত্য গীতায় সমর্থিত হয়েছে এবং আত্মা যে ব্রহ্মাভিন্ন তা গীতায় সর্বত্র দেখানো হয়েছে। ক্ষেত্রজ্ঞ (ক্ষেত্র অর্থাৎ শরীরকে যিনি জানেন) হিসেবে আত্মাকে ঈশ্বরের সঙ্গে এক করে দেখানো হয়েছে—সেই ঈশ্বরের সঙ্গে যাঁর মানব-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। চরম জ্ঞান, যার ফল ব্রহ্মের সঙ্গে একত্ব, তার প্রাপ্তির সহজতম পথ হিসেবে ভক্তির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই 'ব্রহ্মভূত'-অবস্থায় পৌঁছানোই হ'ল লক্ষ্য, কিন্তু তা ভক্তির মাধ্যমেও সাধিত হতে পারে। (গীতা, ১৮।৫৫)

গীতায় সাধন হিসাবে জ্ঞান ও ভক্তি কেমন সমন্বিতভাবে পরস্পর সংমিশ্রিত হয়ে উপদিষ্ট হয়েছে, তা একজন অমনোযোগী গীতাপাঠকেরও নজরে না পড়ে পারে না। ভক্তিকে অবলম্বন করতে বলা হয়েছে, কারণ সাধকের পক্ষে নির্গুণব্রহ্মে মনোনিবেশ করা কঠিন। (ঐ, ১২।৫) সাধারণ মানুষের পক্ষে ভক্তিই স্বাভাবিক পথ— নিরাকার সাধনা উন্নততর সাধকদের জন্যই। কিন্তু জ্ঞানী ও ভক্ত একই লক্ষ্যে পৌঁছান।

পরবর্তী পুরাণগুলিতে ভক্তি প্রাধান্যলাভ করলেও জ্ঞানমার্গাবলম্বীকে নিরুৎসাহ করা হয়নি। তবে শ্রীমদ্‌ভাগবত চূড়ান্ত ভক্তিগ্রন্থ হলেও তা জ্ঞানেরও চরম কৃতি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এটিকে জ্ঞানঘৃতপক্ব ও ভক্তি-রসার্দ্র বলে মনে করতেন।

ভাগবতের গোপীগীতায় আছে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন ক'রে বলছেন : 'আপনি কেবল গোপিকা যশোদার নন্দন নন—আপনি সকল দেহধারীর অন্তরাত্মদর্শী। হে সখে! আপনি বিশ্বরক্ষায় জন্য ব্রহ্মাকর্তৃক প্রার্থিত হয়ে সাত্বতকুলে আবির্ভূত হয়েছেন।' (১০।৩১।৪) মনে হয়, নারদ-ঋষি এই বচনটির এবং অন্যান্য আরো অনুরূপ ভাগবতবচনের অনুসরণ ক'রে স্বরচিত ভক্তিসূত্রে বলেছেন : [যদিও গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমাস্পদরূপেই ভালবাসতেন]

'তথাপি তাঁর মাহাত্ম্য-বিস্মৃতির অপবাদ তাঁদের দেওয়া যায় না; কারণ, ঐ মাহাত্ম্যজ্ঞানবিহীন হলে তাঁদের শ্রীকৃষ্ণানুরাগ অবৈধ জার-প্রেমের মতোই হয়ে যেত।' (১।২২-২৩) ভাগবতের অন্যত্রও উক্ত হয়েছে: 'ভক্তি, পরমেশ্বরের উপলব্ধি এবং সর্ববিষয়ে পরম অনাসক্তি এককালেই লাভ হয়।' (১১।২।৪২) এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে, পরাভক্তি ও পরমজ্ঞান অভিন্ন।

সুতরাং ভারতের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায় পৌরাণিক যুগ প্রতিপাদন করেছিল যে, জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পর-বিরোধী নয়, বরং পরস্পরের পরিপূরক। গীতা এই বিষয়ে অত্যন্ত পরিষ্কার, কারণ সেখানে বলা হয়েছে যে, পরমজ্ঞান লাভ হলে পরাভক্তিও' লাভ হয়: ব্রহ্মভূত প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না—সকল প্রাণীতে সমদর্শী তিনি আমার প্রতি পরাভক্তি লাভ করেন।' (১৮।৫৪)

শঙ্করাচার্য ও পরবর্তী অদ্বৈতবাদি-গণের ভক্তি

শ্রীশঙ্করাচার্য (অনুমানিক খ্রীঃ ৬৯০-৭২২)* যাবতীয় শাখাসমেত অদ্বৈতবেদান্তকে সুসম্বদ্ধ করেছিলেন বলে বিশেষরূপে খ্যাত। ভারতে যত দর্শনের বিকাশ ঘটেছে, তার মধ্যে অদ্বৈতবেদান্ত সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—প্রধান প্রধান উপনিষদ, ভগবদ্-গীতা এবং ব্রহ্মসূত্রের উপর তাঁরই রচিত ভাষ্য-সমূহের দ্বারা। ভারতে 'ফিলজফি' (Philosophy) চিরকালই 'দর্শন' বলেই অভিহিত হয়েছে এবং একারণে তা কখনও বৌদ্ধিক কসরতে পরিণত হয়নি—দার্শনিককে আপন অন্তরতম অধ্যাত্মসত্তা-রূপেই সত্যকে উপলব্ধি করতে হয়েছে। শ্রীশঙ্করও যে সেই সত্যকে আগে উপলব্ধি করে, তবেই তাঁর দর্শন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তার সপক্ষে প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। অনুরূপভাবেই অদ্বৈত-বাদীদের যা লক্ষ্য সেই পরম ঐক্যানুভূতির মুখ্য পথসমূহের অন্যতম পথ হিসেবে ভক্তিকে অনুমোদন করতে তাঁর কোনও দ্বিধা ছিল না।

তাঁর রচিত উপনিষদের ভাষ্যগুলিতে ভক্তির বিষয় আলোচনা করার সুযোগ খুব বেশী ছিল না। তথাপি যখনই সুযোগ এসেছে, পরম দিব্যানুভূতিতে পৌছনোর পথ হিসেবে ভক্তিকে তিনি সমর্থন করেছেন। অধিকন্তু, গীতাভাষ্যে তিনি বলেছেন যে, জ্ঞানী 'একভক্তি' হন কারণ, তিনি ঈশ্বর-ভিন্ন অন্য কোনও ভজনীয় দেখতে পান না (৭।১৭); আর তিনি দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছেন যে, ভক্তির পথ দিয়ে সাধক পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে পারেন। (১৮।৫৫)

তবে, ভক্তি-বিষয়ে তিনি তাঁর স্তবগুলিতেই সর্বোত্তম কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কোন কোন বিদগ্ধব্যক্তি অবশ্য সঙ্গতভাবেই স্বীকার করেননি যে, তাঁর নামে প্রচারিত সব স্তবগুলিই তাঁর রচনা। তাহলেও যে-সব স্তোত্র তাঁরই রচনা ব'লে সাধারণতঃ স্বীকৃত, সেগুলিই এবিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ যে, এই অদ্বৈত-আচার্য একজন পরম ভক্তও ছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ 'মোহ-মুদ্গারে'র ধ্রুবপদেই অজ্ঞজনের প্রতি উপদেশ রয়েছে: 'ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!' ঐ স্তোত্রেই শঙ্করাচার্য বলছেন: 'ধ্যেয়ং শ্রীপতিরূপমজস্রম্'—'আমাদের কর্তব্য সর্বদা শ্রীহরির রূপ ধ্যান করা' এবং 'ভগবদ্গীতা কিঞ্চিদধীতা, গঙ্গাজললবকণিকা পীতা। সকৃদপি যস্য মুরারিসমর্চা তস্য যমঃ কিং কুরুতে চর্চাম্'—যে একটুও গীতাপাঠ করে, গঙ্গাজল কণিকামাত্রও পান করে অথবা ভগবানকে একবারও সম্যক্ উপাসনা করে, সে মৃত্যুভয় থেকে উদ্ধার পায়।

---

* অন্য মতে খ্রীঃ ৭৮৮-৮২০ —সঃ

'অন্নপূর্ণাস্তোত্রে'—জগন্মাতার উদ্দেশে রচিত স্তবে—আচার্য শঙ্করের আসল ছাপটি লক্ষ্য করা যায়। সেখানে তিনি বলেছেন: 'পার্বতীদেবী আমার মা, দেব মহেশ্বর আমার পিতা, শিবভক্তগণ আমার বান্ধব আর ভুবনত্রয়ই আমার স্বদেশ।' প্রায় প্রতি স্তবকের শেষে তিনি জগন্মাতার কাছে জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভিক্ষা প্রার্থনা করেছেন। জীবনের বেশ কিছু কাল পবিত্র বারাণসীধামে কাটানোর ফলে তাঁর বিশেষ অনুরাগ যে ঐ তীর্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মা অন্নপূর্ণা ও পুরপতি বাবা বিশ্বনাথের প্রতি হবে, এতে আর আশ্চর্য কি? ভক্তিসুধাবর্ষী অন্যান্য বহু স্তোত্রও শ্রীশঙ্করেরই রচনা বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু সে-সবগুলি তাঁর রচিত হোক বা না হোক, একটি জিনিস পরিষ্কার যে, শ্রীশঙ্কর অধ্যাত্মসাধনার অন্যতম মৌলিক পথ হিসেবে ভক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ স্বীকার করেছেন। [ক্রমশঃ]

রামকৃষ্ণ

শ্রীবাজীরাও সেন

রামে আর কৃষ্ণে মিলে—
তুমি এক অনাদ্যন্ত অলোক প্রতিভা,
উচ্ছ্বসিত করুণার আশ্চর্য আকাশে স্থির ধ্রুবতারা।
অমর্ত তৃষ্ণায় যতো দূরযাত্রী অমৃত প্রার্থীরা
তোমার প্রবুদ্ধ পথে লিখে রাখে জীবনের ঋণ;
খণ্ডচিন্তা পৃথিবীর ধূসরিত ধূলিলীন পটে
আজো তুমি অমলিন— অসীম, অসীম।

অর্থ আনে অনর্থের পংকিল পিপাসা;
তিক্ততার নগ্ন কোলাহল
কলংকে কুৎসিত করে অন্তরের রোদের ফসল!
এখনও তবুও দেখি, শুচিতার সমূহ সবুজে
ছায়া ফেলে শকুনের স্বর্ণলুব্ধ ডানা!
সব শিক্ষা ব্যর্থ ধূসরতা—
পথও যতো ক্রূর কুটিলতা।

সুতরাং তুমি এসো—
মৃণ্ময় প্রদীপে জ্বেলে চিন্ময় দীপালি
মাটিকে মুখর করে মায়ের ভাষণে;
তমসার পেচক-প্রাচীরে ধীরে হেনে শান্ত করাঘাত
নিয়ে এসো আলোকিত উদার প্রভাত।

শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যাচর্চা

স্বামী প্রভানন্দ

গাছের মধ্যে কোন কোনটি 'অচিন গাছ', তেমনি দেখতে শুনতে মানুষের মত হলেও অবতারপুরুষ অচিন মানুষ; অবতারপুরুষ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; তিনি অনন্যসাধারণ, তিনি নিরুপম। অবতারপুরুষের অনন্যস্বাতন্ত্র্য বোধ করি সর্বাধিক প্রকটিত হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণচরিত্রে।

রসিক শ্রীরামকৃষ্ণ হাস্‌তে হাস্‌তে নিজের সম্বন্ধে বলতেন: 'আমি মূর্খোত্তম', 'আমি তো মুখ্যু'। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) কোনক্রমে নিজের নাম লিখিতে পারিতেন।' অনুরূপভাবে স্বামী প্রেমানন্দ বলেছিলেন, '(তিনি) যো সো করে লিখতে পারতেন মাত্র।' এবং বাইরের জগতে তাঁর পরিচয়, তিনি একজন মূর্খ দরিদ্র ব্রাহ্মণ, মন্দিরের সামান্য একজন পূজকমাত্র। পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের চৌম্বকব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেরই মনোভাবের নমুনা প্রকাশ পেয়েছে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের লেখনীতে। বিস্মিত প্রতাপচন্দ্র নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে লিখেছেন: **'I, a Europeanised, civilised, self-centred, semi-sceptical so-called educated reasoner, and he, (Ramakrishna Paramahansa) a poor, illiterate, shrunken, unpolished, diseased, half-dressed, half-idolatrous, friendless Hindu devotee.'**[১] এই ধরনের মন্তব্যের বহুল ও অনেকক্ষেত্রে যথেচ্ছ ব্যবহারে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাদীক্ষা বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে একটি ধোঁয়াসার সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্লেষণধর্মী ও তথ্যমূলক আলোকসম্পাতের সাহায্যে ধোঁয়াসার আবরণ ভেদ করতে না পারলে শ্রীরামকৃষ্ণের অনুপম চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রায় অজ্ঞাত থেকে যাবে। এই রহস্য ভেদ করতে না পারলে আমরা বুঝতে পারব না, তিনি 'মূর্খ' হলেও পণ্ডিতেরা তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে এসে কেন 'কেঁচো' হয়ে যেত। তাঁর নিজ উক্তি, 'কি আশ্চর্য, আমি মূর্খ। তবু লেখাপড়াওয়ালারা এখানে আসে, এ কি আশ্চর্য!' এর মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারব না।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যকালের নাম গদাধর বা গদাই। শ্রীগদাধরের বাল্যকালের শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে বিবিধ ও বিচিত্র কল্পনার জাল বোনা হয়েছে। কোন জীবনীকার লিখেছেন, 'বিদ্যাভ্যাসে গদায়ের নাহি তত মন', 'গদায়ের পাঠশালে যাওয়া-আসা সার। লেখাপড়া বড় বেশী নাহি হয় তার॥' আবার কেউ অভিযোগ করেছেন যে, বিদ্যাভ্যাসে অমনোযোগী শ্রীগদাধর পড়াশুনার নাম করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে সমবয়সীদের সঙ্গে হাটে মাঠে খেলাধুলা যাত্রাগান করে বেড়াতেন। আরেক জন লিখেছেন, 'গুরু মহাশয় অন্যান্য বালকদিগকে যেমন পীড়ন করিয়া পাঠে মনোযোগ করাইতেন, গদাইয়ের অনুপস্থিতি-সময়ে তাঁহার জন্যও সেইরূপ প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন, মনে করিতেন; কিন্তু গদাই পাঠশালায় উপস্থিত এবং গুরু মহাশয়ের সম্মুখীন হইলে তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইতেন। তিনি গদাইকে অতীব

১ The Theistic Quarterly Review, Oct-Dec., 1879.

ভালবাসিতেন।'[১] অপর একজন লিখেছেন যে, অমনোযোগী বালককে শায়েস্তা করার জন্য গুরু মশাই বালককে বেত্রাঘাত করেও তাঁর বিদ্যাচর্চার অনীহা দূর করতে পারেননি।[২] কেউ বা বলেছেন, লেখাপড়ার জন্য পীড়াপীড়ি করলে শ্রীগদাধর সেইকালেই বলেছিলেন, 'বিদ্যা শিখে ত শ্রাদ্ধ করাতে হবে আর চাল কলা বেঁধে আনতে হবে। আমার অমন বিদ্যায় কাজ নেই। সেই অন্ন খেতে হবে।'[৩] এভাবে বিদ্যাচর্চায় বীতস্পৃহ একগুঁয়ে বালক শ্রীগদাধরের যে চিত্র পরবর্তী কালে জীবনীকারগণ এঁকেছিলেন, তার প্রায় অনুরূপ ছবি তুলে ধরেছিলেন তাঁর সমকালীন পত্রপত্রিকা। 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকা ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে অগস্ট লিখেছিল, 'রামকৃষ্ণ লেখাপড়ার চর্চা প্রায় কিছুই করেন নাই। রীতিমত দুই চারি ছত্র লিখিতে বা পড়িতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।' ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর The Indian Mirror লিখেছিল, 'Born of a poor Brahmin family…Ramakrishna was not fortunate in receiving a good education, secular or spiritual, in his younger days.' প্রাগুক্ত সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণগুণগ্রাহী; তাঁরা বোধ করি শ্রদ্ধাভক্তির আতিশয্যে যথেষ্ট কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং অতিশয়োক্তি করেছিলেন। কেউ আবার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করে শ্রীগদাধরের নিরক্ষরতার যাথার্থ্যও দেখিয়েছিলেন।[৪]

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত করেছিলেন গ্রামবাংলার এক সুদূর পল্লীতে আজ হতে প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে। কিন্তু তাঁর জন্মভূমি কামারপুকুরের অদূরেই ছিল বাংলার অন্যতম প্রধান কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পীঠস্থান বিষ্ণুপুর। সে সময়ে বিষ্ণুপুরের কৃষ্টিসংস্কৃতির প্রভাব কামারপুকুর ও নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলে সুস্পষ্ট। শ্যামল গ্রামীণ বাংলার স্নেহমধুর পরিবেশে বালক শ্রীগদাধর বড় হয়ে উঠছিলেন। পিতা ক্ষুদিরামের কাছে হাতে খড়ি হবার পর শ্রীগদাধর নিকটস্থ পাঠশালায় যোগদান করেছিলেন, তখন তাঁর বয়স পাঁচ বছর। লাহাদের শ্রীশ্রীদুর্গামন্দিরের সম্মুখে যে নাটমন্দির সেখানেই বসত পাঠশালা। শ্রীগদাধরের শিক্ষাকালের প্রথমদিকে গুরুমশাই ছিলেন মুকুন্দপুরনিবাসী যদুনাথ সরকার, পরে ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ সরকার।[৫] সকালে দু'তিন ঘণ্টা ও বিকালে দেড়-দুই ঘণ্টা পাঠশালা বসত। সেকালের রীতি অনুসারে শ্রীগদাধর তালপাতায় বাংলা বর্ণমালা ও বানান লেখা শিখতে আরম্ভ করেন। সেই সঙ্গে সকল শিক্ষার্থীর সঙ্গে এককণ্ঠে তারস্বরে মানসাঙ্ক, কড়া, গণ্ডা, দশকের নামতা উচ্চারণ করে মুখস্থ করতেন। সকল বিষয়েই মুখস্থ করার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হত। তালপাতায় অঙ্ক লেখা অভ্যাস হলে শিক্ষার্থীরা কলাপাতায় তেরিজ (অঙ্কের যোগ) জমাখরচ প্রভৃতি ও নামধাম প্রভৃতি লেখা আয়ত্ত করত।

---

১ গুরুদাস বর্মন : শ্রীরামকৃষ্ণচরিত, পৃঃ ১৩-৪ ২ বৈদ্যনাথ লাহা : কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, পৃঃ ৬০-১

৩ শ্রীরামকৃষ্ণচরিত, পৃঃ ১৪

৪ বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল লিখেছেন : 'তোতাপাখীর মত পুঁথি না পড়িয়া, সাধনপ্রভাবে শিক্ষার প্রতিপাদ্য ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার করিয়া ভবিষ্যতে সকল অক্ষর অর্থাৎ শাস্ত্রকে উদ্ভাসিত করিবেন… হয়ত এই নিমিত্তই নিরক্ষর হইলেন।' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত, পৃঃ ৭)

৫ তত্ত্বমঞ্জরী, সপ্তমবর্ষ, দশম সংখ্যা, পৃঃ ২৩৪ অনুসারে শ্রীগদাধরের পাঠশালার শিক্ষক ছিলেন রামপ্রসাদ গুপ্ত, তাঁর পুত্র আশুতোষ গুপ্ত। সম্ভবতঃ রামপ্রসাদ গুপ্ত অল্পকালের জন্য ঐ পাঠশালাতে শিক্ষকতা করেছিলেন।

গণিতে উৎসাহী ছাত্রদের অধিকন্তু শিখতে হ'ত শুভঙ্করী নিয়ম,[১] মাসমাহিনা সুদকষা জমাবন্দী খৎলেখা জমিদারীর খতিয়ান লেখা ইত্যাদি। তদানীন্তন প্রথানুসারে রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদি ধর্মগ্রন্থের পাঠ ও আবৃত্তি পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হত; শুধু তাই নয়, এই সকল গ্রন্থ বা তার অংশবিশেষ অনুলিপি করাও ছিল পুণ্যকর্ম। প্রাথমিক লেখাপড়া শেষ করে কিশোর শ্রীগদাধর কয়েকটি পুঁথি অনুলিপি করেছিলেন। কাল-সূর্যের ভক্ষণ অতিক্রম করে যে কয়টি পুঁথিপত্র আজও প্রায় অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান সেগুলি সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করবে কিশোর শ্রীগদাধরের বিদ্যাচর্চায় প্রীতি ও নিষ্ঠা। তাঁর হস্তাক্ষরে লেখা পুঁথিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : রামকৃষ্ণায়ণ, হরিশ্চন্দ্রের পালা, সুবাহুর পালা, মহিরাবণ বধের পালা, যোগাদ্যার পালা ও শ্রীশ্রীচণ্ডী। পাঠকের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য শ্রীগদাধরের স্বহস্ত লিখিত পুঁথিগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

(ক) 'হরিশ্চন্দ্রের পালা': ১০½″ × ৩¾″ তুলোট কাগজে ৩৯ পৃষ্ঠার পুঁথি। পুঁথির রীতি অনুযায়ী সাধারণতঃ এক পৃষ্ঠায় লেখা, পর পর দুটি পৃষ্ঠা নিয়ে একটি পৃষ্ঠার নম্বর। এখানে পৃষ্ঠার ক্রমিক নম্বর দশকিয়া ও পণকিয়ার উভয় অঙ্কানুসারে লেখা। শ্রীগদাধর এই পুঁথিটির অনুলেখ সমাপ্ত করেছিলেন বঙ্গাব্দ ১২৫৫ সালের ২০শে বৈশাখ অর্থাৎ সোমবার কৃষ্ণাএকাদশী, শকাব্দ ১৭৭০, ইংরাজী ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ১লা মে। সে সময়ে শ্রীগদাধরের বয়স প্রায় বার বছর দুই মাস। তিনি 'শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। অথ হরিশ্চন্দ্রের পালা।'—লিখে পালাগানের সূচটি আরম্ভ করেছেন। পালাগানের শেষে লিখেছেন তাঁর নিজের নাম ও ঠিকানা। এখানে তাঁর নামের স্বাক্ষর 'শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যা'।

পালা-গানটির মূল-রচয়িতা শঙ্কর, যিনি কবিচন্দ্র, দ্বিজ কবিচন্দ্র, কবিচন্দ্র চক্রবর্তী ইত্যাদি ভণিতাযুক্ত করে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। শঙ্কর কবিচন্দ্রের পিতা মুনিরাম চক্রবর্তী, নিবাস লেগোর নিকটবর্তী আধুনিক পেনো গ্রামে। কবিচন্দ্র বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহের রাজত্ব-কালে (১৭১২-৪৮) সভাকবি ছিলেন। তিনি সংক্ষিপ্ত রামায়ণ পাঁচালী লিখেছিলেন গোপাল সিংহের পিতা রঘুনাথ সিংহের রাজত্বকালে (১৭০২-১২)।[২] কবিচন্দ্রের অধ্যাত্মরামায়ণ দক্ষিণরাঢ়ে 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' নামে খ্যাতি লাভ করেছিল। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর বিখ্যাত History of Bengali Language and Literature (2nd Edn, p. 178-79) গ্রন্থে শঙ্কর কবিচন্দ্রের লেখা যে ৪৬টি কাব্য রচনার তালিকা দিয়েছেন, তার মধ্যে একটি 'হরিশ্চন্দ্রের পালা'। ডাঃ সেনের প্রাপ্ত পুঁথিখানির লিখন তথা অনুলিখনের কাল ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দ। এই পুঁথিখানির কোন একখানির নকল শ্রীগদাধরের আলোচ্য অনুলেখের আকর।

(খ) 'মহিরাবণের পালা': ঐ একই মাপের তুলোট কাগজে ৩১ পৃষ্ঠার পুঁথি। মূলের পূর্বে প্রায় ৪ পৃষ্ঠার বন্দনাগান, 'শ্রীশ্রীরামঃ। বন্দনা

---

১ বাংলায় ও আসামে অঙ্কের ছড়া বা আর্যা অধিকাংশ শুভঙ্করের নামে চলে। শুভঙ্কর সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতকের পূর্বের লোক। পরবর্তী কালে একাধিক কায়স্থ সন্তান শুভঙ্কর নাম বা উপাধি ধারণ করেছিলেন।

২ রামায়ণে রামলীলা কবিচন্দ্রে গায়…
দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় পানুয়ায় বসতি।
রঘুনাথ সিংহের জয় কর রঘুপতি।
(সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃঃ ৩৩৩)

লিখ্যতে।'—দিয়ে সুরু। তিনি পুঁথি সমাপ্ত করে স্বাক্ষর করেছেন 'শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যায়:'। সমাপ্ত করার তারিখ লিখেছেন ২য়া ভাদ্র প্রতিপদ। পুরাতন পঞ্জিকা আলোচনা করে ও শ্রীগদাধরের লেখার বিন্যাস, শব্দের বানান ইত্যাদি লক্ষ্য করে স্থির করা যায় যে, সমাপ্তির তারিখ বঙ্গাব্দ ১২৫৫ সালের ২য়া ভাদ্র, কৃষ্ণাদ্বিতীয়া, বুধবার (ইংরাজী ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অগস্ট) অথবা ১২৫৫ সালের ১লা ভাদ্র প্রতিপদ, মঙ্গলবার। তখন অনুলেখকের বয়স প্রায় সাড়ে বার বছর।

পুঁথিখানির মূল-রচয়িতার অনুসন্ধান করতে গিয়ে কৃত্তিবাস ও কবিচন্দ্র এই দুটি ভণিতার সহাবস্থান বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। এই ধরনের ভণিতা-বিভ্রাট সম্বন্ধে ডাঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, '(মহাভারতের তুলনায়) রামায়ণের বেলায় ভণিতা-বিকৃতি অনেক বেশী হইয়াছে। কেননা রামায়ণ গাওয়া হইত এবং গায়নদের নিজের নাম ভণিতারূপে চালাইয়া দিবার প্রবৃত্তি সর্ব্বদা সজাগ থাকিত। এই কারণে সপ্তদশ শতাব্দে রচিত রামায়ণেও যথেষ্ট ভণিতা-বিভ্রাট ঘটিয়াছে।' (বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ১২২) এখানে ভাষাতে কৃত্তিবাসী সুর যে নাই তা নয়। কিন্তু বন্দনাগানে কৃত্তিবাসকে যেরূপ ভক্তি দেখানো হয়েছে, তাতে এই পালা-গান কৃত্তিবাসের হতে পারে না। সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টই মনে হবে যে, কৃত্তিবাসী রামায়ণের কোন প্রচলিত পাঠের সঙ্গে পালা-গানের গায়ক কবিচন্দ্র নিজের কীর্তি সংযোজন করেছিলেন। এখানে কাহিনী মোটামুটি কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনুসারী।

(গ) 'সুবাহুর পালা': তুলোট কাগজে ২২ পৃষ্ঠার একটি পুঁথি। নাম পত্র ইত্যাদির জন্য রয়েছে তিনটি ভিন্ন পৃষ্ঠা। 'শ্রীশ্রীসীতারামঃ॥ অথ সুবাহুর পালা লিখ্যতে॥'—ভূমিকা করে অনুলেখক শ্রীগদাধর পালাগানটি লিখেছেন। পাণ্ডুলিপি সমাপ্তির তারিখ অনুলেখকের মতে ১২৫৬ সালের ১৯শে আষাঢ়, মঙ্গলবার। পুরাতন পঞ্জিকা অনুসারে ঐ দিনটি ছিল ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ২রা জুলাই; শুক্লা দ্বাদশী তিথি, কিন্তু সোমবার। শ্রীগদাধরের স্বহস্তে লিখিত 'মঙ্গলবার' সঠিক ধরলে তারিখ হবে ২০শে আষাঢ়, ৩রা জুলাই। সে সময়ে শ্রীগদাধরের বয়স তেরো বছর চার মাস।

এখানে ভণিতাতে পাওয়া যায় একমাত্র কৃত্তিবাসের নাম। কিন্তু আলোচ্য পালাগানের কাহিনী প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের কোনও পাঠে আমরা এখন পর্যন্ত দেখতে পাইনি। সুবিখ্যাত জীবনী-কোষ গ্রন্থে[১] যে চল্লিশ জন সুবাহুর পরিচয় পাওয়া যায় তা হতে এই পালা-গানের সুবাহুর কাহিনী ভিন্ন। এখানে সুবাহু বীরবাহুর ভাই, রাবণের প্রিয় পুত্র। সুবাহু রাম-ভক্ত। হৃদয়মুকুরে সদা-ভাস্বর শ্রীরামের অনিন্দ্য-সুন্দর মূর্তি স্মরণ করতে করতে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর মনের ভাব, 'করিয়্যা সম্মুখ রণ যদি আমি মরি। চতুর্ভুজ হয়্যা জাব বৈকুণ্ঠ নগরি॥'

(ঘ) চতুর্থ পুঁথি 'যোগাদ্যার পালার' উল্লেখ করেছেন লীলাপ্রসঙ্গকার ও 'শ্রীরামকৃষ্ণদেব' গ্রন্থের লেখক। যোগাদ্যা শব্দের অর্থ মায়াময়ী, আদ্যাশক্তি, ভগবতী, কালী।[২] ডাঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, 'উত্তররাঢ়ের পুরাতন দেবীপীঠ ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা দেবীর বন্দনা পাওয়া গিয়াছে কৃত্তি-বাসের, দ্বিজদয়ারামের, পরমানন্দ দাসের ও

---

১ শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার : জীবনীকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২০৩৪-৩৭

২ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গীয় শব্দকোষ, পৃঃ ১৮৭৩।

দ্বিজ বাঞ্ছারামের ভণিতায়।'[১] ডাঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেবদেবী ও পীর মাহাত্ম্যবিষয়ক যেসব প্রচুর পুঁথি রচিত হয়েছিল তার মধ্যে যোগাদ্যা দেবীর বন্দনা, তারকেশ্বর বন্দনা প্রভৃতি 'তুইচারি পাতড়ার' পুঁথিগুলি নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর।[২] এই পুঁথিখানি দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। 'শ্রীরামকৃষ্ণদেব' গ্রন্থের লেখক শশিভূষণ ঘোষের মতে এই পুঁথির অনুলিপি শ্রীগদাধর সমাপ্ত করেছিলেন বঙ্গাব্দ ১২৫৫ সালের ২৯শে মাঘ, শনিবার অর্থাৎ ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি। সে সময়ে শ্রীগদাধরের বয়স প্রায় তেরো বছর।

(ঙ) স্বামী সারদানন্দ, রামচন্দ্র দত্ত ও অক্ষয়-কুমার সেন 'রামকৃষ্ণায়ণ' পুঁথির উল্লেখ করেছেন। এর অনুলেখকও শ্রীগদাধর। আমাদের এই পুঁথি-খানিও দেখার সৌভাগ্য হয়নি।

(চ) শিহড় গ্রামে হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রের বাড়ীতে শ্রীগদাধরের নকল করা শ্রীশ্রীচণ্ডীর কিছু অংশ দেখতে পাওয়া যায়। তেরিজপাতাতে লেখা পুঁথিখানির অধিকাংশই বিলুপ্ত, বর্তমানে মাত্র বার তেরোখানি পৃষ্ঠা দেখা যায়। মনে হয় বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় লেখা এই অনুলেখ উপরোক্ত পুঁথিগুলি লেখার পরবর্তী কোন সময়ের।

উপরোক্ত প্রত্যেকটি অনুলেখ শ্রীগদাধরের হস্তাক্ষরের মুন্সিয়ানার উজ্জ্বল প্রমাণ। দৃঢ় বলিষ্ঠ গতিতে ছন্দায়িত তাঁর লিখন ভঙ্গিমা ও স্বাক্ষরের নমুনা পাঠককে এখানে উপহার দেওয়া যাচ্ছে (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। পুঁথিগুলির মধ্যে কিছু কিছু অংশ শ্রীগদাধরের মৌলিক রচনা। সামান্য কিছু অংশ গদ্যে লেখা। 'সুবাহুর পালা' পুঁথি-খানির শেষ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, 'ওঁ রামঃ। শ্রীরামচন্দ্রদাসের পুস্তক জানিবেন।' মূল পাঠ লেখা শেষ করে তিনি 'হরিশ্চন্দ্রের পালা' পুঁথিতে লিখেছেন, 'ভিমস্যাপী রণে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।'[৩] আবার লিখেছেন, 'জথাদিষ্টং তথা লিখিতং লেক্ষকো নাস্তি দোষক।'[৪] এগুলি নিঃসন্দেহে মূল পুঁথি-বহির্ভূত তাঁর নিজস্ব রচনা।

এছাড়াও তদানীন্তনকালের পুঁথি-লিখনের রীতি অনুযায়ী স্বভাবকবি শ্রীগদাধর তাঁর কিছু মৌলিক রচনা পুঁথিগুলির মধ্যে জুড়ে দিয়েছেন। বার তেরো বছরের কিশোর কবির মধ্যে স্বাভাবিকভাবে যে কাব্যপ্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছিল তার কয়েকটি নমুনা এখানে উপস্থাপিত করা যাচ্ছে। কিশোর কবি শ্রীগদাধর 'মহিরাবণ বধ' পালার শেষে লিখেছেন

গদাধরকে বর দিবে য়োহে[৫] গুণনীধী।
মহানন্দে রাখিবে তোমায় জানেদীঃ॥
গুষ্টিবর্গে[৬] বর দিবে জোহে[৫] কমল আঁখি।
জন্মে[৭] ২ থাকে যেন হোএ বড় সুখীঃ॥

তিনি 'সুবাহুর পালা'র অনুলিপি শেষ করে লিখেছেন,

কিৰ্ত্তিবাসের চরনে মোর অসংখ্য প্রনাম
জাহার কৃপায় হইর্নগিত রামায়নঃ॥
শ্রীগদাধরকে বরদিবে ওহেগুননিধি
কর্ন্যানে[৮] রাখিবে রাম তোমায় নিবেদিঃ॥

---

১ সুকুমার সেন : ঐ, পৃঃ ৫১৭, তাছাড়াও পৃঃ ৪৩০ দ্রষ্টব্য।

২ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয়খণ্ড, পৃঃ ১২১৫-৬।

৩ ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।

৪ যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকস্য নাস্তি দোষঃ। 'যথাদৃষ্টং' স্থলে 'যথালিষ্টং' পাঠও গ্রহণযোগ্য।

৫ =যোহে=জোহে=ওহে ৬ গুষ্টিবর্গ=গোষ্ঠীবর্গ ৭ =জন্মে ৮ =কল্যাণে

১। শ্রীরামকৃষ্ণের স্বহস্তলিখিত পুঁথির পৃষ্ঠা

২। শ্রীরামকৃষ্ণের আঁকা ছবি (উপরে) ও লেখা হিসাব (নীচে)।

রামায় রামচন্দ্রায় রাম ভদ্রায় বেধসে
রঘুনাথায় নাথায় সিতায় পথয্যা নম ॥[১]

অনুরূপভাবে 'হরিশ্চন্দ্র পালা' গানের শেষাংশে নিম্নোক্ত দুটি পংক্তিও শ্রীগদাধরের নিজস্ব বচনা মনে করার যথেষ্ট যুক্তি আছে।

এতদূরে হরিশ্চন্দ্রের পালা হইল সায়।
অভিমত বর পায় জেজন গাওয়ায় ॥

আলোচ্য পুঁথিগুলির অধিকাংশ পয়ার ছন্দে লেখা, শুধু কিছু অংশে দেখা যায় পয়ার ত্রিপদী। শ্রীগদাধরের নিজস্ব রচনা সব কয়টি ১৪, ১৫, ১৬ অক্ষরী পয়ারে রচিত, তাছাড়াও তাঁর রচনায় সর্ববিষয়ে দেখা যায় পুরাতন ধারার অনুবৃত্তি।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই ধরনের পুঁথি লেখা শুধুমাত্র লেখার কাজ নয় চারুশিল্পও বটে। আমাদের স্বভাবশিল্পী শ্রীগদাধর তাঁর পুঁথিপাটাকে সজ্জিত করেছিলেন সুরুচিসম্পন্ন ছোটখাট নক্সার সাহায্যে। একটি পৃষ্ঠার দুই প্রান্তে তাঁর হাতে আঁকা দুটি নক্সার আলোকচিত্র পাঠককে উপহার দেওয়া গেল, (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। আরও লক্ষণীয় একটি বিষয় এই যে, তাঁর লেখা প্রত্যেকটি পুঁথি তিনি সুরু করেছেন শ্রীরাম বা শ্রীরামসীতাকে স্মরণ করে। 'সুবাহুর পালা' পুঁথিখানির প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় লেখা সুরু করেছেন 'ওঁ রাম', 'শ্রীরাম' ইত্যাদি দিয়ে। শুধুমাত্র রামকাহিনীর সঙ্গে যুক্ত বলেই রামনামের স্মরণ নয়, শ্রীগদাধর 'রামাৎ' মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন[২] এবং ঐ কালে ইষ্টদেব রঘুবীরের পূজা জপ ধ্যান তদ্গতচিত্তে করে মনের আনন্দে ভাসতেন, সেকারণেও তাঁর লেখাগুলিতে রামনামের পুনঃ পুনঃ স্মরণ।

প্রবীণ বয়সেও তাঁর হস্তাক্ষরের যে সামান্য কয়েকটি স্মৃতিচিহ্ন কালের ক্ষয়-ক্ষতি অতিক্রম করে বর্তমান রয়েছে, তাদের কয়েকটি পাঠককে উপহার দেওয়া যাচ্ছে। তখন তিনি কাশীপুরের বাগানবাটীতে রোগশয্যায় শায়িত। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুআরি সন্ধ্যাবেলা। তিনি একখণ্ড কাগজে স্বহস্তে নরেন্দ্রনাথকে লিখে দেন লোকশিক্ষার ফতোয়া। তিনি লিখেন 'জয় রাধে প্রেমোময়ি নরেন সিক্ষে দিবে জখন ঘুরে বাহিরে হাক দিবে। জয় রাধে।'[৩] অর্থাৎ জয় রাধে! প্রেমময়ী! নরেন শিক্ষে দিবে, যখন ঘরে বাইরে হাঁক দিবে। জয় রাধে!' লেখার নীচে চারুশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ এঁকে দেন ব্যাখ্যাকর একটি মনোহর রেখাচিত্র। বামদিকে আয়তচক্ষু একটি আবক্ষ মস্তক। মাথার গড়ন সাধারণের চাইতে বড়। তাঁর দৃষ্টি সম্মুখে স্থির। পিছনে একটি দীর্ঘপুচ্ছ ময়ূর, ব্যগ্রভাবে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। মনে হয়, নরেন্দ্রনাথের পিছনে শ্রীরামকৃষ্ণ, নবনির্বাচিত লোকশিক্ষকের পিছনে সাগ্রহে অনুসরণকারী জগৎপতি। আবার দেখি, ৯ই এপ্রিল তারিখে তিনি একখণ্ড কাগজে লিখেছেন, 'নরেন্দ্রকে জ্ঞান দাও', আর তারই নীচে এঁকেছেন একটি বাঘ ও একটি ঘোড়া। কাগজখণ্ডের উল্টোপিঠে এঁকেছেন একজন রমণী, তার মাথায় একটি বড় খোঁপা।[৪] এভাবে দেখা যায়, বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে আনন্দকন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ভাবসম্পদ বিতরণ করেছিলেন কখনও রেখাচিত্রের সাহায্যে, কখনও শব্দবর্ণ লিখনের সাহায্যে, কিন্তু ততোধিক তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন গান কীর্তন, নৃত্য ও অনুপম

---

১ অর্থাৎ 'সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ।' শ্রীগদাধর এসময়ে সংস্কৃতভাষা সামান্যই শিখেছিলেন।

২ "আমার বাবা রামের উপাসক ছিলেন। আমিও রামাৎমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলাম।" (শ্রীরামকৃষ্ণদেব, পৃঃ ৫৫)

৩ মাষ্টার মশায়ের ডায়েরী, পৃঃ ৩৩৫　　৪ মাষ্টার মশায়ের ডায়েরী, পৃঃ ৭০৪

কথাশিল্পের মাধ্যমে।

রামচন্দ্র দত্ত লিখেছিলেন, 'লেখাপড়া সম্বন্ধে একেবারে তাঁহার কিছুই আস্থা ছিল না। তাঁহার হস্তলিখিত রামকৃষ্ণায়ণ পুঁথি ও অন্য দুই একখানি পুস্তক আছে, তাহাতেই তিনি যে লেখাপড়া কিরূপ জানিতেন স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত,পৃঃ ৪)। শ্রীগদাধর লিখিত পুঁথিগুলির গভীরে প্রবেশ না করে ভাসা ভাসা দেখলে এরূপ একটি ধারণা হওয়া বিচিত্র নয়। রামচন্দ্র দত্তের বক্রোক্তি সম্ভবতঃ পুঁথির ভাষা, ব্যাকরণ, শব্দের বানান ও পয়ার ছন্দে চৌদ্দ অক্ষরের পরিবর্তে কখনও কখনও ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ অক্ষরের ব্যবহার ইত্যাদিকে লক্ষ্য করে। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা পুঁথি-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত পাঠক জানেন যে, বাংলা ভাষায় পৌরাণিক পুনর্জাগরণের সময়ে প্রাকৃতের যে প্রবল প্রচলন হয়েছিল, পরবর্তী কালে বাংলাভাষা অনেকাংশে সংস্কৃতঘেঁষা হয়ে উঠলেও সেই প্রভাব হতে মুক্ত হতে পারে নি। এই উভয় স্রোতের বিপুল পরিমাণে সংমিশ্রণ ঘটেছিল সেকালে, সেকালের রচিত পুঁথিগুলির অনুসরণ করেছিলেন শ্রীগদাধর। সে কারণে দেখে, লুটিয়ে, বস, থুয়ে, দর্প, শৃগাল, বজ্রাঘাত, হাতে প্রভৃতি শব্দের পরিবর্তে তদানীন্তন প্রচলিত দেখ্যা, লোটায়্যা, বৈস্য, থুয্যা, দপ্প, সিগাল, বয়র্জাঘাত, হাথে প্রভৃতির ব্যবহার দেখে নাসিকাকুঞ্চন করা ঠিক হবে না, তেমনি দিব্য, ক্ষমা, গর্ভপাত, অযোধ্যা ইত্যাদির পরিবর্তে দীর্ব্ব, খেমা, গর্ত্তপাত, অজুধ্যা অথবা বানানের ক্ষেত্রে সরোজ, পশ্চাতে, শরণ, বৃত্তান্ত, তপস্বী, হিমাচল, কৃপা ইত্যাদির পরিবর্তে স্বরজ, পর্শ্চাতে, বির্ত্তান্ত, তপস্মি,হিম্যাচল,ক্রৃপা ইত্যাদির ব্যবহারে স্থানীয় প্রভাবের গাঢ়তাই ইঙ্গিত করে। অবশ্য কয়েক শব্দের বানান তিনি কালক্রমে সংশোধন করে ছিলেন। তাছাড়াও কয়েকটি শব্দের বানান তি বোধ হয় বরাবরই ভুল করেছেন। এগুলির জ দায়ী তাঁর নিজের শেখার ভুল অথবা পাঠশাল গুরুমশাইয়ের ভুল, তা আজ কে হলফ ক বলবে? তাছাড়াও কিশোর শ্রীগদাধর প্রত্যেক পুঁথি নিষ্ঠার সঙ্গে হুবহু নকল করেছিলেন। পুঁথি শেষে তিনি লিখেছেন, 'জথাদৃষ্টং তথা লিখিত লির্ক্ষকো নাস্তি দোসক'[১] এদিক হতে বিচা করলেও অপ্রচলিত প্রাচীন শব্দের ব্যবহা আঞ্চলিক শব্দের প্রভাব, ছন্দের মাত্রার স্খলন বানান ভুল ইত্যাদি ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য অনুলিপিকারের ঘাড়ে দোস না চাপিয়ে যে আকর পুঁথিগুলি তিনি অনুসরণ করেছিলেন সেগুলিকেই দায়ী করা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ অনেকেরই একটি ভ্রান্ত ধারণা এই যে, শ্রীগদাধর হিসাবপত্র কিছু জানতেন না, বুঝতেন না। বিষয়টি একটু তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। অনস্বীকার্য যে তিনি নিজমুখে বলে ছিলেন, 'পাঠশালে শুভঙ্করী আঁকে ধাঁধা লাগত।' লীলাপ্রসঙ্গকার লিখেছেন: 'গণিতশাস্ত্রে বালকের উদাসীনতার কথা আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু পাঠশালায় যাইয়া সে ঐ বিষয়েও উন্নতিসাধন করিয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, ধারাপাতে কাঠাকিয়া পর্যন্ত এবং পাটিগণিতে তেরিজ হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য গুণভাগ পর্যন্ত তাঁহার শিক্ষা অগ্রসর হইয়াছিল।' এখানে তাঁর নিজের হাতে লেখা দুটি হিসাবের আলোকপ্রতিলিপি উপস্থাপিত করা হচ্ছে (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। এ দুটি পাটিগণিতের নিছক মিশ্রযোগ নয়, হিসাবের লেনদেনের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

---

১ তিনি একটি পুঁথিতে লিখেছেন: 'জথাদিষ্টং তথা লিখিতং লেক্ষকো নাস্তি দোসক।'

যদিও পুঁথিকার লিখেছেন, শ্রীগদাধর যোগ জানতেন, বিয়োগ জানতেন না,[১] এই অভিযোগ আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে ভুল হবে। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণজীবনীর পাঠকমাত্রেই জানেন যে, তিনি যখন দ্বৈতাদ্বৈতভাববিবর্জিত অবস্থায় অবস্থান করছিলেন, সেকালে তাঁর হিসাব পচে গিয়েছিল। তিনি নিজমুখে বলেছেন, 'এ অবস্থার পর গণনা হয় না। গণ্‌তে গেলে ১৷৭৷৮ এই রকম গণনা হয়।'

(কথামৃত ১৷১৬৷২)

শ্রীগদাধরের লেখাপড়া বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি কয়েকটি কারণে। বালক মাত্র সাত বছর বয়সে পিতৃদেবকে হারান। পিতৃবিয়োগ বালকের মনে গভীর রেখাপাত করে। 'বালক কিন্তু এখন হইতে চিন্তাশীল ও নির্জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে এবং সংসারের সকল ব্যক্তিকে তাঁহার চিন্তার বিষয় করিয়া তাহাদিগের আচরণ তন্ন তন্ন করিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল।' দ্বিতীয়তঃ নয় বছর বয়সে উপনয়ন লাভের পর শ্রীগদাধর আনন্দমনে সন্ধ্যাবন্দনাদি এবং কুলবিগ্রহ ৺রঘুবীর ও ৺শীতলা মায়ের পূজা করতে থাকেন। সম্ভবতঃ এই সময়েই তাঁর পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত হয়। তাঁর অন্যতম জীবনীকার লিখেছেন, 'কেবল অন্ত্যজ জাতি ব্যতীত গ্রামের ব্রাহ্মণ শূদ্র সকল বর্ণের বালককেই পাঠশালায় একস্থানে বসিয়া মিলিতভাবে শিক্ষালাভ করিতে হইত। কিন্তু ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়ন হইবার পর অপর বর্ণের সংসর্গ হইতে তাহাকে পৃথক থাকিতে হয় বলিয়া শিক্ষা সম্পূর্ণ না হইলেও সে বাধ্য হইয়া পাঠশালা পরিত্যাগ করিত। সুতরাং গদাধরের নয় বৎসর বয়সে উপনয়ন হইবার পরও যে তিনি পাঠশালায় যাইতেন ইহা বলিয়া বোধ হয় না।' (শ্রীরামকৃষ্ণদেব, পৃঃ ৩৮) তৃতীয়তঃ ইতিমধ্যে শ্রীগদাধরের মানসসরোবরে অধ্যাত্মপদ্মের কোরকগুলি একে একে প্রস্ফুটিত হতে থাকে ; তাঁর মধ্যে আসে পরিবর্তন,[২] মামুলি লেখাপড়ায় তাঁর আকর্ষণ কমে যায়। উপরন্তু 'অসাধারণ মেধা, প্রতিভা ও মানসিক সংস্কারসম্পন্ন' কিশোরের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাঁর দেবতুল্য পিতার বৈরাগ্য ঈশ্বরপ্রীতি সত্যবাদিতা সদাচারের তুলনায় গ্রামের পণ্ডিত ও ভট্টাচার্যাদি ব্যক্তিদের ভোগলিপ্সা ও স্বার্থপর আচরণ ধরা পড়েছিল, তাঁর কোমল মনকে ব্যথিত করেছিল। অপরপক্ষে তিনি তাঁর ভাবানুমোদনকারী রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদি পাঠ করতে ও সমকালীন রীতি অনুযায়ী ধর্মবিষয়ক পুঁথিসকল অনুলিপি করতে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। শ্রীগদাধরের সুললিত কণ্ঠে পুরাণাদির পাঠ শুনতে ভীড় লেগে যেত, 'চারিধারে ঘেরে তাঁরে শুনে ব'সে ব'সে। গদায়ের পুঁথিপাঠ পরম উল্লাসে।' (পুঁথি, ১৯)

বিদ্যায়তনের চৌহদ্দির মধ্যে তাঁর বিদ্যাচর্চা বেশীদূর অগ্রসর না হলেও বিদ্যায়তনের বাইরে যে বিদ্যার অফুরন্ত ভাণ্ডার, সেখান হতে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন অমূল্য সম্পদ। কৃষ্টিসম্পন্ন চাটুজ্যে পরিবার ছিল শ্রীগদাধরের শিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তিভূমি। ধর্মপ্রাণ পিতা ক্ষুদিরাম ও সরলমনা ভক্তিমতী মাতা চন্দ্রমণি ছিলেন তাঁর চরিত্রশিক্ষার আদর্শদীপ। সেইসঙ্গে গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য, সামাজিক সম্পদ শিক্ষার্থী শ্রীগদাধরকে জুগিয়েছিল অফুরন্ত উপকরণ। তাঁর তীক্ষ্ণ স্মরণ-

---

১ স্বভাবতঃ যোগে মন তাই যোগ হ'ল। অধম বিয়োগ তাহে বুদ্ধি বেঁকে গেল।
পূর্ণ থেকে পূর্ণ গেলে পূর্ণ থাকে যাঁর। কেমনে বিয়োগে বুদ্ধি আসিবে তাঁহার। পুঁথি, পৃঃ ১৯

২ শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন : 'ছেলেবেলায় তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল।··· সেই দিন থেকে আর এক রকম হয়ে গেলুম। নিজের ভিতর আর একজনকে দেখতে লাগলাম।' (কথামৃত ১৷১৭৷৩) সে সময়ে শ্রীগদাধরের বয়স লীলাপ্রসঙ্গমতে আট বছর, কথামৃতমতে এগার বছর।

শক্তি, সুগভীর বোধশক্তি, সহজাত ঈশ্বরপ্রীতি—রামযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা, রামরসায়ন, চণ্ডীর গান, হরি-সংকীর্তন, রামায়ণ, ভারত, ভাগবত ও পুরাণাদির পাঠ এবং সর্বোপরি বারমাসে তেরো পালা-পার্বণের মধ্য হতে প্রয়োজনমত ভাবরস সংগ্রহ করেছিল।

শ্রীগদাধর আজন্ম ভাবুক। বিশুদ্ধ তাঁর মন। শুকনো দেশলাইয়ের কাঠির মত সামান্য উদ্দীপনেই তাঁর মন সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে, তাঁর মনপাখী দেহডাল ছেড়ে উড়ে যেতে চায় চিদাকাশের অসীমলোকে। সেইসঙ্গে তাঁর ভাবোদ্দীপ্ত মন ও সূক্ষ্ম ও বিচিত্র রসবোধ সহজাত প্রবর্তনায় মেতে ওঠে বিবিধ চারুশিল্পে। চিত্রে, ভাস্কর্যে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, অভিনয়ের মধ্য দিয়ে স্ফুরিত হয় তাঁর অসাধারণ প্রতিভা। তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, কল্পনার গভীরতা ও সহজে ভাবপ্রকাশের দক্ষতা প্রকাশ পায় তাঁর বিভিন্ন শিল্পকর্মের মধ্যে।[১] তাঁর বিচিত্র বিদ্যাচর্চার মধ্যে সুসমঞ্জসভাবে মিলিত হয়েছে তাঁর অসাধারণ শিল্পপ্রতিভা ও তদধিক অসাধারণ তাঁর ঈশ্বরপ্রীতির জন্য প্রাণের আকুতি। ক্রমে তিনি প্রতিষ্ঠিত হন 'বিজ্ঞানী'-রূপে এবং বিশ্ব-বাসীকে আহ্বান করে বলেন যে, 'এই সংসার মজার কুঠি, আমি খাই দাই আর মজা লুটি'।

আশৈশব তাঁর অতুলনীয় ধারণার ও ধারণের সামর্থ্য সকলকে বিস্মিত করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজমুখে বলতেন, 'কিন্তু ছেলেবেলায় লাহাদের ওখানে (কামারপুকুরে) সাধুরা পড়ত বুঝতে পারতুম। তবে একটু আধটু ফাঁক যায়, কোন পণ্ডিত এসে যদি সংস্কৃতে কথা কয় তো বুঝতে পারি। কিন্তু নিজে সংস্কৃত কথা কইতে পারি না।' (কথামৃত ৪।১২।) সেই কারণে তিনি সহজেই দয়ানন্দ সরস্বতী, নারায়ণ শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতদের সঙ্গে ভাবের আদান করতে পারতেন, তেমনি ইংলিশম্যানদের যুক্তিবিচারের আলোচনা অনায়াসে বুঝতে পারতেন ও মাঝে মাঝে গভীর ভাবদ্যোতক মন্তব্য করতেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা কয়েকটি ঘটনা স্মরণ করতে পারি, শ্রীগদাধরের বয়স তখন নয় কি দশ বছর। গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের এক শ্রাদ্ধবাসরে একটি বিরাট পণ্ডিত-সভা বসেছিল। একটি জটিল প্রশ্ন নিয়ে বাদানুবাদ করতে করতে পণ্ডিতেরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু সমাধান খুঁজে পাচ্ছিলেন না। সেখানে উপস্থিত হয়ে শ্রীগদাধর একটি সহজ সরল সমাধান দিয়ে উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করেন। দ্বিতীয় একটি ঘটনা। কাশীপুরে মহিমাচরণ চক্রবর্তীর বাড়ীতে তন্ত্রের কয়েকটি শ্লোকের তাৎপর্য নিয়ে মহিমাচরণ, জনৈক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও অধরলাল সেনের মধ্যে তুমুল বচসা হয়। বাদানুবাদে সমাধান না হওয়াতে তাঁরা উপস্থিত হন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শুনে অধর সেন বিস্মিত বোধ করেন।[২] শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বর্ণনা করেছেন একটি তাৎপর্য-পূর্ণ ঘটনা। তিনি বলেছেন: সেজবাবুর সঙ্গে আরেক জায়গায় গিয়েছিলাম। অনেক পণ্ডিত আমার সঙ্গে বিচার করতে এসেছিল। আমি তো মুখ্যু! তারা আমার সেই অবস্থা দেখলে আর আমার সঙ্গে কথাবার্তা হলে বললে, "মহাশয়! আগে যা পড়েছি, তোমার সঙ্গে কথা কয়ে সে সব পড়া, বিদ্যা, সব থু হয়ে গেল। এখন বুঝেছি, তাঁর

১ 'বিশ্ববাণী', আশ্বিন ১৩৮১: 'শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ' দ্রষ্টব্য।

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১১১ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি, পৃঃ ৩৬৭ বর্ণনার মধ্যে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা থাকলেও মূল ঘটনা এক।

কৃপা হলে জ্ঞানের অভাব থাকে না, মূর্খ বিদ্বান হয়, বোবার কথা ফুটে!" তাই বলছি বই পড়লেই পণ্ডিত হয় না।' (কথামৃত ১।১৭।৩) দয়ানন্দ সরস্বতী নারায়ণ শাস্ত্রী, গৌরী পণ্ডিত, পদ্মলোচন প্রভৃতি শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা শ্রীরামকৃষ্ণের যথার্থ পাণ্ডিত্য দেখে অবাক হয়েছিলেন। দয়ানন্দ সরস্বতী তো বলেছিলেন, ' এঁকে দেখে প্রমাণ হ'লো যে পণ্ডিতেরা কেবল শাস্ত্র মন্থন করে ঘোলটা খান, এরূপ মহাপুরুষেরা মাখনটা সমস্ত খান।' (কথামৃত ১।১৩।৫) তেমনি আবার ইংরাজীপড়া কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, মহেন্দ্রলাল সরকার, মহেন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের যথার্থ বিদ্যাবত্তা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি আবার এইসব ইংলিশম্যানদের সঙ্গে কথা বলার সময় Refine, like, honorary, society, under, tax, cheque, thank you ইত্যাদি চুট্‌কি শব্দ ব্যবহার করে বিমল আনন্দ বিতরণ করতেন। ইংলিশম্যান মহেন্দ্রনাথকে শিখিয়েছিলেন যে, বই পড়লেই জ্ঞান হয় না, ঈশ্বরকে জানার নাম প্রকৃত জ্ঞান। বিদ্যার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন: 'আপনি সব জানেন—তবে খপর নাই।'

নিঃসন্দেহে শ্রীগদাধর তথা শ্রীরামকৃষ্ণের অনুসৃত বিদ্যাচর্চা ও চর্যার ধারা সম্পূর্ণ তাঁর স্বকীয় ও অভিনব। বিজ্ঞানীর স্তরে উত্তীর্ণ হয়েও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ছিল, 'যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।' শ্রীগদাধর হতে শ্রীরামকৃষ্ণে উত্তরণের বিস্তীর্ণ পরিধির মধ্যে সুপরিস্ফুট হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যাচর্চা সম্বন্ধে মৌলিক ভাবনা। তিনি অল্প বয়সেই বুঝেছিলেন যে, প্রচলিত বিদ্যাশিক্ষার গণ্ডী সঙ্কীর্ণ। যৌবনের প্রারম্ভে টোলের পণ্ডিত জ্যেষ্ঠ রামকুমারকে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, 'এই চালকলাবাঁধা বিদ্যা আমি শিখতে চাই না, আমি এমন বিদ্যা শিখতে চাই যাতে জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হয়, মানুষ বাস্তবিক কৃতার্থ হয়।' তিনি শুধুমাত্র বলেছিলেন না, তিনি নিজে সেই বিদ্যা আয়ত্তও করেছিলেন। তিনি গ্রহণ করেছিলেন সেই বিদ্যা যে 'বিদ্যায় বুদ্ধি শুদ্ধি করে' (সুরেশচন্দ্র সঙ্কলিত শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ৩৫৫নং), সেই 'বিদ্যা, যা থেকে ভক্তি, দয়া, জ্ঞান প্রেম ঈশ্বরের পথে লয়ে যায়।' (কথামৃত ৩।২।২) তিনি এই বিদ্যা গ্রহণ করেছিলেন সুনির্দিষ্ট একটি উদ্দেশ্য নিয়ে। মানুষজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। তাঁর মতে 'যার ঈশ্বরে মন সেই ত মানুষ। মানুষ আর মানহুঁস। যার হুঁস আছে, চৈতন্য আছে; যে নিশ্চিত জানে, ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য—সেই মানহুঁস।' (কথামৃত ৩।২০।৩) বিদ্যা মানুষকে মানহুঁশ করে, মানুষকে তাঁর অন্তর্নিহিত পরিপূর্ণতা উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। এই বিদ্যায় বিদ্বান ব্যক্তি সম্বন্ধে উপনিষদ বলেছেন '(বিদ্বান্‌) অমৃতঃ সমভবৎ' (ঐত ৩।১।৪)। এই বিদ্যালাভ করে সব মানুষ অমর হয়ে যায়, বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্‌' (কেনো ২।৪)। বিদ্যালাভ করে মানুষ চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে চলে যায়, তার জ্ঞাতব্য কিছু বাকী থাকে না। 'যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে।' (গীতা ৭।২)

বিদ্যার্থী পুঁথি-পাটার সীমিত শক্তি সম্বন্ধে অনেক সময়েই সচেতন থাকে না, ফলে বিদ্যার লক্ষ্য হতে চ্যুত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যার্থী ও বিদ্যাধারী উভয়কেই হুঁশিয়ার করে বলেছেন, 'শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশেল আছে—চিনিটুকু লওয়া বড় কঠিন।' (কথামৃত ৪।২০।৫) 'শাস্ত্র পড়ে হদ্দ অস্তিমাত্র বোধ হয়।' (কথামৃত ১।২১।৩) শাস্ত্র ঈশ্বরতত্ত্বের সন্ধান দেয় মাত্র। তিনি শাস্ত্রানুরাগীদের ইতিকর্তব্যতা সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছেন নিজেকে নজির দেখিয়ে। তিনি বলেছেন, 'শাস্ত্রের দুই রকম অর্থ—শব্দার্থ ও

মর্মার্থ। মর্মার্থটুকু নিতে হয়; যে অর্থ ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে মিলে। চিঠির কথা, আর যে ব্যক্তি লিখেছে তার মুখের কথা, অনেক তফাৎ। শাস্ত্র হচ্ছে চিঠির কথা। ঈশ্বরের বাণী মুখের কথা। আমি মার মুখের কথার সঙ্গে না মিললে কিছুই লই না।' (কথামৃত ৩।১৫।২) অজ্ঞাতজ্ঞাপক শাস্ত্র বিধান শ্রীরামকৃষ্ণের চূড়ান্ত মাপকাঠি ছিল না, অপরোক্ষজ্ঞানই ছিল তাঁর তুলাদণ্ড।

বিদ্যার উদ্দেশ্যসিদ্ধির সঙ্গে বিদ্যার যে সম্বন্ধ সে বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের অভিমত সম্পূর্ণ মৌলিক। তিনি বলতেন: 'এরা ভাবে আগে লেখাপড়া, তারপর ঈশ্বর, ঈশ্বরকে জানতে হলে লেখাপড়া চাই। কিন্তু যদু মল্লিকের সঙ্গে যদি আলাপ কর্ত্তে হয় তাহলে তার কখানা বাড়ী, কত টাকা, কত কোম্পানীর কাগজ এসব আগে আমার অত খবরে কাজ কি? যো সো করে—স্তব করেই হোক, দ্বারবানদের ধাক্কা খেয়েই হোক, কোন মতে বাড়ীর ভিতরে ঢুকে যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ করতে হয়। আর যদি টাকাকড়ি ঐশ্বর্যের খবর জানতে ইচ্ছা হয়, তখন যদু মল্লিককে জিজ্ঞাসা করলেই হয়ে যাবে। খুব সহজে হয়ে যাবে। আগে রাম— তারপর রামের ঐশ্বর্য— জগৎ।' (কথামৃত ২।২২।১) তিনি নিজে ব্যাকুলতা ও অনুরাগের সাহায্যে শ্রীজগন্মাতার দর্শন লাভ করেছিলেন, ক্রমে শাস্ত্রানুসারে সাধন ভজন করে ঈশ্বরের বৈচিত্র্যময় সগুণরূপ ও নির্গুণ-স্বরূপ বোধে বোধ করেছিলেন। ঈশ্বরের কৃপায় তিনি হয়েছিলেন সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেছেন: 'তিন দিন করে কেঁদেছি, আর পুরাণ তন্ত্র— এসব শাস্ত্রে কি আছে— (তিনি) সব দেখিয়ে দিয়েছেন।' (কথামৃত ৪।২৪।৩) আবার লোকশিক্ষকের ভূমিকায় তাঁর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলেছিলেন: 'তাঁর কৃপা হলে জ্ঞানের কি আর অভাব থাকে? দেখনা, আমি তো মুখ্যু কিছুই জানি না, তবে এ সব কথা বলে কে? আবার এ জ্ঞানের ভাণ্ডার অক্ষয়!··· আমিও যা কথা কয়ে যাই, ফুরিয়ে আসে আসে হয়, মা আবার অমনি অক্ষয় জ্ঞানভাণ্ডারের রাশ ঠেলে দেন।' (কথামৃত ১।১৭।৩) তাছাড়াও লৌকিক উপায়ে স্বচেষ্টায় তিনি অনেক ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে সুপরিচিত হয়েছিলেন[১] এবং সেই সকল শাস্ত্রবাণীর তাৎপর্য অপরোক্ষ জ্ঞানের আলোকে যাচাই করে নিয়েছিলেন।

বিদ্যার্জনের জন্য তিনি যে যুক্তিপূর্ণ অনন্য-সাধারণ একটি পদ্ধতি বেছে নিয়েছিলেন তার শ্রেষ্ঠতা ব্যাখ্যা করে তিনি বলতেন: 'অনেকে মনে করে, বই না পড়ে বুঝি জ্ঞান হয় না, বিদ্যা হয় না। কিন্তু পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, শোনার চেয়ে দেখা ভাল, কাশীর বিষয় পড়া, কাশীর বিষয় শোনা আর কাশীদর্শন অনেক তফাৎ।' (কথামৃত ১।১৫।২) তিনি বিদ্যার উপকরণ সংগ্রহের জন্য শ্রুতি-মাধ্যম বেছে নিয়েছিলেন, কিন্তু সংগৃহীত উপকরণ স্বায়ত্তীকরণের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন বেশী। তিনি বলতেন: 'দেখ, শুধু পড়াশুনাতে কিছু হয় না। বাজনার বোল লোকে মুখস্থ বেশ বলতে পারে— হাতে আনা বড় শক্ত।' (কথামৃত ২।১৪।৩) দুধের কথা শুনলে বা দুধ দেখলে হবে না, দুধ জোগাড় করে খেলেও হবে না, সেই দুধ খেয়ে হজম করে শরীরকে পুষ্ট বলিষ্ঠ করতে হবে—এরূপ বাস্তবধর্মী

---

১ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মন্তব্য করেছিলেন: কেন ইনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) কি শাস্ত্র দেখে বিধান হয়েছেন? আর ইনিও কি ঐ কথা বলেন। শাস্ত্র না পড়লে হবে না? উপস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভুল ধারণা সংশোধন করে দিয়ে বলেন: ওগো, আমি শুনেছি কত। (কথামৃত ২।২০।২)

ও প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বিদ্বান শ্রীরামকৃষ্ণের। শ্রীরামকৃষ্ণের এই শিক্ষাচিন্তার মধ্যে আমরা শুনতে পাই বৃদ্ধ মনুমহারাজের উক্তির প্রতিধ্বনি। তিনি বলেছেন: অজ্ঞেভ্যো গ্রন্থিনঃ শ্রেষ্ঠা গ্রন্থিভ্যো ধারিণো বরাঃ। ধারিভ্যো জ্ঞানিনঃ শ্রেষ্ঠা জ্ঞানিভ্যো ব্যবসায়িনঃ॥ (মনুসংহিতা ১২।১০৩) অর্থাৎ অজ্ঞ অপেক্ষা গ্রন্থের পাঠক শ্রেষ্ঠ; শুধুমাত্র শব্দার্থ পাঠকের চাইতে শ্রেষ্ঠ তিনি যিনি পঠিত বিষয় ধারণা করেছেন। তার চাইতেও শ্রেষ্ঠ তিনি যাঁর জ্ঞান হয়েছে। এবং এদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তিনিই যিনি জ্ঞানানুযায়ী কর্মানুষ্ঠান করেছেন। সমগ্র একটি গ্রন্থাগার স্মৃতিকোষে সঞ্চয়ের চাইতে পাঁচটিমাত্র সদ্ভাব জীবনে আয়ত্ত করার মূল্য অনেক বেশী। অধীত বিদ্যার সার্থকতা তখনই যখন তদনুযায়ী জীবন বিকশিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে পরা ও অপরা বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন। লৌকিক ও অলৌকিক উপায়ে বিদ্যা সংগ্রহ ও স্বকীয় করেছিলেন। বহুজনহিতায় সেই বিদ্যা তিনি আবিশ্ব বিতরণ করেছিলেন। তাই তিনি সর্বলোকপূজ্য জগদ্গুরু।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যার চর্চা ও চর্যাকে মানবজীবন-ভূমিতে যথানুপাতিক প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি ভারতগৌরব পরাবিদ্যাকে স্বমহিমায় পুনঃ-স্থাপন করেছিলেন। অপরাবিদ্যাকে দিয়েছিলেন যথাযোগ্য মর্যাদা। শ্রীরামকৃষ্ণের অর্জিত বিপুল বিদ্যারাশি তাঁর জীবনে বোঝা না হয়ে হয়েছিল বিভূষণ, তাঁর মাধুর্যমণ্ডিত চরিত্রের সুশোভন ঐশ্বর্য। শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যাবত্তায় ছিল না প্রখর উত্তাপ, সেখানে ছিল স্নিগ্ধ প্রশান্তি। সেই বিদ্যার বিমল কিরণের সংস্পর্শে শত শত জীবন-কুমুদ প্রস্ফুটিত হয়েছিল, বর্তমানেও হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও ইংরেজীভাষা

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

[পূর্বানুবৃত্তি]

"ইংলিশম্যানরা[১] যাকে স্বাধীন ইচ্ছা (Free Will)[২] বলে, সেই স্বাধীন ইচ্ছাবোধ তিনিই দিয়ে রাখেন।"— এই বাক্যবন্ধে ইংরেজী শব্দ 'ফ্রি উইল' যেভাবে স্বাধীন ইচ্ছায় রূপান্তরিত হয়েছে, তা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ইংরেজী ভাষা-অনুধাবন-শক্তির আশ্চর্য উদাহরণ। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য— "যারা তাঁকে লাভ করেছে, তারা জানে দেখতেই 'স্বাধীন ইচ্ছা'— বস্তুতঃ তিনিই যন্ত্রী, আমি যন্ত্র। তিনি ইঞ্জিনীয়ার[৩], আমি গাড়ী।" ঊনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারাকে তিনিও অস্বীকার করেননি, কিন্তু একটু অন্যভাবে। তাঁর মতে এই স্বাধীন ইচ্ছার অভিমান মানুষের যথেচ্ছাচার-নিবারণেরই প্রয়োজনে। নইলে, "পাপের আরও বৃদ্ধি হত।" (কথামৃত: ৪র্থ ভাগ: ৫ই জানুআরি ১৮৮৪) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্যবহৃত ইংরেজী শব্দগুলি অবলম্বনে সেকালের পাশ্চাত্যপ্রভাবিত কলকাতার নানা ছবি আমাদের মানসনেত্রে—

১ Englishman: ইংরেজ: এখানে ইংরেজী পণ্ডিত অর্থে ব্যবহৃত।

২ Free Will: ফ্রি উইল। ইংরেজী শব্দ দুটি অনুলেখক মহেন্দ্রনাথ কর্তৃক ব্যবহৃত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রয়োগ নয়।

৩ Engineer

উদ্ভাসিত হতে পারে, যার সঙ্গে আজকের কলকাতারও অনেকখানি যোগ। প্রথমেই ধরুন, সেকালের ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক আন্দোলনে মুখরিত কলকাতায় অজস্র বক্তৃতার আয়োজন; লেকচার (lecture) দেওয়ার দিকে সেকালের শিক্ষিত সমাজের প্রবল ঝোঁক। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা (বিশেষভাবে তাঁরই সামনে দেওয়া) শ্রীরামকৃষ্ণদেব আগ্রহভরে শুনেছিলেন। কিন্তু যথার্থ বক্তৃতা যে ঐশ্বরিক প্রেরণাতেই সম্ভব, এ বিষয়ে তিনি নানাভাবেই অভিমত ব্যক্ত করে গেছেন। তাই বক্তৃতা বা লেকচারের দিকে সেকালের শিক্ষাভিমানীদের অতিমাত্রায় ঝোঁকের প্রতি তাঁর সমালোচনা আজকের দিনের বক্তাদেরও স্মরণীয়।

কথামৃতকার তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনের দ্বিতীয় দিনটিতে (কথামৃত: ১ম ভাগ : ১৮৮২—ফেব্রুআরির শেষের দিকে) এ বিষয়ে একটি আলাদা বিভাগই করেছেন – লেকচার (lecture) ও শ্রীরামকৃষ্ণ। কথা উঠেছিল সাকার-নিরাকারে বিশ্বাস নিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রশ্ন— "আচ্ছা তোমার সাকারে বিশ্বাস, না নিরাকারে?" মাষ্টার —"আজ্ঞা নিরাকার এইটি আমার ভাল লাগে।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব শুনে অনুমোদন করলেন এবং সেই সঙ্গে বললেন - "তবে এ বুদ্ধি করো না যে এইটি কেবল সত্য, আর সব মিথ্যা। এইটি জেনো যে, নিরাকারও সত্য, সাকারও সত্য।"... তখনকার ব্রাহ্ম পরিবেশের প্রভাবে শিক্ষাভিমানী মাষ্টার মশাই দুটিই সত্য একথা সহজে মানতে পারলেন না। মাটির প্রতিমা কেমন করে সত্য হবে? শুনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন, "মাটি কেন গো! চিন্ময়ী প্রতিমা।" একথার অর্থ অনুধাবন করা মাষ্টার মশাইয়ের পক্ষে তখনই সম্ভব হয়নি। স্বভাবসারল্যে বলে ফেলেছিলেন— "আচ্ছা যারা মাটির প্রতিমা পূজা করে, তাদের ত বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নয়, আর প্রতিমার সম্মুখে ঈশ্বরের উদ্দেশে পূজা করো, মাটিকে পূজা করা উচিত নয়।" এর পরের অংশটুকুরই নাম লেকচার ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া) "তোমাদের কলকাতার লোকের ওই এক। কেবল লেকচার দেওয়া আর বুঝিয়ে দেওয়া। আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নাই, তুমি বুঝাবার কে? যাঁর জগৎ তিনি বুঝাবেন।" এই প্রসঙ্গের শেষে মায়ের উদাহরণ দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যার পেটে যা সয় বা অধিকারীভেদে উপাসনায় বৈচিত্র্যের কথা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ ইঞ্জিনীয়ার বা যন্ত্রীকে মনে থাকে না বলেই আমরা বাক্যন্ত্রের ব্যবহারে সদা সমুদ্যত। কথার ইঞ্জিনে দম দিয়ে থাকার ফলই কথায় কথায় লেকচারের প্রবণতা।

কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা প্রসঙ্গেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঈশ্বরোপলব্ধির গভীরতা প্রসঙ্গে এই লেকচারের অসম্পূর্ণতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর ভাষায়—[শিবনাথ শাস্ত্রীর উদ্দেশ্যে] "হ্যাগা, তোমরা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য এত বর্ণনা কর কেন? আমি কেশব সেনকে ঐকথা বলেছিলাম। একদিন তারা সব ওখানে গিছিল। আমি বললুম, তোমরা কি রকম লেকচার দাও, আমি শুনবো। তা গঙ্গার ঘাটের চাঁদনীতে সভা হল, আর কেশব বলতে লাগল। বেশ বললে, আমার ভাব হয়ে গিছিল। পরে কেশবকে আমি বললুম, তুমি এগুলো এত বল কেন? —'হে ঈশ্বর, তুমি কি সুন্দর ফুল করিয়াছ, আকাশ করিয়াছ, তুমি তারা করিয়াছ, তুমি সমুদ্র করিয়াছ,' এই সব? যারা নিজে ঐশ্বর্য ভালবাসে তারা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বর্ণনা করতে ভালবাসে। ..."

(কথামৃত: ১ম: ২৮শে অক্টোবর ১৮৮২)

ঈশ্বরপ্রসঙ্গ যে অধিকারিভেদে করা প্রয়োজন, একথা তথাকথিত লেকচারদাতা বা বক্তার দল মনে রাখেন না। শশধর পণ্ডিতকে শ্রীরামকৃষ্ণ-

দেব সেকথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন — "হাজার লেকচার দাও বিষয়ী লোকদের কিছু করতে পারবে না। পাথরের দেওয়ালে কি পেরেক মারা যায়? ·· তোমার লেকচারে বিষয়ী লোকদের বড় কিছু হচ্ছে না। তবে তুমি ক্রমে ক্রমে জানতে পারবে।..."

সৎপ্রসঙ্গের তাৎপর্য একেবারে নিরর্থক হতে পারে না। শশধরপণ্ডিতের বক্তৃতায় অন্যদের যাই উপকার হোক না কেন, তাঁর নিজের আত্মচিন্তায় সহায়তা হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সিদ্ধান্ত— "আদেশ পেয়ে যদি কেউ লোকশিক্ষা দেয়" অথবা "চাপরাস" পায়, তাহলেই সে লোকশিক্ষার বা লেকচারের সার্থকতা।

(কথামৃত : ১ম : ২৫শে জুন ১৮৮৪)

আগে সাধনা, তপস্যা, তারপর তার প্রকাশ। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ বক্তৃতাই কেবল আত্মপ্রচার, আত্মচিন্তন নয়! আমেরিকায় বক্তৃতার ঝড় তুলতে তুলতে স্বামীজী কিন্তু অনুভব করেছিলেন, 'বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর।' তাঁর সব বাণীরই উৎস শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং! তাঁর যে কত বক্তৃতা তাই মানবজাতির জাগরণে অধ্যাত্ম চিন্তনের জন্য ধ্বনিত।

সেকালের নবীন প্রবীণ যে সব ইংরেজীনবীশ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে যাতায়াত করতেন, তাঁদের কথায় ফিলসফি (Philosophy) (দর্শন) আর সায়েন্স (Science) (বিজ্ঞান) শব্দ দুটি তিনি বহুবার শুনেছেন। পুথিপড়া বিদ্যা আর বস্তুগত জ্ঞান যে সীমাবদ্ধ সে কথা বারবার মনে করিয়ে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব শিক্ষাভিমানীদের তথাকথিত পাণ্ডিত্যের অহমিকা দূর করতে সর্বদা সচেষ্ট।

বুদ্ধিগত পাণ্ডিত্য পরমসত্যের অনুভবের ক্ষেত্রে নিতান্ত অর্থহীন প্রলাপ মনে হয়। সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি জিজ্ঞাসুকে বলছেন, "তোমার ফিলজফিতে কেবল হিসাব কিতাব করে! কেবল বিচার করে। ওতে তাঁকে পাওয়া যায় না।" (কথামৃত : ৯র্থ : ২৫শে ফেব্রুআরি ১৮৮৩) শশধর পণ্ডিতকে একদিন মনে করিয়ে দিয়েছিলেন— "শুচ্ছের শাস্ত্র পড়লে কি হবে? ফ্যালাজফী!" (কথামৃত : ৩য় : ৩০শে জুন ১৮৮৪) শব্দবৈচিত্র্যে এই 'ফ্যালাজফী' শ্রীরামকৃষ্ণদেবের হাস্যভঙ্গিমার এক অনবদ্য প্রকাশ। উপলব্ধির অতল সমুদ্রে যারা ডুবেছে, তারা বিচার বিতর্কের পর্যায় ছাড়িয়ে যায়, তখনই সত্যের উদ্ভাসন!

ফিলসফি (দর্শন) বা সায়েন্স (বিজ্ঞান) প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি এসব ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রসঙ্গেই স্মরণীয়। বিচার-বিতর্কে বা বস্তুবিদ্যাতেই যাঁরা জ্ঞানের সার্থকতা খোঁজেন, তাঁদের প্রসঙ্গেই এ সব কথা প্রযোজ্য। কিন্তু বহিরঙ্গ বিজ্ঞান প্রসঙ্গে তাঁর বিভিন্ন সময়ের উক্তি আমাদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে দৃষ্টিকে আরো সজাগ করে। যেমন ধরুন, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আলাপচারীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্তব্য— "কেউ কেউ মনে করে শাস্ত্র না পড়লে, বই না পড়লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। তারা মনে করে, আগে জগতের বিষয়, জীবের বিষয় জানতে হয়, আগে সায়েন্স (Science) পড়তে হয়। তারা বলে ঈশ্বরের সৃষ্টি এ সব না বুঝলে ঈশ্বরকে জানা যায় না। তুমি কি বল? আগে সায়েন্স না আগে ঈশ্বর?

বঙ্কিম— হ্যা, আগে পাঁচটা জানতে হয়, জগতের বিষয়। একটু এ দিককার জ্ঞান না হ'লে, ঈশ্বর জানবো কেমন করে? আগে পড়াশুনা করে জানতে হয়!

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঐ তোমাদের এক। আগে ঈশ্বর, তারপর সৃষ্টি। তাঁকে লাভ করলে দরকার হয়ত সবই জানতে পারবে।" (কথামৃত : ৫ম : ৬ই ডিসেম্বর ১৮৮৪)

'দেবী চৌধুরাণী'র শিক্ষাব্যবস্থা মনে করলেই অনুশীলনতত্ত্বের প্রবক্তা বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু পরমজ্ঞানের পক্ষে এ জাতীয় বিদ্যাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আদৌ প্রয়োজনীয় মনে করেননি। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের মতো বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গেও তাঁর ঐ কথা—"শিবনাথ বলেছিল, বেশী ঈশ্বর চিন্তা করলে বেহেড* হয়ে যায়। বলে জগৎ-চৈতন্যকে চিন্তা করে অচৈতন্য হয়।···আর তোমার Science (সায়েন্স বা বিজ্ঞান)—এটা মিশলে ওটা হয়, ওটা মিশলে এটা হয়, ওগুলো চিন্তা করলে বরং বোধশূন্য হতে পারে, কেবল জড়গুলো ঘেঁটে!" (কথামৃত: ৩য়: ৩০শে অক্টোবর ১৮৮৫)

বস্তুবিজ্ঞান প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আর একটি মন্তব্য—"ঈশ্বরকে দেখা যায়; তপস্যা করলে তাঁর কৃপায় ঈশ্বর দর্শন হয়। ঋষিরা আত্মার সাক্ষাৎকার করেছিলেন। সায়েন্স-এ ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায় না, তাতে কেবল ওটার সঙ্গে এটা মিশলে এই হয়;···এই সব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসের খবর পাওয়া যায়। তাই এ বুদ্ধির দ্বারা এ সব বুঝা যায় না। সাধুসঙ্গ করতে হয়।"

(কথামৃত: ৪র্থ: ১৪শে মে ১৮৮৪)

বস্তুবিজ্ঞানের ঐক্যানুসন্ধান যখন আত্মোপলব্ধির ঐক্যানুভবে পূর্ণতা লাভ করে তখনই তা অধ্যাত্মবিজ্ঞানে পরিণত। তার আগে অবধি সায়েন্স বা বিজ্ঞান-চর্চা একান্ত বহিরঙ্গ সত্যসন্ধান। কথায় কথায় এ যুগে বিজ্ঞানের উপর নির্ভরতার বিপরীত মেরুতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'আগে ঈশ্বর লাভ, তার পরে সৃষ্টি'-জাতীয় সিদ্ধান্তের নিশ্চিত প্রত্যয় আমাদের বিজ্ঞান বা সায়েন্স সম্বন্ধে নতুন করে ভাবায়। বিশেষতঃ একালের বস্তুবাদীরা (মার্কসবাদীরা তাদের অন্যতম) যখন বস্তু থেকে চৈতন্যের উদ্ভবের কথা একেবারে নিশ্চিত হয়ে ঘোষণা করতে চান, তখন একথা মনে রাখেন যেন, এ মতবাদও বৈজ্ঞানিক প্রমাণসাপেক্ষ!

ঈশ্বরপ্রসঙ্গে অনভিজ্ঞদের এ বিষয়ে মতামত সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অপূর্ব পরিহাসের ভঙ্গীতে মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখদের সেই ইংরেজী লেখাপড়া-জানা খবরের কাগজের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী লোকটির গল্প শুনিয়েছিলেন, যে প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে বাড়ী ভেঙে পড়ার খবর বিশ্বাস করেনি, সে কথা খবরের কাগজে ছাপা হয়নি বলে। সেদিন অবতারপ্রসঙ্গে কথা উঠেছিল। মহেন্দ্রলাল কিছুতেই মানবেন না। ওদিকে গিরিশ ঘোষ প্রমুখেরা অবতারবাদে একান্ত বিশ্বাসী। এ বিতর্কের মাঝখানে হাসতে হাসতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন—"ঈশ্বর অবতার হতে পারেন, একথা যে ওঁর 'সায়েন্স'-এ নাই! তবে কেমন করে বিশ্বাস হয়?" (সকলের হাস্য)। (কথামৃত: ১ম: ২১শে অক্টোবর ১৮৮৫)

শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই ভাষায়—'সুতোর ব্যবসা না করলে সুতোর প্রভেদ বুঝা যায় না।'

ইংরেজীজানা অনেক লোকই শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের আকর্ষণে সমবেত হতেন। স্কুল কলেজের ছাত্রেরা তো ছিলই, আবার কেশবচন্দ্র প্রতাপ মজুমদার শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতিরাও ছিলেন। যাঁরা যথার্থ জিজ্ঞাসু, বিনয়ী, তাঁদের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসন্নতা নানা কথায় ফুটে উঠতো। কারু কারু পরিচয় দেবার সময় সে ক'টি পাস, সেকথা নিজেই উল্লেখ করতেন। কথামৃতসংকলয়িতা মহেন্দ্রনাথ নিজের নানা ছদ্ম

---

* বেহেড—আরবী বে ও ইংরেজী হেড্ (Head) শব্দের মিশ্রণে উৎপন্ন। বিকৃতমস্তিষ্ক অর্থে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত।

নামের মধ্যে 'মণি' নাম দিয়ে যেখানে যেখানে উল্লেখ করেছেন, তারই একজায়গায় রয়েছে— 'ঠাকুর তাঁহাকে কখন কখন ইংলিশম্যান (Englishman) বলিতেন।' (কথামৃত : ৩য় : ৯ই ডিসেম্বর ১৮৮৩)

ইংলিশম্যান এখানে ইংরেজীবিদ্যায় সুপণ্ডিত অর্থেই গ্রহণীয়। ইংলিশম্যানদের 'স্বাধীন ইচ্ছা'-মতবাদ স্মরণীয়। এক হিসাবে তা আধুনিক পাশ্চাত্যভাবাপন্ন মানুষদেরই প্রতীক। কিন্তু মহেন্দ্রনাথের প্রতি ইংলিশম্যান সম্বোধনের মধ্যে যে সস্নেহ প্রশ্রয় ও প্রশংসা রয়েছে, তা গুণগ্রাহী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাববৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। মহেন্দ্রনাথও আত্মবিশ্লেষণে লিখেছেন— "তিনি (মণি) কেশব ও অন্যান্য পণ্ডিতদের লেকচার শুনিতেন, ইংরাজী দর্শন ও বিজ্ঞান পড়িতে ভালবাসেন। কিন্তু ঠাকুরের কাছে আসা অবধি ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের গ্রন্থ ও ইংরাজী বা অন্য ভাষায় লেকচার তাঁহার আলুনি বোধ হইয়াছে।"

[ক্রমশঃ]

অহংবৃত্তি ও ইদংবৃত্তি এবং ব্রহ্মানুভূতির উপায়

শ্রীঅমূল্যপদ চট্টোপাধ্যায়

"অহংবৃত্তিরিদংবৃত্তিরিত্যন্তঃকরণং দ্বিধা।
বিজ্ঞানং স্যাদহংবৃত্তিরিদংবৃত্তির্মনো ভবেৎ॥
অহংপ্রত্যয়বীজত্বমিদংবৃত্তেরিতি স্ফুটম্।
অবিদিত্বা স্বমাত্মানং বাহ্যং বেত্তি ন তু ক্বচিৎ॥"

(পঞ্চদশী—চিত্রদীপ ১০।৭১ শ্লোঃ)

অর্থাৎ 'অহংবৃত্তি ও ইদংবৃত্তি ইত্যাকারে আমাদের অন্তঃকরণ দ্বিধা বিভক্ত। অহংবৃত্তি বিজ্ঞানাত্মা জীবকে এবং ইদংবৃত্তি মনকে বুঝায়। ইহা স্পষ্ট যে, অহংবৃত্তি ইদংবৃত্তির কারণ। এইজন্য অগ্রে অহংবৃত্তি দ্বারা লক্ষিত নিজ আত্মাকে না জানিয়া কেহ বাহ্য বস্তুকে জানিতে পারে না।' অর্থাৎ পূর্বে 'অহং' বা 'আমি' জ্ঞান না থাকিলে 'ইদং' বা 'এই' 'এট' রূপে বাহ্য বস্তুর জ্ঞান হয় না। সুতরাং 'ইদং' জ্ঞানগুলি 'অহং'জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। যেমন রজ্জুতে দৃষ্ট ভ্রান্তিসর্পটির রজ্জু ব্যতীত পৃথক্ সত্তা না থাকায় উহা মিথ্যা, সেইরূপ অহংজ্ঞান ব্যতীত 'ইদম্' বস্তুগুলির পৃথক্ সত্তা না থাকায় উহারা মিথ্যা এবং অহংজ্ঞানটিই এক ও সত্যবস্তু। এখন 'অহং'-এর মধ্যেও দুইটি অংশ আছে—একটি অহং-এর আকারভাগ, অপরটি জ্ঞানাংশ। 'আমি' মানেই তুমি, তিনি, ইহা, উহা প্রভৃতি বাহ্য বস্তু হইতে একটি পৃথক্ সীমাবদ্ধভাব—উহাই 'অহং'-এর আকার। জ্ঞানের কোন আকার নাই, উহা অহং-এর আকারভাগের সহিত অবিবেকবশতঃ যেন একাকার ভাব প্রাপ্ত হইয়া অহংজ্ঞানরূপে প্রকাশ পায়। যেমন গোল, চতুষ্কোণ প্রভৃতি লৌহে অনুপ্রবিষ্ট অগ্নি লৌহের গোল, চতুষ্কোণ প্রভৃতি আকারকে প্রকাশ করে, এইরূপে অহমাকারে অনুপ্রবিষ্ট জ্ঞানই অহং-এর আকারভাগকে প্রকাশ করে। অহং-এর আকার অংশটি জ্ঞানসত্তার অধীন বলিয়া উহাও মিথ্যা হইয়া পড়ে এবং জ্ঞানের দ্বারা আমরা আমাদের অহং বা আমিভাবকে জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে জানিতে পারি এবং সুষুপ্তিকালে উহার অভাবকেও জানিতে পারি বলিয়া উহাও (অহং-এর আকার অংশটিও) দৃশ্য 'ইদম্' কোঠায় পড়িয়া যায়। সুষুপ্তিভঙ্গে অহং-এর উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জগতের উদয় হয় এবং সুষুপ্তিকালে অহং-এর লয়ের সঙ্গে সঙ্গে জগতের লয় হয়, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ অনুভব করি।

সুতরাং অহংব্যতীত জগতের পৃথক্ সত্তা নাই—সুতরাং জগৎ মিথ্যা, অহং-এর আকারভাগও মিথ্যা, কিন্তু জ্ঞানভাগটি সত্য। যেমন সূর্য সব বস্তুকে প্রকাশ করিয়া সর্বদা একরূপ, এইরূপ যে জ্ঞানের দ্বারা আমরা সব জ্ঞেয়বস্তু জানিতে পারি, সেই জ্ঞানও ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সর্বকালে ও সর্ববস্তুতে একরূপ, অখণ্ড ও পূর্ণ। সুষুপ্তিকালে আমার নিকট জগৎ বাদ পড়ে বলিয়া এবং জগৎ জড়, দৃশ্য, পরিচ্ছিন্ন ও পরিবর্তনশীল বলিয়া মিথ্যা।

প্রঃ—সুষুপ্তিকালে আমার নিকট জগৎ না থাকিলেও অপরের নিকট তখন জগৎ থাকে, সুতরাং জগতের অভাব হয় না। জগতের অভাব দেখাইতে না পারিলে, জগৎকে কিরূপে মিথ্যা বলা যাইবে ?

উঃ—সুষুপ্তিকালে যে অপরে থাকে, তাহার প্রমাণ কি ? অপরে থাকে, ইহা তুমিই তো বলিতেছ, সুতরাং সেই অপরের অস্তিত্ব তোমার উপরই নির্ভর করিতেছে। অপরে বলিয়া তুমি যাহাদিগকে বলিতেছ, উহারা জগতেরই অন্তর্গত। তুমি সুষুপ্তিকালে জগতের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য জগতের অন্তর্গত ও উহার পক্ষপাতী সাক্ষীরূপ প্রমাণ গ্রহণ করিতেছ এবং অপর ব্যক্তিরূপ সেই সাক্ষিগণ জগতের পক্ষে মিথ্যা সাক্ষী দিয়া 'জগৎ সত্য' বলিয়া তোমাকে প্রতারিত করিতেছে। একটি দৃষ্টান্তদ্বারা বিষয়টি পরিষ্কার করিতেছি— মনে কর স্বপ্নে তুমি কাশী গিয়াছ এবং সেখানে পথ, ঘাট, মন্দিরাদি দেখিতেছ এবং তোমার ন্যায় অপর অনেক লোকও ঐ সকল দেখিতেছে। এখন তুমি জাগিয়া উঠিলে। তখনও কি তোমার মনে হইবে যে, স্বপ্নস্থ লোকগুলি এখনও কাশীর সেই পথ, ঘাট ও মন্দিরাদি দেখিতেছে এবং উহারা সত্য ? এইরূপ জগন্নিদ্রা হইতে সম্যক্ প্রবুদ্ধ হইলে তুমি বুঝিতে পারিবে যে, এক চৈতন্য বা জ্ঞানই অনাদি অজ্ঞানবশতঃ আমাদের নিকট জীব, জগৎ, ঈশ্বর, অহম্, ইদং, ভিতর, বাহির ইত্যাদিরূপে প্রতীত হন। সম্যক্ জ্ঞানের উদয়ে এক নির্গুণব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকেন, অপর কেহ থাকে না।

প্রঃ—কিন্তু সুষুপ্তিকালে তো ইদংভাব যেমন থাকে না তেমনই অহংভাবও থাকে না।

উঃ—বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে—
"ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টেবিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ।"
(৪।৩।২৩)

অর্থাৎ '(সুষুপ্তিকালে) দ্রষ্টার দৃষ্টির লোপ হয় না, যেহেতু উহা অবিনাশী'। আমাদের দুইটি আমি-ভাব আছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় একটি কাঁচা আমি (অহংকার), অপরটি পাকা আমি (সাক্ষী আমি)। সুষুপ্তিকালে কাঁচা আমির অভাব হইলেও পাকা আমির অভাব হয় না। সুষুপ্তিকালে যদি আমার একান্ত অভাব হইত, তবে জাগিয়া উঠিয়া কিরূপে বলিতে পারে যে, আমার সুষুপ্তি হইয়াছিল ? সুষুপ্তিকালের সকল বস্তুর এবং অহং-এর অভাবকে কে প্রত্যক্ষ করিল ? উহাই পাকা আমি। আরও সুষুপ্তিতে আমার ছেদ পড়িলে জাগিয়া উঠিয়া একটা নূতন আমির অনুভব হইত। কিন্তু তাহা হয় না—সুষুপ্তির পূর্বে যে আমি, জাগিয়া উঠিয়াও সেই আমি। ইহা হইতে বুঝা যায়, সুষুপ্তকালে 'অহং'-এর একেবারে নাশ হয় না। ঐকালে কাঁচা আমি পাকা আমির মধ্যে লীনভাবে অবস্থান করে। যখন চৈতন্য-স্বরূপ সাক্ষী আত্মা অহং এর আকারের মধ্যে স্থিত হইয়া অবিবেকবশতঃ ঐ আকারের সহিত যেন একাকারভাব প্রাপ্ত হন, তখন তিনি কাঁচা আমি বা বদ্ধ জীব হইয়া পড়েন এবং বিবেক-দ্বারা যখন অহং-এর ঐ আকার হইতে নিজেকে পৃথক্ বলিয়া বুঝিতে পারেন এবং চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে স্বীয় স্বরূপ মনে করেন, তখন তিনি মুক্ত

শিব। এই প্রকার জ্ঞানী পুরুষ ব্যবহারকালে যে, 'আমি' শব্দের প্রয়োগ করেন, উহা পাকা আমি; অজ্ঞব্যক্তি অহং-এর আকারের সহিত অবিবিক্তভাবে যে অহংশব্দের প্রয়োগ করে, উহা 'কাঁচা' আমি। এই কাঁচা আমিই দেহাদিতে অভিমানবশতঃ সংসারে সুখদুঃখ ভোগ করে - "পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব)। এই কাঁচা ও পাকা আমির স্বরূপটি একটি দৃষ্টান্তদ্বারা পরিষ্কার করিতেছি। ধর, আকাশের সূর্য পাকা আমি এবং আয়নায় প্রতিফলিত সূর্য কাঁচা আমি। আয়না নড়িলে আয়নার সূর্যকে বা আয়না হইতে নির্গত সূর্যালোককে চঞ্চল দেখা যাইবে, তজ্জন্য আকাশের সূর্য নড়িবে না বা চঞ্চল হইবে না। এইরূপ বুদ্ধিরূপ আয়নায় প্রতিফলিত কাঁচা আমি বুদ্ধির চঞ্চলতায় বা স্থিরত্বে নিজেকে চঞ্চল, স্থির, দুঃখী, সুখী ইত্যাদি মনে করিবে, কিন্তু পাকা আমি কাঁচা আমির চঞ্চলতা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া আকাশস্থ সূর্যের ন্যায় নির্বিকারভাবে অবস্থান করিবে। এই পাকা আমি বা সাক্ষী আমি কখনও বাদ পড়ে না—পাকা আমি সানাই-এর পোঁ ধরিয়া আছে, কাঁচা আমি উহার উপর সুরের রংবেরং তুলিতেছে। জীবনের মূল সুর ঐ পাকা আমির দিকে সর্বদা দৃষ্টি না রাখিলে জীবন-সঙ্গীত মধুময় হয় না।

প্রঃ- আপনার বাক্য হইতে বুঝিলাম যে, সুষুপ্তিকালেও পাকা আমির বা সাক্ষী আমির অভাব হয় না। কিন্তু যখন দেহের নাশ হইবে, তখনও যে উহা থাকিবে, তাহার প্রমাণ কি ?

উঃ— দেশ ও কালের মধ্যে কোন বস্তুর আবির্ভাবকে উহার জন্ম এবং উহার তিরোধানকে উহার নাশ বলে। কিন্তু দেশ ও কালকে প্রমাণ করিবার জন্য জ্ঞানস্বরূপ আত্মার থাকা চাই। সুষুপ্তিকালে যে দেশ ও কাল থাকে না ও কাঁচা আমির অভাব হয়, উহা সাক্ষী আমি প্রকাশ করি। দেশ ও কালের জ্ঞান সাক্ষী আমির উপর নির্ভর করে বলিয়া সাক্ষী আমি বা জ্ঞানস্বরূপ আত্মা দেশকালের অধীন নয়। সেইজন্য সাক্ষী আমি বা পাকা আমি মৃত্যুর কবলের বাহিরে অবস্থিত বা উহার কখনও অভাব হয় না। "নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" (গীতা ২।১৬)। অর্থাৎ সতের অভাব হয় না।'

প্রঃ— এক্ষণে কিরূপে আমি আমার আত্মস্বরূপকে ব্রহ্মরূপে অনুভব করিয়া মৃত্যুর কবল হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি, উহা আমাকে অনুগ্রহপূর্বক প্রদর্শন করুন।

উঃ— পূর্বোক্ত সাক্ষী আমিটি কখনও বাদ পড়ে না বলিয়া উহাই আমার প্রকৃত স্বরূপ। সাক্ষী আমিটি 'অহং' এই আকারের মধ্য দিয়া উহার সহিত যেন একাকার ভাব প্রাপ্ত হইয়া ব্যষ্টি অহংরূপে বা বদ্ধ জীবরূপে প্রতীত হইতেছে। বস্তুতঃ অহংভাবটি শুদ্ধ হইলেও বহু বস্তুবিষয়ক ইদং-ভাবের সম্পর্কে আসিয়া উহা যেন অশুদ্ধ হইয়া পড়ে। বহু বস্তুরূপে প্রতীত ইদং কোঠার বস্তুসকলের কতকগুলির সহিত আমরা —'আমার দেহ, আমার ইন্দ্রিয় আমার মন, আমার বুদ্ধি, আমার স্ত্রী, আমার বিত্ত, আমার ক্ষেত্র, আমার গৃহ' ইত্যাদি প্রকার 'আমার' সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সংসারজালে জড়াইয়া পড়ি এবং যাহাদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করি, উহাদের সুখে, দুঃখে, ক্ষয়ে, বৃদ্ধিতে আমরা নিজেদের সুখ, দুঃখ, ক্ষয় ও বৃদ্ধি অনুভব করি—ইহাই আমাদের বন্ধন। 'আমি' ও 'আমার' ভাব ত্যাগ করিতে পারিলেই মুক্তি। তাই শাস্ত্র বলেন— 'মমেতি বধ্যতে জন্তুর্নির্মমেতি বিমুচ্যতে' (উত্তরগীতা ২।৪৮ অর্থাৎ জীব 'আমার' 'আমার' ভাব দ্বারা বদ্ধ হয়, 'আমার' 'আমার' ভাব ত্যাগ করিলে মুক্ত হয়। সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য জন্মিবার পূর্বে কাহারও সহিত আমার

সম্পর্ক ছিল না এবং মৃত্যুর পর কাহারও সহিত সম্পর্ক থাকিবে না। এই সম্বন্ধ আমিই পাতাই,—স্ত্রী, পুত্র, গৃহাদি আমাকে বলে না, আমাদিগকে 'আমার' 'আমার' বল—আমাকেই উহা ছাড়িতে হইবে।

যত যত আমাদের অহংভাব ইদংভাব হইতে মুক্ত হয়, ততই উহা শুদ্ধ, সূক্ষ্ম ও ব্যাপক হইয়া পড়ে। যেমন আকাশে সূর্যালোককে স্পষ্টরূপে দেখা যায় না, উহা ঘর, বাড়ী, বৃক্ষাদিতে প্রতিফলিত হইয়া স্পষ্ট হয়, এইরূপ 'ইদং'এর অপেক্ষায় 'অহং'ও স্পষ্ট হয়—'ইদং'এর ভাবনা 'অহং'কে বাঁচাইয়া রাখে। 'ইদং' ভাবনার নাশে 'অহং' ক্রমশঃ শুদ্ধ হয় এবং অধিষ্ঠান-প্রধান সেই শুদ্ধ অহংবৃত্তিতে 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র অনুভব হয়। সুতরাং মনে যখনই কোন চিন্তার উদয় হইবে, তখনই উহাকে উৎপত্তিমুখে ধরিয়া ত্যাগ করিবার অভ্যাস করা উচিত। যেমন কোন বদ্ধ ঘরের দীপালোক যদি কোন ছিদ্রপথে বাহিরে আসে, তবে ঐ আলোককে ছিদ্রপথে একটি অঙ্গুলি দ্বারা রুদ্ধ করা যায়, বহু দূরে ঐ আলোক ছড়াইয়া পড়িলে সমগ্র দেহ দ্বারা উহাকে রুদ্ধ করা যায় না, এইরূপ প্রত্যেক চিন্তাকে উৎপত্তিমুখে ধরিয়া উহাকে ত্যাগ করিতে পারিলে ঐ চিন্তাকে সহজেই ত্যাগ করা যায়, কিন্তু ঐ চিন্তা বহুদূরে বিস্তার লাভ করিলে উহাকে ত্যাগ করা কঠিন হয়। সুতরাং প্রত্যেক চিন্তাকে উৎপত্তিমুখে ধরিয়া উহাকে ত্যাগ করার অভ্যাস একটি উৎকৃষ্ট সাধনা এবং ঐ অভ্যাস যত বাড়ান যায়, ততই মঙ্গল। প্রথম প্রথম চিন্তাসকলকে উৎপত্তিমুখে অনেক ক্ষেত্রে ধরাও যাইবে না এবং ভুল হইবে, তথাপি সজাগ হইয়া ঐ অভ্যাস বাড়াইতে হইবে। ইহাতে ক্রমশঃ মন আত্মসংস্থ হইবে এবং লয়প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে 'ইদং'এর 'নেতি' 'নেতি' রূপে নিবৃত্তির চেষ্টা দ্বারা 'ত্বং' পদার্থের শোধন হইয়া জীবের স্বরূপ কূটস্থচৈতন্যের সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু উহাই সম্যক্ জ্ঞান নয়। কূটস্থচৈতন্য-স্বরূপ স্বীয় আত্মাকে বাহিরে ও ভিতরে সর্বত্র অনুভব করিতে পারাই ব্রহ্মজ্ঞান। অন্তরে যে চৈতন্য 'অহং' 'অহং' রূপে স্ফুরিত হয়, উহাই বাহিরে আসিয়া 'ইদং' 'ইদং' রূপে প্রতীত হইতেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে 'অহং'সত্তা ব্যতীত 'ইদম্'-এর পৃথক্ সত্তা নাই—সর্বত্রই নিজেকে দেখিবার অভ্যাস বাড়াইতে থাক—'যত্ত্বং পশ্যসি তত্রৈক-স্ত্বমেব প্রতিভাসসে। কিং পৃথক্ ভাসতে স্বর্ণাৎ কটকাঙ্গদনূপুরম্॥' (অষ্টাবক্র-সংহিতা, ১৫।১৪) অর্থাৎ 'যাহা তুমি দেখিতেছ, উহাতে একমাত্র তুমিই প্রতিভাসিত হইতেছ। স্বর্ণ হইতে কি বলয়, অঙ্গদ, নূপুর প্রভৃতির পৃথক্ সত্তা আছে?' এইরূপে নিজেকে যত সর্বব্যাপক দেখার ভাব বাড়ান যাইবে, ততই 'তৎ' পদার্থের শোধন হইবে। পরে 'তত্ত্বমসি' বাক্যের 'অসি' পদ দ্বারা 'ত্বং'ই 'তৎ' এবং 'তৎ'ই 'ত্বং' এইরূপে উভয় পদের লক্ষ্যার্থের একরসতা করিতে হইবে। পঞ্চদশী বলিয়াছেন—

"ইত্থমন্যোন্যতাদাত্ম্য-প্রতিপত্তির্যদা ভবেৎ।
অব্রহ্মত্বং ত্বমর্থস্য ব্যাবর্তেত তদৈব হি॥
তদর্থস্য চ পারোক্ষ্যং যদ্যেবং কিং ততঃ শৃণু।
পূর্ণানন্দৈকরূপেণ প্রত্যগ্বোধোঽবতিষ্ঠতে॥"
(তৃপ্তিদীপ ৭৭।৭৮)

অর্থাৎ, "এইরূপে 'ত্বং' ও 'তৎ' পদার্থের একরসত্ব হইলে 'ত্বং' পদার্থের (জীবের) অব্রহ্মত্ব এবং 'তৎ' পদার্থের (ব্রহ্মের) পরোক্ষত্বের নিবৃত্তি হইবে। তখন প্রত্যগাত্মা জীব পূর্ণ আনন্দমাত্র-স্বরূপে অবস্থান করিবে।" এইরূপে যিনি নিজ আত্মার সর্বাত্মক ভাব সর্বত্র অনুভব করেন, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত পুরুষ বলা হয়। জীবন্মুক্ত পুরুষ সদানন্দী—"যস্তানন্দো নিরন্তরঃ"
(বিবেকচূড়ামণি—৪৩৩ শ্লোঃ)

পঞ্চদশী বলেন—"বহিরন্তর্বিভাগোঽয়ং দেহাপেক্ষো ন সাক্ষিণি। বিষয়া বাহ্যদেশস্থা দেহস্যান্তরহংকৃতিঃ ॥" (নাটকদীপ ১৬ শ্লোঃ) অর্থাৎ 'এই যে বাহির-ভিতর ভাব (ইদম্ ও অহংবিভাগ) ইহা দেহের অপেক্ষায়ই করা হয়, সাক্ষীতে ঐ বিভাগ নাই। দেহের বাহিরে অবস্থিত বস্তুসকলকে বিষয় এবং দেহের ভিতরে স্থিত অন্তঃকরণবৃত্তিকে অহংকার বলে।' 'সাক্ষী' আত্মার লক্ষ্যার্থে বা নির্গুণব্রহ্মে দেশকাল না থাকায় তাঁহাতে সাক্ষী, সাক্ষ্য, ভিতর, বাহির, অহম্, ইদম্ ইত্যাদি ভাব নাই। তাঁহাকে সর্বব্যাপকও বলা যায় না—"সর্বদেশপ্রকল্পত্বোৎ সর্বগত্বং ন তু স্বতঃ ॥" (নাটকদীপ ২১ শ্লোঃ) অর্থাৎ 'সর্বদেশের কল্পনা হইতেই তাঁহার সর্বগত্ব সিদ্ধ হয়। তত্ত্বতঃ দেশ না থাকায় তাঁহার সর্বব্যাপকত্বও সিদ্ধ হয় না।' এই নির্গুণব্রহ্মই অদ্বৈত-বেদান্তের চরম লক্ষ্য হইলেও, উহা বাক্যমনের অগোচর, অচিন্ত্য, অব্যবহার্য ইত্যাদি। এই নির্গুণব্রহ্মকে ব্যবহাররাজ্যে আনিতে গেলে ব্রহ্মে শক্তি স্বীকারের প্রয়োজন হয়, তখন তিনি ঈশ্বর হইয়া পড়েন। এই ঈশ্বরই সর্বব্যাপক, নিত্যজ্ঞানী ও নিত্যমুক্ত। ইঁহারই কৃপায় জীবের জ্ঞান হয়। নির্গুণব্রহ্মে জ্ঞান-অজ্ঞান, বন্ধন-মুক্তির প্রসঙ্গ নাই। সেইজন্য নির্গুণব্রহ্ম বা নির্গুণজ্ঞান অজ্ঞানের নাশক নয়। ঈশ্বর নিত্যজ্ঞানী ও নিত্যমুক্ত। ঈশ্বর মায়িক ব্যবহার বশতঃ সগুণ ও কর্তারূপে প্রতীত হইলেও তত্ত্বতঃ স্বীয় নির্গুণস্বরূপ হইতে চ্যুত নহেন এবং সব করিয়াও কিছুই করেন না—জীবন্মুক্তের স্থিতিও ঐ প্রকার। তিনি ঈশ্বরসদৃশ হইলেও শক্তির দিক দিয়া বিচার করিলে ঈশ্বরের সমান নহেন। জীবন্মুক্ত পুরুষ বিদেহমুক্তির পূর্বপর্যন্ত ঈশ্বরকোটিতে বিরাজ করেন এবং স্বীয় শুদ্ধবুদ্ধিদ্বারা আপনার নির্গুণস্বরূপকেই সত্য বলিয়া মনে করেন—তিনি জানেন জ্ঞান, অজ্ঞান, জীবত্ব, ঈশ্বরত্ব, বন্ধন, মুক্তি ইত্যাদি সমস্ত বিকল্প ঈশ্বরের মায়ারাজ্যে অবস্থিত। নির্গুণব্রহ্মে ঐ সকল কোন বিকল্প নাই। জ্ঞানের পর সম্যক্ প্রারব্ধক্ষয়ে জীবন্মুক্তের নির্গুণব্রহ্ম-স্বরূপে স্থিতি। ইহাই বিদেহমুক্তি বা ব্রহ্মনির্বাণ। এই অবস্থা বাক্যমনের অগোচর। "তদা স্তিমিতগম্ভীরং ন তেজো ন তমস্ততম্। অনাখ্যমনভিব্যক্তং সৎ কিঞ্চিদবশিষ্যতে" ॥ (যোগবাশিষ্ঠ ও পঞ্চদশী ২।৪০) অর্থাৎ 'সেই অবস্থা স্তিমিত (চুপচাপ) ও গম্ভীর, উহা তেজ নয়, অন্ধকার নয়, উহার নাম নাই, উহাকে ব্যক্তও করা যায় না—বলিতে গেলে বলিতে হয়, একমাত্র সৎই অবশিষ্ট থাকেন।'

বালকস্বভাব বিবেকানন্দ

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

আমেরিকায় স্বামীজীর বহু বর্ণনার মধ্যে নিম্নলিখিত বিবরণী আকর্ষণীয় :— ···The Hindu monks have no monasteries, no property. ...According to him, the monks were not required to do penance or to worship. They were in short, minor deities to the Hindu people ; but yet the Swami was wonderfully unspoiled and simple, claiming nothing for himself, playing with the children, twirling a stick

between his fingers with laughing skill and glee at their inability to equal him...
— হিন্দু সন্ন্যাসীদের কোনও মঠ বা সম্পত্তি নেই। ··তাঁর মতে সন্ন্যাসীদের প্রায়শ্চিত্ত বা উপাসনা করার প্রয়োজন নেই। সংক্ষেপে তাঁরা হিন্দুদের নিকট ছোটখাট দেবতা; কিন্তু তবুও স্বামীজী আশ্চর্য রকম সরল ও অবিকৃত। নিজের জন্য কিছুই চান না, শিশুদের সাথে খেলা করেন —তাঁর আঙুলের মাঝে একটি লাঠি হাসিমুখে নিপুণভাবে ঘুরিয়ে এবং তাদের তাঁর সমকক্ষ হবার অক্ষমতায় থাকেন আনন্দে ভরপুর···।

স্বামীজীর পোষা ছাগল 'মটরু'র গলায় ঘুঙুর বেঁধে 'মটরু'র সাথে মঠের ময়দানে বালকের ন্যায় দৌড়ের পাল্লা দেওয়া, সে এক অভিনব দৃশ্য। আবার 'মটরু' হঠাৎ মরে যাওয়ায় দুঃখ করা— 'আমি যাদের ভালবাসি তারাই মরে যায়।' মটরুর ভালবাসা যেন প্রমাণ ক'রে দেয়:— The love of the Hindu, goes further than the love of Christian, for that stops at man, but the religion of Buddha goes on towards the beasts of the field and every creeping thing that has life.— হিন্দুদের ভালবাসা, খ্রীষ্টানদের ভালবাসা হতেও সুদূর-প্রসারী, কারণ শেষোক্ত মানুষেই আবদ্ধ, কিন্তু বুদ্ধের ধর্ম মাঠের পশু এবং প্রত্যেক লতানে বস্তু যার প্রাণ আছে, সেই পর্যন্ত প্রসারিত।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ ২৬শে জুলাই হেল-ভগিনীদের স্বামীজী যে চিঠি লেখেন, তা তাঁর বালক স্বভাবের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এ যেন অন্তর্দৃষ্টির উচ্চ ভূমি থেকে মুহূর্তে শিশুর সারল্যের সমভূমিতে অপ্রত্যাশিত অবতরণ।

'দেখো, আমার চিঠিগুলো যেন নিজেদের বাইরে না যায়।···দেখছ তো সমাজে আমি কি রকম বেড়ে চলেছি। এ-সব ভগিনী জিনির শিক্ষার ফলে। খেলা দৌড়ঝাঁপে সে ধুরন্ধর, মিনিটে ৫০০ হিসাবে ইতর ভাষা ব্যবহারে দক্ষ, কথার তোড়ে অদ্বিতীয়, ধর্মের বড় ধার ধারে না, তবে ঐ যা একটু আধটু। · দূর, ছাই, সব ভুলে যাই, সমুদ্রে স্নান করছি ডুবে ডুবে মাছের মতো। বেশ লাগছে। 'প্রান্তর মাঝে' (dans la plaine' ইত্যাদি কি ছাইভস্ম গানটি হ্যারিয়েট আমায় শিখিয়েছিল, জাহান্নামে যাক! এক ফরাসী পণ্ডিত আমার অদ্ভুত অনুবাদ শুনে হেসে কুটি-পাটি। এই রকম ক'রে তোমরা আমায় ফরাসী শিখিয়েছিলে, বেকুফের দল। তোমরা ডাঙায়-তোলা মাছের মতো খাবি খাচ্ছো তো? বেশ হয়েছে গরমে ভাজা হ'য়ে যাচ্ছ। আঃ, এখানে কেমন সুন্দর ঠাণ্ডা। যখন ভাবি তোমরা চারজনে গরমে ভাজা পোড়া সেদ্ধ হ'য়ে যাচ্ছ, আর আমি এখানে কি তোফা ঠাণ্ডা উপভোগ করছি, তখন আমার আনন্দ শত গুণ বেড়ে যায়। আ হা হা হা।'

আমেরিকায় তাঁর বিরুদ্ধপক্ষও বলতো:

'He is a marvellous combination of sweetness and irresistible force, verily a child and a prophet in one.'— তিনি মাধুর্য ও দুর্নিবার শক্তির আশ্চর্য সম্মেলন সত্যই একাধারে শিশু ও প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ।

দ্বিতীয়বার আমেরিকা সফরের সময় স্বামীজী কয়েকজন ছাত্রকে এক পুলের উপর দাঁড়িয়ে কতকগুলি ভাসমান ডিমের খোলা গুলি করতে দেখেন। খোলাগুলি সুতো দিয়ে পর পর বাঁধা এবং একদিকে এক টুকরো কাঠ ও অপরদিকে এক টুকরো পাথর বেঁধে মোটামুটি নোঙরের কাজ করা হচ্ছিল। একটি ছোট নদীতে ঐগুলি ভাসিয়ে দিয়ে স্রোতের টানে ভেসে যাবার মুখে গুলি ক'রে লক্ষ্যভেদে তাদের অকৃতকার্য হ'তে দেখে স্বামীজী হাসতে থাকেন। দলের একজন তা লক্ষ্য করে

এবং তাঁকে লক্ষ্যভেদে আহ্বান করে— বিষয়টি সহজ নয় তাও বুঝিয়ে দেয়। স্বামীজী তাদের হাত থেকে বন্দুক নিয়ে পর পর প্রায় এক ডজন ডিমের খোলা অব্যর্থ সন্ধানে গুলিবিদ্ধ করেন। এতে তারা সবাই স্তম্ভিত হয় এবং মনে করে যে, স্বামীজী বন্দুক ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত ও পাকা তাঁর নিশানা। কিন্তু স্বামীজী তাদের বুঝিয়ে দেন যে, তিনি জীবনে সেই প্রথম বন্দুক ব্যবহার করলেন। তাঁর কৃতকার্যতার হেতু মনের একাগ্রতা। এই ঘটনাটিতে একাধারে যোগী ও বালকের রূপ ফুটে উঠেছে।

এইভাবে যুগপৎ মহান্ ধর্মগুরু ও পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ভাবে তাঁর স্বল্পপরিসর জীবন জগৎ-কল্যাণে নিয়োজিত ক'রে স্বামীজী বিশ্বরঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। মহাসমাধির দুই বৎসর আগে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন :

'আমি এখন সেই আগেকার বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক্ হ'য়ে শুনত আর বিভোর হ'য়ে যেত। ঐ বালক-ভাবটাই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি— আর কাজকর্ম, পরোপকার ইত্যাদি যা-কিছু করা গেছে তা ঐ প্রকৃতিরই উপরে কিছুকালের জন্ম আরোপিত একটা উপাধি মাত্র।'

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুলাই এক পত্রে শ্রীযুক্ত লেগেটকে স্বামীজী লেখেন : 'Brotherhood or playmatehood— a school of romping children let out to play in this playground of the world !'— আমাদের পরস্পরের ভ্রাতৃভাবই বলো আর খেলার সাথীর ভাবই বলো, এ যেন জগতের ক্রীড়াক্ষেত্রে একদল স্কুলের ছেলেকে খেলতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, আর সকলে চেঁচামেচি ক'রে খেলা করছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় নরেন ধরাধামে দুদিন হেসে খেলে মায়ের শান্তিময় ক্রোড়ে চির-নিদ্রিত হ'লেন— শিশুর নিশ্চিন্ত আশ্রয় মাতৃক্রোড়ে।

যে তীর্থ আজও আছে পঞ্চনদের দেশে

শ্রীনির্মলচন্দ্র ঘোষ

[পূর্বানুবৃত্তি]

সুজনপুর তিরা

লোকানুন্মদয়ন্ শ্রুতিং মুখরয়ন্
ক্ষৌণীরুহান্ হর্ষয়ন্
শৈলান্ বিদ্রবয়ন্ মৃগান্ বিবশয়ন্
গোবৃন্দমানন্দয়ন্।
গোপান্ সম্ভ্রময়ন্ মুনীন্ মুকুলয়ন্
সপ্তস্বরান্ জৃম্ভয়ন্
ওঙ্কারার্থমুদীরয়ন্ বিজয়তে
বংশীনিনাদঃ শিশোঃ॥[1]

[ত্রিলোক উন্মদ করিয়া, বেদ মুখরিত করিয়া, বৃক্ষরাজি হর্ষিত করিয়া, পর্বত বিগলিত করিয়া, পশুদিগকে বিবশ করিয়া, গোবৃন্দকে আনন্দিত করিয়া, গোপগণকে সম্ভ্রমযুক্ত করিয়া, মুনিগণকে পুলকিত করিয়া, সপ্তস্বর মূর্ছিত করিয়া এবং ওঙ্কারের অর্থ নিনাদিত করিয়া শিশুর বংশীধ্বনি জয়যুক্ত হউক।]

কাঙ্গরা শহরের প্রায় বত্রিশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে, পুণ্যতোয়া ব্যাস নদীর তীরে সুজন-

---

১ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতস্তোত্রম্, ৫ম শ্লোক।

পুর তিরা একটি শহর।

শহরে পাঁচটি পুরাতন মন্দির আছে। তাদের মধ্যে মুরলীমনোহর, গৌরীশঙ্কর ও নর্মদেশ্বরের মন্দির উল্লেখযোগ্য।

মুরলীমনোহরের মন্দির ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। গৌরীশঙ্করের মন্দির রাজা সংসার চাঁদ ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী করেছিলেন। নর্মদেশ্বর শিবের মন্দির ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী হয়।

শালি

হিমাচল প্রদেশে মহাশু জেলায়, সিমলার অনতিদূরে মোসোব্রা নামক স্থানের নিকটে শালি একটি পুণ্যগিরি। সমুদ্রের উপরিতল (sea level) হতে পর্বতশৃঙ্গ প্রায় ৯৬২৩´ ফুট উচ্চে অবস্থিত।

শালি পর্বতের চূড়ায় মা-কালীর একটি প্রাচীন মন্দির আছে।

কালীং রত্ননিবদ্ধনূপুরলসৎপাদাম্বুজামিষ্টদাং
কাঞ্চীরত্নদুকূলহারললিতাং নীলাং ত্রিনেত্রোজ্জ্বলাম্।
শূলাদ্যস্ত্রসহস্রমণ্ডিতভুজামূর্ধ্বক্ত্রপীনস্তনীং
আবদ্ধামৃতরশ্মিরত্নমুকুটাং বন্দে মহেশপ্রিয়াম্॥

[যাঁহার চরণকমলে রত্নখচিত নূপুর ঝঙ্কৃত, যিনি ইচ্ছা পূরণ করেন, যিনি মেখলা, রত্নময় ক্ষৌমবস্ত্র ও হারে সুশোভিতা, যিনি নীলবর্ণা, যাঁহার উজ্জ্বল ত্রিনেত্র, যাঁহার হস্ত শূলাদি সহস্র অস্ত্রে শোভিত, যিনি উর্ধ্বমুখী ও পীনস্তনযুক্তা এবং যিনি অমৃত-বর্ষিকিরণযুক্ত রত্নমুকুটধারিণী, সেই শিবপ্রিয়া কালীকে আমি বন্দনা করি।]

শুনি

সিমলা হতে প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে, পুণ্যতোয়া শতদ্রু নদীর তীরে শুনি অবস্থিত। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্বে শুনি ভজ্জি রাজ্যের রাজধানী ছিল। শুনির আর এক নাম শিউনি।[১]

শুনিতে শিবের একটি প্রাচীন মন্দির আছে। শিবমন্দিরের পাশে কয়েকটি গন্ধক মিশ্রিত গরম জলের ফোয়ারা আছে।

শুনির আশেপাশে নয়টি প্রাচীন মন্দির আছে।

প্রাতর্ভজামি শিবমেকমনন্তমাদ্যং
বেদান্তবেদ্যমনঘং পুরুষং মহান্তম্।
নামাদিভেদরহিতং ষড়্ভাবশূন্যং
সংসাররোগহরমৌষধমদ্বিতীয়ম্॥[২]

[প্রাতঃকালে আমি অদ্বিতীয়, অনন্ত, আদিপুরুষ, বেদান্তবেদ্য, নিরঞ্জন, নামাদি-ভেদরহিত, জন্মাদিষড়্ভাবশূন্য, সংসাররোগের বিনাশক অদ্বিতীয় ঔষধস্বরূপ, মহান্ পুরুষ শিবকে ভজনা করি।]

দেওবুহা

হিমাচল প্রদেশের মহাশু জেলায় দেওবুহা অবস্থিত। দেওবুহা সিমলা হতে সড়ক পথে প্রায় আশী কিলোমিটার দূরে, উত্তর-পূর্ব দিকে, হিমালয়ের উপরে। ভারতের স্বাধীনতার পূর্বে দেওবুহা জুব্বল নামক পার্বত্য রাজ্যের রাজধানী ছিল।

দেওবুহার শিবমন্দির প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। ঠাকুরের নাম মহাশু অর্থাৎ মহাশিব। উচ্চারণের দোষে মহাশিব হতে মহাশিউ, তারপর মহাশু হয়েছে। জেলার নামও তদ্রূপ।

দেওবুহার ত্রিশ কিলোমিটার পশ্চিমে গিরিগঙ্গা তীর্থ। অনতিদূরে পুণ্যতোয়া গিরিনদীর উৎস। গিরিগঙ্গায় পুষ্করিণীর তীরে লক্ষ্মী-নারায়ণ, শিব ও গঙ্গার প্রাচীন মন্দির আছে। একটি কালী মন্দিরও আছে। [ক্রমশঃ]

---

১ পূর্বে বোধ হয় নাম ছিল শিবনিবাস। ক্রমে উচ্চারণের দোষে হয় শিবনি, তারপর শিউনি এবং শুনি।

২ শিবপ্রাতঃস্মরণস্তোত্রম্, তৃতীয় শ্লোক।

সমালোচনা

শ্রীম-দর্শন (চতুর্দশ ভাগ)—(১৩৮১) স্বামী নিত্যাত্মানন্দ। পরিবেশক: জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। পৃষ্ঠা ২৯৫, মূল্য বার টাকা।

উঁচু কথায় নয়, আচরণেই মানুষের সত্যকার রূপটি জীবন্ত হয়ে ওঠে, আর সে যা শেখাতে চায়, তা তার জীবনচর্যায় চিত্রিত হয়ে প্রাণবন্ত ও প্রভাবশালী হয়। শ্রীম-দর্শনে ধর্ম-আদর্শের এই সজীব মূর্তিটি শ্রীম-চরিত্রকে অবলম্বন করে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদপ্রান্তে যে ভাব-ঐশ্বর্য ও ঈশ্বরময়তা শ্রীম লাভ করেছিলেন তার প্রকাশ তাঁর অমৃতনিস্যন্দী কথাতেই নয়, তাঁর ক্ষুদ্র বৃহৎ আচরণের মাধ্যমেও জীবন্ত সত্যে রূপায়িত হয়েছে। মন্দিরে— দেবদর্শন কালে, পথে—ভেকধারী সন্ন্যাসীর কাছে, ট্রেনে— সাধারণ যাত্রীর সান্নিধ্যে, একান্তে— সমুদ্রসৈকতে অনন্তস্পর্শে শ্রীম'র যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে কালি-কলমের আঁচড়ে, তাতে পুষ্পের সৌরভের মত আমোদিত উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছেন আর একজন, তিনি 'অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বাক্যমনের অতীত পরব্রহ্মের সাকার নররূপ শ্রীরামকৃষ্ণ'।

মহাবাক্যের পৌনঃপুনিক আবৃত্তির মতন শ্রীম'র কণ্ঠে উদ্গীত হয়েছে সে-কথা যা, ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন: 'পুরীতে আমিই জগন্নাথ'। তাই মাষ্টার মহাশয়কে ঠাকুর পুরীতে কয়েক-বার পাঠিয়েছিলেন। শ্রীম বলেছেন: "আবার আমাকেই বলেছিলেন, 'ক্রাইস্ট, চৈতন্য, আর আমি এক'। নরেন্দ্রকে বলেছিলেন, 'এই যে লোক 'গৌর' 'গৌর' করে, সে গৌর আমি'। ঠাকুর অনেকবার বলেছেন, 'আমি আর চৈতন্য এক'।

"তাই পুরীতে নিজে যেতেন না। বলেছিলেন, 'পুরী গেলে শরীর চলে যাবে ঐ (চৈতন্যদেবের) উচ্চ মহাভাবে'। মানে, পূর্ব স্মৃতি স্মরণ হবে। উহা এ শরীর ধারণ করতে পারবে না। গয়াতেও যান নাই ঐ জন্যে।' বলতেন, 'শরীর চলে যাবে'। ওখান থেকে এসেছিলেন কি না।" [পৃঃ ৮০]

গ্রন্থখানিতে পুরীর তীর্থমাহাত্ম্য, তীর্থের দর্শনীয় স্থানগুলির বর্ণনা, ঐতিহাসিক আলোচনা থেকে সুরু করে গভীর অধ্যাত্ম-তত্ত্ব ও ব্যবহার-বিজ্ঞান পর্যন্ত অপূর্বভাবে পরিবেশিত হয়েছে।

২১টি অধ্যায়ের মধ্যে দশম অধ্যায়টি 'দেবত্বের সন্ধানে – ক্রাইস্ট ও রামকৃষ্ণ' তুলনামূলক ধর্মীয় আলোচনার এক সার্থক নিদর্শন হয়ে থাকবে। শ্রীরামকৃষ্ণভাব যেমন সার্বজনীন তেমনি শ্রীম'র সার্বজনীন উদার সপ্রেম আলোচনায় 'চৈতন্যদেবের লীলাভূমি পুরী' 'বকুলতলে ব্রহ্ম হরিদাস' 'গির্জায় ও সিদ্ধাশ্রমে' প্রভৃতি অধ্যায়ে নানাভাবাদর্শ ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্মানুমোদিত তীর্থগুলি এবং তাদের ইষ্টদেবতা অখণ্ড ঐক্যে বিধৃত হয়ে গেছে।

গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় শ্রীমকে ঈশ্বরকোটি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। লীলাপ্রসঙ্গাদি প্রামাণ্য গ্রন্থের বর্ণনার সঙ্গে এর সামঞ্জস্য হয় না।

পরিশেষে, পরিশিষ্টে সংযোজিত স্মৃতিকথাটি খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়েছে, কিন্তু লেখকের নাম দিলে পাঠকের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হত। আমরা এই অমূল্য গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব

বেলুড় মঠ : গত ২রা ফেব্রুআরি ১৯৭৫, ১৯শে মাঘ ১৩৮১, রবিবার, পুণ্য কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে আচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের ১১৩তম জন্মতিথি মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। মঙ্গলারতি বেদপাঠ পূজা হোম ভজন ও উচ্চাঙ্গ সংগীত শ্রীশ্রীচণ্ডীপারায়ণ কালীকীর্তন এবং আলোচনা-সভা উৎসবের অঙ্গ ছিল। প্রভাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে ছাত্র- ও ভক্ত-গণ শ্রীশ্রীঠাকুর মা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ মঠ প্রদক্ষিণ করে। মধ্যাহ্নে প্রায় বিশ হাজার নর-নারীকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় শ্রীভূপেন চক্রবর্তী কর্তৃক উদ্বোধন-সংগীতের পর পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র (ইংরাজীতে), ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ও সভাপতি স্বামী গম্ভীরানন্দ (বাংলায়) সুচিন্তিত ভাষণের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।*

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র বলেন : শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসি-মণ্ডলীর সামনে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে কিছু বলা প্রগল্‌ভতা বলে মনে করি। তবু আমার মতো সাধারণ মানুষের কাছে স্বামীজী যেভাবে প্রতিভাত হয়েছেন, সে-সম্বন্ধে কিছু বলতে চেষ্টা করবো।

আমাদের কাছে বিবেকানন্দ শুধু একটি নাম-মাত্র নন। বিবেকানন্দ একটি ত্রিধা-বিভক্ত আন্দোলন বা জাগৃতির প্রতীক—(১) আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে মিলন-সূত্রে গ্রথিত সুগভীর স্বদেশ-প্রেমের প্রতীক, (২) ভারতীয় সংস্কৃতির মহান উত্তরাধিকার সম্পর্কে যথার্থ সচেতনতার প্রতীক এবং (৩) হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষ যে আধ্যাত্মিকতা প্রচার করে এসেছে, তারও প্রতীক।

এদেশে বৃটিশ রাজত্বের সবচেয়ে অন্ধকারময় যুগে, যখন বুদ্ধিজীবীদের একটি বৃহৎ অংশ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির চাকচিক্যে মোহমুগ্ধ, তখন বিবেকানন্দের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। শুধু বুদ্ধিজীবীদের বা সাধারণ ভক্তদের নয়—যুবকদের ও ছাত্রদেরও তিনি সাহসের সঙ্গে আহ্বান করে স্বদেশমন্ত্র শোনালেন : "ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ ; আর বল দিন-রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর'।"

তাঁর এই আহ্বানবাণী সেদিন যেমন প্রাসঙ্গিক ছিল, আজকের এই স্বার্থপরতা এবং ক্ষমতাপ্রিয়তার দিনে তার চেয়ে অনেক বেশী প্রাসঙ্গিক। আজ খুব কম লোকেই বলতে পারেন—'ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, ভারতবাসী আমার ভাই।' সুতরাং বিবেকানন্দ যে স্বদেশপ্রেম আমাদের ভেতর অনুপ্রবিষ্ট করতে চেয়েছিলেন, তার দ্বারা আজ আমাদের অনুপ্রাণিত হতে হবে।

আগেই বলেছি, স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম

---

* ভাষণ তিনটি শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত ও শ্রীসমীরকুমার রায় কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত। অনুলিখিত ভাষণগুলি সংক্ষেপিত আকারে মুদ্রিত। প্রথম ভাষণটি মূল ইংরেজী হইতে অনূদিত।—সঃ

আন্তর্জাতিকতা-সমন্বিত ছিল। এর মূলে রয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। যে উদার বিশ্বজনীন ভাব মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, ধর্মে ধর্মে কোনও ভেদ করে না, তা তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। সুতরাং বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেমকে এই পরিপ্রেক্ষিতেই বুঝতে হবে। এইটি হ'ল প্রথম কথা।

দ্বিতীয়তঃ, স্বামীজী ছিলেন ভারতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারে দৃঢ় বিশ্বাসী। এবিষয়ে তিনি শুধু এদেশেই বলেননি, পাশ্চাত্য দেশে গিয়েও বারংবার বলেছেন যে, শুধু বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিদ্যা নিয়ে থাকলে হবে না—ভারতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে, নতুবা ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, ওদেশে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রচার করার চেয়ে ভারতীয় সংস্কৃতিকেই তিনি বিশেষভাবে প্রচার করেছেন আর এদেশেও তিনি বলেছেন, ভারতবাসীরা যদি তাদের আধ্যাত্মিক কৃষ্টিকে উপেক্ষা করে তো বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

তৃতীয়তঃ, বিবেকানন্দ ছিলেন যথার্থ আধ্যাত্মিকতার প্রতীক। এই আধ্যাত্মিকতা কি, তা জানতে হবে তাঁরই বাণী থেকে। তিনি বৈদান্তিক ছিলেন—কেবল ধর্মের ক্ষেত্রে নয়—ব্যবহারের ক্ষেত্রেও। তিনি নিজেকে 'সোশ্যালিস্ট' বলেছিলেন। বস্তুতঃ তিনিই ছিলেন ভারতের প্রথম 'সোশ্যালিস্ট'। কিন্তু তিনি সমাজতন্ত্রবাদে পৌঁছেছিলেন, পাশ্চাত্যের জড়বাদের মাধ্যমে নয়—প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে। এর প্রমাণস্বরূপ আমি তাঁর রচনা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তিনি বলেছিলেন, আমরা পৃথিবীর যাবতীয় পুস্তক পড়ে ফেলতে পারি, কিন্তু তবু ধর্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি কথাও না বুঝতে পারি। মন্দির, গীর্জা, পুঁথিপত্র—এসব ধর্মের 'কিণ্ডারগার্টেন' মাত্র। ধর্ম হচ্ছে অনুভূতি—নিজেকে আত্মা বলে জানা; এই অনুভূতি তিনি জাগতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ ক'রে বলেছিলেন: বহুরূপে যে বিরাট আমাদের সামনে রয়েছেন তাঁকে উপাসনা না করে আর কোন্ ঈশ্বরের উপাসনা আমরা করবো! রামেশ্বর মন্দিরে তিনি যে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতেই তাঁর অধ্যাত্ম-দর্শন সামগ্রিকভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। গত বৎসর কন্যাকুমারী থেকে রামেশ্বরে গিয়ে দেখলাম মন্দিরের প্রধান ফটকে একটি প্রস্তর-ফলকে তাঁর সেই কথাগুলি উৎকীর্ণ রয়েছে—ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ ঐ ফলকটির আবরণ উন্মোচন করেন ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ সালে। সংক্ষেপে তাঁর কথাগুলি হচ্ছে:

'ধর্ম অনুরাগে—বাহ্য অনুষ্ঠানে নহে। হৃদয়ের পবিত্র ও অকপট প্রেমেই ধর্ম। যদি দেহ মন শুদ্ধ না হয়, তবে মন্দিরে গিয়া শিব-পূজা করা বৃথা। যাহাদের দেহ মন পবিত্র, শিব তাহাদেরই কথা শুনেন।... সবচেয়ে বড় পাপ স্বার্থপরতা আগে নিজের ভাবনা ভাবা।... কেহ ধার্মিক কি অধার্মিক পরীক্ষা করিতে হইলে, দেখিতে হইবে, সে ব্যক্তি কতদূর নিঃস্বার্থ। যে অধিক নিঃস্বার্থ, সে-ই অধিক ধার্মিক। সে-ই শিবের সামীপ্য লাভ করে।'

বন্ধুগণ, যদি আমরা বিবেকানন্দকে গ্রহণ করতে চাই, তাহলে আমাদের দ্বিমুখী অভিযান চালাতে হবে—একদিকে ভারতবাসীর অন্তর্নিহিত ধর্মপ্রবণতাকে প্রাচীন শিক্ষাদীক্ষাসহায়ে সার্থক রূপ দিতে হবে, আত্মার স্বরূপকে জানতে হবে, ঈশ্বরে বিশ্বাস, যার অপর নাম আত্মবিশ্বাস তা জাগিয়ে তুলতে হবে; অন্যদিকে এই জাগ্রত অধ্যাত্মশক্তিকে আমাদের জাতির পুনর্গঠনের কাজে নিয়োগ করতে হবে। জাতির নেতৃবৃন্দ বারংবার বলছেন দেশ আজ চরিত্রের সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছে। ঐ দ্বিমুখী অভিযান ছাড়া এই সঙ্কট

থেকে মুক্তি পাবার আর অন্য কোনও উপায় নেই।

ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় বলেন :

স্বামী বিবেকানন্দের এই পুণ্য আবির্ভাবের মহালগ্নে তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। কালচক্রের আবর্তনে এ রকম এক একটি মহা মাহেন্দ্রক্ষণের মধ্য দিয়ে সুদূর আলোকোজ্জ্বল লোক থেকে এক একজন নেমে আসেন এই ধূলিধূসর ধরণীতে—আমাদের প্রাণে দিব্য আলোকের প্রেরণা তাঁরা জ্বালিয়ে দেন—মানবজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন করেন; নইলে গতানুগতিক এই কাল-স্রোত, মনে হয় যেন অর্থহীন উদ্দেশ্যবিহীন। কিন্তু যখন আমরা তাকিয়ে দেখি এমন একটা আবির্ভাবের দিকে, তখন আমাদের জীবনেরও তাৎপর্য আমরা যেন খুঁজে পাই।

আজ যাঁর আবির্ভাব-লগ্নে আমরা সমবেত হয়েছি, তিনি ছিলেন 'নরেন্দ্রনাথ'। নরের মধ্যে ইন্দ্র অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। তাঁর নামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে তাঁর জীবন ও বাণীর সার্থকতা। মনুষ্যত্ব লাভের—নরত্ব লাভের জন্যই তিনি যেন আমাদের জন্য উদ্বোধনী বাণী এনেছিলেন। নরেন্দ্রনাথকে বলতে পারি যুগ-মানব, যেমন যিনি তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তিনি ছিলেন যুগাবতার। আজকে বিশ্বময় মানুষের সবচেয়ে বড় সঙ্কট—মানবতার সঙ্কট। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ঘটেছে মানুষের, কিন্তু তা তাকে কেন্দ্রচ্যুত করছে। তাই স্বামীজী ভারতের প্রাচীন সাধনায়, ঐতিহ্যে—বেদান্তে উদ্‌ঘোষিত মানুষের মহিমা আমাদের কাছে প্রকট করেছেন।

তাঁর সন্ন্যাস নাম 'বিবেকানন্দ'। তারও গভীর তাৎপর্য রয়েছে। মানুষের মধ্যে সবচাইতে বড় জিনিস, যা তাকে সব কিছু থেকে আলাদা করে সেটি হ'ল বিবেক—বিবেচন। মানুষের আসল সত্তা কি, তা জড় জগৎ থেকে পৃথক্ করে বিবেচন করে আমাদের জানতে হবে। জগৎ জুড়ে তিনি ঘুরেছেন প্রাচীন বেদান্তের এই বিবেকবাণী নিয়ে —মানুষকে জাগ্রত করতে। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'।

পরাধীনতা নির্বীর্যতার কালে তিনি ঘুমন্ত দেশকে জাগিয়েছেন, সক্রিয় করেছেন। চেয়েছিলেন চতুর্দিকে রজোগুণের উদ্বোধন। যে রজোগুণ মানুষকে বিক্ষিপ্ত করে, ভোগের লাম্পট্যের মধ্যে টেনে নামায়—সে রজোগুণ নয়; নিশ্চেষ্টতা—তামসিকতাকে দেশ সাত্ত্বিকতা ব'লে ভুল করেছিল; তারই প্রতিকারকল্পে স্বামীজীর এই আহ্বান। কর্মহীনতার দ্বারা নৈষ্কর্ম্য হতে পারে না। স্বাধীনতার পরও সবচাইতে বড় অভাব এই কর্মের অভাব। তিনি চেয়েছিলেন : জাতির জীবনে, ব্যক্তির জীবনে আমরা সক্রিয় হই, সচেষ্ট হই—বেদান্তের ধারায়। বেদান্ত বলতে সাধারণতঃ সংসার-বিমুখ গিরিগুহাশ্রয়ীদের তত্ত্বালোচনাই বোঝায়—যেমন শাস্ত্রে বলা হয়েছে :

প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামাঃ।
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ॥

স্বামীজী সে-রকম বেদান্তের আদর্শ প্রচার করেননি।

স্বামীজী তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে দেখিয়ে গিয়েছেন যে, তিনি যুগ-মানব। পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় যে পরখ করা, যাচাই করার চেষ্টা—তার প্রতীক নরেন্দ্রনাথ। অনেকের দ্বারে পরমসত্যের সন্ধানে ঘুরেছেন—দেখেছেন, তাদের মধ্যে নেই কোন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি—নেই জাগ্রত জীবন্ত অনুভূতির ছাপ। তা পেলেন তিনি দক্ষিণেশ্বরে।

অপরোক্ষ অনুভবে-নির্বিকল্প চেতনায় তাঁর সত্তা প্রতিষ্ঠিত হল। ব্যুত্থিত হয়ে বুঝলেন তাঁর জীবনের তাৎপর্য। তাঁর জীবনের দুটি নীড়—একটি অমরনাথ, তুষারমৌলি শান্ত শিব-সত্তা;—

অন্যটি কন্যাকুমারী—সমুদ্রোর্মিমেখলা, অনন্ত কর্ম-কোলাহলময় শক্তির বিচ্ছুরণ—দুটি প্রান্ত, দুটি মেরু। এই হল ভারতবর্ষের সাধনার সার্থক রূপ— শিব-শক্তি; অনন্ত কর্মবৈচিত্র্যের মধ্যেও অপার স্থৈর্য— এই সাধনার কথাই বলে গেছেন তিনি।

স্বামীজী মানুষকে অভীঃ করতে চেয়েছিলেন। এই অভয়ের মন্ত্রই বেদান্তের মূল কথা,— 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন'। এই অভয়ই আত্মোপলব্ধির সার্থক লক্ষণ। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কখনও, কোন অবস্থাতেই ভয় নেই।—সম্প্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ। তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি॥ আত্মোপলব্ধি—আত্মানং বিদ্ধি—ভারতবর্ষ এটির ওপর সবচাইতে বেশী জোর দিয়েছেন—স্বামীজীও এই ভাব সহায়ে জাতির জীবনে এনেছেন আত্মবিশ্বাস।—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ।' আর 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্।' স্বামীজী বলেছেন: 'আমি হয়ত একটি ক্ষুদ্র বুদ্বুদ, তুমি হয়ত পর্বততুল্য উচ্চ তরঙ্গ, কিন্তু জানিও আমাদের উভয়ের পিছনে অনন্ত সমুদ্র রহিয়াছে— অনন্ত ঈশ্বর আমাদের সকল শক্তি ও বীর্যের ভাণ্ডারস্বরূপ। সুতরাং উভয়েই আমরা সেইখান হইতে যত ইচ্ছা শক্তি সংগ্রহ করিতে পারি। অতএব নিজের উপর বিশ্বাস করিও।' এই ভাব তিনি সমাজের প্রতি স্তরে ছড়াতে আহ্বান করেছেন। এ-ই আমাদের দায়—ঋষিঋণ। 'হে ভ্রাতৃবৃন্দ! আমাদের সকলকে এখন কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। এখন ঘুমাইবার সময় নয়। আমাদের কার্যের উপর ভারতের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে।' আজকের যুবকবৃন্দ যারা, তাদের যদি বুঝিয়ে দিতে পারতাম স্বামীজীর ঐ বাণী—'ঘুমিও না, কাজের মধ্যে প্রকাশিত হও,' তবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন সার্থক হোত।

ব্রাহ্মণ সর্বশ্রেষ্ঠ ব'লে ভারতে কেন পূজিত হতেন? মহর্ষি মনু বলেছেন, 'ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে'। স্বামীজী বলেছেন, এই পবিত্র ভারতভূমিতে যে কেউ জন্মগ্রহণ করে, তারই দায়—তারই জন্ম-গ্রহণের উদ্দেশ্য 'ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে'। ধর্মের সংরক্ষণের চেয়ে বড় কাজ আর কিছু নেই। সেই ব্রতকে উদ্‌যাপন করতে হবে, তবেই আমাদের জন্ম সার্থক হবে। স্বামীজী ছিলেন যুগনায়ক। যুগাবতারের পদপ্রান্তে বসে দিব্যদৃষ্টি লাভ করে মানুষের দুঃখ-বেদনা তাঁর অন্তরে স্পন্দিত হয়েছিল। তা দূর করবার রাস্তা তিনি দেখিয়ে গিয়েছেন প্রাচীন ভারতের সেই বেদান্তের বাণীর নব উন্মেষণের মাধ্যমে। আজ যদি আমরা সেই বাণীর এতটুকু সার্থকতা নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করতে পারি, অন্ততঃ সেই 'ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে'— সেই ধর্মের যে ভাণ্ডার তা রক্ষা করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে পারি, তাহলেই আমাদের স্বামীজীকে শ্রদ্ধা জানানো সার্থক হবে। আজ আপনাদের সকলের সঙ্গে মিলে সেই মহামানবের চরণে আমার অন্তরের ভক্তিপূর্ণ প্রণতি জানিয়ে আপনাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি।

স্বামী গম্ভীরানন্দ বলেন:

অনেকেই মনে করে থাকেন, স্বামীজীকে অবলম্বন করে যে বাণী বা বার্তা—যে কার্যধারা ভারতে প্রসারিত হয়েছে, তা হয়তো বা শ্রীরাম-কৃষ্ণের অনুমোদিত নয়, হয়তো বা ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে তার কোনপ্রকার যোগসূত্র নেই। সংক্ষেপে আমাদের আলোচনা করতে হবে, স্বামীজী যা কিছু করেছেন, সবই ঠাকুরের কথা অবলম্বনে—এটা ধ্রুব সত্য। প্রধান যে-তিনটি মৌলিক প্রশ্ন আমাদের মনে উঠে থাকে— (১) মনুষ্যত্বের অর্থ কি? (২) মানব-জীবনের উদ্দেশ্য কি? এবং (৩) সেই উদ্দেশ্যে পৌঁছবার উপায় কি?—সেই তিনটি প্রশ্নের উত্তর শ্রীরাম-

কৃষ্ণদেব ও স্বামীজী যা দিয়ে গেছেন তা আলোচনা করে, আমরা দেখাতে চেষ্টা করবো, স্বামীজী এমন কিছু করেননি, এমন কিছু বলেননি, এমন কিছু আমাদের করতে বলেননি যা শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা অনুমোদিত নয়—যার ভেতরে শ্রীরামকৃষ্ণের অনুপ্রেরণা নেই।

এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর নিয়ে নানা মতভেদ রয়েছে— ধর্মজগতে রয়েছে, বৈজ্ঞানিক জগতেও রয়েছে। সেমেটিক জাতির ধারণা, মানুষ পাপী ; বৌদ্ধরা বলেন, আমিত্ব একটা ভুয়ো জিনিস। আবার ডারউইন, মার্ক্স তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রচার করলেন। এই সমস্ত মতবাদের বিরুদ্ধে যেন দাঁড়ালেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁরা বল্লেন—মানুষ হচ্ছে পবিত্র। ঠাকুর বল্লেন সোজা কথায়— যারা নিজেদের 'পাপী' 'পাপী' বলে তারা পাপীই হয়ে যায়, মানুষের ভেতরে রয়েছেন স্বয়ং নারায়ণ। স্বামীজীও ঠিক তেমনি-ভাবেই তাঁরই কথা উপনিষদের উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন— শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ / আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। বিশ্বমানবকে আহ্বান করে জানালেন— তোমরা পাপী নও, তোমরা হচ্ছ অমৃতের পুত্র।

জীবনের উদ্দেশ্য কি ?— এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর সোজা কথায় বল্লেন—ভগবান-লাভ। স্বামীজীও তাই বল্লেন— ভগবান লাভের জন্যই আমরা এজগতে এসেছি। কথাটা হয়তো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অন্য জায়গায় অন্যভাবে বলেছেন— মুক্তি লাভ করা, মায়ার আবরণ থেকে মুক্ত হওয়াই হচ্ছে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। কোন রত্নকে হীরাকে মণিকে বা সোনাকে যদি দীর্ঘকাল ফেলে রাখা যায় তাহলে তাতে একটা ময়লা আবরণ পড়ে যায়—বুঝতে পারা যায় না, সেটা হীরা, কি মণি, কি সোনা। কিন্তু যদি তাকে পরিষ্কার করা হয় তাহলে আপনা থেকে তার ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায়। ঠাকুর ও স্বামীজী বল্লেন— সব মানুষই হচ্ছেন তেমনিভাবে আবৃত ব্রহ্ম—এই মায়া আবরণ সরিয়ে ফেলে স্বরূপকে প্রকাশিত করাই জীবনের উদ্দেশ্য। কী সেই মায়া ? আমি শূন্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছি, শূন্যের সঙ্গে কথা বলছি, আর শূন্যে মিলিয়ে যাবো— সে-জাতের মায়ার কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বলেননি, স্বামী বিবেকানন্দও বলেননি। তবে কি মায়া নেই ? আছে মায়া। স্বামীজী বল্লেন, প্রত্যেকের জীবনে সত্যকে মিথ্যা বলে জানা—এই যে জগৎ তাকে টুকরো টুকরো করে দেখা— ব্রহ্মসত্তাতিরিক্তরূপে দেখা— এরই নাম মায়া। ঠাকুর বল্লেন, জ্ঞানের পর আছে বিজ্ঞান— সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে দেখে, ছাদ যে ইট সুরকি ইত্যাদি জিনিস দিয়ে তৈরী, সিঁড়ি আর সমস্ত বাড়ীটাই সেই জিনিস দিয়েই তৈরী। তেমনি নেতি নেতি করে ওপরে উঠে তারপর সমাধি থেকে ফিরে এসে দেখা যায়, জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ — মায়া তখন অপসারিত। জ্ঞানের পর বিজ্ঞানীর অবস্থা।

তৃতীয় প্রশ্ন হ'ল—সেই সমাধিতে, সেই মুক্তিতে, সেই বিজ্ঞানীর অবস্থাতে পৌঁছবার উপায় কি ? আবার আসুন, আমরা দেখি এ-বিষয়ে ঠাকুরের সঙ্গে স্বামীজীর কোন তফাৎ আছে কিনা। এটি সুবিদিত কথা, স্বামীজী বলেছিলেন, নির্বিকল্পসমাধিতে নিমগ্ন হয়ে থাকবো ; আর ঠাকুর তাঁকে ধিক্কার দিয়ে বলে-ছিলেন— তোর এত হীনবুদ্ধি ! ভেবেছিলাম, তুই একটা প্রকাণ্ড বটগাছের মত বেড়ে উঠবি— তার তলায় সহস্র সহস্র নরনারী এসে বিশ্রাম লাভ করবে, শান্তি পাবে, আর তুই স্বার্থপরের মতো বলছিস, নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে থাকবি ! সুতরাং কাজে তাঁকে নামিয়েছিলেন কে ? স্বামীজী কি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জনসেবার কাজে নেমেছিলেন, না শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা অনুপ্রাণিত

হয়ে? সোজা কথার সোজা উত্তর। ঠাকুর বলেছিলেন—প্রতিমাতে যদি পূজো হয়, তাহলে মানুষে কেন পূজো হবে না। সেই কথা নিয়েছিলেন স্বামীজী, যখন তিনি শিবরূপে দর্শন করলেন সমস্ত মানুষকে এবং শিবজ্ঞানে জীবসেবার জন্য সকলকে উদ্বোধিত করলেন। জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায়রূপে তিনি এই যে কার্যকরী বেদান্তের প্রচার করলেন, তার পেছনে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণেরই ইঙ্গিত। স্বামীজীর সমাজ-সেবায় ছিল না কোন রাজনীতি, কোন সমাজ-নীতি—ছিল শুধু ধর্ম, নিছক ধর্ম। তিনি আমাদের তা-ই দিয়ে গেছেন। এই সমাজসেবা—সর্বভূতে নারায়ণকে দর্শন করে নারায়ণেরই সেবা—শ্রীরামকৃষ্ণ করেছিলেন দেওঘরের পথে।

এই সমাজসেবার কথাটা আপনারা একটু ভেবে দেখবেন। বাইবেলে আছে: Love thy neighbour as thyself. কথাটাকে লম্বা করে স্বামীজী উচ্চারণ করলেন: Love thy neighbour as thy self—as thy self! তোমার আত্মা, আর তোমার প্রতিবেশীর আত্মা তো আলাদা নয়; সুতরাং তোমার প্রতিবেশীকে তোমার আত্মা জেনে সেবা করবে। তুমিও অনভিব্যক্ত শিব, সেও অনভিব্যক্ত শিব। সেই শিবেরই পূজোর জন্যে আহ্বান জানালেন স্বামীজী।

ঠাকুর বলেছিলেন: তুই অপরের কী সেবা করবি? অপরের সেবার দ্বারা তুই নিজে কৃতার্থ হচ্ছিস; তোর নিজের মঙ্গল। স্বামীজীও তাই বলেছিলেন: আমরা জনসেবা যখন করতে যাই নারায়ণজ্ঞানেতে, তার দ্বারা সে কি উপকৃত হচ্ছে না হচ্ছে, তা জানি না, উপকৃত হই আমরা। পূজাদি করি কেন? প্রতিমার মঙ্গলের জন্য নয়। মঙ্গল হয় আমাদের।

উদ্দেশ্য লাভের এই পথ ভারতীয় সনাতন ধারা। ঠাকুর ও স্বামীজী এসে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন। আজ আমরা জানতে পারছি যে, এটি আমাদেরই হারানো ধন। স্মরণ করুন, ঠাকুরের দেওয়া সেই দৃষ্টান্ত—লণ্ঠন রয়েছে হাতে, তবু দুপুর রাতে অন্যের বাড়ী গিয়ে দরজা ঠেলাঠেলি—তামাক খাবে, আগুন চাই! আলো রয়েছে আমাদেরই হাতে, অথচ বৃথা ঘুরে বেড়াচ্ছি, ভাবছি পাশ্চাত্য জগৎ থেকে আমাদের আনতে হবে সমাজসেবার ধারণা! সর্বত্র ভগবান বিদ্যমান—এই অনুভূতির দ্বারাই প্রকৃত সাম্য স্থাপিত হবে—গড়েপিটে যে সাম্য করা হয় তা চিরকাল থাকে না। সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে স্থাপিত সাম্য সংঘর্ষের দ্বারাই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। সমাজ উন্নত হয় সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে নয়—ভালবাসার ভেতর দিয়ে। স্বামীজী বললেন: 'প্রেম প্রেম এই মাত্র ধন'। বললেন: 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' প্রেমের ভিতর দিয়ে মানবসমাজ একতাবদ্ধ হয়। আর এই প্রেম হচ্ছেন ব্রহ্ম। আনন্দময় হচ্ছেন ব্রহ্ম। 'রসো বৈ সঃ'—তিনি হচ্ছেন রসস্বরূপ। এই প্রেমকে অবলম্বন করে সমাজের উন্নতি হবে, মানুষ এক হবে। এই সংবাদ দিয়ে গেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর প্রতি কথার ভেতর, প্রতি কাজের ভেতর, প্রতি ইঙ্গিতের পিছনে রয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁকে মুখপাত্র করে, যেন নিজেরই হস্তস্বরূপ করে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মাধ্যমে সমাজের কল্যাণের জন্য সমস্ত ব্যবস্থাই করে গেছেন।

উৎসব

এলাহাবাদ রামকৃষ্ণ মঠে গত ২৮শে নভেম্বর ১৯৭৪, শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের ১০৭তম জন্মতিথি মঙ্গলারতি বৈদিক মন্ত্রাবৃত্তি পূজা হোম ভজন কালীকীর্তন জীবনী-আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। সকাল ৭টায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট, স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী, পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী যে-বাড়ীটিতে দীর্ঘ ৩০ বৎসর বাস করিয়াছিলেন পুনর্নির্মিত সেই বাড়ীটি উৎসর্গ করেন এবং সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর স্মৃতিকথা বলেন।

আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী ব্যোমানন্দ এলাহাবাদ আশ্রমের ইতিবৃত্ত বলিয়া স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন ও উক্ত ভবনটির নির্মাণকার্যে সাহায্যকারী, দাতা, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

পরদিন স্বামী অপূর্বানন্দজীর পরিচালনায় 'বিজ্ঞানানন্দ কুটীরে' রামনাম সঙ্কীর্তন হয়।

মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ৪.১.৭৫ তারিখে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর ১২২তম শুভ জন্মোৎসব বিশেষ পূজা পাঠ হোম ও ভজন-কীর্তনের মাধ্যমে যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী কৈলাসানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যজীবন বিশেষভাবে আলোচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি খড়্গপুর শহরের ইন্দা অঞ্চলে একটি আলোচনাচক্রে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে এবং আশ্রম-মন্দিরে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের জন্মতিথিতে মহারাজজীর পুণ্যজীবন ও অবদান সম্বন্ধে ভাষণ দেন। বহু ভক্ত নরনারী হাতে হাতে প্রসাদ পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার : গত ৪ঠা মাঘ ১৩৮১, ইংরাজী ১৮ই জানুআরি ১৯৭৫, শনিবার, শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর শুভ জন্মতিথি মঙ্গলারতি পূজা হোম শ্রীশ্রীচণ্ডীপারায়ণ ও ভজনাদির মাধ্যমে পালিত হয়। পূর্বাহ্নে স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ ও আলোচনা করেন। সমগ্র দিন হাতে হাতে প্রসাদ পান প্রায় দুই হাজার ভক্ত নর-নারী।

সন্ধ্যারতির পর উদ্বোধন কার্যালয়ের নূতন ভবনে প্রায় দুই শতাধিক ভক্তের এক সভায় আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ বলেন : 'রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহকারী সাধারণ সম্পাদক স্বামী ভূতেশানন্দজী পরম পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজীর কৃপাপ্রাপ্ত। আমাদের বিশেষ আগ্রহে ও অনুরোধে তিনি আজ এখানে সারদানন্দ মহারাজের স্মৃতিকথা কিছু কিছু বলবেন।

'আপনারা জানেন উদ্বোধন অফিস, আমাদের প্রকাশন বিভাগ ও মায়ের বাড়ীর সব কিছুরই মূলে স্বামী সারদানন্দজী। আজ তাঁর পুণ্য জন্মদিন। এই শুভ দিনে আমাদের এই নূতন হলটির নাম আমরা রাখছি— 'সারদানন্দ হল'। এর পর থেকে এটি 'সারদানন্দ হল' নামে পরিচিত হবে।'

শ্রীসুপ্রকাশ সাহার উদ্বোধন-সংগীতের পর স্বামী ভূতেশানন্দ পূজ্যপাদ সারদানন্দজীর স্মৃতি-চারণ করেন। স্মৃতিকথাটি চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

বিবিধ সংবাদ

আলিপুরদুয়ার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৩রা জানুআরি শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে মঙ্গলারতি, বিশেষ-পূজা 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ মাতৃসঙ্গীত হোম ইত্যাদি হয়। প্রায় পাঁচশত ভক্ত নরনারীকে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় কুচবিহারের শ্রীযোগেশচন্দ্র দাস মহাশয় কর্তৃক ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনালেখ্য প্রদর্শিত হয়।

কলিকাতায় গত ১লা জানুআরি ১৯৭৫ ৺হরেন্দ্র কুমার নাগ মহাশয়ের ভবনে কল্পতরু উৎসব সুচারুরূপে উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা ভোগ-রাগ, শ্রীরথীন ঘোষ ও তৎসম্প্রদায়ের লীলাকীর্তন এবং শ্রীজগবন্ধু চক্রবর্তী ও শ্রীমতী শান্তি চ্যাটার্জী কর্তৃক ভক্তিমূলক গান পরিবেশিত হইয়াছিল। কল্পতরু উৎসবের সার্থকতা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীশংকর প্রসাদ মিত্র ও শ্রীদিলীপকুমার সেনগুপ্ত (ডাইরেক্টর, অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও, কলিকাতা)। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পণ্ডিত মুরারীমোহন শাস্ত্রী।

চাঁদপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে কল্পতরু উৎসবে উপলক্ষ্যে ১লা জানুআরি ১৯৭৫, শ্রীশ্রীঠাকুরের, ২রা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ও ৩রা স্বামীজীর ষোড়শোপচারে পূজা হোম এবং জীবনী ও বাণী আলোচনা হয়। স্বামী অক্ষরানন্দ, স্বামী পরদেবানন্দ, সর্বশ্রী রাসমোহন চক্রবর্তী, নিকুঞ্জবিহারী গোস্বামী, পূর্ণেন্দুশেখর সেন এবং শ্রীযুক্তা সুহাসিনী দেবী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভায় ভাষণ দেন। ৩রা ধর্মসভায় বৌদ্ধ খ্রীষ্ট এবং ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে যথাক্রমে ধর্মরক্ষিত ভিক্ষু, মিঃ অরুণকুমার দেবনাথ, অধ্যাপক এ. বি. এম. ওয়ালীউল্লাহ এবং শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী (সভাপতি) ভাষণ দেন। ৮ঠা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর শুভ আবির্ভাবতিথি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। প্রত্যহ সহস্রাধিক ভক্ত নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ৪—৬ ই জানুআরি শ্রীগোপাল চন্দ্র ব্যানার্জীর পালা কীর্তনে বহু সহস্র শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

বারাসাত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে গত ২০শে পৌষ, ১৩৮১, হইতে পাঁচদিনব্যাপী পরম পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের জন্মতিথি-উৎসব বিবিধ ধর্মমূলক আনন্দানুষ্ঠানের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

জন্মতিথি দিবস প্রাতে বিশেষ পূজা শাস্ত্রপাঠ হয়; পূর্বাহ্নে শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত স্বামী শিবানন্দ মহারাজের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন এবং বারাসাত সরকারী বিদ্যালয়ে রক্ষিত মহাপুরুষজীর (বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ছাত্র তারকনাথের) প্রতিকৃতিতে স্বামী অমৃতত্বানন্দ মাল্যদান করিয়া বক্তৃতা দেন। মধ্যাহ্নে প্রসাদ বিতরণ, অপরাহ্নে শ্রীযামিনী চট্টোপাধ্যায় সম্প্রদায়ের সুরে কথামৃত, রামনাম-সংকীর্তন, শ্রীনিমাই ও কাশীনাথ দাস সম্প্রদায়ের শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতি আলেখ্য এবং সন্ধ্যায় মহাকালী সঙ্গীত সমাজ কর্তৃক কালীকীর্তন হয়। দ্বিতীয় দিন শ্রীচৈতন্য চক্রবর্তীর রামায়ণ গান এবং শ্রীঅতুল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত সহ 'হরগৌরীর পরিণয়'-কথকতা হয়। তৃতীয় দিন শ্রীঅনন্ত চট্টোপাধ্যায় সম্প্রদায় শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন-

আলেখ্য ও শ্রীকানাই বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাকীর্তন পরিবেশন করেন। চতুর্থ দিন রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ-মন্দির কর্তৃক 'ভক্ত প্রহ্লাদ'-ছায়া-কায়া নাট্য প্রদর্শিত হয়। পঞ্চম দিন প্রাতে কয়েক হাজার ভক্ত নরনারী ও বালক বালিকার এক বিরাট শোভাযাত্রা চারিটি সুসজ্জিত সিংহাসনে স্থাপিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীসারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী শিবানন্দের বৃহৎ প্রতিকৃতি বহন করিয়া সঙ্গীত, কীর্তন ও রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের বালকবৃন্দের 'ব্যাণ্ড পার্টি' সহ বারাসাত শহরের কয়েকটি প্রধান রাস্তা পরিক্রমা করে। মধ্যাহ্নে শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ হয়। অপরাহ্নে শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত কর্তৃক 'শিবানন্দ-বাণী' পাঠ ও ব্যাখ্যার পর ধর্মসভায় স্বামী কৈলাসানন্দ (সভাপতি), স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ ও শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু শ্রীশ্রীমহা-পুরুষজীর জীবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক শ্রোতৃ-বর্গের নিকট উপস্থাপিত করেন। সন্ধ্যায় শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় মাতৃ-সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং নিবাধুই সান্ধ্য সম্মিলনীর 'প্রেমের ঠাকুর—নদীয়া লীলা' অভিনীত হয়।

ভূপাল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ৪. ১. ৭৫ তারিখে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১২২তম জন্মতিথি সাড়ম্বরে পালিত হইয়াছে। মঙ্গলারতি, চণ্ডীপাঠ, মায়ের জীবনী আলোচনা, ভজন কীর্তন ও আরাত্রিকাদি হয়। প্রায় ২৫০ জন ভক্ত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা স্বামী পরানন্দ ও অন্যান্য বক্তাগণ মায়ের জীবনী ও বাণীর আলোচনা করেন।

রাউরকেলা শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ১লা জানুআরি শ্রীশ্রীঠাকুরের "কল্পতরু" উৎসব এবং ৪ঠা জানুআরি শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উৎসব সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়। স্বামী অকামানন্দ ধর্মসভায় ভাষণ দেন। পূজা হোম শাস্ত্রপাঠ এবং ভজন কীর্তনাদি উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। প্রায় ৩০০ ভক্ত নরনারী খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন।

পরলোকে কুন্তলিনী দাশগুপ্ত

বিগত ১লা পৌষ, ১৩৮১ (ইংরাজী ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭৪) রাত্রি ৭-৫৫ মিনিটে শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্যা কুন্তলিনী দাশগুপ্ত (শ্রীশ্রীমা, ঠাকুর ও স্বামীজীর জীবনীকার শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য শ্রীমানদাশংকর দাশগুপ্ত মহাশয়ের সহধর্মিণী) পূর্ণজ্ঞানে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য নাম উচ্চারণ করিতে করিতে মরদেহ ত্যাগ করিয়া পরমা জননীর অভয় পাদপদ্মে মিলিত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৪ বৎসর হইয়াছিল। ১৯১৮ সালে উদ্বোধনের বর্তমান বাড়ীতে মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মহামন্ত্র লাভ করেন। তদবধি তিনি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত নিত্য জপ ও ঠাকুরসেবায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিতেন। সংসারের শত কর্মের মধ্যেও স্নানান্তে কথামৃত পাঠ তাঁহার নিত্যকর্ম ছিল, নিতান্ত অসুস্থ অবস্থায়ও যতক্ষণ শরীরে বিন্দুমাত্র শক্তি ছিল, ইহার ব্যত্যয় কখনও হয় নাই। সাধু ভক্ত সেবায়ও তাঁহার গভীর প্রীতি ও আনন্দ ছিল। সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায়, নিরলস সেবাপরায়ণতায়, দয়াদাক্ষিণ্য ও স্নেহ-শীলতায়, দৃঢ় বিশ্বাস ও ঐকান্তিক নিষ্ঠায়, সাহস ও ধৈর্যপরায়ণতায় তিনি একটি বিশিষ্ট চরিত্রের অধিকারিণী ছিলেন।

আমরা তাঁহার দেহবিযুক্ত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

[পুনর্মুদ্রণ]

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ।] ১লা শ্রাবণ। (১৩০৬ সাল) [১৩শ সংখ্যা।]

অন্নচিন্তা

(বাবু প্রবোধ চন্দ্র দে।)

[পূর্বানুবৃত্তি]

আমরা ইহা অস্বীকার করি না যে, সেকাল অপেক্ষা একালের লোকে অধিকতর পরিশ্রম করে, অধিক পরিমাণে উপার্জ্জনও করে, কিন্তু তাহাতে কি থাকিয়া যায়? এক্ষণে প্রতিপদে সকল খরচই প্রায় চতুর্গুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আয় কখনই চতুর্গুণ হয় নাই। আর এক কথা— সংসারের সকল পুরুষ যদি উপার্জ্জনক্ষম হইত, মহিলাগণ যদি শিল্পী হইত, তাহা হইলেও বরং কথা ছিল! যে সংসারে একজন পুরুষ উপার্জ্জনক্ষম, তাহাকে আরও পাঁচটীকে প্রতিপালন করিতে হয়। বেকার ভ্রাতা, বৃদ্ধ পিতা মাতা, কুমারী বা বিধবা ভগ্নী, তাঁহাদিগের পুত্র কন্যা ইত্যাদিতে হিন্দু গৃহস্থের সংসার পরিপূর্ণ। সমাজে থাকিয়া ইহাদিগের মান-ইজ্জত সামাজিক পদ-মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া সুশৃঙ্খলে দিনাতিপাত করা আজকালের দিনে কত কঠিন, তাহা গৃহস্থ-লোক মাত্রেই অনবগত নহেন। ইহা সচরাচর দেখা গিয়া থাকে যে, উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির আয় কমিয়া গেলে, তাঁহার প্রধান কার্য্য, সংসারের পাচক বা পাচিকাকে বিদায় দিয়া সাশ্রয় করিবার চেষ্টা হয়, কিন্তু আমাদিগের মনে হয়, একটী পাচক বা পাচিকাকে বিদায় দিয়া একমাসে পাঁচ ছয় টাকার সাশ্রয়ের চেষ্টা করা অপেক্ষা যাহাতে নিজের এবং সংসারের অপরাপর ব্যক্তির চেষ্টায় আর্থিক আয় বৃদ্ধি হইতে পারে ও সাংসারিক সুশৃঙ্খলতা দ্বারা দুই পয়সা খরচ হ্রাস হইতে পারে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিলে তদপেক্ষা অধিক লাভ হয়। পাচক পাচিকা বা পরিচারিকার কার্য্যে গৃহিণী বা সংসারের অপর কোন মহিলাকে নিযুক্ত না করিয়া এমন অনেক কার্য্য আছে, যাহাতে তাঁহারা নিযুক্ত থাকিলে অনেক সাহায্য হইতে পারে।

বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর দোষেও দারিদ্র্যের অনেকটা সহায়তা হইতেছে, বলিতে হইবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীতে এরূপ কার্য্যকরী বন্দোবস্ত থাকা উচিত, ছাত্রদিগকে এরূপ কার্য্যকরী শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাহাতে তাহারা ভবিষ্যতে উপকার লাভ করিতে পারে। এক্ষণকার বিদ্যালয়সমূহে কেবল নানাবিধ ও কঠিন পুস্তকের তালিকার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। আজকাল নিম্নশ্রেণীর বালকগণকেও এত অধিকসংখ্যক পুস্তকাদি পাঠ করিতে হয় যে, তাহাতে প্রকৃত পড়াশুনাই হয় না—হওয়া সম্ভবও নহে। তাহা ব্যতীত অধিকাংশ পুস্তকই বাজে। এইরূপে অনর্থক কতকগুলো পুস্তক প্রবর্ত্তিত করিয়া কেবল যে সময় নষ্ট করা হয়, তাহা নহে,—ছাত্রদিগের শরীরও

ভগ্ন করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। এইরূপে অনর্থক সময় নষ্ট না করাইয়া কর্তৃপক্ষগণ যদি কার্য্যকরী শিক্ষাদ্বারা বালকগণের ভাবী ও সংসার বিচরণের পথ বিস্তৃত ও সহজ করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহারা দেশের প্রকৃত হিতকারী নামে পরিগণিত হইতে পারেন, সঙ্গে সঙ্গে সুকোমলপ্রাণ বালকগণও অতিরিক্ত পাঠনির্য্যাতন হইতে রক্ষা পায়। এক্ষণে বিদ্যালয়সমূহে যেরূপ নানাশাস্ত্রের বিদ্যা বালকদিগের গলাধঃকরণ করিতে হয়, পূর্ব্বে কিন্তু এরূপ ছিল না। বিদ্যামাত্রেই উচ্চ—শাস্ত্র মাত্রেই মান্য, কিন্তু এই ঘোর অন্নচিন্তার দিনে আপামর সাধারণের পক্ষে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইবার চেষ্টা না করা ভাল। যাহাদিগকে অন্নের জন্য চিন্তা করিতে হয় ও উপার্জ্জন করিতে হয়, তাহাদিগকে এরূভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত যে, সে শিক্ষা কার্য্যকালে উপকারে আসিতে পারে। যাহাদিগের কর্তৃপক্ষ বা অভিভাবকগণ স্ব স্ব বালকদিগকে উচ্চশিক্ষা দিতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক, তাঁহাদিগের পক্ষে সেই বালকদিগকে উচ্চশিক্ষার অনাবশ্যকীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির দ্বারা বিজড়িত ও বিড়ম্বিত করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করা নিতান্ত অদূরদর্শিতার কার্য্য। এই বিষয়ে অভিভাবক অপেক্ষা বিদ্যালয়ের এবং তদপেক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। যে বিদ্যা জগতের বা সংসারের কোন কার্য্যে না আইসে, অথবা আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই, সে বিদ্যার কোন মূল্য আছে কি না জানি না। পুস্তকলিখিত পাঠ কণ্ঠস্থ করিলেই যদি বিদ্বান হওয়া যায়, তাহা হইলে রামা মুদীর দোকানের সেই পুরাতন ময়না পক্ষীটাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দিলেও কোন ক্ষতি নাই। শতকরা দশজন ছাত্র যদি বি-এ, বা বি-এল, পরীক্ষা দেয়, তাহার জন্য বাকী নব্বই জন ছাত্রকে স্কুল বিভাগের নিম্নশ্রেণী হইতে হরেক রকমের পুস্তকাদি পাঠ করাইয়া অনর্থক কেন সময় নষ্ট করান হয়, ইহার উত্তর কে দিবে? যাহাদিগের উচ্চ শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা বা অভিলাষ নাই, তাহাদিগকে বিদ্যালয়ের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলি শিখাইবার সঙ্গে কার্য্যকরী কোন কোন বিশেষ বিষয় শিক্ষা দিলে তাহাদিগের যে বিশেষ উপকার হয়, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন না হইলে আমাদিগের আশা দুরাশামাত্র। বালকদিগের শিক্ষা হইতে বালিকাদিগের বিষয় বিশেষের যেরূপ বিভিন্নতা আছে, সেইরূপ উচ্চ ও নিম্নশিক্ষার্থীদিগের শিক্ষার মধ্যে যাহাতে কিছু বিশেষত্ব বা তারতম্য থাকে, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লক্ষ্য রাখা উচিত। গভর্ণমেণ্টের স্কুলসমূহে ব্যায়াম বা চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য যেরূপ সময় নির্দ্দিষ্ট আছে এবং তাহার জন্য যেরূপ স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে, সেইরূপ বিদ্যালয়মাত্রেই অথবা কয়েকটি বিদ্যালয়ের সম্মিলিত উদ্যোগে স্থানে স্থানে শিল্পবিভাগ (Industrial and Mechanical) স্থাপিত হইলে ভবিষ্যতে বালকদিগের সংসারক্ষেত্রে কার্য্য করিবার অনেকটা সাহায্য করা হয় না কি? এইরূপ নানাবিধ উপায় না থাকায় সকল বালককেই বাধ্য হইয়া নিরূপিত পাঠকাল পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে আবদ্ধ থাকিতে হয়। পরে বিদ্যালয়ের বিকৃত বিদ্যা লাভ করিয়া শিল্পাদি শিক্ষার দিকে অগ্রসর হইবার ইচ্ছা হ্রাস হইয়া যায়, অথবা সে সকল বিষয় শিখিবার সময় থাকে না, অগত্যা যে সে কার্য্যে প্রবেশ করিয়া আজীবন দুঃখ ও কষ্টে কাটাইতে হয়।

—*—

সমালোচনা।

"অর্থসংগ্রহঃ"।—দেবনাগরী অক্ষরে সটীক সংস্কৃত দার্শনিক পুস্তক—১১০ পৃষ্ঠা, ডিঃ ৮—মূল্য ||০ আনা। গ্রন্থকার—মহামহোপাধ্যায় লৌগাক্ষিভাস্কর। টীকাকার—পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ; ইনি অধুনা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার ও স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক এবং "উদ্বোধনের" গীতাশাঙ্করভাষ্যের ও বেদান্তসূত্র-রামানুজভাষ্যের বঙ্গানুবাদক। পুস্তকখানি "জৈমিনিনয়ে প্রবেশায় অর্থসংগ্রহঃ"; অর্থাৎ জৈমিনিপ্রণীত দ্বাদশাধ্যায়ী পূর্ব্বমীমাংসাশিক্ষায় প্রথম প্রবেশকদিগের নিমিত্ত উক্ত দর্শনের সরল অর্থসংগ্রহ—যথার্থই অতি সরল সংস্কৃতে অথচ সংক্ষেপে সমগ্র মীমাংসাদর্শনের সারভাব এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার মধ্যে অতি বিচক্ষণতার সহিত সংগ্রহ করা হইয়াছে। লেখা - সূত্রাকারে নহে, পদ্যেও নহে; সামান্য গদ্যে মাত্র। যিনি সবে ২।১ খানি মাত্র সংস্কৃত পুস্তক পড়িয়াছেন, তাঁহারও এই গ্রন্থপাঠে কিছু কাঠিন্য বোধ হইবে না—অনায়াসে মীমাংসাদর্শনে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিবেন। জ্ঞানী সন্ন্যাসীদিগের নিমিত্ত, শ্রুতির শেষাংশ উপনিষৎ হইতে যেমন উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন বিরচিত হইয়াছে, তেমনি কর্ম্মী গৃহস্থদিগের নিমিত্ত, বেদের প্রথমাংশ কর্ম্মকাণ্ড হইতে পূর্ব্বমীমাংসা বা "মীমাংসাদর্শন" প্রণীত হইয়াছে। বেদান্ত-সূত্রের প্রারম্ভে যেমন "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"; মীমাংসাদর্শন জৈমিনিসূত্রের প্রথমেও "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" এইরূপভাবে আরম্ভ হইয়াছে। লৌগাক্ষিভাস্করও তাঁহার "অর্থসংগ্রহে" জৈমিনির প্রায় সেইরূপ প্রণালীতেই অর্থ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে একটু বক্তব্য এই যে, "অর্থসংগ্রহের"মূল যেমন সহজ হইয়াছে, পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ কর্ত্তৃক তট্টীকা তত সহজ হয় নাই। টীকাতে পণ্ডিত মহাশয়ের দার্শনিক ব্যুৎপত্তি বেশ প্রকাশ পাইয়াছে বটে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে বিশেষ কঠিন হইয়াছে। ইহা ঠিক যেন গীতাশাঙ্করভাষ্যের উপর আনন্দগিরির টীকা, অথবা বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননের বৈশেষিককারিকাবলীর উপর মুক্তাবলী টীকা। "অর্থসংগ্রহের" তিন লাইন মূলের উপর এক পৃষ্ঠা বা ততোধিক পরিমাণ বিস্তৃত দার্শনিকী টীকা! যাহা হউক, অর্থসংগ্রহের মূল পড়িয়া যেমন দর্শনশাস্ত্রে অনভিজ্ঞগণ বিশেষ উপকার পাইবেন, পণ্ডিতগণও ইহার টীকা পাঠ করিয়া তেমনি অতিশয় আনন্দ লাভ করিবেন। ফল কথা, পুস্তকখানি প্রবর্ত্তক ও পণ্ডিত উভয় সমাজেই সমান আদরণীয় হইবার যোগ্য সন্দেহ নাই।

"পাতঞ্জল দর্শন"।—বেদান্তচুঞ্চু-সাংখ্যভূষণ-সাহিত্যাচার্য্য শ্রীপূর্ণচন্দ্র শর্ম্মা সঙ্কলিত। ডিঃ ৮, ৩৫০ পৃষ্ঠা—মূল্য ২৲। ইহাতে পতঞ্জলিসূত্র ও তাহার সরল সংস্কৃতার্থ, বঙ্গার্থ, ব্যাসভাষ্য, ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ এবং বিস্তৃত বাঙ্গালা মন্তব্য দেওয়া হইয়াছে। পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় যে পাতঞ্জল দর্শন সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি নিজকৃত পদবোধনী নামক অতি সরল সংস্কৃত টীকা দিয়াছেন বটে, কিন্তু কোন প্রাচীন সিদ্ধ ঋষির টীকা অথবা ভাষ্য দেন নাই; এই অভাব উক্ত বেদান্তচুঞ্চু মহাশয় মোচন করিয়াছেন। পুস্তকখানি আমাদিগের খুব ভাল লাগিয়াছে।

গত ২০শে জুন মঙ্গলবার স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও সিস্টার নিবেদিতা ইংলণ্ড শুভযাত্রা করিয়াছেন।

মহাভাষ্যম্।

(পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যারত্নকর্ত্তৃক অনুবাদিত।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভাষ্য-মূল।—কিং পুনর্নিত্যঃ শব্দ আহোস্বিৎ কার্য্যঃ। সংগ্রহে এতৎ প্রাধান্যেন পরীক্ষিতং নিত্যো বা স্যাৎ কার্য্যো বেতি। তত্রোক্তা দোষাঃ প্রয়োজনান্যপ্যুক্তানি। তত্র ত্বেষ নির্ণয়ঃ। যদ্যেব নিত্যঃ। অথাপি কার্য্যঃ। উভয়থাপি লক্ষণং প্রবর্ত্ত্যমিতি।

বঙ্গানুবাদ।—শব্দ কি নিত্য অথবা কার্য্য? সংগ্রহ গ্রন্থে (১) ইহা বিশেষ প্রকারে পরীক্ষিত হইয়াছে যে, শব্দ নিত্য হইবে অথবা কার্য্য হইবে। তাহাতে দোষসকল উক্ত হইয়াছে এবং প্রয়োজনসকলও উক্ত হইয়াছে। তাহাতে ইহা নির্ণীত হইয়াছে, যদি শব্দ নিত্য হয়, তাহা হইলেও কার্য্য। উভয় প্রকারেই লক্ষণ প্রবর্ত্তিত করা উচিত।

ভাষ্য-মূল।— কথং পুনরিদং ভগবতঃ পাণিনেরাচার্য্যস্য লক্ষণং প্রবৃত্তম্।

সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে—।

সিদ্ধে শব্দেঽর্থে সম্বন্ধে চেতি। অথ সিদ্ধশব্দস্য কঃ পদার্থঃ। নিত্যপর্য্যায়বাচী সিদ্ধশব্দঃ কথং জ্ঞায়তে। যৎ কূটস্থেষ্ববিচালিষু ভাবেষু বর্ত্ততে। তদ্যথা,—সিদ্ধা দ্যৌঃ, সিদ্ধা পৃথিবী, সিদ্ধমাকাশমিতি। ননু চ ভোঃ কার্য্যেষ্বপি বর্ত্ততে। তদ্যথা,—সিদ্ধ ওদনঃ, সিদ্ধঃ সূপঃ, সিদ্ধা যবাগূরিতি। যাবতা কার্য্যেষ্বপি বর্ত্ততে। তত্র কুত এতন্নিত্যপর্য্যায়বাচিনো গ্রহণম্। ন পুনঃ কার্য্যে যঃ সিদ্ধশব্দ ইতি। সংগ্রহে তাবৎ কার্য্যপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবান্মন্যামহে নিত্যপর্য্যায়বাচিনো গ্রহণমিতি ইহাপি তদেব।

বঙ্গানুবাদ।—আচার্য্য ভগবান্ পাণিনি এই লক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? সিদ্ধ শব্দ, অর্থ ও সম্বন্ধে—।

শব্দ, অর্থ ও সম্বন্ধ সিদ্ধই আছে; (অতএব সিদ্ধ বিষয়ে লক্ষণ করিবার প্রয়োজন কি?) সিদ্ধ শব্দের পদার্থ কি? সিদ্ধ শব্দ নিত্যপর্য্যায় কি প্রকারে জানা যায়? যেহেতু কূটস্থ অর্থাৎ বিনাশরহিত ও অবিচালী অর্থাৎ গতিশক্তিহীন দ্রব্যে থাকে; (অতএব, সিদ্ধ শব্দ নিত্যপর্য্যায়বোধক।) যেমন স্বর্গ সিদ্ধ, পৃথিবী সিদ্ধা, আকাশ সিদ্ধ। আচ্ছা মহাশয়! সিদ্ধ শব্দ কার্য্যদ্রব্যেও থাকে। যেমন অন্ন সিদ্ধ, ব্যঞ্জন সিদ্ধ, যবাগূ (হোমের দ্রব্য বিশেষ) সিদ্ধ। সমস্ত কার্য্যদ্রব্যেও সিদ্ধ শব্দ থাকে। তন্মধ্যে এই নিত্যপর্য্যায়বোধক সিদ্ধ শব্দের গ্রহণ কেন? কার্য্যদ্রব্যে যে সিদ্ধ শব্দ তাহার

---

(১) ব্যাড়িনামক পণ্ডিতকৃত লক্ষশ্লোকাত্মক একখানি গ্রন্থ ছিল, তাহার নাম 'সংগ্রহ'। এক্ষণে সেই গ্রন্থ এতদ্দেশে অপ্রাপ্য। দেশান্তরে পাওয়া যায় কি না, তাহা আমরা জানি না।

নহে। সংগ্রহে (ব্যাডিকৃত গ্রন্থবিশেষে) কার্য্যের প্রতিদ্বন্দ্বিভাববশতঃই বোধ হয়, নিত্যপর্য্যায়বোধক সিদ্ধ শব্দের গ্রহণ হইয়াছে। এই স্থলেও সেই প্রকার (অর্থাৎ কার্য্যের প্রতিদ্বন্দ্বিভাববশতঃই নিত্যপর্য্যায়বোধক সিদ্ধ শব্দের গ্রহণ হইয়াছে)।

ভাষ্য-মূল।—অথবা সন্তোকপদান্যপ্যবধারণানি তদ্যথা,—অব্‌ভক্ষো বায়ুভক্ষ ইতি। অপ এব ভক্ষয়তি, বায়ুমেব ভক্ষয়তীতি গম্যতে। এবমিহাপি সিদ্ধ এব ন সাধ্য ইতি। অথবা পূর্ব্বপদলোপোহত্র দ্রষ্টব্যঃ। অত্যন্তসিদ্ধঃ সিদ্ধ ইতি। তদ্যথা,—দেবদত্তো দত্ত সত্যভামা ভামেতি। অথবা ব্যাখ্যানতো বিশেষ প্রতিপত্তির্নহি সন্দেহাদলক্ষণমিতি নিত্যপর্য্যায়বাচিনো গ্রহণমিতি ব্যাখ্যাস্যামঃ। কিং পুনরনেন বর্ণ্যেন কিং ন মহতা কণ্ঠেন নিত্যশব্দ এবোপাত্তঃ। যস্মিন্নুপাদীয়মানেঽসন্দেহঃ স্যাৎ।

বঙ্গানুবাদ।—অথবা, একপদসকলও অবধারণবোধক আছে। যেমন,—অব্‌ভক্ষ, বায়ুভক্ষ। (অব্‌ভক্ষ বলিলে) অপ্‌ অর্থাৎ জলকেই ভক্ষণ করে, (বায়ুভক্ষ বলিলে) বায়ুকেই ভক্ষণ করে ইহা বুঝায়। এইরূপ এইস্থলেও সিদ্ধই সাধ্য নহে, অথবা এইস্থলে পূর্ব্বপদের লোপ হইয়াছে বিবেচনা করিতে হইবে। অত্যন্তসিদ্ধই সিদ্ধ। যেমন,—দেবদত্ত দত্ত, সত্যভামা ভামা (স্থলবিশেষে বৈযাকরণেরা বিকল্পে পূর্ব্বপদের লোপ করিয়া থাকেন। "দেবদত্ত" এইস্থলে "দত্ত" এইরূপ প্রয়োগ করেন এবং "সত্যভামা" এইস্থলে "ভামা" এইরূপ প্রয়োগ করিয়া থাকেন; তদ্রূপ এইস্থলে "অত্যন্তসিদ্ধ" এই প্রয়োগের পরিবর্ত্তে "সিদ্ধ" এইরূপ প্রযুক্ত হইয়াছে।) অথবা "ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তির্নহি সন্দেহাদলক্ষণম্" "ব্যাখ্যা হইতেই বিশেষ প্রকারে প্রতিপত্তি অর্থাৎ জ্ঞানলাভ হয়; সন্দেহ উপস্থিত হইল বলিয়াই তাহা অলক্ষণ নহে।" এই শাস্ত্রানুসারে নিত্যপর্য্যায়বোধক সিদ্ধ শব্দের গ্রহণ হইয়াছে। এইরূপ বর্ণনারই বা প্রয়োজন কি? মহৎ কণ্ঠের দ্বারা নিত্যশব্দই গৃহীত হইয়াছে, কেন এইরূপ স্বীকার কর না। যাহা গ্রহণ করিলে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ভাষ্য-মূল।—মঙ্গলার্থম। মাঙ্গলিক আচার্য্যো মহতঃ শাস্ত্রৌঘস্য মঙ্গলার্থং সিদ্ধশব্দমাদিতঃ প্রযুঙ্‌ক্তে। মঙ্গলাদীনি হি শাস্ত্রাণি প্রথন্তে বীরপুরুষাণি চ ভবন্তি আয়ুষ্মৎপুরুষাণি চাধ্যেতারশ্চ সিদ্ধার্থা যথা স্যুরিতি। অয়ং খলু নিত্যশব্দো নাবশ্যং কূটস্থেষবিচালিষু ভাবেষু বর্ত্ততে। কিং তর্হ্যাভীক্ষ্ণ্যেঽপি বর্ত্ততে। তদ্যথা, নিত্যপ্রহসিতো নিত্যপ্রজ্বলিত ইতি। যাবতাভীক্ষ্ণ্যেঽপি বর্ত্ততে তত্রাপ্যনেনৈবার্থঃ স্যাৎ। ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তির্নহি সন্দেহাদলক্ষণমিতি।

বঙ্গানুবাদ।—মঙ্গলের নিমিত্ত। মাঙ্গলিক আচার্য্য বিপুল শাস্ত্ররাশির মঙ্গলের নিমিত্ত সিদ্ধ শব্দ আদিতে প্রয়োগ করিতেছেন। মঙ্গলাদি অর্থাৎ যাহার আদিতে মঙ্গলাচরণ করা হইয়া থাকে, সেইরূপ শাস্ত্রসকল প্রথিত অর্থাৎ খ্যাত হয়, বীরপুরুষ (১) ও আয়ুষ্মৎপুরুষ (২) হয় এবং অধ্যেতৃগণও

---

(১) কৈয়ট ব্যাখ্যা করিতেছেন,—"বীরপুরুষাণীতি শ্রোতৄণাং পরৈরপরাজয়াৎ।" অর্থাৎ মঙ্গলাদি শাস্ত্র যাহারা শ্রবণ করেন, অন্যে তাঁহাদিগকে জয় করিতে পারে না। ঐ শাস্ত্রই তাঁহাদিগকে রক্ষা করে। এই হেতু উক্তশাস্ত্রকে 'বীরপুরুষ' বলা হইয়াছে।

(২) "আয়ুষ্মৎ পুরুষাণীতি শাস্ত্রানুষ্ঠানে ধর্ম্মোপচয়াদায়ুর্বর্দ্ধনাৎ।" ঐ শাস্ত্রের অনুষ্ঠান করিলে ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়, তাহা হইতে আয়ুবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই হেতু উক্ত শাস্ত্রকে "আয়ুষ্মৎপুরুষ" বলা হইয়াছে।

সিদ্ধার্থ (১) অর্থাৎ পূর্ণমনোরথ হয়েন। এই নিত্যশব্দ নিশ্চিতরূপে কূটস্থ অর্থাৎ বিনাশরহিত ও অবিচালী অর্থাৎ গতিশক্তিহীন দ্রব্যে থাকে না। তবে কি আভীক্ষ্ণ্য অর্থাৎ পৌনঃপুন্য অর্থেও থাকে? যেমন নিত্য প্রহসিত, নিত্য প্রজ্বলিত। পৌনঃপুন্য অর্থেও থাকে, তাহাতেও ইহাদ্বারাই অর্থসিদ্ধি হইতে পারে, "ব্যাখ্যা হইতেই বিশেষপ্রকারে প্রতিপত্তি অর্থাৎ জ্ঞানলাভ হয়, সন্দেহ হইল বলিয়াই তাহা অলক্ষণ নহে।"

ভাষ্য-মূল।—পশ্যতি ত্বাচার্য্যো মঙ্গলার্থ শৈচব সিদ্ধশব্দ আদিতঃ প্রযুক্তো ভবিষ্যতি শক্ষ্যামি চৈনং নিত্যপর্য্যায়বাচিনং বর্ণয়িতুমিতি। অতঃ সিদ্ধশব্দ এবোপাত্তো ন নিত্যশব্দঃ।

বঙ্গানুবাদ।—আচার্য্য বিবেচনা করিলেন, যদি মঙ্গলার্থ সিদ্ধশব্দ আদিতে প্রযুক্ত হয়, তবে ইহাকে নিত্যপর্য্যায়বোধক বলিয়া বর্ণনা করিতে পারিব। অতএব "সিদ্ধ" এই শব্দটিই গ্রহণ করিয়াছেন, "নিত্য" এই শব্দটি গ্রহণ করেন নাই।

ভাষ্য-মূল।—অথ কং পুনঃ পদার্থং মত্বা এষ বিগ্রহঃ ক্রিয়তে সিদ্ধে শব্দেঽর্থে সম্বন্ধে চেতি। আকৃতিমিত্যাহ। কুত এতৎ। আকৃতির্হি নিত্যা দ্রব্যমনিত্যম্। অথ দ্রব্যে পদার্থে কথং বিগ্রহঃ কর্ত্তব্যঃ, সিদ্ধে শব্দে অর্থসম্বন্ধে চেতি। নিত্যোহ্যর্থবতামর্থৈরভিসম্বন্ধঃ। অথবা দ্রব্যে এব পদার্থে এষ বিগ্রহো ন্যায্যঃ। সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চেতি।

বঙ্গানুবাদ।—কোন্ পদার্থ (২) বিবেচনা করিয়া "সিদ্ধে শব্দেঽর্থে সম্বন্ধে চেতি" "সিদ্ধ শব্দে অর্থে ও সম্বন্ধে" এইরূপ বিগ্রহ (৩) করিতেছ? আকৃতিকে, ইহা বলিলেন (অর্থাৎ আকৃতিকে পদার্থ বিবেচনা করিয়া একপ বিগ্রহ করিতেছি, ইহা বলিলেন।) ইহা কেন? (অর্থাৎ এইরূপ বলিতেছ কেন?) আকৃতি নিত্য দ্রব্য অনিত্য। দ্রব্যপদার্থে কি প্রকার বিগ্রহ করা উচিত? সিদ্ধ শব্দে এবং অর্থসম্বন্ধে। অর্থবান্ শব্দের অর্থের সহিত সম্বন্ধ নিত্য। অথবা দ্রব্যপদার্থে এইরূপ বিগ্রহ করা উচিত,—সিদ্ধ শব্দে, অর্থে ও সম্বন্ধে।

ভাষ্য-মূল—দ্রব্যং হি নিত্যমাকৃতিরনিত্যা কথং জ্ঞায়তে? এবং হি দৃশ্যতে লোকে মৃৎ কয়াচিদাকৃত্যা যুক্তা পিণ্ডো ভবতি, পিণ্ডাকৃতিমুপমৃদ্য ঘটিকাঃ ক্রিয়ন্তে, ঘটিকাকৃতিমুপমৃদ্য কুণ্ডিকাঃ ক্রিয়ন্তে। তথা সুবর্ণং কয়াচিদাকৃত্যা যুক্তং পিণ্ডো ভবতি, পিণ্ডাকৃতিমুপমৃদ্য রুচকাঃ ক্রিয়ন্তে। রুচকাকৃতিমুপমৃদ্য কটকাঃ ক্রিয়ন্তে, কটকাকৃতিমুপমৃদ্য স্বস্তিকাঃ ক্রিয়ন্তে। পুনরাবৃত্তঃ সুবর্ণপিণ্ডঃ, পুনরপরয়াকৃত্যা যুক্তঃ খদিরাঙ্গারসদৃশে কুণ্ডলে ভবতঃ। আকৃতিরন্যা চান্যা চ ভবতি, দ্রব্যং পুনস্তদেব। আকৃত্যুপমর্দ্দেন দ্রব্যমেবাবশিষ্যতে। আকৃতাবপি পদার্থে এষ বিগ্রহো ন্যায্যঃ। সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চেতি।

---

(১) "অধ্যয়ননিষ্পত্তিরেব তেষাং সিদ্ধিঃ।" অধ্যয়ন সুসম্পন্ন হওয়াই অধ্যেতৃগণের সিদ্ধি। তাঁহাদিগের অধ্যয়ন সুনিষ্পন্ন হইলেই তাঁহারা সিদ্ধার্থ হইয়া থাকেন।

(২) পদার্থ সাত প্রকার,—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব।

দ্রব্যং গুণাস্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকম্।
সমবায়স্তথাভাবঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ॥ ইতি ভাষাপরিচ্ছেদঃ।

(৩) পদের অর্থবোধক বাক্যকে বিগ্রহবাক্য কহে।

বঙ্গানুবাদ।—দ্রব্য নিত্য, আকৃতি অনিত্য। কি প্রকারে জানিতে পারা যায়? এই প্রকার দেখা যায়, জগতে মৃত্তিকা কোন একটী আকৃতিযুক্ত হইয়া পিণ্ড হয়, পিণ্ডাকৃতিকে উপমর্দ্দন করিয়া ঘট নির্ম্মাণ করে এবং ঘটাকৃতিকেও উপমর্দ্দন করিয়া কুণ্ডিকা (হাঁড়ী) নির্ম্মাণ করে। তদ্রূপ স্বর্ণ কোন একটী আকৃতি বিশিষ্ট হইয়া পিণ্ড হয়, পিণ্ডাকৃতিকে উপমর্দ্দন করিয়া রুচক (১) নির্ম্মাণ করা হয়, রুচকাকৃতিকে উপমর্দ্দন করিয়া কটক (২) নির্মাণ করা হয় এবং কটকাকৃতিকে উপমর্দ্দন করিয়া স্বস্তিক (৩) নির্মাণ করা হয়। পুনরায় স্বর্ণ পিণ্ডে পরিণত হইয়া পুনরায় অপর আকৃতিযুক্ত হইয়া খদির কাষ্ঠের অঙ্গারসদৃশ কুণ্ডলদ্বয় হয়। আকৃতি অন্য অন্য প্রকার হয়, কিন্তু দ্রব্য তাহাই থাকে। আকৃতির উপমর্দ্দন করিলে দ্রব্যই অবশিষ্ট থাকে। আকৃতি পদার্থেও এই প্রকার বিগ্রহ করা উচিত,— সিদ্ধ শব্দে, অর্থেও সম্বন্ধে।

ভাষ্য-মূল।— নমু চোক্তমাকৃতিরনিত্যেতি। নৈতদস্তি। নিত্যাকৃতিঃ। কথম্? ন ক্বচিদুপরতেতি কৃত্বা সর্বত্রোপরতা ভবতি, দ্রব্যান্তরস্থা তূপলভ্যতে।

বঙ্গানুবাদ।— মহাশয় তো বলিয়াছেন, আকৃতি অনিত্য। ইহা নহে। আকৃতি নিত্য। কোনস্থলে আকৃতি অস্পষ্ট থাকে বলিয়া সর্বত্র অস্পষ্ট হয় না, সেই আকৃতি আবার দ্রব্যান্তরে থাকিয়া অনুভূত হয়। (যেমন মৃত্তিকার পিণ্ডকে উপমর্দ্দন করিয়া ঘট নির্মাণ করা হইল, ইহাতে মৃত্তিকার পিণ্ডাকৃতি অনভিব্যক্ত হইল বটে, কিন্তু অপর মৃত্তিকার পিণ্ডের পিণ্ডাকৃতি তাহাতে বিগত হয় না, অতএব আকৃতি নিত্য)।

ভাষ্য-মূল।—অথবা নেদমেব নিত্যলক্ষণম্। ধ্রুবং কূটস্থমবিচাল্যনপায়োপজনবিকার্য্যনুৎপত্ত্যবৃদ্ধ্যব্যয়যোগি যত্তন্নিত্যমিতি। তদপি নিত্যং যস্মিংস্তত্ত্বং ন বিহন্যতে। কিং পুনস্তত্ত্বম্। তদ্ভাবস্তত্ত্বম্। আকৃতাবপি তত্ত্বং ন বিহন্যতে। অথবা কিং ন এতেন ইদং নিত্যমিদমনিত্যমিতি। যন্নিত্যং তং পদার্থং মত্বৈষ বিগ্রহঃ ক্রিয়তে, সিদ্ধে শব্দেঽর্থে সম্বন্ধে চেতি।

বঙ্গানুবাদ।—অথবা ইহাই নিত্যের লক্ষণ নহে (৪) যাহা ধ্রুব অর্থাৎ স্থির, কূটস্থ অর্থাৎ বিনাশরহিত, অবিচালী অর্থাৎ দেশান্তরপ্রাপ্তিবিহীন (যাহা অন্যত্র গমন করে না) উৎপত্তিরহিত, বৃদ্ধিহীন এবং অক্ষয় তাহাই নিত্য। তাহাও নিত্য যাহাতে তত্ত্ব বিনষ্ট হয় না। তত্ত্ব কাহাকে

(১) কণ্ঠভূষণ বিশেষ।

(২) হস্তাভরণ বলয়।

(৩) সর্পফণাকৃতি হস্তপাত্র।

(৪) অনিত্যতা তিন প্রকার যথা,—সংসর্গানিত্যতা, পরিণামানিত্যতা এবং প্রধ্বংসানিত্যতা। কোন দ্রব্যের সংসর্গবশতঃ যে অনিত্যতা, তাহাকে সংসর্গানিত্যতা কহে। যেমন স্ফটিকের নিকট জবাপুষ্প রাখিলে তখন স্ফটিকের প্রকৃত বর্ণ তিরোহিত হইল, কিন্তু জবাপুষ্পটীকেই সেই স্ফটিকের নিকট হইতে দূরীভূত করিলে পুনরায় স্ফটিকের স্বরূপ প্রাপ্তি হয়। পরিণামে অনিত্যতা প্রাপ্তিকে পরিণামানিত্যতা কহে। যেমন,—বদরীফল পক্ক হইলে তাহার শ্যামতা তিরোভূত হইয়া লৌহিত্য প্রাপ্তি হয়। সম্পূর্ণরূপে বিনাশকে প্রধ্বংসানিত্যতা কহে।

কহে? তদ্ভাবকে অর্থাৎ যে দ্রব্যের যে ধর্ম্ম তাহাকে তত্ত্ব কহে। আকৃতিতেও তত্ত্ব অর্থাৎ আকৃতিত্ব বিনষ্ট হয় না। অথবা ইহা নিত্য, ইহা অনিত্য এইরূপ বিচারে আমাদিগের কি প্রয়োজন? যাহা নিত্য সেই পদার্থ বিবেচনা করিয়া "সিদ্ধ শব্দে, অর্থে এবং সম্বন্ধে" এইরূপ বিগ্রহ বাক্য প্রয়োগ করা হইতেছে। (১)

ভাষ্য-মূল।—কথং পুনর্জ্ঞায়তে সিদ্ধঃ শব্দোঽর্থঃ সম্বন্ধশ্চেতি। লোকতঃ। যল্লোকেঽর্থমর্থমুপাদায় শব্দান্ প্রযুঞ্জতে নৈষাং নির্ব্বৃত্তৌ যত্নং কুর্ব্বন্তি। যে পুনঃ কার্য্যা ভাবা নির্ব্বৃত্তৌ তাবৎ তেষাং যত্নঃ ক্রিয়তে। তদ্‌যথা,—ঘটেন কার্য্যং করিষ্যন্ কুম্ভকারকুলং গত্বাহ, কুরু ঘটং কার্য্যমনেন করিষ্যামীতি, ন তদ্বচ্ছব্দান্ প্রযুযুক্ষমাণো বৈয়াকরণকুলং গত্বাহ, কুরু শব্দান্ প্রযোক্ষ্যে ইতি। তাবত্যেবার্থমুপাদায় শব্দান্ প্রযুঞ্জতে।

বঙ্গানুবাদ।—কি প্রকারে জানিতে পারা যায় যে শব্দ, অর্থ ও সম্বন্ধ সিদ্ধ। লোক হইতে। লোকে অর্থানুসারে গ্রহণ করিয়া শব্দসকলকে প্রয়োগ করে, শব্দসমূহের নিষ্পাদনের নিমিত্ত যত্ন করে না। কিন্তু যে সকল ভাব কার্য্য তাহাদিগের নিষ্পাদনের নিমিত্ত যত্ন করে। যেমন;—যে ব্যক্তি ঘটের দ্বারা কার্য্য করিবে, সেই ব্যক্তি কুম্ভকারগণ সমীপে গমন করিয়া বলে, "ঘট নির্ম্মাণ কর, ঘটের দ্বারা কার্য্য করিব।" তদ্রূপ যিনি শব্দ প্রয়োগ করিবেন, বৈয়াকরণগণ সমীপে গিয়া বলেন না "শব্দ-নির্ম্মাণ কর, প্রয়োগ করিব।" বুদ্ধিদ্বারা বস্তু নিরূপণ করিয়া শব্দ প্রয়োগ করেন।

ভাষ্য-মূল।—যদি তর্হি লোক এষু শব্দেষু প্রমাণং কিং শাস্ত্রেণ ক্রিয়তে।

লোকতোঽর্থপ্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে শাস্ত্রেণ ধর্ম্মনিয়মঃ—।

লোকতোঽর্থপ্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে শাস্ত্রে ধর্ম্মনিয়মঃ ক্রিয়তে। কিমিদং ধর্ম্মনিয়ম ইতি। ধর্ম্মায় নিয়মো ধর্ম্মনিয়মঃ, ধর্ম্মার্থো বা নিয়মো ধর্ম্মনিয়মঃ, ধর্ম্মপ্রয়োজনো বা নিয়মো ধর্ম্মনিয়মঃ।

বঙ্গানুবাদ।—যদি এই সকল শব্দে লোকই প্রমাণ হইল, তবে শাস্ত্র দ্বারা কি করা যায়? অর্থাৎ শাস্ত্র প্রয়োজন কি?

লোক হইতে অর্থপ্রযুক্ত হইলে শাস্ত্রের দ্বারা শব্দপ্রয়োগে ধর্ম্মনিয়ম আছে—।

লোক হইতেই অর্থের প্রয়োগ থাকিলে শাস্ত্রের দ্বারা শব্দপ্রয়োগবিষয়ে নিয়ম করিতেছেন (অর্থাৎ) শব্দের অর্থ ব্যবহার লোক হইতে হয়, তথাপিও শাস্ত্রানুসারে শব্দপ্রয়োগবিষয়ে ধর্ম্মনিয়ম নিরূপণ করিয়াছেন। এই ধর্ম্মনিয়ম কি? ধর্মের নিমিত্ত নিয়ম—ধর্মনিয়ম কিংবা ধর্মার্থে নিয়ম—ধর্মনিয়ম (২) ধর্মপ্রয়োজন নিয়ম—ধর্মনিয়ম। (৩) [ক্রমশঃ]

---

(১) কৈয়ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"বুদ্ধিপ্রতিভাসঃ শব্দার্থো, যদা যদা শব্দ উচ্চারিতস্তদা তদার্থাকারা বুদ্ধিরুপজায়তে ইতি প্রবাহনিত্যত্বাদর্থস্য নিত্যত্বমিত্যর্থঃ।" শব্দের অর্থ বুদ্ধির প্রতিভাসক। যখন যখন শব্দ উচ্চারণ করা হয়, তখন তখন অর্থাকারা বুদ্ধি জন্মে. এই প্রবাহের নিত্যতাবশতঃ অর্থের নিত্যতা।

(২) কৈয়ট ব্যাখ্যা করেন "ধর্ম্মার্থত্বাৎ নিয়ম এব ধর্ম্মশব্দেনাভিধীয়তে ইতি কর্ম্মধারয়ঃ সমাস" ধর্ম্মলাভ হয় এই হেতু নিয়ম ধর্ম্মশব্দদ্বারা অভিহিত হইতেছে। অতএব কর্মধারয় সমাসঃ।

(৩) "লিঙাদিবিষয়েণ নিয়োগাখ্যেন ধর্ম্মেণ প্রযুক্ত ইত্যর্থঃ।" "লিঙ্" প্রভৃতি বিষয় স্বরূপ যে নিয়োগ নামক ধর্ম্ম অর্থাৎ (নিয়োগার্থ) তাহাদ্বারাই প্রযুক্ত।

দিব্য বাণী

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ১।৪।১১

প্রথমতঃ হয় শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ পরে ;
সাধুসঙ্গ পেয়ে জীব ভজনাদি করে।
অনর্থনিবৃত্তি হয় ভজনের বলে
তার ফলে নিষ্ঠা হয়, রুচি তার ফলে।
আসক্তি তা হতে জন্মে, ক্রমে ভাবোদয় ;
ভাব হতে প্রেম হয়, জানিও নিশ্চয়।
অষ্টম ভাবের স্থান, নবম প্রেমের
প্রেমোদয়ে ক্রম এই সাধকগণের।

কথাপ্রসঙ্গে

'এক তরী করে পারাপার'

(১)

শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন : 'ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে'— হে জগদীশ্বর, আমি ধন জন পাণ্ডিত্য, কিছুই কামনা করি না। তাঁহার শিষ্য রঘুনাথ দাসকে তিনি উপদেশ দিলেন : 'ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।' কিন্তু সাধারণ মানুষ ভাল খাইতে চায়, ভাল পরিতে চায়, ধন জন পাণ্ডিত্য চায়— চায় আরও অনেক কিছু। অনন্ত তাহার ইচ্ছা। এই ইচ্ছারই অপর নাম 'কাম'। কামের পূর্তির জন্য প্রয়োজন 'অর্থের'। সেই অর্থও সদুপায়েই অর্জিত হওয়া উচিত এবং সেই জন্য প্রয়োজন 'ধর্মের', অর্থাৎ ন্যায়-নীতির। ধর্মের অবিরোধী কামের প্রশংসা গীতাতেও করা হইয়াছে : 'ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ'। শুধু অর্থ ও কামের জন্য লালায়িত হইলে মানুষ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িবেই। ধর্মই অর্থ ও কামকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। তাই সর্বাগ্রে ধর্মের স্থান। মহাভারতকার বলেন : 'ধর্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যাঃ'— ধর্ম অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গ যুগপৎ অনুষ্ঠেয়।

(২)

কিন্তু এই ত্রিবর্গের অনুষ্ঠানের দ্বারা মানুষের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয় না। সংসারে কথঞ্চিৎ সুখী হইলেও, সে শোক তাপ ভয় জরা ব্যাধি মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় না। সুখদুঃখের অবিরাম আবর্তিত চক্র হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে, যাহাতে পুনর্জন্ম না হয়, সেই ব্যবস্থা যে করিতে হইবে, ইহা শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে কালক্রমে প্রতিভাত হয়। ঋষিগণ এই পুনর্জন্মনিরোধকেই মোক্ষ বা চতুর্থ বর্গরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং বর্ণাশ্রমধর্মের প্রবর্তন করিয়া সাধারণ নিয়ম হিসাবে জীবনের শেষভাগে মোক্ষে মনোনিবেশ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, মোক্ষের সহিত ত্রিবর্গের কোনও সম্পর্ক নাই। কাম ও অর্থের সহিত মোক্ষের যে সম্পর্ক নাই, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। কিন্তু ধর্মের সহিত ?— ধর্মের সহিতও মোক্ষের কোনও সম্পর্ক নাই। ইহা সত্য যে, অধার্মিক ব্যক্তি কখনও মোক্ষপরায়ণ হইতে পারে না। কিন্তু মুমুক্ষুর ধর্ম অর্থাৎ নৈতিক আচরণ স্বভাবসিদ্ধই থাকে, তাই ধর্মাচরণের প্রতি তাঁহার আগ্রহ থাকে না। মোক্ষ amoral— অর্থাৎ নৈতিকতার অতীত বস্তু। এইজন্যই মহাভারতকার যুগপৎ ত্রিবর্গেরই সেবা করিতে বলিয়াছেন— চতুর্বর্গের নয়, কারণ তাহা সম্ভব নয়।

(৩)

মোক্ষের দ্বারা পুনর্জন্মবারণ তো হইল, কিন্তু তাহার পর কী ? মুক্তাবস্থায় জীব কিভাবে থাকে, তাহা লইয়া দার্শনিকদের জল্পনা-কল্পনার অন্ত নাই। শুধু জল্পনা-কল্পনা নয়, সাধনসহায়েও তাঁহারা অনুভূতির এক একটি ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মোক্ষ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ধারণার সৃষ্টি করিলেন। সাংখ্য অতি প্রাচীন দর্শন। তাহাতে মুক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি-বিযুক্ত বহু আত্মা স্বীকৃত হইল। যোগদর্শনে ঈশ্বরের স্থান গৌণ। তাই ঈশ্বর-প্রণিধান চিত্তবৃত্তি-নিরোধের অন্যতম উপায় হিসাবেই গৃহীত হইল— 'কলক্কণা' ভক্তির প্রসঙ্গ সেখানে নাই। সুতরাং নিরীশ্বর

সাংখ্য ও পাতঞ্জল-দর্শনে কৈবল্য বিষয়ে কোনও পার্থক্য নাই। অদ্বৈতবেদান্তমতে জীবাত্মা বলিয়া বস্তুতঃ কোনও সত্য পদার্থই নাই। ধীস্থ চিদাভাসকেই জীবাত্মা বলা হয়। মুক্তিতে ঐ আভাসচৈতন্য অখণ্ডচৈতন্যে নিঃশেষে লয়-প্রাপ্ত হয়। এই মুক্তির অপর নাম সাযুজ্য মুক্তি। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ইত্যাদি মতে সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য ও সামীপ্য এই চতুর্বিধ মুক্তির কথা পাওয়া যায়। অদ্বৈতবাদীদের মতে এই চতুর্বিধ মুক্তি সংসারেরই অন্তর্গত— আসল মুক্তি নয়।

(৪)

একদিকে মোক্ষ সম্পর্কে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধারণা— অপরদিকে মুক্তিপাগল লোকের পুনর্জন্ম-নিবারণের উদ্দেশ্যে অশেষ কৃচ্ছ্রসাধনা, এই সকল লক্ষ্য করিয়া প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব সুপ্রাচীন চতুর্বর্গের চৌহদ্দি অতিক্রম করিয়া 'পঞ্চম পুরুষার্থ'-রূপে প্রেমকে উপস্থাপিত করিলেন। তাঁহার অন্তরের ভাব: 'কীটেষু পক্ষিষু মৃগেষু সরীসৃপেষু / রক্ষঃপিশাচমনুজেষ্বপি যত্র তত্র/জাতস্য মে ভবতু কেশব ত্বৎপ্রসাদাৎ/ ত্বয্যেব ভক্তিরচলাব্যভিচারিণী চ'— হে কেশব, কীট পক্ষী মৃগ সরীসৃপ রাক্ষস পিশাচ মানুষ — যে-শরীরেই জন্ম হউক, তোমার কৃপায় তোমারই প্রতি যেন আমার অচলা ও অব্যভিচারিণী ভক্তি থাকে।

(৫)

প্রেমরূপ পঞ্চম পুরুষার্থের প্রমাণ হিসাবে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতকে গ্রহণ করিলেন: 'শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্' — শ্রীমদ্ভাগবতই বিশুদ্ধ প্রমাণ, প্রেমই মহান পুরুষার্থ। তিনি বলিতেন: ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য। সুতরাং ভাগবতে যাহা আছে, তাহাই বেদান্তসিদ্ধান্ত।

ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকেই বলা হইয়াছে যে, উক্ত গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে— 'ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ', অর্থাৎ ফলাভিসন্ধি-রহিত ধর্ম। টীকাকার শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন, 'প্র'-উপসর্গের দ্বারা মোক্ষের বাঞ্ছাকেও নিরস্ত করা হইয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যাকে বিশেষ সম্মান দিতেন। বল্লভ ভট্ট যখন গর্ব করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া ভাগবতের টীকা লিখিয়াছেন, তখন— "প্রভু হাসি কহে 'স্বামী না মানে যেই জন/ বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন/···শ্রীধরস্বামী-প্রসাদেতে ভাগবত জানি/জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি।' "

ভাগবতের অনেক শ্লোকেই মোক্ষাপেক্ষা প্রেমভক্তির উৎকর্ষ দেখানো হইয়াছে। এখানে সেগুলির উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব নয়, তবে শ্রীধর-স্বামীর ব্যাখ্যাসহ উপরি-উক্ত শ্লোকাংশটির উল্লেখই এই বিষয়ে যথেষ্ট মনে করি।

(৬)

অবশ্য ভাগবত ব্যতীত শ্রীরামানুজাদি আচার্য-গণের গ্রন্থেও অনুরূপ ভাবের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। 'পঞ্চম পুরুষার্থ'-কথাটি উল্লিখিত না হইলেও, সাংখ্য ও পাতঞ্জল-দর্শনের কৈবল্যই যে শেষ কথা নয়, মোক্ষাবস্থায়ও যে প্রেম-ভক্তি লইয়াই থাকিতে হইবে, ইহা তাঁহাদের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত। ইহার প্রমাণস্বরূপ তাঁহারা যে-সকল শাস্ত্রবাক্যের উদ্ধৃতি দেন, তাহাদের মধ্যে অন্যতম হইতেছে, 'যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা/শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ' এবং 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি/সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্' — গীতার এই দুইটি সুপ্রসিদ্ধ শ্লোক। মুখ্যতঃ সেশ্বর সাংখ্যই

(পাতঞ্জল-দর্শনের ন্যায় সেশ্বর সাংখ্য নয়) তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদের ভিত্তি বলিয়া তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তে কোনও অসঙ্গতি দৃষ্ট হয় না।

তবে অদ্বৈতবাদের দিক হইতে বলা যায়—সুপ্রাচীন চতুর্বর্গকে অতিক্রম করিয়া প্রেমকে পঞ্চম পুরুষার্থরূপে উপস্থাপিত করিবার কোনও প্রয়োজন উপলব্ধ হয় না। কারণ, এই মতে প্রেম ও মোক্ষে কোনও পার্থক্য নাই। মোক্ষ তো আত্মাই। তাই কর্মসম্পাদ্য নয়। 'নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয় / শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়।' মোক্ষ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যে আচার্য শংকর এই কথাটি অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন। বহু বিচার করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, কোনও কর্ম মোক্ষের কারণ হইতে পারে না; এমনকি জ্ঞানকেও যখন মোক্ষের কারণ বলা হয়, তখনও উহা উপচারের দ্বারা—গৌণ প্রয়োগের দ্বারাই বলা হয়, কারণ জ্ঞান কেবল অজ্ঞাননিবৃত্তি করে এবং অজ্ঞান নিবৃত্ত হওয়ামাত্রই মোক্ষ স্বয়ং প্রকাশিত হয় :

'নিত্যত্বাৎ মোক্ষস্য সাধকস্বরূপাব্যতিরেকাচ্চ'—কারণ, মোক্ষ নিত্যসিদ্ধ এবং উহা সাধকের আত্মরূপ ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। আর আত্মা তো সচ্চিদানন্দস্বরূপ—প্রেমস্বরূপ। সুতরাং মোক্ষও প্রেমস্বরূপ।

(৭)

প্রেম চতুর্থ পুরুষার্থ কি পঞ্চম পুরুষার্থ, তাহা লইয়া কলহ করিয়া লাভ নাই। প্রেম লইয়া কথা! প্রয়োজন প্রেমের। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন : প্রেম রজ্জুর স্বরূপ, প্রেম হলে ভক্তের কাছে ঈশ্বর বাঁধা পড়েন; প্রেমভক্তি না হলে ঈশ্বর লাভ হয় না; প্রেম, পাকা ভক্তি হলে সাকার নিরাকার দুই সাক্ষাৎকার হয়; প্রেম হলে দেখে, তিনি ছাড়া কিছুই নেই, ইত্যাদি।

শ্রীমা সারদাদেবী বলিয়াছেন : "জপতপের দ্বারা কর্মপাশ কেটে যায়। কিন্তু ভগবানকে প্রেমভক্তি ছাড়া পাওয়া যায় না। জপ-টপ কি জান? ওর দ্বারা ইন্দ্রিয়-টিন্দ্রিয়গুলোর প্রভাব কেটে যায়... বৃন্দাবনে রাখালরা কি কৃষ্ণকে জপধ্যান ক'রে পেয়েছিল? না, তারা 'আয় রে, খা রে, নে রে'—এই ক'রে কৃষ্ণকে পেয়েছিল?"

মীরাবাঈ-এর প্রসিদ্ধ উক্তি : বিনা প্রেমসে ন মিলে নন্দলালা।

স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন : 'শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার—/তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর, এক তরী করে পারাপার—/ মন্ত্র-তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান, / ত্যাগ-ভোগ—বুদ্ধির বিভ্রম; 'প্রেম' 'প্রেম'—এই মাত্র ধন।'

তাঁহার একটি পত্রে আছে : 'পুঁথিপাতড়া বিদ্যেসিদ্যে যোগ ধ্যান জ্ঞান—প্রেমের কাছে সব ধূল সমান—প্রেমেই অণিমাদি সিদ্ধি, প্রেমেই ভক্তি, প্রেমেই জ্ঞান, প্রেমেই মুক্তি।'

(৮)

লৌকিক প্রেমও মানুষের হৃদয়কে সরস করিয়া দীনদুঃখীদের প্রতি দানাদি সদয় ব্যবহার, সমবয়স্কদের প্রতি প্রীতিপূর্ণ আচরণ ও গুরুজনদের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে— ইহা সমাজ-জীবনে সকলেরই প্রত্যক্ষ এবং ইহার স্বাক্ষর আবহমান কাল ধরিয়া নাট্যকার ও কথাসাহিত্যিকদের রচনায় রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু ভগবৎ-প্রেমের তুলনায় তাহা সিন্ধুতে বিন্দুবৎ। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন : 'মানবীয় প্রেমের মত্ততা সাধুমহাপুরুষগণের উন্মত্ত ঈশ্বরপ্রেমের ক্ষীণতম প্রতিধ্বনিমাত্র।' সুতরাং লৌকিক প্রেমও যখন আত্মপ্রকাশ করে সদ্ভাব-

সম্প্রীতির মাধ্যমে, তখন ভগবৎ-প্রেম যাঁহারা লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছেন, তাঁহারা যে বিশ্ব-প্রেমিক হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য কি! বস্তুতঃ বিশ্বপ্রেমে তাঁহাদেরই অধিকার। যাহারা তোতাপাখির মতো বিশ্বপ্রেম বিশ্বভ্রাতৃত্ব ইত্যাদির অভ্যস্ত বুলি আওড়ায়, তাহাদের উহা কথার কথা—'অন্তরের ব্যথা' নয়।

(৯)

বৈদিক ঋষি বলিতেছেন: 'নমো বঞ্চতে পরিবঞ্চতে'—প্রতারকদিগকে নমস্কার; 'স্তেনানাং পতয়ে নমঃ'— সিঁধেল চোরদিগের সর্দারকে নমস্কার; 'তস্করাণাং পতয়ে নমঃ'—দস্যুদিগের দলপতিকে নমস্কার। সূত্রধর রথকার কুম্ভকার কর্মকার চণ্ডাল ব্যাধ কুকুর অশ্ব—সকলকেই তিনি প্রণাম জানাইতেছেন, কারণ তাঁহার প্রেম লাভ হইয়াছে—সর্বত্র তিনি প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরকে দর্শন করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের কথায়: 'স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি / সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফূর্তি।'

তাহার পর কত শত যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে। যুগে যুগে কত মহাপুরুষ ও মহিমময়ী নারী এই পুণ্য ভারতভূমিতে অনুরূপভাবে প্রেম-লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া গিয়াছেন এবং শ্রীভগবানও অনন্ত করুণায় অবতীর্ণ হইয়া জীবকে প্রেমভক্তি শিখাইয়াছেন। প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্বে নবদ্বীপধামে শুভ ফাল্গুনী পূর্ণিমা-তিথিতে যাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহাতে আমরা প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়া চমৎকৃত হই। তাঁহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন: 'নদীয়ার অবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে মহা-ভাবের যেমন বিকাশ হইয়াছিল, তেমনটি আর কোথাও হয় নাই।' ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দের শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে উক্তি: 'তাঁর আনন্দ বা বিরহ-যন্ত্রণার কণামাত্রও জীব সহ্য করিতে পারে না।'

জীবনের শেষ আঠারো বৎসর তিনি পুরীধামে বাস করিয়া নিরন্তর রাধাভাবে আবিষ্ট থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলামাধুর্য আস্বাদন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক, শ্রীরাধিকা যে কবি-কল্পনা ন'ন, তাহা তাঁহারই জীবনে আমরা প্রত্যক্ষ করি এবং 'প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি / সেই মহা-ভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী'— এই সিদ্ধান্তের সত্যতা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের পুণ্য আবির্ভাব-তিথির শুভাবসরে আমরা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাই, ত্যাগ-বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভগবৎ-প্রেমের একটি কণিকাও যেন আমরা লাভ করিয়া জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারি— তাঁহারই ভাষায় যেন আন্তরিকভাবে বলিতে পারি: ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে / মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।

যস্যৈব পাদাম্বুজভক্তিলভ্যঃ প্রেমাভিধানঃ পরমঃ পুমর্থঃ।
তস্মৈ জগন্মঙ্গলমঙ্গলায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে॥

—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্, ৯

যাঁহার পাদপদ্মে ভক্তির দ্বারা প্রেম-নামক পরম পুরুষার্থ লভ্য হয়, জগতের মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ সেই চৈতন্যচন্দ্রকে বারংবার নমস্কার।

পরাভক্তি

অধ্যাপক শ্রীশিবশম্ভু সরকার

প্রেমিক তুমি জাগবে যেদিন হায়
মথন করে বিশুষ্ক অন্তরে—
বাসি ফুলও গন্ধ দেবে জানি
অকাল ফাগুন ফুটবে যে মন্তরে।
জানাজানি রইবে না আর বাকি
সুরভি সুর বইবে থাকি থাকি
অশ্রুতে স্নান করবে সকল ব্যথা
মুক্ত হোয়ে ফুটবে নীলাম্বরে—
যতই আমি গড়েছি সব আমার
বাঁধ্‌ল তারাই—সফল কারাগার
জানি তুমি ভাঙ্‌বে সকল দ্বার
ডেকে নেবে খোলা দিগন্তরে—
কেন যে হায় ভিখারী সাজ পরি'
ঘরে ঘরে অভাব ফিরি করি
সব রহস্য পড়্‌বে খসি ঝরি'
আঁকড়ে ধরি' উদাস দিগম্বরে!
আমার আমি কইবে শুধু 'তুমি'
আকাশ বেয়ে উঠ্‌বে নীচের ভূমি
অমূর্ত সে মূর্ত হবে জানি,
চারিপাশে—বাহিরে অন্তরে!

"যখন অন্তর শুদ্ধ, পবিত্র এবং ঐশ্বরিক প্রেমামৃতে পরিপূর্ণ হয়, তখন 'ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ'—এই ভাব ব্যতীত ঈশ্বরের অন্য সর্বপ্রকার ধারণা বালকোচিত ও অসম্পূর্ণ বা অনুপযুক্ত বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। বাস্তবিক পরাভক্তির প্রভাবই এইরূপ। তখন সেই সিদ্ধ ভক্ত তাঁহার ভগবানকে মন্দিরাদিতে বা গির্জায় দর্শন করিতে যান না; তিনি এমন স্থানই দেখিতে পান না—যেখানে ভগবান নাই। তিনি তাঁহাকে মন্দিরের ভিতরে দেখিতে পান, বাহিরেও দেখিতে পান, সাধুর সাধুতায় দেখিতে পান, পাপীর পাপেও দেখিতে পান, কারণ তিনি যে পূর্বেই তাঁহাকে নিত্যদীপ্তিমান ও নিত্যবর্তমান এক সর্বশক্তিমান অনির্বাণ প্রেমজ্যোতিরূপে নিজ হৃদয়ে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও ইংরেজীভাষা

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাসংগ্রহে ব্যবহৃত ইংরেজী শব্দ-অবলম্বনে আমরা সেকালের শিক্ষিতসমাজের মানসচিত্রটি অনেক পরিমাণে দেখতে পাই। এই শিক্ষিতসমাজের আনাগোনা শুরু হয় কেশবচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যোগাযোগের পর থেকে। 'আচার্য কেশবচন্দ্র'-গ্রন্থে গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় ১৮৭৫ সালের ১৫ই মার্চ কেশবচন্দ্র-শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎকারের যে কথা বলেছেন, তার আগেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব কেশবচন্দ্রকে দেখেছেন, কিন্তু দু'জনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ এই সময় থেকেই।

স্বামী সারদানন্দ তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-গ্রন্থের গুরুভাব—উত্তরার্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা উদ্ধৃত করেছেন—"কেশব সেনের আসবার পর থেকে তোদের মত 'ইয়ং বেঙ্গলে'র (Young Bengal [নব্য বঙ্গ বা তরুণ বাঙালী]) দলই সব এখানে আসতে শুরু করেছে। আগে আগে এখানে কত যে সাধু-সন্ত, ত্যাগী-সন্ন্যাসী, বৈরাগী-বাবাজী সব আস্‌ত যেতো, তা তোরা কি জানবি?" স্বামী সারদানন্দ বা শরৎচন্দ্র প্রমুখ স্কুল-কলেজের তরুণ ছাত্রদল এবং অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বা মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত— এই সব ইংরেজী-শিক্ষিতদের সংস্পর্শে এসেই যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইংরেজী শব্দ বেশী ব্যবহার করতেন, সেকথা তাঁর কথাসংগ্রহে স্পষ্টই প্রতিভাত।

এই 'ইয়ং বেঙ্গল' বা নব্য বঙ্গদের নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর শেষ অসুখের সূচনাসময়ে পাণিহাটিতে 'চিড়ার মহোৎসবে' যোগদান করতে গিয়েছিলেন। এ উৎসবে যোগদানের জন্য তাঁদের বলেছিলেন, "সেখানে ঐ দিন আনন্দের মেলা, হরিনামের হাট-বাজার বসে—তোরা সব 'ইয়ং বেঙ্গল', 'কখন ঐরূপ দেখিস্ নাই, চল্ দেখে আসবি'।" (লীলাপ্রসঙ্গ : দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ)

'ইয়ং বেঙ্গল' শব্দটির প্রথম প্রয়োগ ডিরোজিওর সুখ্যাত বা কুখ্যাত ছাত্রবৃন্দ সম্বন্ধে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে এই ছাত্রদলের আচার আচরণে যে সংস্কারমুক্তির প্রচেষ্টা দেখা যেত, তাতে অনেক বাড়াবাড়ি ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ছাত্রদের উন্মার্গগামিতা যেমন সত্য, তেমনি সত্য পরবর্তী কালে স্বদেশের কল্যাণব্রতে এঁদের আত্মনিয়োগ। এঁদের অধিকাংশই পরিণত বয়সে গভীরভাবে ধর্মচিন্তার পথে অগ্রসর হয়েছেন। তবু সাধারণতঃ 'ইয়ং বেঙ্গল' শব্দটির ব্যঞ্জনা ছিল অবিশ্বাসী, উৎকেন্দ্রিক, স্বেচ্ছাচারী তরুণদল হিসাবে। সেই 'ইয়ং বেঙ্গল' ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্ম-আন্দোলনে আকৃষ্ট হয়, পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চারপাশে সমবেত হয়। নরেন্দ্রনাথ দত্ত এক হিসাবে সেকালের 'ইয়ং বেঙ্গলে'র অন্যতম প্রতিনিধি। শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে এসে এই 'ইয়ং বেঙ্গল'-ই পরম সত্যের অনুসন্ধানী সর্বস্বত্যাগী তরুণদলে পরিণত।

ইংরেজীভাষামাধ্যম শিক্ষাব্যবস্থায় সেকালের তরুণমানসকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছিল পাশ্চাত্যদর্শন। এমন কি বিদ্যাসাগর পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনসাধন করতে চেয়ে প্রাচ্যদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য-দর্শনের পঠনপাঠনের উপর সমধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এমন মন্তব্যও করেছিলেন যে,—

"বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্তদর্শন, এ সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নাই।" (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পৃঃ ৩৫) অবশ্য এ সম্বন্ধে কোনো বিশদ যুক্তি তিনি দেননি, কিন্তু সাধারণভাবে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর চিন্তাধারা সম্বন্ধে এ থেকে ধারণা করা চলে। ব্রাহ্ম-আন্দোলন বা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারায় অবশ্য বেদান্তই সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে। যদিচ দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য যথেষ্ট। সেকালের 'ইয়ং বেঙ্গল'দের (পাশ্চাত্য) দর্শন বা ফিলসফিচর্চার প্রতি অতিমাত্রায় ঝোঁক বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বুদ্ধিগত, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ব্যাকুলতাসঞ্জাত নয়। স্বভাবতই এ জাতীয় দর্শনচর্চার প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আস্থা ছিল না। "তোমার ফিলজফিতে কেবল হিসাব কিতাব করে!"

উনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক চিন্তাধারার যুক্তিসর্বস্বতা পরম সত্য থেকে আমাদের তরুণ-মানসকে বহুদূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারতো; সে সম্ভাবনাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর সাধনা ও উপলব্ধির দ্বারা এইভাবে সংযত করে আত্মস্থতার পথে এগিয়ে দিয়েছিলেন। অনেক গ্রন্থপাঠের চেয়ে একটু উপলব্ধি যে মহত্তর সত্য, সেকথা সেদিনের "ফ্যাজাজফী"-চর্চাকারীদের মতো এ যুগের দর্শন-অনুরাগীদের পক্ষেও সমান স্মরণীয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দার্শনিক চিন্তা কিন্তু ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে আর এক অধ্যায়ের সূচনা।

কাণ্ট, হেগেল, সোপেনহাওয়ার, মিল, বেন্থাম, স্পেন্সার প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিকবৃন্দের চিন্তায় প্রভাবিত তদানীন্তন তরুণ বঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবেরই কাছে মানবজীবনের উদ্দেশ্য হিসাবে ঈশ্বরলাভের কথা শুনলো। আগে ঈশ্বরলাভ, তার পরে তাঁর জীবজগতের রহস্য। আগে যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ, তারপর তাঁর বিষয়-সম্পত্তির বিবরণ। আগে আম খাওয়া, পরে তার সংখ্যাতত্ত্বের বিবরণ।

সেকালের বাবুসমাজের ছবিটি শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ব্যবহৃত ইংরেজী শব্দের দ্বারা নানাভাবেই ফুটে উঠেছে। বিলেতফেরত লোকদের শিক্ষিত-সমাজে তখন বিশেষ উচ্চস্থান। কেশবচন্দ্র শুধু ইংলণ্ডে যাননি, স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার (Queen Victoria) সঙ্গে আলাপ করে এসেছেন। সে প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি—"...কেশব সেনকে কত লোকে গণে মানে, বিলাতে পর্যন্ত জানে—কুইন (রাণী ভিক্টোরিয়া) কেশবের সঙ্গে কথা কয়েছে!" (কথামৃত : ৪র্থ : ৫ই অক্টোবর, ১৮৮৪ ; এইসঙ্গে কথামৃত : ৫ম : ২৪শে মে, ১৮৮৪ দ্রঃ)

আবার অন্যত্রও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আধ্যাত্মিক উপমাই এই 'কুইন' থেকে জগজ্জননীর অনুধ্যানে উত্তীর্ণ—"অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে কি সকলে ধরতে পারে? কিন্তু নিত্যে উঠে যে বিলাসের জন্য লীলায় থাকে, তারই পাকা ভক্তি। বিলাতে কুইনকে দেখে এলে পর, তখন কুইন-এর কথা, কুইন-এর কার্য, এ সকল বর্ণনা করা চলতে পারে। কুইন-এর কথা তখন ঠিক ঠিক বলা হয়।" (কথামৃত : ২য় : ১১ই মার্চ, ১৮৮৩)

ইংরেজশাসনে তখন রাণী ভিক্টোরিয়ার যুগ, কুইন বা রাণীর কথা সাধারণ মানুষেরও মুখে মুখে ফিরতো। কলকাতার বাবুসমাজ ও তরুণসমাজে কুইনের উপমাটি সুপ্রযুক্ত।

সমকালীন বাবুসমাজে সহজেই ব্যবহৃত হতো চিকিৎসাসংক্রান্ত হাসপাতাল (Hospital), ডিসপেন্সারী (Dispensary), ফিবর মিক্শ্চার (Fever Mixture), মেডিকেল কলেজ (Medical College) জাতীয় শব্দ। লোকমান্যের সঙ্গে ঈশ্বরশরণাগতির অনেক দূরত্ব। সেকথাটি বোঝাতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন—"ইচ্ছা

করে বেশী কাজ জড়ানো ভালো নয়,— ঈশ্বরকে ভুলে যেতে হয়। ···শম্ভুকে তাই বললুম, যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হন, তাঁকে কি বলবে কতকগুলো হাসপাতাল ডিসপেন্সারি করে দাও?" (কথামৃত: ১ম: ২৭শে অক্টোবর, ১৮৮২) সেকালে ম্যালেরিয়া কালাজ্বর প্রভৃতির পরিবেশে কবিরাজি ওষুধ ক্রমে অচল হয়ে আসছিল, এ্যালোপ্যাথির জ্বরের ওষুধ বা ফিবর মিক্শ্চারই তখন বেশী প্রচলিত। যুগোপযোগী সাধনা হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তিকেই নির্দিষ্ট করে বলছেন — "কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি!—শাস্ত্রে যে সকল কর্মের কথা আছে, তার সময় কৈ? আজকাল জ্বরে দশমূল পাঁচন চলে না। দশমূল পাঁচন দিতে গেলে রোগীর এদিকে হয়ে যায়, আজকাল ফিবার মিক্শ্চার (Fever Mixture)।" (কথামৃত: ১ম: ২৫শে জুন, '৮৮৪)

জ্ঞান, কর্ম, যোগের চেয়ে ভক্তিকেই শ্রীচৈতন্য থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রমুখ শ্রেষ্ঠ সাধকেরা যুগধর্মরূপে গ্রহণ করেছেন। আর সমকালীন রোগযন্ত্রণায় ফিবর মিক্শ্চারের উপমাটি এই যুগোচিত সাধনপন্থারই প্রতীক হয়ে উঠেছে।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবিকাগত পরিচয়ে ডেপুটি (Deputy), মাস্টার (Master), হেডমাস্টার (Headmaster), জজ (Judge) প্রভৃতি শব্দ অধর সেন, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বা অন্যান্যদের প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অনেক সময়ই ব্যবহার করেছেন। নেপালের রাজার উকিল রাজপ্রতিনিধি বিশ্বনাথ উপাধ্যায়কে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন কাপ্তেন (Captain)। চাকরিস্থল হিসাবে 'আফিস' (Office) শব্দটিও অনেক সময়ই ব্যবহার করেছেন —'আফিসের কাজ' 'আফিসের হিসাবপত্র' ইত্যাদি।

জজ শব্দটির ব্যবহারের দ্বারা আধ্যাত্মিক সত্যকে নিপুণভাবে ফুটিয়েছেন 'কথামৃতে'র কয়েকটি ক্ষেত্রে। পিতৃবিয়োগে নরেন্দ্রনাথের নানা ঝঞ্ঝাট দেখা দিয়েছে— এ প্রসঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে একদিন হাজরামশায় বলছেন— 'নরেন্দ্র আবার মোকদ্দমায় পড়েছে।' শুনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন, 'শক্তি মানে না। দেহধারণ করলে শক্তি মানতে হয়।' তখন অবধি নিরাকার ব্রহ্মবাদী নরেন্দ্রনাথের অন্তরে ব্রহ্ম ও শক্তি দুই মানা সম্বন্ধে সংশয় আছে। সেই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন— "··· এখন শক্তিরই এলাকায় এসেছে। জজসাহেব পর্যন্ত যখন সাক্ষী দেয়, তাঁকে সাক্ষীর বাক্সে নেমে এসে দাঁড়াতে হয়।" (কথামৃত: ৪র্থ: ৩রা অগস্ট, ১৮৮৪)

ঈশ্বরের দিকে জীবের মন যায় না মায়ার প্রভাবে সেকথা বোঝাতে গিয়ে আর একদিন বলেছিলেন, "কেন ঈশ্বরের দিকে মন যায় না? ঈশ্বরের চেয়ে তাঁর মহামায়ার আবার জোর বেশী। জজের চেয়ে প্যায়দার ক্ষমতা বেশী।" (কথামৃত: ৩য়: ৯ই মে, ১৮৮৫)

অহংকার প্রসঙ্গে— "এই অহংকার আড়াল আছে বলে তাই ঈশ্বরকে দেখা যায় না। অহংকার করা বৃথা। এ শরীর, এ ঐশ্বর্য কিছুই থাকবে না। একটা মাতাল দুর্গাপ্রতিমা দেখছিল। প্রতিমার সাজগোজ দেখে বলছে, 'মা যতই সাজো-গোজো, দিন দুই পরে তোমায় টেনে গঙ্গায় ফেলে দিবে।' (সকলের হাস্য) তাই সকলকে বলছি, জজই হও আর যেই হও, সব দুদিনের জন্য।" (কথামৃত: ১ম: ১৯শে অক্টোবর, ১৮৮৪)

ব্রহ্ম ও শক্তির সম্বন্ধ, জগদ্রূপে শক্তির খেলা, অহংমুক্ত ঈশ্বরচেতনা—অধ্যাত্মতত্ত্বের এই বিভিন্ন দিকগুলি জজের উদাহরণ অবলম্বনে শিক্ষিত শ্রেণীর কাছে কতখানি স্বচ্ছ হয়ে উঠতো তা সহজেই অনুমেয়।

সেকালের বাবুসমাজে প্রচলিত বিরক্তির প্রকাশরূপে ড্যাম্ (Damn) শব্দটির ব্যবহারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনবদ্য কৌতুকরসাত্মক গল্পটি স্মরণীয়। ইংরেজী ভাষায় শব্দটি অধঃপাতে যাওয়া অর্থে ব্যবহৃত। ইংরেজপ্রভুদের কাছে বশংবদ বাবুরা এ শব্দটি অনেকবারই শুনতেন। সেই অভ্যাসটি ইংরেজী অনভিজ্ঞ সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগের ফল— "একজন নাপিত কামাতে গিয়েছিল। একজন ভদ্রলোককে কামাচ্ছিল। এখন কামাতে কামাতে তার একটু লেগেছিল। আর সে লোকটি ড্যাম বলে উঠেছিল। নাপিত কিন্তু ড্যামের মানে জানে না। তখন সে ক্ষুরটুর সব সেখানে রেখে, শীতকাল, জামার আস্তিন গুটিয়ে বলে, 'তুমি আমায় ড্যাম্ বললে, এর মানে কি, এখন বল।' সে লোকটি বললে, 'আরে তুই কামা না; ওর মানে এমন কিছু নয়, তবে একটু সাবধানে কামাস।' নাপিত সে ছাড়বার পাত্র নয়, সে বলতে লাগল, 'ড্যাম্ মানে যদি ভাল হয়, তাহলে আমি ড্যাম, আমার বাপ ড্যাম, আমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম। (সকলের হাস্য) আর ড্যাম মানে যদি খারাপ হয়, তা হলে তুমি ড্যাম, তোমার বাবা ড্যাম, তোমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম। (সকলের হাস্য) আর শুধু ড্যাম নয়। ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যা ড্যাম্ ড্যাম্।' (সকলের হাস্য)।"

এই ভাষাবিভ্রান্তির উদাহরণটি বলার উপলক্ষ্য ১৮৮৪ সালের ৬ই ডিসেম্বর অধর সেনের বাড়ীতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ অধর সেনের বন্ধুদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আলাপচারী। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ যখন এক সময়ে একটু থেমেছে, তখন অধরের বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে ইংরেজীতে আলাপ করতে থাকেন। হঠাৎ এই ভাষান্তরে আলাপ দেখে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই গল্পটি মনে পড়ে। (কথামৃত : ৫ম : খণ্ড, পরিশিষ্ট [ক])

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, বঙ্কিমাদির প্রতি)—"কি গো। আপনারা ইংরেজীতে কি কথাবার্তা করছো?" (সকলের হাস্য)

অধর— "আজ্ঞে, এই বিষয়ে একটু কথা হচ্ছিল, কৃষ্ণরূপের ব্যাখ্যার কথা।" একটু আগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, সকলের প্রতি)— "একটা কথা মনে পড়ে আমার হাসি পাচ্ছে। শুনো, একটা গল্প বলি।" — এইভাবেই 'ড্যাম্' শব্দ নিয়ে বিপত্তির গল্পটি এসেছিল। কিন্তু ওই-সঙ্গে একথাও মনে হয় যে, কোনো বিশেষ ভাষায় অনভিজ্ঞ কেউ সামনে থাকলে, তার সামনে সর্বজনবোধ্য ভাষায় কথা বলাই শিষ্টাচার। সেকথা আমাদের ইংরেজীনবীশদের সব সময় মনে থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গল্পটির মধ্যে কি সে-দিকেও একটু কৌতুককটাক্ষ ছিল? [ক্রমশঃ]

"ইংরেজী 'গড্' (God) শব্দ ধর, উহাতে যে ভাব প্রকাশ করে, তাহা নিতান্ত সীমাবদ্ধ। যদি উহার অতিরিক্ত কোন ভাব ঐ শব্দ দ্বারা বুঝাইতে ইচ্ছা কর, তবে তোমাকে বিশেষণ যোগ করিতে হইবে—যেমন সগুণ (Personal), নির্গুণ (Impersonal), পূর্ণ বা পরম (Absolute) ইত্যাদি। অন্য সব ভাষায় ঈশ্বর-বাচক যে-সকল শব্দ আছে, সে সম্বন্ধেও এই কথা খাটে; ঐগুলির অতি অল্প-ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি আছে। কিন্তু 'ওঁ'—শব্দে উক্ত সর্বপ্রকার ভাবই রহিয়াছে। অতএব উহা প্রত্যেকের গ্রহণ করা উচিত।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা

স্বামী সারদেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি-রচয়িতা, শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা-প্রাপ্ত ভক্ত, শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণাশ্রিত সন্তান অক্ষয়কুমার সেনের জন্মস্থান ময়নাপুর গ্রাম জয়রামবাটী হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। সেন মহাশয় শেষজীবনে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া জন্মভূমিতে বসবাস করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহ সুস্থ সবল ছিল না, এতদূর হাঁটিয়া জয়রামবাটী আসা সম্ভব হইত না, সেজন্য মা দেশে থাকাকালে মায়ের সংবাদ ও আশীর্বাদ পাইবার জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে ময়নাপুর গ্রাম হইতে জয়রামবাটীতে লোক পাঠাইতেন এবং সাংসারিক অবস্থা খুব সচ্ছল না হইলেও মায়ের সেবার জন্য নানা জিনিসপত্রও পাঠাইতেন। ময়নাপুর অঞ্চলে মহিষের বাথান আছে। অতি চমৎকার ভৈষা ঘি পাওয়া যায়। সেন মহাশয় সুবিধামত সেই উৎকৃষ্ট ঘিও মায়ের জন্য পাঠাইতেন। মাখনের মতো সাদা সেই চমৎকার ঘি গরম ভাতের উপর দিয়া মা সন্তানগণকে হৃষ্টান্তঃকরণে বলিতেন, 'অক্ষয় মাস্টারের পাঠানো ঘি, কেমন সুস্বাদ খেয়ে ছাখো।' মার নিজের ভোগে কতটুকু যাইত কে জানে, কিন্তু নানা দিগ্‌দেশাগত প্রিয় সন্তানগণকে ভাল ঘি খাওয়াইয়া তাঁহার পরম পরিতৃপ্তি। একবার একটি নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবী মেয়ের হাতে সেন মহাশয় মায়ের জন্য জিনিসপত্র পাঠাইয়াছেন; দ্বিপ্রহরে উপস্থিত হইয়া মেয়েটি মাকে তাঁহার ভক্তিপূর্ণ প্রণামসহ জিনিস-পত্র সমঝাইয়া দিল। মা তাহাকে স্নেহ সমাদর করিয়া বিশ্রাম ও স্নানাহারের পর যাইতে বলিলেন।

মায়ের বাড়ীতে কুলি মজুর গাড়ীওয়ালা পালকী-বেহারা ফেরিওয়ালা মেছুনী-জেলে যেই আসুক, সকলেই তাঁর পুত্র কন্যা; সকলেই ভক্তগণেরই মতো স্নেহ আদর পায়। এখানে শুধু জিনিসপত্র টাকাকড়ির বাহ্যিক আদান-প্রদান নহে, স্বার্থপর সাংসারিক রীতির ঊর্ধ্বে নিঃস্বার্থ প্রেমের ব্যাপার; সকলেই তাহা জানে। যে আসে, যে কোন প্রয়োজনেই হউক, মাকে দর্শন করিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া, তাঁহার শুভ স্নেহাশীর্বাদ লাভ করিয়া তাহারই প্রাণ জুড়ায়। সকলেই মায়ের সন্তান, যে কোন উপলক্ষেই আসুক, সুমিষ্ট সম্ভাষণ, স্নেহাদরে জলখাবার মুড়ি গুড়, না হইলে অন্ততঃ একটু প্রসাদী মিষ্টি জল পাইবেই। আর সেই সকরুণ স্নেহদৃষ্টি যাহা ইহ-পরকালে আর ভুলিতে পারিবে না, যদি বা বিস্মরণ হয়, দুঃখ-কষ্টে পড়িলেই মনে হইবে অভয়াকে, আর মনে পড়িবে তাঁহার অভয় বাণী, কৃপাদৃষ্টি! তাই পরবর্তী কালেও দেখা গিয়াছে—বাহ্যতঃ যাহাদের সঙ্গে ভগবদ্ভাব-ভক্তির মাধ্যমে তাঁহার কোনো প্রকার আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ছিল না, সেজন্য যাহারা তাঁহার সমীপস্থ হয় নাই, তাহারাও তাঁহার করুণার স্নেহ-মমতার স্মৃতিতে আকুল হইয়া নয়নবারি বিসর্জন করিতেছে! ধন্য তাহারা, সার্থক তাহাদের মানবজন্ম। এই যে অন্তরের টান, শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি মমত্ববোধ, আপন মা বলিয়া বোধ, ইহাই তো সারাৎসার বস্তু; জীবের ভববন্ধন, কোটি জন্মের কর্মপাশ মুহূর্তে ছিন্ন হইবে। পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ বলিয়াছেন, 'জেনেই হোক আর না-জেনেই

হোক, যেকোন কারণে ক্ষণকালও ভগবানে মন গেলেই মানবজন্ম সফল।' শ্রীমদ্ভাগবতে পরমহংসাগ্রণী শুকদেব ভগবদ্দ্বেষী শিশুপালের উর্ধ্বগতি লাভ-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 'ভগবানকে যেকোন প্রকারে চিন্তনেই মুক্তিলাভ হয়।' সেই জন্যই তো নরলীলা, মা, তোমার— 'ওরূপ যে দেখেছে, সেই মজেছে, অন্যরূপ লাগে না ভাল !!'

তেল মাখিয়া স্নান করিয়া পেট ভরিয়া প্রসাদ পাইয়া ময়নাপুরের মুটে মেয়েটি পরমানন্দিত। বেলা গিয়াছে দেখিয়া মা তাহাকে অবেলায় চলিতে নিষেধ করিয়া রাত্রেও বিশ্রাম করিয়া যাইতে বলিলেন। মায়ের ঘরের বারান্দায় দরজার পাশেই, সামনে, রাত্রে শোবার ব্যবস্থা হইয়াছে। মেয়েটির বয়স হইয়াছিল, বৃদ্ধাই বলা চলে। ম্যালেরিয়ার রোগী, অনেক দূর হাঁটিয়া, বোঝা বহিয়া আসিয়াছে, বিশেষ ক্লান্ত— রাত্রে আবার একটু জ্বরও হইয়াছে। বেহুঁশের মতো পড়িয়া রহিল। মা ভোররাত্রেই উঠেন— বরাবরের অভ্যাস। আজ দরজা খুলিয়াই বুঝিলেন, মেয়েটি অসাড়ে বিছানা নোংরা করিয়া ফেলিয়াছে। কি উপায়! প্রাতে উঠিয়া অন্যেরা টের পাইলেই তাঁহার দুঃখিনী মেয়ের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার একশেষ হইবে। ভাবিয়া মায়ের চিত্ত ব্যাকুল হইল। মেয়েটি তখনও ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন, মা ধীরে ধীরে তাহাকে জাগাইলেন। মিষ্ট কথায় প্রবোধ ও চুপি চুপি জলপানির জন্য মুড়িগুড় হাতে দিয়া বলিলেন, 'মা, তুমি সকাল সকাল বেরিয়ে গেলে রোদে কষ্ট হবে না।' সে সন্তুষ্টচিত্তে প্রণামান্তর বিদায় নিলে মা স্বহস্তে সব পরিষ্কার করিলেন। গোবর মাটি দিয়া বারান্দা লেপিলেন, চাটাইখানি ভাল করিয়া ধুইয়া পুকুরের পাড়ে মেলিয়া দিলেন, কেহই কিছু টের পাইল না। প্রভাতে উঠিয়া যে যার কাজে ব্যস্ত, কে কার খবর রাখে! ঝি আসিয়া বারান্দা লেপা দেখিয়া বরং খুশীই হইল। কিন্তু অনৈকা প্রৌঢ়া বুদ্ধিমতী ভক্তমহিলা মায়ের বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। এত সকালে কে বারান্দায় 'ন্যাতা' দিয়া গেল— এ বিষয়ে কৌতূহলী হইয়া তিনি অনুসন্ধান করিয়া ক্রমে সব ঘটনা অবগত হইয়াছিলেন এবং অন্তরঙ্গগণের নিকট পরে বলিয়াছিলেন, মায়ের অদ্ভুত এই লীলাকথা।

জয়রামবাটী গ্রামে একটি বালবিধবা ছিল, অতি গরীব দুঃখিনী, মজুরী মেহনৎ করিয়া, গতর খাটাইয়া কষ্টে দিন গুজরান করিত। কবে বিবাহ হইয়াছিল, স্বামী কিরূপ, কখন বিধবা হইয়াছে, কিছুই জ্ঞান নাই। যখন একটু বয়স হইল, তখন বুঝিল যে, সে বিধবা, তাহার আর বিবাহ হইবে না, সংসারসুখ ভোগে তাহার অধিকার নাই। ভক্তগণের জিনিসপত্রের বোঝা বহিবার জন্য মায়ের বাড়ীতে তাহার যাতায়াত আছে। মা স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করেন। ক্রমে সে পূর্ণ-যৌবনা হইল, একটি যুবকের সহিত অবৈধভাবে মিশিবার ফলে ব্যাপার বহুদূর গড়াইয়া জানাজানি হইল। হৃদয়হীন সমাজপতিগণ এতকাল এই অনাথার কোন খোঁজ খবর রাখেন নাই। তাহাকে সৎশিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থাই করেন নাই, এইবার দুঃখিনীর প্রতি তাহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়িল। মাতব্বরগণ মিলিয়া যুক্তি পরামর্শ করিলেন। অভাগিনীর গঞ্জনা-লাঞ্ছনা চলিল। জয়রামবাটী গ্রামে পল্লীর রীতিনীতি অনুযায়ী এই ব্যাপার লইয়া তুমুল আলোচনা দলাদলির সূত্রপাত হইল। মা সব কথা শুনিয়া সেই অভাগিনী কন্যার ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া অত্যন্ত দুঃখিতা ও চিন্তিতা হইলেন। কিন্তু ভগবানের নিকট প্রার্থনা ভিন্ন তিনি আর কি করিতে পারেন!

ভগবানের করুণা হইল। মায়ের কৃপাপ্রাপ্ত সন্তানস্থানীয় জমিদারের একজন হস্তক্ষেপ করিয়া গোলমাল মিটাইয়া দিলেন। গ্রামে শান্তি হইল।

মা শুনিয়া আশ্বস্তা হইলেন, হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কয়েক দিন পর তাঁহার সেই জমিদার-সন্তানটি প্রণাম করিতে আসিলে প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে স্নেহাশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "বাবা! দুঃখিনীকে বাঁচিয়ে দিয়েছ, রক্ষা করেছ, শুনে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হয়েছে। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।"

যাহাদের আমরা অতি অধম বলিয়া ঘৃণা করি, তাহাদেরও ভালবাসিয়া তাহাদের বিপদের সময় এই সমবেদনা, এই অপার স্নেহ জগজ্জননী ছাড়া, 'জন্ম-জন্মান্তরের মা', 'সতেরও মা, অসতেরও মা' ছাড়া আর কে দেখাইতে পারে! [ক্রমশঃ]

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর স্মৃতিকথা*

স্বামী ভূতেশানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলী! আজকের এই পবিত্র দিনে স্বামী সারদানন্দ মহারাজের সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্যে এই আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ বিশেষ করে অনুরোধ করেছিলেন; আমি বার বার তাঁকে জানিয়েছি, আমার অসামর্থ্য এ-বিষয়ে। স্বামী সারদানন্দ মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত বলে আমাকে এই সভায় তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন, তাতে আমার ভেতরের সংকোচ যেন আরো বাড়িয়ে দিলেন। বলা বাহুল্য, স্বামী সারদানন্দের পদপ্রান্তে বসবার সৌভাগ্য কিছু কিছু হয়েছে, কিন্তু তাঁকে কতটা বোঝবার চেষ্টা করেছি তা বলতে পারি না— এসেছি, তাঁর পায়ে প্রণাম করেছি, কাছে বসেছি, হয়তো কিছু কথাও শুনেছি, কিন্তু বুদ্ধিও পরিপক্ব ছিল না এবং সে সব কথা বোঝবার চেষ্টাও বিশেষ করেছি যে, তাও নয়। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে মুগ্ধ হ'য়ে তিনি যা বলছেন, তা শুধু শুনে গেছি। তাঁর পদপ্রান্তে বসে আছি— এই সার্থকতাটুকুই মনে আসছে, আর কিছু তখন ভাবিনি, যদি কোন দূর কল্পনাতেও মনে আসতো যে, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে, তা হ'লে নিজেকে তখন থেকে তৈরি করতুম। সে কথা মনে ওঠেনি, এখনও পর্যন্ত ওঠে না। তাঁর সম্বন্ধে লেখবার জন্য অনেকে বলেছেন, অনুরোধ করেছেন—কারুর অনুরোধ রক্ষা করতে পারিনি। কারণ তাঁকে নিজে বোঝবার চেষ্টা করিনি— অপরকে বোঝাবো কেমন করে? তাঁর পদ-প্রান্তে যখন এসেছি, একেবারে নিজেকে বালকের মত বোধ হয়েছে, এখনও হয়। যখনই আসি, ঐ উদ্বোধনের বাড়ীটিতে যখন প্রবেশ করি, সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরোণো বালকটি যেন জেগে উঠে— আর সব ভুলে যাই। কাজেই তাঁর সম্বন্ধে বলতে আমাকে এত জোর করে অনুরোধ করায়, খুব আমি সংকোচ বোধ করছিলুম, কিন্তু তবু রেহাই পাইনি। তাই কোন কথা গুছিয়ে বলার চেষ্টা না করে, মাত্র দু'চারটি কথা যা মনে আসবে, খুব সংলগ্ন হবে না, অসংলগ্ন বিচ্ছিন্ন স্মৃতি-কণাগুলি আপনাদের কিছু পরিবেশন করবার চেষ্টা করবো।

কখনো সাধারণ সভায় মহারাজ সম্বন্ধে বলিনি —মহারাজ বলেই আমি বলি এখন, আপনারাও সেইভাবেই বুঝে নিন—আমি স্বামী সারদানন্দ

* ১৮ই জানুআরি ১৯৭০, শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের 'সারদানন্দ হলে' প্রদত্ত ভাষণ—শ্রীসমীরকুমার রায় ও শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত।—সঃ

মহারাজকে লক্ষ্য করে বলছি। মহারাজ সম্বন্ধে আমাদের একান্ত অন্তরঙ্গ, সাধু ব্রহ্মচারীদের কাছে কখন কখন দুই একটি পুরোণো স্মৃতি উল্লেখ করেছি মাত্র, কোন সুসংবদ্ধ বক্তৃতা হিসাবে কিছু বলিনি। তবে এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁরাও সেই ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে মনে করে, দু-চার কথা যা মনে আসবে তা বলবো, আপনারা তার প্রাসঙ্গিকতা আছে কিনা লক্ষ্য করবেন না, অপ্রাসঙ্গিক হ'লে কিছু মনে করবেন না, মাত্র এই কথাগুলি থেকে আপনাদের যদি কিছু গ্রহণ করার থাকে তা নেবেন— বাকি ভুলে যাবেন। আমি বক্তা হিসাবে বলছি না।

তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমি আগেই বলেছি, কখনও বিচার করে দেখিনি। এখনও করি না। ব্যক্তিত্ব বুঝি না, আসতুম যখন, দেখতুম— বেশীর ভাগ ঐ ছোট বাসবার ঘরটিতে বসে থাকতেন— দরজার কাছে; আমরা এসে বসতুম —ছোট তখন। প্রণাম ক'রে বসে আছি, কথা হচ্ছে, সব কথা যে মন দিয়ে শুনছি, বুঝছি, তা নয়। কখন কখন সেইখানে নিজেদের খেয়ালে চোখ বুঁজে ধ্যান করতে লেগে গেলুম। আবার তিনি বলতেন: 'যা না, ধ্যান করতে হয় তো, ঠাকুরঘরে যা।' ঠাকুরঘরে ধ্যান করা যেমন, তাঁর কাছে বসে ধ্যান করার আকর্ষণ যে তার চেয়ে কম জিনিস নয়, সে কথা বলার ধৃষ্টতা হয়নি। সেখানে বসে দেখেছি, কলকাতার নানা লোক আসতেন—তাঁদের নিজেদের নানা রকমের অশান্তির বোঝা নিয়ে আসতেন এবং সব বোঝা তাঁর পদপ্রান্তে নিবেদন করতেন। আমরা তখন ছোট,—সংসারের এত দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে কিছুমাত্র পরিচয় নেই। মনে হোত যে, এঁরা কেন সাংসারিক কথা এত ক'রে বলেন, আর মহারাজও সমস্ত নির্বিকার চিত্তে শোনেন। ভাল লাগতো না। কখন কখন ভেতরে অভিমান হ'তো, আমরা কি এসব কথা শোনবার জন্যে এসেছি। তিনি যে কেবল দু'চারটি ছেলেকে আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে দেবার জন্য মাত্র বসে নেই, তিনি বসে আছেন যারা তাপিত, যারা এই সংসারে দুঃখকষ্টে নানা রকম যন্ত্রণা ভোগ করছে, তাদের সকলের সেই যন্ত্রণার লাঘব করবার জন্যে— এ কথা বোঝার সামর্থ্য ছিল না। তাই ভাল লাগতো না। আমাদের যে ভাল লাগতো না, তিনি যে তা বুঝতেন না তা নয়, তাই আমাদের জন্যে আবার দয়া করে একটু কথার মোড় ঘোরাবার জন্যে বলতেন— 'এই ডাক্তার এসো না এদিকে!' ডাক্তার মানে স্বামী পূর্ণানন্দ— প্রাচীন সাধু, তাঁকে হয়তো আপনারা অনেকেই দেখেননি। তিনি সদর দরজা দিয়ে ঢুকে অপর প্রান্তে যে ছোট্ট ঘরটি পাওয়া যায়— যেখানে এখন নানা জিনিসের গুদামের মত, অনেক সময় আমরা যেখানে জুতোটুতো রেখে তারপর উপরে যাই — সেই ঘরটিতে তিনি থাকতেন, বড় একটা ঘরের বাইরে আসতেন না— জপধ্যান নিয়ে থাকতেন বেশীর ভাগ সময়। মহারাজ তাঁকে বলতেন, 'এসো না এদিকে'। তিনি বুঝতেন, কেন তাঁর ডাক পড়েছে। এসে সৎ-প্রসঙ্গ কিছু তুলতেন। তখন অন্ততঃ সেই সময়ের জন্যে একটু কথার মোড় ফিরতো। আমরা বুঝতে পারি, সেটা আমাদের জন্যে— আমাদের মত যারা সংসারে অনভিজ্ঞ এবং তাঁর কাছে এসেছে অন্য জিনিস আকাঙ্ক্ষা ক'রে, তাদের জন্যে ঐ ভাবে কথার মোড় ফেরাতেন। কিন্তু এখন অনেক দিন পরে, সংসার সম্বন্ধে সাক্ষাৎ না হ'লেও পরোক্ষ অভিজ্ঞতা কিছু হওয়াতে, বুঝতে পারছি, কত বড় একটা প্রয়োজন তিনি সকলের মেটাতেন,—ঐভাবে ওখানে স্থির হ'য়ে বসে থেকে। নিজে কথা যে বেশী বলতেন, তা নয়। কিন্তু যাঁরা এসে তাঁর কাছে নিজেদের দুঃখ নিবেদন করতেন, তাঁরা

সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের বোঝার ভার যে লাঘব হচ্ছে তা বুঝতে পারতেন। ফেরবার সময়—যে মানুষটি এসেছিলেন, সে মানুষটি আর ফিরতেন না—ভেতরে শান্তি নিয়ে ফিরে যেতেন।

এই কথা ভেবে এখন মনে হয়, এই ছোট্ট পরিবেশের ভেতরে কি যে এক বিরাট অবদান তিনি দিয়ে গেছেন, কত লোককে যে তিনি শান্তি দিয়েছেন, তার আর ইয়ত্তা নেই—ভেবে মুগ্ধ হই। তিনি সংসারবিরাগী, কিন্তু সকলের সংসারের বোঝা নিজের মাথায় নিয়ে চলেছেন—মায়ের সেবক। মা তাঁর দেহসম্বন্ধে যাঁরা তাঁর সাক্ষাৎ পরিবারবর্গ তাঁদের বোঝা তো নিয়েছেনই, তা ছাড়া বিশাল জগতের যাঁদের মায়ের স্নেহের প্রয়োজন— মায়ের কাছ থেকে যাঁদের সাহসের প্রয়োজন— মায়ের কাছ থেকে যাঁদেব প্রয়োজন একটি নিরাপদ অঞ্চল, তাঁরা যেমন মার কাছে এসে শান্তি পেয়েছেন, মায়ের সেবক সেই ধারা ঠিক বজায় রেখে চিরকাল এইভাবে সকলকে শান্তি দিয়ে গেছেন— এক ভাবে বলতে গেলে, তখনই আমাদের মনে হতো — যেন মা-ই রূপান্তর নিয়ে বসে আছেন। ঠিক মা! পুরোপুরি মা! তাই তাঁর বাহিরের গাম্ভীর্যের আবরণ আমাদের এতটুকু ভয়ের উদ্রেক করত না। সত্যি সত্যি আমরা তাঁকে মা বলে দেখতুম। মায়ের কাছে আবদার চলে। মায়ের কাছে সন্তানের চাহিদা অনায়াসে মেটে। তাই আমরা সেই চাহিদা নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছি। বাণীর দ্বারা উচ্চারণ না করেও আমাদের যা দরকার তা পেয়েছি। অনেক সময় আমরা যে উপদেশ চাইতুম, তা নয়। একটা অগাধ স্নেহের সম্বন্ধ যেন আপনা থেকে সকলকে আচ্ছন্ন করে রাখতো। এইটি হচ্ছে অন্তরের অভিজ্ঞতা। বক্তৃতার ভেতর দিয়ে কি ক'রে বোঝানো যায় জানি না; এই জন্ত বোঝাতে চাই না, চেষ্টা করি না। মাতৃত্বের প্রকাশ তাঁর মধ্যে দেখেছি, আমাদের অনুভবগম্য হয়েছে বার বার— স্নেহ পেয়েছি অগাধ। কখনো হয়তো ধমকও খেয়েছি— ছোটখাট; কিন্তু কখনো তাঁর কাছে থেকে যাকে বলে তীব্র ভর্ৎসনা তা পাইনি। কোন দোষ বা কোন বালসুলভ ত্রুটি হলে, তাঁর আদরের ভর্ৎসনা ছিল 'বাঁদর'। বলতেন 'বাঁদর'। সেই 'বাঁদর' বলবার মতো আপন জন কারো বেশী দিন থাকে না। তিনিও বেশী দিন স্থূল শরীরে রইলেন না। কিন্তু সেই মিষ্টি সম্ভাষণ এখনো কানে প্রতিধ্বনিত হয়। আপনাদের মধ্যে সকলের না হোক কারো কারো নিশ্চয় তাঁর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়েছে। তাঁরা মনে হয় এই রকম অনুভব নিশ্চয় করেছেন তাঁর কাছে, কাজেই তাঁরা আমার কথা খুব ভাল করে উপলব্ধি করবেন। এমন হয়েছে, কোন একটা প্রশ্ন করেছি যা হয়তো অবান্তর। ভর্ৎসনা করে বললেন — 'বাঁদর'। কিন্তু তারপর মিষ্টি করে বুঝিয়ে মনের যা সংকোচ সংশয় তা দূর করে দিলেন— এ রকম অনেক সময় ঘটতো। তাঁর সান্নিধ্যে এই জিনিসটি আমরা খুব অনুভব করেছি। আমরা খুব ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর কাছে বেশী দিন থাকবার সুযোগ পাইনি। মনে হয় এখন যে, আমাদের মধ্যে সে-আগ্রহ থাকলে সে-সুযোগ তিনি দিতেন, বঞ্চিত করতেন না। কিন্তু তখন সে-আকাঙ্ক্ষা মনে জাগেনি। তখন মনে হত, যেন তাঁরা চিরকাল থাকবেন। সুতরাং এ তো হাতের পাঁচ যখনি বলবো তখনি পাবো। অমূল্য জিনিস হাতের খুব কাছে পেলে মানুষের এই রকম মনে হয়। যেন খুব সুলভ, ইচ্ছা করলেই পাওয়া যায়— যেন চিরকালই পাওয়া যাবে। কে জানতো যে, আমাদের বাল্য চিরকাল থাকবে না! কে জানতো যে, এ সংসারে পরিবর্তন সর্বদা ঘটছে।

আজ যে পরিবেশ আছে কাল তা থাকবে না, এ কথা মনে হত না।

তিনি সর্বংসহা ধরিত্রীর মত কত অত্যাচার সহ্য করেছেন। কত পাগলকে নিয়ে তিনি ঘর করেছেন—আক্ষরিক অর্থে। অনেকগুলি পাগল তাঁর পোষা ছিল। আবার সেই পোষা পাগলগুলির কারো পাগলামির মাত্রা যখন বেড়ে যেত, তখন তিনি হয়ত বলতেন, 'ওরে সাতু, এ বুড়িটা কয়েকদিন কিছু খাচ্ছে না; একে একটু ওষুধ এনে দে!' পাগলামি বেড়ে গেছে কখন, সেদিকেও তাঁর দৃষ্টি থাকত। একটি লাঠি হাতে করে মাথায় পাগড়ী বেঁধে কেউ বলছে, 'মহারাজের দরোয়ান।' যত পাগলের তিনি হচ্ছেন রক্ষক, তিনি তাদের পোষণ করছেন, তাদের সমস্ত অত্যাচার থেকে রক্ষা করছেন। অদ্ভুত ব্যাপার। আমরা যারা তখন মঠে থাকতুম, ঠাট্টা করে বলতুম, 'উদ্বোধন ত পাগলের আড্ডা'। সত্যি পাগলের আড্ডা। কত পাগলের মেলা! তখন জানতুম না যে, এতগুলি পাগলের অভিভাবক হওয়া কত কঠিন; এতগুলি পাগলকে নিয়ে ঘর করা, তাদের জন্য এত চিন্তা করা, তাদের কল্যাণ—ইহকাল পরকালের কল্যাণ—এমন করে দেখা, এ আর কে করবে! কার সামর্থ্য আছে? ইচ্ছা করলেও কে করতে পারে? মাত্র নীলকণ্ঠই সমস্ত জগতের বিষকে হজম করতে পারেন, আর কারো সাধ্য নেই। মহারাজ যে-ভাবে সকলের বিষকে নিঃশেষে গলাধঃকরণ ক'রে তাদের শান্তি দিয়েছেন, তাঁর স্থান নীলকণ্ঠের মত। ধীর স্থির অচঞ্চল, যত কিছু ঝড়-ঝাপটা ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, কিন্তু তাঁর সেই অতুল গাম্ভীর্যের একটুও হানি হচ্ছে না তাতে। কতদূর স্থৈর্য যে, সেই খুঁটির মত বসে আছেন—একটু স্থূল শরীর—স্থির হয়ে বসে থাকতেন। চঞ্চলতা একটুও নেই—শরীরেও নেই, মনেও নেই। অথচ সেই অচঞ্চল পর্বতের কাছে এসে লোকে যখন তাদের দুঃখ নিবেদন করছে, তখন তারা পাষাণের কাছে নিবেদন করছে না। সকলে তাঁর ভেতর থেকে এমন একটি মৌন সহানুভূতি পাচ্ছে যে, তাদের সমস্ত সন্তাপ জুড়িয়ে যাচ্ছে। কত রকমেরই না লোক, আর কত রকমেরই না তাদের প্রকৃতি নিয়ে তারা আসছে! সকলের সেখানে অবাধ অধিকার। অপরে বিরক্ত হতে পারে, তিনি বিরক্ত হতেন না; আর আমাদের আবদার—তাও কি কম সহ্য করেছেন!

মহারাজের বাত হয়েছে। বাতের জন্যে চলতে কষ্ট হয় বড্ড। আমরা তখন এই বাগ-বাজারেই একটি আশ্রম তৈরী করেছিলাম—জ্ঞান মহারাজের আশ্রম বলে প্রচলিত ছিল জায়গাটি—তাতে তিন তলার ওপর ঠাকুরঘর। মহারাজকে নিমন্ত্রণ করলাম, আমরা 'মহাবীরের পূজো করব, আপনাকে যেতে হবে।' 'হ্যাঁ বাবা, যাব।' গেলেন। সরু সিঁড়ি, তিন তলার ওপর উঠতে হবে; বাতের কষ্ট এত যে, হেঁটে উঠতে পারছেন না। হামাগুড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছেন—দেখে যারপরনেই কষ্ট হল আমাদের, মনে হল কি অন্যায় করেছি! কিন্তু তাঁর একটুও বিরক্তি নেই। অত কষ্ট করে গেলেন সেখানে; কেন? আমাদের একটু আনন্দ দেবার জন্যে, আমাদের তৃপ্তি হবে এই জন্যে। ছোটখাট ব্যাপার, হয়তো এটা কিছু বইয়ের পাতায় লেখবার মত জিনিস নয়, কিন্তু মনে করুন, যারা তাঁকে আপনার বলে মনে করছে, তাদের মনের ওপর কি রকম প্রতিক্রিয়া হয়। এই হল তাঁর স্বভাব। নিজের কষ্টের জন্য তিনি অপরের আবদারকে উপেক্ষা করতে জানতেন না কখনও।

প্রত্যেককে তার নিজের প্রকৃতি অনুসারে এগিয়ে নিয়ে যেতেন তিনি। আমরা সাধু হব, এই দৃঢ় ভাবনা রয়েছে, নিশ্চিত সিদ্ধান্ত

রয়েছে। সেইভাবে তিনি আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের একটি বন্ধু, খুব সৎ প্রকৃতি এবং ত্যাগের ভাব রয়েছে। মহারাজকে বললে, 'মহারাজ, আমি সংসার ত্যাগ করে মঠে যোগ দোব।' তিনি বললেন, 'বাবা, সন্ন্যাস সকলের জন্য নয়।' আমরা শুনে অবাক হয়ে গেলুম,—এমন ত্যাগী ছেলেটি, আর মহারাজ এমন করে তাকে কেন বারণ করলেন? যাকে বারণ করলেন তার মনে এজন্যে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হল না। কারণ, এত স্নেহের সঙ্গে বললেন। পরে তিনি গৃহস্থ হয়েছিলেন—আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, বলেছিলেন, 'ভাই এতদিনে বুঝতে পারছি, মহারাজ যে আমার ভবিষ্যৎকে কি রকম স্পষ্টভাবে দেখতেন, তখন আমরা তা বুঝতে পারিনি।' ঠাকুর যেমন মাষ্টার মশাইকে বলেছেন: তোমার তো সব আমি জানি; তোমার অতীত, তোমার বর্তমান, তোমার ভবিষ্যৎ— আমি তো সব জানি! এরকম না জানলে ঠিক এইভাবে সকলকে গড়া সম্ভব নয়। এ কেবল কল্পনার কথা নয়, মাত্র কতকগুলি theory —এ নয়, একেবারে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, অনুভব থেকে তিনি আমাদের এগিয়ে নিযে যাচ্ছেন। দেখে বোঝা যায়।

আমাদের আর একটি বন্ধু, অতিশয় সৎ-প্রকৃতি, অসুস্থ হয়ে তিনি মহারাজেরই নির্দেশে হাসপাতালে ভর্তি হলেন। মহারাজ তখন কাশী গেলেন। কাশী থেকে ফিরছেন। হাওড়ায় পৌঁছেই তিনি তাঁর সেবককে বললেন, 'তুমি এক্ষুণি হাসপাতালে যাও, খবর নিয়ে এস।' খবর নিতে গিয়ে দেখেন সেবক যে, ভক্তটি "গুরুদেব, গুরুদেব" বলতে বলতে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। এ-শব্দ তাঁর কানে পৌঁছুচ্ছে এবং তাঁকে অস্থির করে তুলছে। তাই জন্যে সঙ্গে সঙ্গে তিনি খবর করতে পাঠালেন। সাধারণ গুরু নয়! সাধারণ গুরু কতকগুলি মন্ত্র পড়ে দিয়ে গুরুগিরি করেন— এ তা নয়। সন্তান তাঁর! যাকে বলে বাংলায় নাড়ীর সম্বন্ধ; তার চেয়েও বেশী। আত্মার সম্বন্ধ! এইভাবে তিনি তাঁর সন্তানদের রক্ষা করতেন তাঁর সন্তানদের কথা ভাবতেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করতেন।

আমার জীবনের আর একটি ঘটনা বলছি—আপনাদের কাছে বলতে আমার খুব সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে। কারণ, তাঁর কথা বলতে গেলে আমার নিজের কথা যে অনেক এসে যায়, যেগুলো এইভাবে পরিবেশন করার মত কথা নয়। উপায় নেই। একবার মনে হল যে,— আরও গোড়ার কথা বলছি— ব্রহ্মচর্য নিতে হবে; যেয়ে বললুম, 'মহারাজ, আমি ব্রহ্মচর্য নোব।' হেসে বললেন, 'হ্যারে, ব্রহ্মচর্য তো আমি দিই না; তা যা, মঠে যা, গিয়ে মহাপুরুষ মহারাজকে বল।' আমি বললুম, 'আমি মহাপুরুষ মহারাজকে ভয় করি, বলতে পারি না।' 'সে কি রে! মহাপুরুষ মহারাজকে ভয় করিস কি! আচ্ছা যা, জ্ঞান মহারাজকে গিয়ে বল।' 'জ্ঞান মহারাজকে আমি বলব কি, আমি জানি তিনি পছন্দ করবেন না।' মহারাজ বললেন, 'তুই আমার নাম করে বলবি।' জ্ঞান মহারাজকে বললুম। তিনি তখন নিরুপায়। মহাপুরুষ মহারাজের কাছে গিয়ে বললেন। ঠিক হল, ব্রহ্মচর্য হবে। হল।— এ যেন একটা ছেলেখেলা জিনিস আমি চাইলুম— তাঁকে দিতে হবে। মহারাজের দিতে কোন বাধা নেই, দিতে কোন আপত্তি নেই, একবারও বললেন না—'তুই কি যোগ্য এর জন্যে?' প্রশ্ন করলেন না। যোগ্যাযোগ্য বিচার করার কোন প্রয়োজন বোধ করলেন না।

আর একটি ঘটনার কথা বলছি— সাধু তখন, ইচ্ছে হলো কাশীতে গিয়ে শাস্ত্রচর্চা করবো। বললুম, 'মহারাজ আমি কাশীতে পড়তে যাবো।' 'কাশীতে পড়তে যাবে? তা বাপু,— তুমি মঠে

রয়েছ, মহাপুরুষ মহারাজ রয়েছেন, তাঁকে জিগ্যেস করো।' আচ্ছা। মহাপুরুষ মহারাজ তখন বাইরে— তাঁকে চিঠি লিখলুম। তিনি বললেন, 'ছাখো, কতকগুলো ব্যাকরণ-চচ্চড়ি হওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তুমি যদি বেদান্ত পড়তে চাও তাহলে মঠে আমাদের ভাল পণ্ডিত রয়েছেন, তাঁর কাছে বেদান্ত-চর্চা কর, কাশী যাবার দরকার কি?' সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে ঐ আকাঙ্ক্ষা চলে গেল। মহারাজ আমাকে একটা দারুন সঙ্কট থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। তখন ভাল করে বুঝিনি, পরে বুঝেছি— 'শাস্ত্র-ব্যসন' বলে একটা কথা আছে— যে জিনিস অন্যান্য আকর্ষণ থেকে কম নয়। মানুষকে শাস্ত্র-অধ্যয়ন যেমন এগিয়ে দেয়, আবার শাস্ত্র-ব্যসন তেমনি তাকে পেছনে টেনে রাখে- আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। তিনি তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে তা দেখছেন, তাই পছন্দ করলেন না। যদি পছন্দ করতেন, বলতেন— 'হ্যাঁ যাবে বৈ কি!' কত ভাল কাজে, কত শুভ সঙ্কল্পে তিনি কত উৎসাহ দিয়েছেন। সুতরাং সেভাবে বললেন না।

আর এক দিনের কথা বলি: ছেলেমানুষী কথা সব। জয়রামবাটী কামারপুকুর দর্শনে গিয়েছি। তখনকার দিনে চাঁপাডাঙ্গা পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে সেখান থেকে হেঁটে যেতে হোতো কামারপুকুর ২৪ মাইল, জয়রামবাটী ২৭ মাইল। আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে দর্শনে গেছলুম,— ফিরে আসছি,— সঙ্গে জপের মালা ছিল, রাস্তায় চাঁপাডাঙ্গাতে রাত্রিবাস করতে হয়েছে, সেখানে জপের মালাটি হারিয়েছি। সকালবেলায় ট্রেন ধরেছি; ট্রেন চলছে যখন, তখন মালার খোঁজ পড়লো—দেখি যে মালাটি হারিয়েছি। ট্রেন থেকে নেবে পড়লুম। হেঁটে ফিরে এলুম চাঁপাডাঙ্গায়, খোঁজ করলুম, মালা পাওয়া গেল না। সেখান থেকে অনেক হাঙ্গামা ক'রে খানিকটা হেঁটে, খানিকটা ট্রেনে, এইভাবে ফিরতে সন্ধ্যের কাছাকাছি,— মুখটুক শুকনো, এসেছি মহারাজের কাছে। 'মহারাজ আমার মালা হারিয়ে গেছে।' 'বাঁদর! মালা হারিয়ে গেছে তো কি হয়েছে? করে জপ শ্রেষ্ঠ জপ; মালা হারিয়েছে তো হারিয়েছে, আবার একটা মালা করে নিবিখন্।' তারপরের কথা হ'ল, 'ওরে খেতে দে, একে খেতে দে।' সারাদিন খাওয়া হয়নি— উপবাস সারাদিন। মালা হারিয়ে গেছে কি ক'রে খাবো। তিনি ব্যবস্থা করলেন। খাওয়ার মাত্রাটা একটু বেশীই হ'ল। মনের সমস্ত শঙ্কা তো চলেই গেল, শারীরিক অস্বস্তি সেটাও দূর হলো।

আর একদিনের কথা বলছি— তখন মঠে থাকি। কিন্তু মনে যখন শঙ্কা ওঠে, তাঁর কাছে যাই। গেছি— নিজের কোন ব্যক্তিগত সাধন সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছি। তিনি বললেন, 'বোকা, সব কথা আমাকে জিগ্যেস করতে হয়?' আমি একটু অভিমান বোধ করলুম যে, আপনাকে জিগ্যেস করব না তো কাকে করব? তারপরেই বলছেন, 'দেখো বাবা, আমরা কি চিরকাল থাকবো। তোমাদের ভেতরে যা সমস্যা আসবে তার সমাধান তোমাদের ভেতর থেকে চেষ্টা ক'রে করতে হবে। জেনো, আমরা চিরকাল তোমাদের সমস্যার সমাধান করতে আসবো না। তোমাকেই করতে হবে— ভেতর থেকে সমস্যার সমাধান পেতে হবে।' বুঝলুম, একটা কিছু করতে হবে, কিন্তু যা করবার জন্যে আমাদের প্রস্তুতি নেই। কিন্তু আগেই বলেছি, এমন দিন আসবে, যখন তাঁর সাক্ষাৎ সাহায্য পাওয়া যাবে না— একথা তখন ভাবতেই পারিনি। কাজেই তাঁর কথাগুলো শুনলুম বটে, কিন্তু তত মনের ওপর কোন রেখাপাত করলো না। এখন বুঝি, তিনি কিভাবে ধীরে ধীরে আমাদের স্বনির্ভরশীল করবার চেষ্টা করেছেন— অধ্যাত্মজীবনেও। এইটিই

হচ্ছে শ্রেষ্ঠ গুরুর কাজ। গুরু শিষ্যকে গুরুর ওপরও নির্ভরশীল রাখবেন না। তিনি তাকে স্বনির্ভর ক'রে তুলবেন— যাতে তার সমস্ত সমস্যার সমাধান সে ভেতর থেকে পায়। দেখলুম, তিনি সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন। তা না হ'লে আমাদের সাধ্য কি যে তাঁর আদেশ ছাড়া, একটি পাও নিজেরা চলি, কোন একটা বিষয়ে নিজে থেকে সিদ্ধান্ত করি,— তৈরী হয়নি মন। তৈরী করছেন— গোড়া থেকে তৈরী করছেন— বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, তোমাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে। কখনো মিষ্ট ভর্ৎসনা ক'রে, আবার তার সঙ্গে সঙ্গে ভালবেসে মনের সব গ্লানি মুছে দিচ্ছেন। কেউ যদি তাঁর বোকুনি খেতো, সেটা তার মহাভাগ্য, কারণ তারপরেই পাবে তাঁর অকুণ্ঠ স্নেহ। এটা স্বাভাবিক— চিরকাল এরকম হোতো। কারুর মনেতে দুঃখের স্থায়ী রেখা তিনি রেখে ব্যবহার করতেন না কারুর সঙ্গে। কখনো কারুকে রূঢ় কথা বলেননি, যাতে তার মনে দীর্ঘকাল আঘাত বোধ থাকবে। এই হলো তাঁর বৈশিষ্ট্য। আগেই বলেছি, তাঁকে দেখলে মায়ের মত বোধ হোতো। অনেক সময়ে অনেকে বলতেন— শুনেছি— 'তিনি এত গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন যে, তাঁর কাছে এগোনো যেতো না।' কথাটা আংশিকভাবে সত্য বলে মনে হোতো। বাহিরের আবরণ হিসাবে গাম্ভীর্য ছিল বটে, কিন্তু যারা সাহস ক'রে একটু কাছে এগুতে পেরেছে, তারা সেখানে দেখেছে একটি স্নেহময় মাতৃহৃদয়, মাখনের মত নরম, তার ভেতরে কোথাও কাঠিন্য নেই, এটি প্রত্যেকের অনুভবের জিনিস। অনুভব তারা করেছে যে, এখানে এলে আর কোন ভয় নেই, এখানে এসে যদি ভর্ৎসনাও পায়, তার পেছনেই আসছে অশেষ স্নেহ, কাজেই কোন চিন্তার কারণ ছিল না। আমরা যারা সমবয়সী বন্ধু ছিলুম, আমাদের কেউ সাধু হয়েছেন আবার কেউ—একটু আগে যার কথা বললুম—গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু সকলেরই এক কথা— মন চিরকালের জন্যে তাঁর পায়ে বাঁধা। এবিষয়ে সন্ন্যাসী গৃহস্থের কোন পার্থক্য ছিল না। ভক্তদের মধ্যে এমন একটিও দেখি নাই, যে নিজের জীবনকে তাঁর সম্পর্কে এসে সার্থকতামণ্ডিত ব'লে বোধ না করেছে। সকলকে তিনি সফল করেছেন, তাঁর জীবনে— সকলকে। এটি আমরা আমাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে দেখি।

আগেই বলেছি, তাঁর ব্যবহারে একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, কোথাও রূঢ় ভাব ছিল না। তাঁর মুখ দিয়ে কেউ কখনো অশিষ্ট শব্দ শোনেনি। অনেক সময়ে নির্দোষভাবেও অনেকে শব্দ প্রয়োগ করেন, যে-শব্দের ভেতরে সব সময়ে শিষ্টতার মর্যাদা থাকে না। তাঁর ভাষায় কখনো আমরা, সেরকম অশিষ্ট শব্দের প্রয়োগ দেখিনি। কোন জায়গায় না। ব্যবহারে মাধুর্য, শব্দের ভেতরে অদ্ভুত শালীনতাই দেখেছি। কোন জায়গাতে এমন কোন বাক্য তিনি ব্যবহার করেননি, যা তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কোন দিক দিয়ে অশোভন হয়। এই জিনিসটি সকলের চিরকালের একটা দৃঢ়বদ্ধ ধারণা এবং সকলকে চিরকাল তা আনন্দ দিচ্ছে, দেবে।

তাঁর ওপরে ছিল বিরাট দায়িত্ব। আপনারা জানেন, মা স্বয়ং বলতেন যে, আমার ভার শরৎ বইতে পারে, আর কে বইবে! এক ছিল যোগীন, আর এক শরৎ, সে বইতে পারে। মায়ের ভার যে কি করে তিনি বইতেন, তা তো আপনারা তাঁর সম্বন্ধে কত বই বেরিয়েছে তা থেকে পাচ্ছেন। অকাতরে মায়ের তিনি সেবা করে যাচ্ছেন এবং মায়ের সেবা করবার জন্যে তাঁর অদেয় কিছু ছিল না। কোন সঙ্কোচ এর ভেতরে ছিল না— এতটা অবধি দেওয়া যায়, এমন কোন

সীমা ছিল না। তিনি সন্ন্যাসী হয়েও, গৃহস্থের মত মায়ের ভক্ত-পরিবারদের সকলের বোঝা বইছেন এবং এই বোঝা বইবার ভেতরে কোন বিরক্তির চিহ্ন নেই, কোন জায়গায় নেই। এক কথায় বলতে গেলে সমস্ত কামারপুকুর-জয়রামবাটীর বোঝা যেন তাঁর মাথায়। বলতেন, 'ত্যাখো, কামারপুকুর-জয়রামবাটীর কুকুর বেড়াল পর্যন্ত আমাদের কাছে পবিত্র, আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র।' কুকুর বেড়াল পর্যন্ত। একথাটা শুধু অতিশয়োক্তির মতো একটা কাব্যের ভাষা নয়— এই রকম তাঁর ব্যবহার। যেমন মা তাঁর সন্তানদের আবদার সব সহ্য করেছেন—মায়ের সন্তানও যেন তাঁর এই সব গুণগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন। আসল কথা— তাঁর ভেতরে মা ছাড়া যেন আর কিছু নেই। মা সেখানে এমনভাবে বিকাশ লাভ করেছেন যে, সমস্ত ব্যবহার মায়ের মতোই হয়েছে— মায়ের মতো সমস্ত ব্যবহার এবং তার দ্বারা সকলকে আকর্ষণ, যার ফলে মায়ের স্থূল শরীরের লীলাসংবরণের পর ভক্তেরা তাঁর কাছে এসে তাদের সেই মায়ের অভাব মেটাতে পেরেছে। এত বড় একটা স্থান তাঁকে নিতে হয়েছে। যেন সেইজন্যেই তিনি গোড়া থেকে তৈরী রয়েছেন একদিক দিয়ে।

আবার আর একদিক দিয়ে এই বিরাট রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পরিচালনের গুরুদায়িত্ব তাঁর মাথায়। আমরা দেখেছি, মহারাজের শরীর যখন আছে, তখন এত ভাল করে বুঝতে পারিনি— মহাপুরুষ মহারাজ যখন সঙ্ঘের অধ্যক্ষ তখন দেখেছি, কোন কিছু সঙ্ঘের সমস্যা এলেই মহাপুরুষ মহারাজ বলতেন, 'শরৎ মহারাজকে জিগ্যেস করো, শরৎ মহারাজ যা বলেন সেই রকম করো।' সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা সেখানে। মহাপুরুষ মহারাজ অত এইজন্যে মাথা ঘামাতেন না। তিনি সঙ্ঘ-নেতা, কিন্তু তিনি জানেন যে, শরৎ মহারাজের কাছে গেলে ঠিক ঠিক নির্দেশ সকলে পাবে— এবং তাঁর কাছে সেজন্যে পাঠিয়ে দিতেন। এই যে একটি জায়গা, যেখানে সমস্ত সঙ্ঘের সমস্ত সমস্যার সমাধান মেলে— এ অদ্বিতীয়। এবং এই অদ্বিতীয় ব্যক্তি দীর্ঘকাল ধরে এই বোঝা বয়ে গেছেন— কখনও বিরক্তি প্রকাশ না ক'রে। কোন্ ক্ষেত্রের কথা বলবো? তাঁর সঙ্ঘনেতৃত্ব, সংঘের পরিচালনের কাজ;—তার পরে আর একটি জিনিস দেখুন— শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শকে এমন সুষ্ঠু সঙ্গত বুদ্ধিগম্য করে পরিবেশন করার বিরাট দায়িত্ব তিনি এর ভেতর থেকে নিয়েছেন। লীলা-প্রসঙ্গ তাঁর যে অতুলনীয় অবদান তা লেখা হয়েছে এই উদ্বোধনের ভেতরে বসে। এইখানে বসে, যেখানে সাধারণ লোকের হয়ত একটু স্থির হয়ে চিন্তা করারও অবকাশ মেলে না, তার ভেতর। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এইসব দায়িত্ব-গুলো মাথায় নিয়ে— সঙ্ঘের দায়িত্ব— সাধুদের দায়িত্ব— গৃহস্থ ভক্তের দায়িত্ব - তাদের সংসারের সব সমস্যা তাঁর কাছে উপস্থিত করতো তারা। কত বৃদ্ধা তাদের যা সম্বল ছিল তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখত। কারণ জানত, এইটি একটি নিরাপদ স্থান। তিনি আবার সেইগুলি সব পুঁটুলি বেঁধে বেঁধে এইটা অমুকের— এইটা তমুকের,— এই রকম করে রাখতেন— প্রত্যেকটি জিনিস সযত্নে রাখতেন। কখনও তাদের বলেননি, 'বাপু, আমি এত মাথা ঘামাবো কেন— আমি সন্ন্যাসী, আমার কাছে কেন আসছো?' একথাও না। প্রত্যেকের জন্যে তাঁকে ভাবতে হবে— তাঁর দায়িত্ব। মা তাঁকে তাঁর এই দায়িত্ব দিয়ে গেছেন— কাজেই পালন করতে হবে। যেমন তিনি নিজেকে মায়ের দ্বারী ব'লে বলতেন। মাকে দর্শন করতে যাওয়া —ডাক্তার বলছেন যে, নিতান্ত প্রয়োজন হলে মায়ের কাছে যাবে— তখন মায়ের শরীর খুব অসুস্থ, শরৎ মহারাজের কাছ দিয়ে না হ'লে

যাওয়া যাবে না। একজন সমস্ত বাধা নিষেধ না শুনে যাবেন, মাকে দর্শন করবেনই—উনি দরজা আগলে দাঁড়িয়েছেন—তাঁকে ধাক্কা দিয়ে তিনি ভেতরে ঢুকে গেলেন। একটুমাত্র বিরক্তি নেই। ভদ্রলোক ভক্ত, প্রথমে যাবার সময় হুঁশ ছিল না, ওঁকে ধাক্কা দিয়েই চলে গেছেন—ফিরে এসে পায়ে ধরে বলছেন, 'মহারাজ, ক্ষমা করুন।' 'তুমি ত কোন দোষ করোনি, তুমি মায়ের কাছে যাচ্ছিলে— তোমার মনে মাকে দর্শন করবার প্রবল আগ্রহ ছিল। তা একটু ধাক্কাধুক্কি করেও যদি যেয়ে থাকো, দোস কি?' দোষদৃষ্টি নেই। নিজে খুশীই হয়েছেন মনে হল, বিরক্ত না হয়ে।— এই তো তাঁর কর্তব্য, তিনি করে যাচ্ছেন। কত রকমের দায়িত্ব! কত লোকের সংসারের বোঝা তাঁকে বইতে হচ্ছে! আমরা আগেই বললুম, যখন তাঁর ঐ ঘরটির ভেতর বসে বসে শুনতুম, দেখতুম সব—নানান্ জন, নানান্ রকমের প্রকৃতি—তার ভেতরে কাকেও বিরক্ত না ক'রে, কারও উপরে সহানুভূতি কিছুমাত্র কম না ক'রে, কাকেও বঞ্চিত না ক'রে, তিনি সকলের দুঃখ শুনছেন সকলকে পরামর্শ দিচ্ছেন। সকলের অশান্তির ভেতর তিনি শান্তিসুধা বর্ষণ করছেন, যেমন গৃহস্থের পক্ষে তেমনি সাধুর পক্ষে— চিরকাল এই রকম। এতদিন ধরে এইভাবে কাটালেন— শেষ সময় যখন তাঁর stroke হল—তারপরে, অত অসুস্থতার ভেতরেও ভক্তরা যাচ্ছেন, সাধুরা যাচ্ছেন, খুব বেদনা নিয়ে। তিনি কথা বলতে পারছেন না। কিন্তু কি এক স্নিগ্ধ দৃষ্টি! সেই স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাদের দিকে চাইছেন, যেন তাদের সমস্ত অন্তরের বেদনাকে মুছে দিচ্ছেন। দীর্ঘ প্রায় তেরো দিন, এই রকম রইলেন সেই অবস্থায়—দূর দূরান্তর থেকে ভক্তেরা এসে দেখা করলেন, সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সাধুরা বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে এলেন— সকলকে যেন সুযোগ দেবার জন্যে এই কষ্টের ভেতরেও তিনি শরীরকে ধারণ করে রইলেন, যেন এদের দর্শন না দিয়ে, এদের মনে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা না দিয়ে আমি যেতে পারি না— যেন এই ভাব। এই বেদনার ভেতর দিয়েও এইভাবে তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রইলেন। একজন ডাক্তার, তিনি মঠের ভক্ত ছিলেন না, পরিচিত ছিলেন না—একেবারে অপরিচিত। তাঁর একজন ডাক্তার বন্ধু, যিনি মঠের ভক্ত, তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন মহারাজের অসুস্থতার সময়। মহারাজ নবাগত অপরিচিত ডাক্তারটির দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছেন। তাঁর যেন তার বেশী প্রয়োজন ছিল না। তিনি পরে বলেছেন: ঐ দৃষ্টিই আমাকে অভিভূত করেছে। তাঁর জীবন চিরকালের জন্যে এই সঙ্ঘের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। শেষকালে তিনি বরাবর সঙ্ঘের ঘনিষ্ঠ ভক্তরূপে সেবা করেছেন। মহারাজ তখন কথা বলতে পারছেন না। আর শরীরের কোন অঙ্গ সঞ্চালন করতে পারছেন না—কেবল দৃষ্টি দিয়ে দেখা। ভাবতে পারি কি আমরা— সেই দৃষ্টির মূল্য কী, সেই দৃষ্টির ভেতর দিয়ে তিনি কী সুধা বর্ষণ করলেন, কী আকর্ষণ বিস্তার করলেন, যার ফলে একটি জীবন চিরকালের জন্যে বাঁধা হয়ে রইলো, ঋণী হয়ে রইলো? একথা বোঝানো সম্ভব নয়, অনুভবগম্য। যে অনুভব করেছে, মাত্র সেই বুঝতে পারে।

আরও অনেক তাঁর প্রসঙ্গ আছে। আমাদের আর এখানে বসে সব একসঙ্গে বলা তো সম্ভব নয়। আর আগেই বলেছি এগুলি সুসম্বদ্ধ নয়, এলোমেলো যা মনে এসেছে সেই কথাগুলি পরিবেশন করলুম। আপনারা এর ভেতর থেকে যদি কিছু আকর্ষণ— কোন শব্দের, কোন ঘটনার প্রতি— বোধ করে থাকেন, খুব ভাল। আমার

ভেতর এগুলো যেন টুকরো টুকরো সম্পদ হিসাবে আছে। আমি জানি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করে আমার এই সম্পদ কিছু কমছে না, বরং ভক্ত-সঙ্গে প্রসঙ্গ করার ফলে আমার মন আর একটু হয়তো তাঁর দিকে এগিয়ে যাবে। তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, তাঁর কৃপায় আমাদের সকলের তাঁর প্রতি এবং তিনি যে আদর্শকে তাঁর দেহ মনের ভেতর দিয়ে প্রসারিত করেছেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর প্রতি যেন চিরকাল মতি থাকে। তাঁদের কৃপায় যেন আমাদের জীবন সার্থক হয়।

সারদানন্দ-সঙ্গীত

বাগেশ্রী—একতাল

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

মাতা সারদাতে সদা আনন্দ, 'সারদানন্দ' নমি তোমায়।
ঠাকুর বলেন, 'যীশু-সনে তুমি করিয়াছ লীলা এই ধরায়॥'
ব্রহ্মানন্দ ত্যজিয়া হেলায় আপনা সঁপিলে মায়ের সেবায়
নারীমাত্রই মায়ের মূরতি দেখিয়াছ তুমি মা'র কৃপায়॥
শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের ভার বহিয়াছ শিরে সারাজীবন
অনন্ত ক্ষমা ধৈর্য তোমার হেরিয়া 'স্বামীজী' মুগ্ধ হন।
শ্রীমা কহিলেন, 'নরেনের পর এমন হৃদয় নাই বসুধায়'
হে মোর দেবতা! প্রণমি তোমায়, দাও মোরে দাও শ্রীপদছায়॥

অর্চনা

শ্রীঅবধূত চট্টোপাধ্যায়

অচল আমার অন্তর হোক্ সচল তোমার নৃত্যে হে
শতবিহঙ্গ-কলগুঞ্জনে জাগো এ রিক্ত চিত্তে হে।
চরণপদ্মে সঁপি প্রাণমন; অন্তরে দাও অন্তর-ধন;
দীন ভক্তকে করো প্রপূর্ণ চতুর্বর্গ বিত্তে হে
অচল আমার অন্তর হোক্ সচল তোমার নৃত্যে হে॥

অশুভ জড়তা অপগত হোক্ তোমার শক্তি-স্পর্শনে,
ধন্য হোক্ এ ক্ষুদ্র জীবন তোমার দীপ্ত দর্শনে।
চেতনা আমার রাখো জাগ্রত তোমাতেই যেন থাকি ধ্যানরত,
বিপ্রবহ্নি জ্বলুক অঙ্গে তোমার পৌরোহিত্যে হে
অচল আমার অন্তর হোক্ সচল তোমার নৃত্যে হে॥

'ঈশ্বর কল্পতরু' ও শ্রীরামকৃষ্ণ*

স্বামী বুধানন্দ

(১)

১লা জানুআরি, ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দ।

নানা আশা-নৈরাশ্য, ঘাত-প্রতিঘাত, সুখ-দুঃখ ও দ্বন্দ্ব-সমস্যা বিক্ষুব্ধ আর একটি বছর পেরিয়ে আমরা এসে পৌঁছেছি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অত্যাশ্চর্য কৃপা-বিস্তারের ও অপূর্ব আত্মপ্রকাশে অভয়দানের অবিস্মরণীয় দিনটিতে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী পাঠকগণ জানেন যে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের এই দিনটিতে তাঁর নিদারুণ পীড়ার কিছু উপশম বোধ করায় বেলা তিনটার সময়ে তাঁর শয়নকক্ষ থেকে তিনি নীচে নেবে আসেন। সে দিনটি ছুটির দিন থাকায় অন্যদিনের চেয়ে বেশী ভক্ত-সমাগম হয়েছিল। ভক্তগণ ত্বরায় তাঁর কাছে এসে সানন্দে প্রণাম নিবেদন করলে তিনি ভক্তবীর গিরিশকে জিজ্ঞেস করেন: 'গিরিশ, তুমি যে সকলকে (আমার অবতারত্ব সম্বন্ধে) বলে বেড়াও, তুমি (আমার সম্বন্ধে) কি দেখেছ ও বুঝেছ?' গিরিশ কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে ঠাকুরের পদপ্রান্তে নতজানু হয়ে নিজ হৃদয়ের উদ্বেলিত-ভক্তিতে গদ্‌গদ স্বরে করজোড়ে বলেন: 'ব্যাস-বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেননি, আমি তাঁর সম্বন্ধে অধিক কি আর বলতে পারি?'[১]

গিরিশের অন্তরের সরল বিশ্বাসের গভীরতায় মুগ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ, করুণায় বিগলিত হয়ে গিরিশকে উপলক্ষ্য করে সকল ভক্তগণকে বলেন: "তোমাদের কি আর বলব, আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হোক!"[২]

তারপর প্রেমে ও প্রসন্নতায় আত্মহারা হয়ে ঠাকুর তাঁর দিব্য-শক্তিপূত স্পর্শে একে একে ভক্তগণকে স্পর্শ করতে থাকেন। ঐ স্পর্শের ও তাঁর অব্যর্থ আশীর্বাদের অব্যবহিত প্রত্যক্ষ ফল-রূপে ভক্তগণ সুদুর্লভ আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভে ধন্য হন।

ঠাকুর গিরিশের ভক্তিপূত ঐ কয়টি কথায় এতো যে মুগ্ধ ও আত্মহারা হয়েছিলেন তার একটি কারণ এই হতে পারে না কি, যে ঐ সার্থক স্তুতির আরাব তাঁর স্বরূপ-স্মৃতির সদা-সাধা বীণাটি পূর্ণরূপে ঝংকৃত করে তুলেছিল? তাঁর মধ্যেকার বাল্মীকি-বন্দিত শ্রীরাম, ব্যাস-বন্দিত শ্রীকৃষ্ণ ও গিরিশ-বন্দিত শ্রীরামকৃষ্ণ এককালে পূর্ণরূপে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিলেন। তাই অন্যদিকে যদিও বলার অভ্যেস ছিল। 'আমার আশীর্বাদ করতে নেই', সে দিনে তাঁর ঈশ-হৃদয়ে দয়ার যে প্লাবন এসেছিল তাতে সব কুণ্ঠা ভেসে গিছল। তাই একান্ত অহেতুক কৃপায় স্পষ্ট বলেছিলেন: '...আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হোক।'

ঐ দিনের মহিমা স্মরণ করে সহস্র সহস্র ভক্ত এসেছেন আজ এই মহাতীর্থে, তাঁর অন্ত্যলীলা-স্থলে, তাঁর কৃপার অবারিত দ্বারে। আজ এখানে তাঁকে নিয়ে কত ভজন, আরাধনা ও কথা হবে।

ঠাকুরের শ্রীমুখের কথা: 'যেখানে তাঁর কথা

---

* কাশীপুরে ১লা জানুআরি, ১৯৭৫ তারিখের 'কল্পতরু উৎসবে' প্রদত্ত ভাষণের প্রাক্-চিন্তন-লিখন।

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড (১৩৭৯), পৃঃ ৩৯৪ (কথাসার)

২ তদেব

হয়, সেইখানে তাঁর আবির্ভাব হয়,— আর সকল তীর্থ উপস্থিত হয়।'[৩]

তাই আজকের এই ভক্ত-সমাবেশে তাঁর যে একটি বিশেষ আবির্ভাব হয়ে আছে— যেমন করে অদৃশ্য সৌরভ ফুলে জড়িয়ে থেকে ছড়িয়ে পড়ে— এ প্রতিশ্রুতিটি ঠাকুরেরই দেওয়া।

ভাবছিলুম তাঁকে যদি সশরীরে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যেত,[৪] যদি বলা যেত: আমাদের একটু কিছু বলুন এই বিশেষ দিনটিতে!

এই ভক্ত-আসরে বসে আজ তিনি কি বলতেন?

কিছুই বলতেন না। বলতে পারতেন না। এত ভক্তদর্শনে আনন্দ-বিহ্বল গভীর সমাধিলীন হয়েই থাকতেন। দু-নয়নে শুধু ধারা বইতে থাকতো।

আজকের দিনে তাঁর বিশেষ আবির্ভাবটি এমনি করেই হয়ে আছে নীরবে সম্ভাব্য ভক্ত-চিত্তভূমিতে।

যদিও তাঁকে আজকের আসরে কিছু বলতে পাওয়া গেল না, এটা দুর্ভাগ্যের কিছু নয়। কারণ তিনি সশরীরে জীবিত অবস্থায় তাঁর সকল বক্তব্যের নির্যাসটুকু চিরকালের জন্যে আমাদের দিয়ে গেছেন। এই বিঘূর্ণিত ভূমণ্ডলের সকল আর্ত-জিজ্ঞাসু-অর্থার্থী ও জ্ঞানীর সাধন মর্মস্থলে উচ্চারণ করলেন ঐ দিনে অপ্রত্যাশিত ও সুদুর্লভ আশীর্বাণীটি: তোমাদের আর কি বলব, আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হোক।

এই বিশ্বে এর চেয়ে বড় আশীর্বাণী আর নেই। আর এই আশীর্বাণী উচ্চারণ করেছিলেন স্বয়ং অবতীর্ণ 'নিষ্কারণ-ভকত-শরণ' ভগবান। অধিকারের ভেদ-বিচার করেননি। সকলের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত এই বিশ্ব-উদার আশীর্বাণী আমাদের জীবনের দুয়ারে নিত্য অপেক্ষমাণ অতিথি। অপেক্ষা করে আছে অনুপ্রবেশের অনুমতির জন্যে। ঝুলি ঝেড়ে সব দিয়ে গেলেন। কিন্তু এর কতটুকু নিজ অন্তরের অন্তঃপুরে নিতে চেয়েছি, নিতে পেরেছি? এ প্রশ্নটি স্বতই অন্তরে জাগে।

---

৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪র্থ ভাগ (১৩৭৩) পৃঃ ১৭

৪ পরে মনে হয়েছিল, কি যে তরলমতি ভাবালুতা হচ্ছে! ফুলুই শ্যামবাজারে যখন লোকে বেশী কিছু আঁচ পায়নি, তখনই খোলের তাকুটী-তাকুটী সাত দিন রাত—স্নানাহারের অবকাশ পর্যন্ত মেলেনি। শেষে মামাকে নিয়ে হৃদয়কে কোন প্রকারে পালিয়ে আসতে [illegible] শিহড়ে। (লীলাপ্রসঙ্গ—সাধকভাব (১৩৫৮) পৃঃ ৩৯৭)

১লা জানুয়ারিতে দক্ষিণেশ্বরে আর কাশীপুরে ভক্তদের ভিড় দেখে স্বস্তি-নিঃশ্বসিত এই ভাবনাই হয়েছিল পরে: ভাগ্যিস হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গার ব্যাপারটি সময় বুঝে যাবার ঠিক আগখানিটিতে করেছিলেন। তা না হলে কী সর্বনাশই না হত। সেপাই পুলিশ, দানা-ভক্তের দল— কেউ কি আর রক্ষা করতে পারত সর্বেশ্বরের দেহটিকে?

ঠাকুরের ঐ কালো মা-মণিটি ইচ্ছাময়ী হলেও, তাঁর নৃত্যে ছন্দপতন নেই। যেখানে ভাঙছেন সেখানেও পালনের অন্নকূট নেপথ্য-সঞ্চয়ে রেখে রেখে যাচ্ছেন। ঠাকুর কাশীপুরে এ ইঙ্গিতটি নিজেই করেছিলেন: "যখন অধিক লোকে (তাঁর দিব্য মহিমার বিষয়) জানতে পারবে, কানাকানি করবে, তখন (নিজ শরীর দেখিয়ে) এ খোলটা আর থাকবে না, মার ইচ্ছায় ভেঙ্গে যাবে।" (লীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম ভাগ পৃঃ ৩৭৮)

'খোলটা' কিন্তু মা এখন নিজের গলায় ঝুলিয়ে দুনিয়াময় তাকুটী-তাকুটী নেচে বেড়াচ্ছেন। কর না এখন কত ভিড় করবে!

এইটিই আমাদের বেশ। এর চেয়ে বেশী আমরা বইতে পারতুম কি? সইতে পারতুম কি?

আছেন কাছেই, অথচ জীবন-সংশয় হবার সম্ভাবনা নেই। এর চেয়ে বেশী কৃপা যদি করতে চান, আমরা তো আর বাধা দিচ্ছিনে।

কেন জানিনা, এই কল্পতরু দিনটি নিয়েই, ঠাকুরের এই আত্মপ্রকাশে অভয়দানের দিনটিকে নিয়েই, আমার মনে একটি ভয় উঁকি দেয়।

ভয়টা ছবি হয়ে ভাসে আমার মনে।

কালাকালের তেপান্তর পেরিয়ে অচিন দেশের এসেছেন এক পান্থ। এক হাঁটু ধুলো পায়ে, বসে আছেন দাওয়ায়, অভুক্ত। মুখে কথা নেই। দৃষ্টিতে তিরস্কার নেই। ফ্যালফ্যাল করে শুধু চেয়ে থাকেন।

দুর্মূল্যের দিনের হাড়-কৃপণ সেয়ানা লোক কি-না, তাই ভাবি : একি আপদ! ডেকে জিজ্ঞেস করিনে, খেয়েছে কিনা— যদি নিজের অন্নের ভাগ দিতে হয়!

সারাদিন বসে থাকে। কথাটি বলে না। কি আপদ! বসে আছে, থাকুক্ গে। সব চেয়ে বিশ্রী লাগে ঐ ফ্যালফ্যাল তাকানো-টা— একেবারে যেন অন্তরের ভেতরে ঢুকে গিয়ে কি চায়। তাই আর ওর চোখের দিকে তাকানো হয় না।

দিনের শেষে অন্ধকার যখন ঘনিয়ে আসে, দোর ভেজিয়ে শুয়ে পড়ি। কোথায় পান্থ তখন থাকে জানিনে।

পরদিন আবার সেই পূর্বানুবৃত্তি। এমনি করে দিনের পর দিন।

একদিন ধৈর্য হারিয়ে বলি : যাও আর দাওয়ায় বসতে হবে না। ঐ উঠানের বাইরে কোথাও যেয়ে বসো। তারপর থেকে তাই। দাওয়া থেকে নেবে উঠানের কোণে এসে রোজ বসে থাকে।

নিত্য অভুক্তকে দেখে দেখে হৃদয় কঠিন করে নিয়েছি। অতিথির আসা-যাওয়ায় মনে কোন আবেগের অনুসঞ্চার আর হয় না। এমনি করে বছর ঘুরে আসে। ৩৬৪ দিন পেরিয়ে যায় এমনি করে।

হঠাৎ প্রাণে একটা ব্যথিত ধিক্কারের ধাক্কায় জেগে উঠি মাঝ রাতে। মনে হয় : ধিক্ আমাকে! শাস্ত্রে বলেছে 'অতিথিদেবো ভব।'[৪] আর আমি কিনা একদিনও আমার এই নিত্য-অতিথির কোন সেবা করলুম না! অনুশোচনায় হৃদয় ভরে উঠে। প্রতীক্ষা করে থাকি প্রভাতের—আজ যখন অতিথি আসবেন, তাঁর পা দুখানি ধুইয়ে দেব। তাঁর মাথায় সুগন্ধি তেল দিয়ে স্নান করিয়ে, নতুন কাপড় পরিয়ে, তাঁর গলায় বনফুলের মালা দুলিয়ে দেব। তারপর তাঁকে ষোড়শোপচারে ভুরি ভোজন করিয়ে তাঁর তৃপ্তিতে তৃপ্ত হব।

ভোর হতে ঘর-বার করছি। চেয়ে থাকি পথের পানে, নানা আয়োজনের ফাঁকে ফাঁকে। বহু ব্যস্ততায় উদ্বিগ্ন দিন গড়িয়ে পড়ে অস্তাচলে।

কিন্তু হায়! সে দিন তিনি আর এলেন না। প্রাণের মধ্যে তিক্ত বেদনার জ্বালায় ধক্ ধক্ করতে থাকল তাঁর নিত্যকার ঐ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকাটি!

এটি আমার একটি শংকার ছবি। খুবই ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবু বললুম এই লোভে যে, হয়ত সমবেদনা মিলবে।

আমার নিত্য সাধনের দাওয়ায় বসা অভুক্ত তাঁকে ঘরে এনে আমার সামান্ত ভক্তির 'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং'-ও যদি নিত্য না দিই, আমার ব্যক্তি-জীবনের কলমুখর উৎসবের দিনে তিনি আসবেন কি?

(৩)

একদিনের চোখ-মন-চেতনা ঝল্‌সানো এক ঝলক অত্যুজ্জ্বল প্রকাশকে স্তম্ভিত করে ভক্তগণ এই যে আনন্দ-প্রেরণাদায়ক এক মহোৎসব

---

[৪] তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ১।১১।২

গড়েছেন, এটি সংগঠন-নিপুণ কয়েকজন সাধু-ভক্তের ইচ্ছা-চেষ্টায় হয়নি ; ঠাকুরের ইচ্ছাতেই হয়েছে— তাঁরই কৃপার আকর্ষণে ভক্তগণ বহু পরিবহণ-কৃচ্ছ্রতা সহ্য করে এখানে এসেছেন। তাঁদের এই বাৎসরিক তপস্যাটি যাতে সার্থক হয় তার যোজনা শুধু আজকের উৎসব আয়োজনের উপর নির্ভর করছে না।

আমাদের জীবন-ধারণের ও কর্মনির্বাহের নিত্যকার আলোর প্রয়োজন কালো মেঘের উপর হঠাৎ ঝল্‌সানো বিদ্যুৎ-প্রকাশের দ্বারা মেটে না। আমাদের চাই প্রতি প্রত্যুষে লোহিত পূর্বগগনে উঠে আসা নিত্য সূর্যটি, চিরকালের নির্ভরযোগ্য অনিমেষ সূর্যটি। এই সূর্যটি আছেন বলেই, আমরা রাত্রির অন্ধকারে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুই এই আশ্বাসে যে, জীবনের যোগক্ষেমের ভার রয়েছে নির্ভরযোগ্য হাতে।

ধরুন, যদি সূর্য না থাকতেন, শুধু থাকতো হঠাৎ কোন-কবে বিদ্যুৎ ঝল্‌সানোর সম্ভাবনা, তবে কি জীবনধারণ সম্ভব হত ? না বিদ্যুৎ-প্রকাশই হত সম্ভব ?

ইষ্টদর্শনাকাঙ্ক্ষী আমরা দলে দলে আজ এই 'কল্পতরু' দিনে যখন এই কৃপাতীর্থে আসি, আমাদের অন্তরের গভীরে অস্ফুট একটি আশা-লোভ উঁকি-ঝুঁকি দেয় না কি : হয়ত বা এই দিনে কোন প্রকারে আমাদেরও একটু কিছু হয়ে যাবে ?

কারো কিছু যদি হয়ে গিয়ে থাকে আজ, তিনি ধন্য। যাঁদের কিছু হয়ে যাচ্ছে না প্রতি বৎসরের কল্পতরু উৎসবে যোগ দিয়েও, তাঁরাও ধন্য— কম কিছু নয়। হয়ত বেশীই।

জীবন ক্ষণস্থায়ী। হেঁয়ালিপনার সময় নেই। বুঝতে হবে কল্পতরুর দিনে এখানে এসে এসে যাঁদের কিছু হয়ে যাচ্ছে না, তাঁরাও কেন ধন্য।

কারণটি এই : ঠাকুর বহু কৃপায় আমাদের দৃষ্টি তাঁর একদিনের লোভনীয় বিদ্যুৎ প্রকাশের দিক থেকে হয়ত চিরদিনের লাভজনক সূর্য-প্রকাশের দিকে ফিরিয়ে দিতে চাইছেন।

সত্য-সাধক একদিনের একক্ষণের বিদ্যুৎ-প্রকাশ নিয়ে নিজের জীবনের কতটুকু অন্ধকার দূর করবেন ?* তাঁর চাই চিরকালের সূর্যকে। ১লা জানুআরির বহু মহিমা-মণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণকল্পতরুর মূলে আমাদের অজস্র কোটি প্রণাম। কিন্তু চিরকালের অভাব মেটানোর জন্য চাই আমাদের শাশ্বত কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণকে।

তাই আজকের দিনে দর্শনলোভী ভক্তের ফস্ করে কিছু একটা না-হওয়া তাঁর অকৃপা নয়, কৃপায় না-হওয়া। মনে রাখা ভাল, যাঁদের কল্পতরু-দিবসে কিছু হয়েছিল তাঁরা সকলে গৃহী হলেও, তাঁদের প্রত্যেককে স্ব-ভাব অনুযায়ী সাধন করিয়ে নিচ্ছিলেন ঠাকুর।

আধার তৈরী না হলে ঈশ-আবেশ ধারণ দুর্বিষহ হয়। আধার ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এমন কি তৈরী আধারও হয়তো সবটা সহ্য করে উঠতে পারে না। লীলাপ্রসঙ্গে

---

* এই উপমাটি প্রবন্ধের আদিতে মধ্যে ও অন্তে ব্যবহৃত হইয়া উপমেয় বিষয়টি সুপরিস্ফুট করিয়াছে। তথাপি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি : 'হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যদি আলো আসে, সে কি একটু একটু করে আলো হয় ?—না, একেবারে দপ্ করে আলো হয় ?' (দৃষ্টান্ত) বেদান্তেও বলা হয়—'অহং ব্রহ্মাস্মি'-বৃত্তিতে মন এক মুহূর্তের জন্যও সমাহিত হইলে অনাদি অবিদ্যা তৎক্ষণাৎ এবং চিরকালের জন্য নিবৃত্ত হয়। (দার্ষ্টান্তিক) বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণকথিত দৃষ্টান্তের সহিত প্রবন্ধোক্ত দৃষ্টান্তের কিছুটা সাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ক্ষেত্রের দার্ষ্টান্তিক সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সহজ কথায় প্রবন্ধোক্ত দৃষ্টান্তের দার্ষ্টান্তিক হইতেছে : একটু জ্যোতির্দর্শন, একটু নাদশ্রবণ ইত্যাকার আধ্যাত্মিক অনুভূতির দ্বারা অজ্ঞান চিরকালের জন্য নিবৃত্ত হয় না।—সঃ

বৈকুণ্ঠনাথের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি আন্তরিক সাধন করতেন। তবু কৃপার দুর্বিবহ ভার বইতে না পেরে সভয়ে প্রার্থনা করেছিলেন: 'প্রভু এ ভাবধারণে সক্ষম হচ্ছি না। যাতে এর উপশম হয় তা করে দাও।'[৬] কল্পতরু যখন এ প্রার্থনাও অংশত পূর্ণ করলেন, তখন জীবন হল অনুশোচনাময়।

তা ছাড়া এমন কৃপা সম্ভব হয়, যখন অবতীর্ণ ভগবান সশরীরে বর্তমান এ ধরায়।

যখন তিনি অশরীরী তখন মনে হয়, তাঁর শাশ্বত কল্পতরুত্বকেই আশ্রয় করা আমাদের শ্রেয়স্কর। কিন্তু ১লা জানুআরির বিদ্যুৎ-প্রকাশের রূপাটুকু আহরণ আমরা যথাসাধ্য করে নিয়েই শাশ্বত কল্পতরুর শরণাপন্ন হব।

(৪)

ঠাকুর তাঁর গৃহী ভক্তদের আড়াল করে ত্যাগী ভক্তদের অনেক উপদেশ দিতেন। কারণ, কারো ভাব নষ্ট করতে নেই। ধর্ম-সংস্থাপন স্ব-ধর্মকে মেনে নিয়েই যুগে যুগে করা হয়েছে।

এই 'কল্পতরু-দিবসে' কার্যতঃ ত্যাগীদের আড়াল করে ঠাকুর গৃহী ভক্তদের সুমুখেই মুখ্যতঃ স্বমহিমা প্রকট করেছিলেন।

কেন?

নিছক কৃপায়।

নিজেই ভবতারিণীর নিকট প্রর্থনা করেছিলেন। কথামৃতে শ্রীম লিখেছেন: "ঠাকুর মার কাছে করুণ গদ্গদ স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রার্থনা করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! ভক্তদের জন্য মার কাছে কাঁদছেন—'মা, যারা যারা তোমার কাছে আসছে, তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কোরো! —সব ত্যাগ করিও না মা! —আচ্ছা, শেষে না হয় কোরো!

'মা, সংসারে যদি রাখো, তো এক একবার দেখা দিস্!—না হলে কেমন করে থাকবে। এক একবার দেখা না দিলে উৎসাহ হবে কেমন করে মা!— তারপর শেষে যা হয় কোরো।'[৭]

কত সামূহিক বেদনার কি সকরুণ প্রার্থনা!

যদিও ভক্ত ভোলাতে লীলাচ্ছলে কখনো কখনো বলেছেন: 'নদীরই ঢেউ, ঢেউএর কিছু নদী নয়।' তবু ভাবাবেশে এমন কথাও উচ্চারণ করেছেন: 'মা! আমি না তুমি? আমি কি করি? —না, না, তুমি।'[৮]

এ উক্তির মরমিয়া সত্যকেন্দ্রে যে অঙ্গীকার রয়েছে—যা পরে বহু কৃপায় যাবার আগে হাটে হাড়ি ভেঙ্গে জানিয়ে গিছলেন—তাতে নির্ভরশীল ভক্ত নিঃসন্দেহে জেনেছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ভবতারিণীরই অন্ত-প্রকাশ। তাই যে প্রার্থনা তিনি মাকে করেছিলেন ভক্তদের হয়ে, তা নিজেই পূর্ণ করেছিলেন মায়ের দিক থেকে ১৮৮৬ সালের ১লা জানুআরি। কারণ—'…না হলে কেমন করে থাকবে। এক একবার দেখা না দিলে উৎসাহ হবে কেমন করে মা!'

সেই উৎসাহ-সঞ্চারী দেখা দেওয়াটি এমন করে ভক্তদের উপস্থিতি-সমারোহে করিয়েছিলেন যে, সে দিনটি চিরস্মরণীয়রূপে ভক্ত-মানসে চিহ্নিত হয়ে আছে।

(৫)

কিন্তু কথা আছে! হঠাৎ-পাওয়া অঢেল 'উৎসাহ' একদিনের ভূরি-ভোজন হতে পারে।

---

৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড (কথারূপ) পৃঃ ৩৯৮-৪০০

৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৪র্থ ভাগ (১৩৭৪) পৃঃ ৬১

৮ তদেব পৃঃ ১৫২

কিন্তু নিত্যকার অন্ন নয়। আমাদের তুই-ই চাই। যেমন চাই সাধনপথে এগিয়ে চলার উৎসাহ, তেমন চাই নিত্য পথচলার পাথেয়, রোজকার অন্ন-সংস্থান।

ঠাকুর বহু কৃপায় আমাদের জন্যে এ তু' ব্যবস্থাই করে রেখে গেছেন। তাই এই বিশেষ দিনেও আমাদের শাশ্বত-কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনাও অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বস্তুতঃ, শাশ্বত কল্পতরুর পটভূমিকাতেই, ঐ বিশেষ দিনের প্রকাশ বিধৃত ও তাৎপর্যে ভরপুর হয়ে আছে।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুআরির বহুশ্রুত শ্রীরামকৃষ্ণ-কৃপাকে রামচন্দ্রপ্রমুখ ভক্তগণ "ঠাকুরের কল্পতরু হওয়া" বলে নির্দেশ করেছিলেন। কিন্তু তার বহু পূর্বেই (১৮৮৪, ৩০শে জুন) পণ্ডিত শশধরকে উপদেশ দান প্রসঙ্গে 'ঈশ্বর কল্পতরু'[৯] এ মহাবাক্যটি ঠাকুর উচ্চারণ করেন। ঐ দিনে তিনি 'ঈশ্বর শাশ্বত-কল্পতরু' এ ভাবের ভিত্তিতেই সকল আধ্যাত্মিক তত্ত্বও ব্যাখ্যা করেন। পরেও[১০] (১৮৮৫, ২৮শে জুলাই) যখন এ প্রসঙ্গ করেন ঈশ্বরকে শাশ্বত কল্পতরুরূপেই তিনি ভক্তসমক্ষে উপস্থাপিত করেন।

উল্লিখিত প্রথম দিনে তিনি বলেছিলেন: 'ঈশ্বর কল্পতরু। যে যা চাইবে তাই পাবে। কিন্তু কল্পতরুর কাছে থেকে চাইতে হয়, তবে কথা থাকে।'

একই আসরে এ কথার পুনরাবৃত্তি করে বললেন: 'ঈশ্বর কল্পতরু। তাঁর কাছে থেকে চাইতে হয়। তখন সে যা চায় তাই পায়।'

তুবারই বললেন: "ঈশ্বরের কাছে থেকে চাইতে হয়।"

কাছ থেকে চাওয়া এক কথা, আর কাছে থেকে চাওয়া আর এক কথা। যে ঈশ্বরকে জানিনে শুনিনে, যাঁর অস্তিত্বমাত্র বোধে বোধ হয়নি, তাঁর কাছে কি করেই বা থাকি, আর কি-ই বা চাই।

এ সমস্যার সম্যক্ সমাধান ঠাকুরের উপদেশেই আছে: 'তাঁর (ঈশ্বরের) অবতারকে দেখলেই তাঁকে দেখা হ'লো।'[১১]

অবতীর্ণ ভগবানকে যুগে যুগে ধরায় এসে নিজেকেই বলতে হয়েছে: দেখো গো এই আমি এসেছি! ঠাকুরকেও তাই করতে হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক যুগের গা ঘেঁষে এসেছিলেন বলে, বললেন নরেনকে: বাজিয়ে নে! যুক্তি-পরীক্ষা-নিরীক্ষার নানা প্রকারে বাজিয়ে নিয়ে তবে প্রত্যক্ষদর্শী ঋষি নরেন ঘোষণা করলেন: 'জিস্তুত যুগ-ঈশ্বর জগদীশ্বর যোগ-সহায়' বলে।

আর শ্রীমা বলেছেন, 'ছায়া কায়া এক'। কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তের কোন অচিনদেশের অব্যক্ত পরমেশ্বরের পশ্চাতে ধাবমান হবার প্রয়োজন নেই। তিনি আমাদের ঘরের দাওয়ায় বসে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েই আছেন।

তিনি কাছে থাকতে চান বলেই এসেছেন। আমরাই তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখি। তিনি যে কত কাছে আছেন, সেটি বোঝাতে যেয়ে একদিন ভক্তদের বললেন: "এই দেখো, আমি এই গামছাখানা দিয়ে মুখের সামনে আড়াল করছি আর আমায় দেখতে পাচ্ছ না। তবু আমি এত কাছে। সেইরূপ ভগবান সকলের চেয়ে কাছে তবু, এই মায়া বা আবরণের দরুণ তাঁকে দেখতে পারছ না।"[১২]

---

৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩য় ভাগ (১৩৭৪), পৃঃ ৮১

১০ তদেব পৃঃ ২০২

১১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ (১৩৭৫) পৃঃ ১৯০

১২ তদেব ১ম ভাগ (১৩৭৫) পৃঃ ৭৫

কি আশ্চর্য! ভেবে দেখুন। মায়া বোঝাচ্ছেন স্বয়ং মায়াধীশ। অবতীর্ণ ভগবান নিজের মুখের সুমুখে গামছাখানি ধরে বললেন: "এই দেখ ...আর আমায় দেখতে পাচ্ছ না। তবু আমি এত কাছে।" কত কাছে এসে, কত কৃপায় তিনি বলছেন: "সেইরূপ ভগবান সকলের চেয়ে কাছে··· ।"

একেবারে বিনামূল্যে পাওয়া এই ঈশ-অঙ্গীকারটিতে রয়েছে সাধকের এক অমূল্য অনিঃশেষণীয় সম্পদ্।

ঠাকুরের শ্রীমুখকথিত, "তবু আমি এত কাছে।"—এ বাণীটি যদি আমাদের বিশ্বাসের শক্তিতে ধারণা ও ধারণ করতে পারি, তবেই হবে আমাদের কল্পতরুর কাছে থাকা।

বলেছেন: 'বিশ্বাস হ'য়ে গেলেই হল। বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নাই।"[১৩]

এই কল্পতরুর কাছে থাকাটা সাধক বিশ্বাসঘন স্মরণ-মননের দ্বারা আয়ত্ত করতে পারেন। যাকে খ্রীষ্টধর্মের এক মরমী সিদ্ধপুরুষ[১৪] 'ভগবানের উপস্থিতি অভ্যাস' নামে অভিহিত করেছেন।

(৬)

এখন কথা হল: কল্পতরুর কাছে থেকে চাইতে হবে। কল্পতরুর কাছে যে যা চায় তাই পাবে। এটাই হলো সমস্যা। অফলপ্রসূ প্রার্থনার চেয়ে সফল প্রার্থনায় বিপদ বেশী। কারণ মনে রাখতে হবে, বললেন যাত্রাওয়ালাকে, 'হ্যা, ঐ বোধ, যে বাঘ আসে।'[১৫] এ যে শাশ্বত কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণের কত গভীর করুণায় সাবধান-বাণী —এটি ধ্যানের বিষয়।

কেমন করে বাঘটি এসেছিল ঠাকুরই বলেছিলেন তাঁর এক গল্পে:

ধূধূ করছে এক আপাতপ্রান্তহীন মাঠ। কাঠ-ফাটা রোদ। অনেক ক্রোশ রোদে হেঁটে এক অতিক্লান্ত ঘর্মাক্ত পথিক বসে পড়ল একটি গাছের গা-জুড়ানো ছায়ায়। বসে বসে ভাবছে: আঃ যদি একটা নরম বিছানা পেতুম এই শীতল ছায়ায় কি আরামে একটু ঘুমুতে পারতুম। সে জানতো না, যে-গাছের নীচে সে বসেছে, সেটি একটি কল্পতরু। যেই নরম বিছানার কথা ভাবা, অমনি সামনেই ছড়ানো দেখতে পেলে নরম বিছানাটি। খুবই যদিও আশ্চর্য হল, তবু বিছানায় শুয়ে পড়ল আরামের লোভে। তার কল্পনায় তখন লেগেছে এক রম্য রঙের ছোঁয়া। ভাবলে আহা, এমন সময় একটি যুবতী এসে যদি পা দুটোতে তার কোমল হাত বুলিয়ে দিত! কি আশ্চর্য; দেখতে পেলে এক যুবতী তার পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। খুশীতে তার প্রাণ ভরে উঠল। অনেক পথ হেঁটে পেটে ছিল দারুণ ক্ষুধা। ভাবলে ইচ্ছে মাত্র সব এসে যাচ্ছে। এখন কিছু ভাল খাবার পেলে ক্ষুধাটা মেটে। অমনি দেখলে সামনেই ছড়ানো নানা সুস্বাদু খাবার। পরিতৃপ্তি-সহকারে পেট ভরে খেয়ে, বিছানায় গা এলিয়ে ভাবতে লাগল, এই তাক্-লাগানো ঘটনাগুলির কথা। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে একটা শংকা উঁকি দিল; 'যদি একটা বাঘ হঠাৎ আমায় আক্রমণ করে!' বাস্, অমনি কোত্থেকে এক বাঘ লাফিয়ে পড়ে তার ঘাড়টি অনায়াসে মটকে রক্ত খেতে থাকল। এই ভাবে পথিক হারাল তার প্রাণ কল্পতরুর মূলে।

গল্পের উপসংহারে ঠাকুর বললেন: "সাধারণ

---

১৩ তদেব, পৃঃ ২৮

১৪ Brother Lawrence

১৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, [illegible] ভাগ (১৩৭৫) পৃঃ ১২১

মানুষের ভাগ্যে প্রায় এরূপই হয়ে থাকে। ধ্যানের সময় যদি পরিজন, অর্থ-কড়ি, লোকমান্য এ সব চাওয়া যায়, প্রার্থনার ফল যে কিছু হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে রেখো, ঐ সব পাওয়ার পেছনে ওৎ পেতে আছে বাঘ। আর ঐ সব বাঘগুলি— যেমন রোগ, শোক, সম্মান-হানি, অর্থহানি— বনের বাঘগুলির চেয়ে আরো ভয়ংকর।"[১৬]

এই হল কল্পতরুর কাছে থেকে চাওয়ার বিপদ!

আমাদের ব্যক্তিগত হওয়াটির সঙ্গে ব্যক্তি-বিশেষের চাওয়া-টির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। যে অন্তরে সাধন বা সাধনাভাববশতঃ যে স্তরে যেমনটি হয়ে আছি, আমাদের চাওয়াটি তার চেয়ে উচ্চ-স্তরের ভাল হতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ আক্ষেপ করে গীতায় বলেছিলেন: "প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।"[১৭] জীবগণ নিজ নিজ প্রকৃতিকে অনুসরণ করে। শাসনে কি ফল হবে?

সাধকের কি তা হলে এগিয়ে যাবার কোন উপায় নেই? নিশ্চিতই আছে। সাধককে তার হওয়া-টির চেয়ে উন্নততর প্রার্থনা করতে পারতে হবে। এটি কেমন করে সম্ভব হয়? এটি সম্ভব হয় অবতীর্ণ ভগবানের কৃপায়। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

কৃপাতেই কল্পতরুর কাছে থেকে আমরা সাবধানবাণীটি পেলুম যে: হাঁ, ঐ বোধ, যে 'বাঘ আসে'!

পরমপুরুষার্থ দিতে চান বলেই, পাছে অ-বস্তু চেয়ে নাস্তানাবুদ হই, তাই এত হুঁশিয়ারি।

কল্পতরুর কাছে থেকে চাওয়া নিয়ে আরও একটি সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন ঠাকুর। বলেছেন: "তবে একটি কথা আছে— তিনি ভাবগ্রাহী। যে যা মনে ক'রে সাধনা করে, সেইরূপই হয়। যেমন ভাব তেমনি লাভ। একজন বাজীকর খেলা দেখাচ্ছে রাজার সামনে। আর মাঝে মাঝে বলছে, 'রাজা টাকা দেও, কাপড়া দেও।' এমন সময় তার জিব তালুর মূলের কাছে উল্‌টে গেল। অমনি কুম্ভক হ'য়ে গেল। আর কথা নাই, শব্দ নাই, স্পন্দ নাই! তখন সকলে তাকে ইটের কবর তৈয়ার ক'রে সেই ভাবেই পুঁতে রাখলে! হাজার বৎসর পরে সেই কবর কে খুঁড়েছিল। তখন লোকে দেখে যে একজন যেন সমাধিস্থ হ'য়ে ব'সে আছে! তারা তাকে সাধু মনে করে পূজা করতে লাগল। এমন সময় নাড়াচাড়া দিতে দিতে জিব তালু থেকে সরে এল। তখন তার চৈতন্য হলো, আর সে চীৎকার করে বলতে লাগলো, 'লাগ ভেল্‌কী লাগ! রাজা টাকা দেও, কাপড়া দেও!'"[১৮]

হাজার বছর পরেও কবর থেকে বেরিয়ে এসে এই যে মানুষের 'লাগ ভেল্‌কি লাগ! রাজা টাকা দেও, কাপড়া দেও' বলার ক্ষমতা-স্বীকার, এটি ভগবানের একটি বড় দারুণ পরিহাস!

এ দুটি সাবধানবাণী যদিও আমাদের প্রাণে বাঁচাতে পারে,— অবশ্যি যদি আমরা এ শিক্ষা কর্মে পরিণত করি,— তবু এ দুটি নেতি-বাচক বলে এতেই শুধু আধ্যাত্মিকতার পুষ্টি ও পূর্তি হতে পারে না সাধক জীবনের।

তাই কল্পতরুর কাছ থেকে কি চাইতে হবে না ও কি চাইতে হবে— এ দুটি বিষয়ই সযত্নে

---

১৬ Sayings of Sri Ramakrishna, Sri Ramakrishna Math, 1949, pp. 336-37. এই পুস্তকে প্রকাশিত গল্পের ও উপদেশের ভাবানুবাদ দেওয়া হল এখানে।

১৭ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৩।৩৩

১৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৩য় ভাগ (১৩৭৪) পৃঃ ৮১

শিক্ষণীয়। এ দুটি বিষয়েই ঠাকুর বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। আমাদের প্রাণে বাঁচার প্রয়োজন ও সার্থক সাধন-পুষ্টির প্রয়োজন দুটিই শাশ্বত কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ পুরোপুরি মিটিয়ে রেখে গেছেন।

তাঁর সাবধানবাণীও আমাদের লক্ষ্যে অবহিত করার জন্যেই উক্ত হয়েছে। ঈশ্বর যে নিত্য-কল্পতরু এটিও তিনি সজোরে বিশেষভাবে আমাদের মনে দাগ কেটে বসাতে চেয়েছেন। বলেছেন :

"...তিনি অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম ! তিনি আছেনই, তিনি নিত্য ! তবে একটি কথা আছে— তিনি 'কল্পতরু—'

"কালী কল্পতরু মূলে রে মন, চারি ফল কুড়ায়ে পাবি !

"কল্পতরুর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করতে হয়, তবে ফল পাওয়া যায়,— তবে ফল তরুর মূলে পড়ে,— তখন কুড়িয়ে লওয়া যায়। চারি ফল,— ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।

"জ্ঞানীরা মুক্তি (মোক্ষফল) চায়, ভক্তেরা ভক্তি চায়,— অহেতুকী ভক্তি। তারা ধর্ম, অর্থ, কাম চায় না।"[১৯]

(৭)

ভগবান দেহধারণের অশেষ ক্লেশ স্বীকার করে আমাদের বিক্ষুব্ধ অপরিচ্ছন্ন ধরায় যে অবতীর্ণ হন, এটাই কিন্তু তাঁর কৃপার শেষ কথা নয়। অবতীর্ণ হয়ে যে তিনি 'কর্মকঠোর' যত্নপর হন আমাদের বন্ধনমুক্তি ও আধ্যাত্মিক পূর্তি করতে এটাই তাঁর কৃপার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ।

শিক্ষা দিলেন "কলিযুগে ভক্তিযোগ, ভগবানের নাম গুণগান আর প্রার্থনা। ভক্তিযোগই যুগ-ধর্ম।"[২০]

যেহেতু আমরা কল্পতরুর মূলে বসে আছি, সেই হেতু তিনি সযত্নে এমন সব প্রার্থনা আমাদের শেখালেন যাতে বাধ কিছুতেই না আসতে পারে ; আর যাতে আমাদের আপাত-হওয়াটির চেয়েও উন্নততর প্রার্থনায় সক্ষম হয়ে আধ্যাত্মিক বিকাশের পথে এগিয়ে যেতে পারি। কত কাছে বসে কত প্রেমের সঙ্গে বলেছেন : "...কেঁদে নির্জনে তাঁর কাছে প্রার্থনা ক'রতে হবে, যাতে ঐ কর্মগুলি নিষ্কামভাবে করা যায়। আর বলবে, হে ঈশ্বর, আমার বিষয়-কর্ম কমিয়ে দাও, কেননা ঠাকুর দেখ্‌ছি যে বেশী কর্ম জুটলে তোমায় ভুলে যাই। মনে করছি, নিষ্কাম কর্ম করছি, কিন্তু সকাম হ'য়ে পড়ে। হয়তো দান সদাব্রত বেশী ক'রতে গিয়ে লোকমান্য হ'তে ইচ্ছা হয়ে পড়ে।"[২১]

কি অভাবনীয় ব্যাপার বলুন দেখি ! যিনি প্রার্থনা শুনবেন, তিনিই বলে দিচ্ছেন প্রার্থনাটি কেমন করে করতে হবে। কঠিন যোগ-সাধনার কথা বললেন না সবার জন্যে। অথচ মোক্ষ-সাধনের অব্যর্থ উপায়টি হাতে-কানে গুঁজে দিয়ে গেলেন এক রকম ঘরে চড়াও হয়ে। এটি নিয়ে আমরা কি করেছি ?

তাঁর কথা উদ্ধৃত করে তাঁকেই ধরতে হবে নাছোড়বান্দা হয়ে। বলতে হবে : এ সব যে তোমার শেখানো প্রার্থনা, এ তো আর ব্যর্থ হবার নয়। আমার প্রার্থনাটি আন্তরিক করিয়ে বলাও। পাওনাটি দাও চুকিয়ে। পাওনাটি কি ? দর্শন, ঘরে আনা, কথা কওয়া। তিনি ধরা দিতে চান বলেই ধরায় আসেন ! কাজেই এটি কিছু দুরাশা নয়, কল্পতরুর প্রতিশ্রুত কৃপায়। মনে হতে পারে, বলেও থাকি ভব্যতার খাতিরে :

১৯ তদেব ৩য় ভাগ (১৩৭৪) পৃঃ ২০২
২০ তদেব ১ম ভাগ (১৩৭৫) পৃঃ ৫১
২১ তদেব ১ম ভাগ পৃঃ ৫১

ও সব বহু দূরের কথা! কিন্তু মনে রাখতে হয় তিনি নিজেই বলেছেন: '... ভগবান সকলের চেয়ে কাছে', অর্থাৎ তাঁর চেয়ে আমার কাছে আর কিছু নেই। কাজেই এক হিসেবে এ সব বহু দূরের কথা নয়, সবচেয়ে কাছের কথা।

তা ছাড়া সবচেয়ে বড় কথা, বলেছেন: "ঈশ্বর কল্পতরু। যে যা চাইবে তাই পাবে। কিন্তু কল্পতরুর কাছে থেকে চাইতে হয়, তবে কথা থাকে।"

যাতে বাঘ এসে না পড়ে সে জন্মে কৃপায় ঠাকুর স্বয়ং সাধনাঙ্গ হিসাবে প্রার্থনার উপর খুব জোর দিয়েছেন। কথামৃতে অন্ততঃ ৪০ জায়গায় ঠাকুর প্রার্থনা সম্বন্ধে তাঁর মন্ত্রোপদেশ করেছেন। ঐ সব মন্ত্রগুলি সঙ্কলন করে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী অভ্যেস করলে, নিজ নিজ অনুরাগ আন্তরিকতা অনুযায়ী সকল সাধকেরই প্রভূত কল্যাণ হবেই হবে। আমরা উক্ত যোগ-সাধনে অসমর্থ হতে পারি বা আমাদের পরিবেশ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপের প্রতিকূল হতে পারে বা কিরূপ প্রার্থনা করলে পরমার্থ লাভ হয়, সে সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ হতে পারি। কিন্তু ঠাকুর তো ভেবে-বুঝে সব কিছুরই ব্যবস্থা করে রেখে গেছেন সকলের জন্মে। তিনি যে সব প্রার্থনা শিখিয়েছেন, তার মধ্য থেকে কয়েকটি আপন আপন অভিরুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী, বাড়ীতে, কোন মন্দিরে বা কোন নির্জন স্থানে বসে আন্তরিকতার সঙ্গে সকলেই অভ্যেস করতে পারেন। আর এতে বাঘ এসে যাবার কোন ভয়ই নেই।

তাঁর শেখানো কয়েকটি মাত্র প্রার্থনা-মন্ত্র এখানে উল্লেখ করা সম্ভব। খুব জোরের সঙ্গে পূর্ণরূপে আশ্বাস দিয়ে ঠাকুর বলেছেন:

'[প্রার্থনা করলে তিনি] এক-শো-বার [শুনবেন] যদি ঠিক হয়—যদি আন্তরিক হয়।'[২২]

'আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে তাঁর নাম গুণগান কর, প্রার্থনা কর, ভগবান লাভ করবে, কোন সন্দেহ নাই।'[২৩]

'উপায় অনুরাগ,...আর প্রার্থনা। অনুরাগ আগে, পরে প্রার্থনা।'[২৪]

'প্রার্থনা কর—সেই পরমাত্মার সঙ্গে সব জীবেরই যোগ হ'তে পারে।'[২৫]

'ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁকে প্রার্থনা করো। আর কাঁদো। এইরূপে চিত্তশুদ্ধি হয়ে যাবে।'[২৬]

জীবের কি মহাসৌভাগ্য যে, ভগবান আমাদের প্রার্থনা শুনবেন। তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হয়ে মা যেমন ছোট ছেলেকে কোলে বসিয়ে মুখে মুখে পড়া বা ছড়া শেখান তেমনি করে আমাদের বলছেন:

'ঈশ্বর একজন ব্যক্তি ব'লে বোধ থাকলেই হলো—যে ব্যক্তি প্রার্থনা শুনেন...।'[২৭]

'আর প্রার্থনা—যেন ভোগাসক্তি যায় আর তোমার পাদপদ্মে মন হয়।'[২৮]

'...প্রার্থনা করতে হয়, হে ঈশ্বর আমার কর্ম কমিয়ে দাও।'[২৯]

'ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে প্রার্থনা কর, যাতে তাঁর নামে রুচি হয়।'[৩০]

---

২২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪র্থ ভাগ (১৩৮১) পৃঃ ১৭৩
২৩ তদেব ১ম „ (১৩৭৫) পৃঃ ৭৭
২৪ তদেব ৫ম „ (১৩৮১) পৃঃ ৩০
২৫ তদেব ২য় „ (১৩৮২) পৃঃ ৩১
২৬ তদেব ১ম ভাগ (১৩৭৫) পৃঃ ১৬০
২৭ তদেব ১ম „ (১৩৭৫) পৃঃ ৬০
২৮ তদেব ৫ম „ (১৩৭৫) পৃঃ ২২১
২৯ তদেব ১ম „ (১৩৭৫) পৃঃ ১২৭
৩০ তদেব ২য় „ (১৩৮২) পৃঃ ২৯

'তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, বিবেকের জন্য প্রার্থনা কর।'[৩১]

"ঈশ্বরকে প্রার্থনা করা হয়, 'হে ঈশ্বর, আমায় সৎ ইচ্ছা দাও যেন অসৎ কাজে মতি না হয়।"[৩২]

"যেমন ভক্তি প্রার্থনা করবে, তেমনি ওটাও বলবে— 'যেন কারু নিন্দা না করি'।"[৩৩]

'ঈশ্বরকে প্রার্থনা ক'রতে হয়, ঠাকুর, কৃপা ক'রে জ্ঞানের আলো তোমার নিজের উপর একবার ধর, আমি তোমায় দর্শন করি।'[৩৪]

'আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ ক'রো না, মা, শরণাগত! শরণাগত!'[৩৫]

"সরলভাবে বলো '…হে ঈশ্বর, কামিনী-কাঞ্চন থেকে মন তফাৎ কর'।"[৩৬]

'তাঁর শরণাগত হও, আর ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা কর, যাতে অনুকূল হাওয়া বয়, —যাতে শুভযোগ ঘটে।'[৩৭]

'গুরু না থাকেন, তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা কর, তিনি কেমন, – তিনিই জানিয়ে দিবেন।'[৩৮]

'ত্যাগ করতে হলে ঈশ্বরের কাছে পুরুষ-কারের জন্য প্রার্থনা করতে হয়।'[৩৯]

গৃহী ভক্তদের বিশেষ করে একটি প্রার্থনা শেখালেন : '…ঈশ্বরকে সর্বদা প্রার্থনা করবে, যাতে ইন্দ্রিয় সুখেতে মন না যায়,— ছেলেপুলে আর না হয়।'[৪০]

এই সব মন্ত্রবাণীতে ঠাকুর আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন কেমন ভাবে, কি জন্য প্রার্থনা করতে হয় ও প্রার্থনার কি ফলাফল। আর পরম কারুণিক ঠাকুর মানুষের হয়ে জগদম্বার কাছে প্রার্থনা করছেন, যারা তাঁর কাছে আসছে তাদের মনোবাঞ্ছা যেন পূর্ণ হয়। সাধন ও সিদ্ধির পন্থা এর চেয়ে সহজভাবে ও দরদের সঙ্গে কোথাও ব্যক্ত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

ঠাকুর বলেছেন সার্থক প্রার্থনা করতে হলে চাই : সারল্য, অনুরাগ, আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতা। নির্জনে একান্তে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতে বলেছেন। নিরন্তর প্রার্থনা করতে বলেছেন। তাঁর শরণাগত হয়ে প্রার্থনা করতে বলেছেন।

তিনি যে সব প্রার্থনা আমাদের শিখিয়েছেন তার মূল কথা : প্রয়োজনীয় যোগাযোগ হয়ে যাতে ঈশ্বর লাভ হয়। প্রার্থনার ভেতর দিয়ে তার সঙ্গে মননে-ধ্যানে যুক্ত হতে হবে।

প্রার্থনায় কি হয়? চিত্ত শুদ্ধ হয়। বিবেক-বৈরাগ্য, ভক্তি, জ্ঞান লাভ হয়। ভগবানের দর্শন লাভ হয়। আর কি চাই?

কল্পতরুর কাছে থাকার অর্থ : ঠাকুরের আশ্বাসাশ্রিত হয়ে, এটি বোধে বোধ করে কৃতনিশ্চয় মানসধন হওয়া যে : ঈশ্বর সব চেয়ে কাছের বস্তু। শুধু কল্পতরু নন। কারণ, তিনি সকলেরই হৃদ্দেশেই আছেন।

সাধনবলে কল্পতরুর কাছে থাকাটি অভ্যস্ত হয়ে গেলে, ঠাকুরের শেখানো প্রার্থনাই নিজের অন্তরের স্বতঃ উৎসারিত আকুতিরূপে উচ্চারিত হবে, যাতে হয় পরম পুরুষার্থ লাভ।

এই হল শাশ্বত কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণকৃপার বয়ান। এতে হঠাৎ পাওয়ার চমক যেমন নেই,

---

৩১ তদেব ৩য় ভাগ (১৩৮১) পৃঃ ১৪৭
৩২ তদেব ১ম „ (১৩৭৫) পৃঃ ২৪৪
৩৩ তদেব ৪র্থ „ (১৩৮১) পৃঃ ১৭৩
৩৪ তদেব ১ম „ (১৩৭৪) পৃঃ ৮১
৩৫ তদেব ৫ম „ (১৩৮১) পৃঃ ৭৭
৩৬ তদেব ৫ম ভাগ (১৩৮১) পৃঃ ৬৯
৩৭ তদেব ৩য় „ (১৩৮১) পৃঃ ১৯২
৩৮ তদেব ১ম „ (১৩৭৫) পৃঃ ১৭০
৩৯ তদেব ৫ম „ (১৩৮১) পৃঃ ১০৯
৪০ তদেব ১ম „ (১৩৭৫) পৃঃ ২২১

হঠাৎ অসহ হারানোর ভয়ও তেমন নেই। এ দেওয়ার বনিয়াদ ঈশ্বরের অক্ষয় জীব-প্রেমে।

তাই বলেছিলাম, যাদের 'কল্পতরু-দিবসে' কাশীপুরে এসে ফস্ করে কিছু হয়ে গেল না, সেটাও তাঁর কৃপাতেই হল। কারণ তিনি তাঁদেরকে এই অনাপ্তির ভেতর দিয়ে তাঁর শাশ্বত কল্পতরুত্বের মূলে আহ্বান করলেন।

এই আহ্বানটি শুনে ও মেনে যদি আমরা এগিয়ে যাই, তাহলে আমরা এ পুণ্যদিনে যা পাবার, পেয়ে ধন্য হলুম।

(৮)

শাশ্বত কল্পতরুর কৃপাব্যাখ্যানের এখানেই ইতি নয়, শুধু শুরু। অল্প কথায় এই শুরুর কথা বলেই সাঙ্গ হবে এ প্রসঙ্গ।

অভয়দানের জন্য ঠাকুরের আত্মপ্রকাশটি কল্পতরু দিবসের বিশেষ অবদানরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ঐ আত্মপ্রকাশটি শুধু ঐ দিনেই হতে আরম্ভ করেনি বা ঐ দিনেই স্তব্ধ হয়ে রইল না। জাগ্রত নির্মুক্তি নির্ঝরের দুর্দাম প্রাণবেগ নিয়ে পাহাড়-কান্তার জনপদে সোনার ফসল, রঙীন ফুল, রসাল ফল ফলাতে ফলাতে বয়ে চলল কালের মহা মোহনার দিকে।

ঠাকুরের যেদিন দেহান্ত হলো সেদিন অনেকের হয়ত মনে হয়েছিল: বুঝি আনন্দের হাটটি একেবারে ভেঙ্গে গেল!

কিন্তু তিনি যে এসেছিলেন জীবের জন্যে যুগ-যুগান্তের পরমান্নের সংস্থান করতে। তাই দেহান্তের বহু পূর্ব থেকেই এ ব্যবস্থা সুনিপুণ-ভাবে করতে রত হয়েছিলেন যাতে তাঁর দেহান্তের পরে তাঁর অভয়দানের ধারাটি বেগশালী হয়ে চলে নবীকৃত আত্ম-বিকাশ-প্রকাশের বিবর্তনের ভেতর দিয়ে জগৎময়। অবতীর্ণ ভগবানের সে এক অত্যাশ্চর্য কৃপা-বিস্তারের পরিযোজনার কাহিনী, এখানে বলে শেষ করার বিষয়বস্তু নয়।

সংক্ষেপে এই শুধু বলা চলবে যে, তাঁর দ্বাদশ বৎসরের ভগবৎ-সাধনার শেষ হবার পর, যখন তাঁর চতুর্দশ বৎসরের মানুষ-সাধনা শুরু হল, তখন যে তিনি শুধু আকস্মিক-আগত সাধকগণকে প্রেরণা ও শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছিলেন তা নয়।

তাঁর সেই সময়কার সাধনার সবচেয়ে আধ্যাত্মিক গুরুত্বপূর্ণ নিবেদন হল, যাঁকে তিনি 'আমার শক্তি' বলে অভিহিত করেছেন, সেই শক্তির পূর্ণ আত্মবিকাশের সম্যক্ চর্চা ও কয়েকজন মহাশক্তিধর জগদ্গুরু সৃষ্টি করা।

অন্তরালবর্তিনী শ্রীমা যখন ঠাকুরের প্রেরণায় ও ইচ্ছার যথাসময়ে সামান্যতার আবরণ উন্মোচন করে উমা হৈমবতীর মতো তাঁর স্নিগ্ধ কিরণে দিগন্ত উদ্ভাসিত করে মানুষের মাঝে আবির্ভূত হলেন সুধা-ভাণ্ড হাতে নিয়ে, তখন মানুষ জানল শাশ্বত কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণের অন্য-প্রকাশকে। ঠাকুর যে-সব ধন ছড়িয়ে রেখে চলে গেলেন সে-সব কুড়িয়ে নিয়ে সাজিয়ে তুললেন তিনি, আর ঐ যে পিঁপড়ের দলের সারি তাঁদের মধ্যেও হল কৃপার ছড়াছড়ি। ওপর থেকে ফিরে আসা শ্রীরামকৃষ্ণ এঘরেই আবার বাস করতে থাকলেন যেন শ্রীমা-রূপে। সে এক অবিশ্বাস্য কৃপা-বিস্তার।

শাশ্বত কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ-কৃপা-কথার এখানেও শেষ নয়।

যাঁকে গড়লেন বহু সাধনায় সব দিয়ে ফকির হয়ে তাঁর মহান হৃদয়ে প্রেমের আগুন ধরিয়ে দিয়ে তাঁকে ছড়িয়ে দিলেন জগৎময়। তাঁরই অভয়ের গঙ্গাধারায় প্রবহমাণ হয়ে স্বামীজী এই শাশ্বত কল্পতরুর কৃপাফল বয়ে নিয়ে গেলেন মানুষের দুয়ারে দেশ হতে দেশান্তরে।

যাঁকে বলেছেন নিজের আত্মা, যাঁকে বলেছেন মানস-পুত্র, যাঁকে বলেছেন 'আত্মজ'— যাঁদের

পালন করেছেন অন্তরঙ্গরূপে—তাঁদের সকলের মধ্য দিয়েই তাঁর কৃপা রয়েছে জগতে প্রবহমাণ, তিনি গৃহীই হউন আর সন্ন্যাসীই হউন।

তাঁর কোন সন্তান যেখানে যাননি সেখানে গিয়েও পৌঁছেছে তাঁর অমৃত-কথা। ঐ সব কথা শুনে বা পড়ে লোকেরা জেগে উঠে বসছে। যে আশিস কল্পতরু দিনে উচ্চারণ করেছিলেন, সে অমোঘ অশিস, কালজয়ী আশিস, তাদের শিরেও বর্ষিত হচ্ছে।

যেখানে যেয়ে ধ্বনিত হচ্ছে স্বামীজীর উদাত্ত বাণী—সেখানেই জাগরণের যে সাড়া পড়ে যায়, তার কারণ এই যে, যা-দিয়ে ফকির হয়েছিলেন স্বামীজীর বাণী তারই শব্দ-প্রকাশ। তাই তাঁর বাণীতে চৈতন্য-জাগরণের এত শক্তি।

তাই বলছিলাম, আজকের দিনের যা পাবার তাতো কল্পতরুমূল থেকে কুড়িয়ে নেবই। কিন্তু শাশ্বত কল্পতরুর কাছ থেকে চাইলে যে আমরা আরও পেতে পারি, এ বিষয়ে ঠাকুরের সাদর আমন্ত্রণটি শুনতেও আমরা যেন সাগ্রহে সাড়া দিই।

একদিনের অপূর্ব ঈশকৃপার বিদ্যুৎ-প্রকাশকে আমরা যেমন আন্তরিক ভক্তি করতে শিখেছি, তাঁর কৃপার সূর্য-প্রকাশকে যিনি—প্রতি প্রত্যূষে লোহিত পূর্ব গগনে উদিত হয়ে আমাদের শক্তি প্রেরণা ও অন্নের ব্যবস্থা করেন ও এগিয়ে চলার আহ্বান জানান, সে প্রকাশকেও পূর্ণ স্বীকৃতি দিতে, ভক্তি করতে আমরা যেন শিখতে পারি।

তাঁর কৃপায় তাঁর মহাশীর্বাদ—'তোমাদের চৈতন্য হোক'—আমাদের জীবনেও যে অনুস্যূত হয়ে আছে এ-টি আমরা যেন বোধে বোধ করে অভয় হতে পারি।

কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী প্রভানন্দ

দ্বিতীয় পর্ব

[পূর্বানুবৃত্তি]

২রা জানুআরি হতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাধি বেড়েই চলেছিল। বেদনাতুর বিশ্বমানবের আত্যন্তিক কল্যাণবিধানের জন্যই অবতার-পুরুষের শরীরধারণ, রোগশোক প্রভৃতি শরীরধর্ম হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে অপরের কল্যাণসাধন-রূপ তাঁর ব্রত উদ্‌যাপন। এই ব্রত-উদ্‌যাপনের কাহিনী যত বেদনাবিধুর, ততোধিক বিস্ময়পূর্ণ ও আকর্ষণীয়। তদানীন্তন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দিনগুলি স্মরণ করে শ্রীমাতাঠাকুরাণী বলেছিলেন: 'অবতারপুরুষকে সকলে কি ধরতে পারে? দুই একজন চিনতে পারে মাত্র। তাঁরা জীব-উদ্ধারের জন্য কত যাতনাই না সহ্য করেন! ঠাকুরের গলা দিয়ে রক্ত বের হত, তবুও কথার বিরাম নেই, কিসে জীবের মঙ্গল হয়।' (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২।৪৫১) কিন্তু যাঁরা তাঁর নিত্যসঙ্গী লীলাপরিকর তাঁদের প্রধান ভাবনা ছিল প্রেমময় 'পরমহংসদেবের' অবর্ণনীয় দেহ-যন্ত্রণার লাঘব হয় কিসে, তাঁকে ব্যাধিমুক্ত করা যায় কি উপায়ে। তাঁরা ভাবেন, লোকজনের সঙ্গে পরামর্শ করেন, কখনও বা হতাশ হয়ে গোপনে কাঁদেন, কিন্তু সুনিশ্চিত কোন সমাধানই পান না। বরঞ্চ এত দেহ-যাতনার মধ্যেও বাৎসল্য-সর্বস্ব জননীর ন্যায় ঠাকুরের ভক্তদের জন্য স্নেহ করুণা উদ্বেগ তাঁদেরকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি গভীরতর-

ভাবে আকৃষ্ট করে, তাঁর উপর নির্ভরশীল করে তোলে।

(৭২১)* কাশীপুর বাগানবাড়ীর দোতলার গোলঘর। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একটি বালাপোষ গায়ে মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। ঠাকুরের গলায় ক্যান্সারের ক্ষত দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, গলা ফুলে গেছে। তাঁর গলায় নিদারুণ যন্ত্রণা।

আজ সোমবার ১১ই জানুআরি, ১০৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী, ঠাকুরের ঘরে উপস্থিত বাগবাজারের কবিরাজ ও কয়েকজন সেবক ভক্ত, আজকাল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাগবাজারের কবিরাজের ঔষধ ব্যবহার করছেন।[১] ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ক্ষীণকণ্ঠে বলেন: 'আর কেন, এই বেলা শরীরটা যদি যায়!'

শ্রীরামকৃষ্ণ ধীরে ধীরে বলতে থাকেন: 'অবতার অবতার করে তো এই [অবস্থা]...'

কিছুক্ষণ পর তাঁর মুখে আনন্দের ভাব ফুটে ওঠে; বলতে থাকেন: 'দেখছি যেন ছেলেবেলা —খেলছি—খুব আনন্দ। কিন্তু কাশি এসেই গোল।'

কাশির দমক দীর্ঘদিনের রুগ্ন শরীরকে কাঁপিয়ে তোলে। এক একবার কাশি এত প্রবল হয় যে, দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়। ঠাকুর কিছুটা সুস্থ হলে কবিরাজ বিদায় নেন ও নীচে ভক্তদের কাছে গিয়ে বসেন।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করেন মাষ্টার মশাই[২] ও কালীপ্রসাদ। মাষ্টার মশাই দেখেন ঠাকুরের নিকট বসে রাখাল, ঘরে উপস্থিত আরও দু'একজন সেবক।

ঠাকুরের নির্দেশে মাষ্টার মশাই নীচতলা হতে কবিরাজকে ডেকে আনেন। কবিরাজ মশাই ঠাকুরের নাড়ী পরীক্ষা করে মন্তব্য করেন: 'বায়ুর আধিক্য—[নাড়ী] মাঝে মাঝে থামে আবার চঞ্চল।'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বালক-স্বভাব। বালকের সরল বিশ্বাস ও সহজ আনন্দ তাঁর জীবনের আবাল্য নিত্যসহচর। এই বাল্যভাবের আবেগে তাঁর সকল আচরণ সম্পৃক্ত, সেই কারণে তাঁর ব্যবহার হত মাধুর্যমণ্ডিত। কবিরাজের কথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বলেন: 'যখন থামে তখন আমার খুব আনন্দ—এইবার বুঝি [শরীর] যাবে।' (৭২১)।

(৭২২) কবিরাজ: 'আপনি ওসব ভাবছেন কেন?'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ [চুপ করে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে] বলেন: 'এত যন্ত্রণা—আবার কি একেবারে শয্যাশায়ী হব?'

রাখালের দিকে পড়ে তাঁর স্নেহদৃষ্টি। আদরের রাখাল তাঁর মানসপুত্র। তিনি রাখালকে লক্ষ্য করে বলেন: 'তুই কাঁদবি। তারচেয়ে এই বেলায় [শরীর যাওয়াই] ভাল।

'আমার তো আর ভোগ নেই, সুখ নেই—

---

* প্রথম বন্ধনীর মধ্যস্থ সংখ্যাগুলি মাষ্টার মশায়ের ডায়েরীর পৃষ্ঠা-সংখ্যা। উক্তিগুলির মধ্যস্থ তৃতীয় বন্ধনীর অন্তর্গত কথাগুলি বোধসৌকর্যার্থ সংযোজিত।—সঃ

১ কাশীপুর দূর হওয়াতে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার নিয়মিত ভাবে ঠাকুরকে দেখাশোনা করতে পারছিলেন না। ভক্তগণ ডাক্তার সরকারের অনুমতি নিয়ে বাগবাজারের কবিরাজ নবীনচন্দ্র পালকে দেখা-শোনা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। (বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত, পৃঃ ২০৮ দ্রষ্টব্য) ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরে থাকাকালীন এই কবিরাজ কিছুদিন চিকিৎসা করেছিলেন।

২ মাষ্টার মশাই গতদিন অর্থাৎ রবিবারেও কাশীপুর বাগানে এসেছিলেন। নিকুঞ্জদেবীর মাথার ব্যাধি বৃদ্ধি পাওয়াতে এই দিনই মাষ্টার মশাই নিকুঞ্জদেবীকে কলুটোলার সেনদের বাড়ীতে রেখে এসেছিলেন। নিকুঞ্জদেবী ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের আত্মীয়া।

সুখের যা হয়েছে ঢেউ ঢেউ হয়ে গেছে।' আরও কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হয়। কবিরাজ ও অন্যান্যেরা ঘর থেকে বাইরে যান। ঘরে থাকেন শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাষ্টার মশাই। একসময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে বলেন : 'মহিন্দর এখন গেলেই হয়!'

পরবর্তী এক দৃশ্যে দেখতে পাই ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হয়েছেন ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। প্রতাপচন্দ্র ডাক্তার ভাদুড়ীর জামাতা। প্রতাপচন্দ্র ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হতে এল. এম. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, কিন্তু ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ হতে সুরু করেন হোমিওপ্যাথ চিকিৎসা। অল্পসময়ের মধ্যেই তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। উদীয়মান হোমিওপ্যাথ হিসাবে তাঁর সমাদর বাড়তে থাকে।

বেশ কিছুকাল পরে তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হয়েছেন। ঠাকুরের ব্যাধিবৃদ্ধির খবর শুনে তিনি নিজেই এসেছিলেন অথবা ঠাকুরের কোন সেবক ভক্তের আহ্বানে এসেছিলেন, তা জানা যায় না। বাগবাজারের কবিরাজ ঠাকুরের গলব্যাধির চিকিৎসা প্রথম সুরু করেছিলেন ৩০শে নভেম্বর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। সেই সময় হতে কিছুকাল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর চিকিৎসাধীনে থাকলেও ঠাকুর কাশীপুর বাগানে আসার পর খ্যাতিমান হোমিওপ্যাথ রাজেন্দ্র দত্ত স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঠাকুরকে ঔষধ দিয়েছিলেন। তাতে ঠাকুরের স্বাস্থ্যের বেশ কিছুটা উন্নতি হয়। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যা জানুআরি হতে সেই সাময়িক উন্নতি ব্যাহত হয়, উপরন্তু তাঁর ব্যাধির প্রকোপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এখন ডাক্তার প্রতাপকে দেখে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন : তুমিই না হয় দেখবে কিছুদিন ঔষধ দেওয়া'।

ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র সম্মত হন। ইদানীং কবিরাজী চিকিৎসায় কোন উপকার হচ্ছে না দেখে ঠাকুর প্রতাপচন্দ্রকে হোমিওপ্যাথ ঔষধ দিতে অনুরোধ করছেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বালকস্বভাব। তিনি মাঝে মাঝে অধৈর্য হয়ে পড়েন, তিনি ডাক্তারকে বলেন : [ঔষধ] এখন খাব? কাশি তো হচ্ছেই।'

আবার বলেন : 'কার কাছে ঔষধ ?'

সেবক রাখাল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শরীরের অবস্থা বিস্তারিতভাবে বলেন। তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ লাটুকে বলেন : 'তুই বল।' (৭৯২)।

এরই কাছাকাছি কোন সময় যথেষ্ট সেবকের অভাব হচ্ছে শুনে শরৎচন্দ্র কাশীপুর বাগানে দিবারাত্র থাকতে সুরু করেছিলেন। তিনি চিকিৎসাবিদ্যা শিখছিলেন। তাঁর মেডিকেল কলেজে পড়াশুনা স্থগিত রেখে তিনি প্রাণমন ঢেলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করতে থাকেন। পুত্রের মতিগতি দেখে পিতা গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী আশঙ্কিত হয়ে ওঠেন। তিনি অনেক ভেবে-চিন্তে একটি কৌশল আশ্রয় করেছিলেন। তিনি তাঁর নিজের গুরুদেব শাস্ত্রজ্ঞ ও সাধক পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মশায়কে নিয়ে যান কাশীপুর বাগানে। উদ্দেশ্য, পণ্ডিতের সামনে নিরক্ষর পরমহংসমশায় কেঁচো হয়ে যাবেন এবং তাঁর পুত্র পরমহংসমশায়ের দৈন্য স্বচক্ষে দেখে মোহমুক্ত হয়ে ঘরে ফিরে যাবে। ঘটনা ঘটে অন্যরকম। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক উচ্চ অবস্থা দেখে পণ্ডিত মুগ্ধ হন। তিনি গোপনে গিরিশচন্দ্রকে জানান যে, তাঁর পুত্রের পরম সৌভাগ্য যে ঐরূপ গুরুলাভ হয়েছে। গিরিশচন্দ্র হতাশ হন। তিনি কয়েকদিন পরে পুনরায় আরেকটি কৌশল করেন। একদিন সুযোগ বুঝে তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেন : 'আপনি একটু বললেই ও বিয়ে করবে।' শরৎ নিকটেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। শরৎ ফস্ করে বলেন : 'উনি বললেই আমি বিয়ে করব কিনা! যা কর্তব্য মনে করেছি, উনি বললেও তার অন্যথা হবে না।'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বলেন, 'শুনেছ কি বলে ? আমি আর কি করব ?' গিরিশচন্দ্র দুঃখিত অন্তরে ফিরে যান, অথগুনীয় ভবিতব্যের জন্ত তাঁর মনকে প্রস্তুত করেন।[১]

(৭৯২) উপস্থিত হয় পৌষ-সংক্রান্তি। সেদিন মঙ্গলবার, ২৯শে পৌষ, ১২৯২ সাল, ইংরাজী ১২ই জানুআরি, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। গঙ্গা ও সাগরের সঙ্গমে স্নান ও মেলার জন্ত দেশ দেশান্তর হতে পুণ্যার্থীরা সমবেত হয়েছে। শুভ মুহূর্তে সাগর-সঙ্গমে অবগাহন করে কৃতকর্মের গ্লানি হতে মুক্ত হবে মানুষ, সেই উদ্দেশ্যে সাগরসঙ্গমে সমবেত হয়েছে জনসমুদ্র।

মনে হয় মকরসংক্রান্তি উপলক্ষ্যে মাষ্টার মশায়ের স্কুলে হাফ্-হলিডে ছিল। মাষ্টার মশাই দুপুর সোয়া দুটোর সময় স্কুল থেকে যাত্রা করেন। তখনকার দিনে শ্যামবাজারের মোড়ে, বীডন স্ট্রীটের মোড়ে ছিল শেয়ারের ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডাখানা। বীডন পার্ক হতে কাশীপুর চৌরাস্তা পর্যন্ত ভাড়া ছিল এক আনা বা চার পয়সা। মাষ্টার মশায় শেয়ারের গাড়ীতে চড়ে কাশীপুর রওয়ানা হন।

তিনি কাশীপুর বাগানবাড়ীতে উপস্থিত হয়ে দেখেন, 'দানাদের ঘরে' শুয়ে আছেন নরেন্দ্রনাথ, তাঁর হাতে জপের মালা। তিনি একমনে মন্ত্র-জপ করে চলেছেন। সেই ঘরেই বসে ভূপতি সুর করে 'ভক্তমাল' হতে পাঠ করছেন। তিনি গুহক চণ্ডাল প্রভৃতির কাহিনী পড়ছেন। (৭৯২)।

ভক্তবীর গুহকের কাহিনী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ প্রিয়।

ভীলরাজ গুহক শ্রীরামচন্দ্রকে মিত্ররূপে লাভ করে ধন্য হয়েছেন। শ্রীরামচন্দ্র অরণ্যে প্রবেশ করলে 'পরিবার রাজ্য সহ ক্রন্দনের ধ্বনি' উঠে শ্রীরাম-বিচ্ছেদের যন্ত্রণা ভুলবার জন্য গুহরাজ 'রামনাম সার' করে চৌদ্দ বছর কালাতিপাত করেন। চৌদ্দ বছর পূর্ণ হয়ে অপরাহ্ণ উপস্থিত হয়, তখন পর্যন্ত শ্রীরাম আসেননি দেখে গুহরাজ অগ্নিতে আত্মাহুতি দেবার জন্য প্রস্তুত হন এমন সময়ে 'শ্রীরাম জয়রাম জয়রাম নামগান উচ্চৈঃস্বরে করিয়া আইসে হনুমান॥' অল্পসময়ের মধ্যেই 'রামপ্রেমে ডগমগ বীর চূড়ামণি' গুহরাজ দয়াল পরমানন্দ শ্রীরামের প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হন। উপস্থিত সকলে ধন্য ধন্য করে।[২]

মাষ্টার মশায় দোতলায় ঠাকুরের ঘরে যান। (৭৯২ ঘরে উপস্থিতদের মধ্যে দেখতে পান বালক ভক্ত ক্ষীরোদকে।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: 'তেলটা পেটে মাখিয়ে দাও তো।' (৭৯২)।

আলোচ্য দিনটির দু'একদিন পূর্বেই সংঘটিত হয়েছিল একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানদল লাভ করেছিলেন সন্ন্যাসের প্রতীক গেরুয়া বস্ত্র। সাধারণের দুর্বোধ্য এ ধরণের ছোটখাট ঘটনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল অবতারপুরুষের লোকসংগ্রহের পরিকল্পনা, অবতারপুরুষ-প্রবর্তিত নূতন ভাব ধারার প্রচার, পুষ্টিসাধন ও প্রসারের কার্যসূচী।

প্রবীণ সেবক বুড়োগোপাল তীর্থভ্রমণ শেষ করে কাশীপুর বাগানে ফিরেছিলেন এবং ৮ই জানুআরি রাত্রে একটি ভাণ্ডারা দিয়েছিলেন। অতঃপর তাঁর আকাঙ্ক্ষা হয় গঙ্গাসাগর যাত্রী সাধুদের মধ্যে কাপড়, রুদ্রাক্ষের মালা ও চন্দন দান করবেন। তিনি বারটি কাপড় ও মালা কিনে আনেন। নিজহাতে কাপড় কয়খানি গেরিমাটি

---

১ ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য: স্বামী সারদানন্দের জীবনী, পৃঃ ৪৩ ৪ দ্রষ্টব্য।

২ শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ, ষষ্ঠমালা, পৃঃ ৬২-৭

দিয়ে রঙ করেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ খবর পেয়ে বুড়োগোপালকে ডেকে পাঠান। বুড়োগোপাল মনের আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেন: 'জগন্নাথ-ঘাটের সাধুদের গেরুয়া কাপড় দিলে যে ফল হবে, তার হাজার গুণ বেশী ফল হবে যদি তুই আমার এই ছেলেদের দিস্। এদের মতো ত্যাগী সাধু আর কোথায় পাবি! এদের এক এক জন হাজার সাধুর সমান। এরা হাজারী সাধু।[১] বুঝলি?' বুড়োগোপাল শ্রীরামকৃষ্ণের ইঙ্গিতপূর্ণ আদেশ মাথা পেতে নেন। ঠাকুর 'সেই বারোখানি গেরুয়া বস্ত্র এবং রুদ্রাক্ষের মালা স্পর্শ ও মন্ত্রপূত' করে দেন। তাঁর আদেশে বুড়োগোপাল ত্যাগী সন্তানদের এগারো জনকে 'সেই গৈরিক বস্ত্রগুলি ও রুদ্রাক্ষের মালা পরাইয়া দিলেন।'[২] এই এগারো জন ভাগ্যবানের নাম— নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, বাবুরাম, শশী, শরৎ, কালী, যোগীন, লাটু, তারক ও বুড়োগোপাল। অবশিষ্ট বস্ত্রখানি কারুর মতে পেয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র, অপর এক মতে পেয়েছিলেন ছোট গোপাল। শেষোক্ত দুজনের কেউই সন্ন্যাস গ্রহণ করেননি। ত্যাগ ও পবিত্রতার পরিচায়ক গৈরিক বস্ত্র ধারণ করে ত্যাগী ভক্তগণের সাধনজীবন অধিকতর উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। তাঁদের হৃদয়ে বৈরাগ্যের দীপশিখা উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে, ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুলতা তীব্রতর হয়ে ওঠে। আর এই সকল প্রয়াসের মধ্যমণি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁর সেবাশুশ্রূষার জন্য প্রাণাতিপাত পরিশ্রমও ত্যাগী সাধকদের সাধনভজনের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে।

(৭১৩) বুধবার, ১লা মাঘ, শুক্লা অষ্টমী তিথি। ইংরাজী ১৩ই জানুআরি। আজ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের রোগের অবস্থা ভীতিপ্রদ। মধ্যাহ্নে তাঁর একবার দম বন্ধ হয়ে যায়। রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে সিমলার রামচন্দ্র দত্ত ও শ্যামপুকুরের কালীপদ ঘোষকে টেলিগ্রাফ করে জানান হয়। সে সময়ে কাশীপুর চৌরাস্তার নিকটেই ছিল টেলিগ্রাফ অফিস। কোন কারণে রামবাবু সেদিন কাশীপুরে আসতে পারেননি। মাষ্টার মশাই বাগানে এসে পৌঁছান তখন বিকাল প্রায় সাড়ে চারটা। তিনি দেখতে পান ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র ঠাকুরের ঘরে উপস্থিত।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বালকভাব সহজাত। তিনি সরল, উদার, অহঙ্কারের বাঁধন নেই; তাঁর কোন পার্থিব বস্তুতে নেই আসক্তি। তিনি কোন গুণের বশ নন। অন্যান্য অবতারপুরুষের ন্যায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে দেখা যায় মানব-

---

১ ঠাকুর গোপালকে বলেন: 'এখানে এই যুবক সেবকেরা হাজারি অর্থাৎ প্রত্যেকেই হাজার সাধুর সমান। তুমি এদের সৎকার কর।' (শ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃ: ২৫১)

পুঁথিকারের মতে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি: 'বলিলেন দাও যদি দাও এইখানে॥ এমন সুন্দর সাধু ভুবনে বিরল। অকলঙ্ক তনু ঘটে ভরা গঙ্গাজল॥' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, পৃ: ৬১২)

২ স্বামী অভেদানন্দ: আমার জীবন কথা, পৃ: ১০০-১০১ দ্রষ্টব্য। কথামৃতকার লিখেছেন: 'ঠাকুর কাহাকেও সন্ন্যাসীর বাহ্যচিহ্ন (গেরুয়া বস্ত্র ইত্যাদি ধারণ করিতে অথবা গৃহীর উপাধি ত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন নাই।...কিন্তু ঠাকুর তাঁদের অন্তরে ত্যাগী করিয়া গিয়াছিলেন।' (কথামৃত, ২। পরিশিষ্ট। ১) অপরপক্ষে স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন: 'এখানেই (কাশীপুর উদ্যানে) নরেন্দ্র-প্রমুখ দ্বাদশজন বালক-ভক্তের ঠাকুরের শ্রীহস্ত হইতে গৈরিকবসন লাভ... ।' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৪। পৃ: ৩০৪) বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের মতে বুড়োগোপাল "ঠাকুরের সমক্ষে যুবকগণকে...গৈরিকবসন এবং প্রভুর করকমল-শোধিত রুদ্রাক্ষমালা পরাইয়া প্রসাদী মিষ্টান্নে পরিতোষ' করেছিলেন। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত, পৃ: ১৯৬) স্পষ্টই মনে হয় গৈরিকবস্ত্র বিতরণের সময় মাষ্টার মশায় কাশীপুর বাগানে উপস্থিত ছিলেন না।

ভাব ও দেবভাবের চমৎকার সহাবস্থান। এক মুহূর্তে তাঁর আচরণে মনে হয় তিনি অপরাপর দশ জনেরই মত, কিন্তু পর মুহূর্তেই তাঁর মধ্যে প্রকটিত হয় লোকাতীত রহস্যের দ্যুতি। উপস্থিত সকলে লক্ষ্য করেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এখন বালকের মত যন্ত্রণায় অধীর। শিশুর মত আবেগ ও প্রত্যাশার ভাবটি প্রকাশ পায় তাঁর সরল আচরণে। তিনি একবার জোড়করে প্রতাপ ডাক্তারকে বলেন: 'বড় কষ্ট— এইটে [সারিয়ে দাও] —'

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের ইঙ্গিত লক্ষ্য করে মাষ্টার মশায় প্রতাপ ডাক্তারকে বলেন: 'ওঁর ইচ্ছা, আপনি আজ এখানে থাকেন।' (৭৯৩)।

ডাক্তার মজুমদার উত্তরে কি বলেছিলেন জানা যায় না।

কাশীপুর বাগানে একদিকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাশুশ্রূষা পূর্ণ উদ্যমে চলতে থাকে, অপরদিকে নরেন্দ্রপ্রমুখ কয়েকজন তাপসের ব্যাকুল সাধন-ভজন সকলকে বিস্মিত করে। 'ঠাকুরের যে ভীষণ ব্যাধি, তিনি দেহরক্ষার সংকল্প করিয়াছেন কিনা কে বলিতে পারে? সময় থাকিতে তাঁহার সেবা ও ধ্যান-ভজন করিয়া যে যতটা পারিস আধ্যাত্মিক উন্নতি করিয়া নে, নতুবা তিনি সরিয়া যাইলে পশ্চাত্তাপের অবধি থাকিবে না।'[১]—নরেন্দ্রনাথের এই উপদেশ পালনে সর্বাধিক যত্নপর দেখা গেল নরেন্দ্রনাথ স্বয়ং। বিগত ৮ই জানুআরি তারিখে নরেন্দ্রনাথ মাষ্টার মশাইকে একান্তে বলেছিলেন: 'রামনাম ওঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) কুলের ইষ্টমন্ত্র[২] তাই আমায় দিলেন।' মাষ্টার মশাই উত্তরে বলেছিলেন: 'হাঁ, রঘুবীর আছেন।' ইদানীং নরেন্দ্রনাথ রাম-মন্ত্রের সাধনে মেতে উঠেছেন।

(৭৯৩) আজ সারাদিন তিনি উপবাস করেছিলেন। সন্ধ্যার পর তিনি স্বহস্তে রুটি তৈরী করে সেই রুটি খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করেন।

রাত্রি প্রায় আটটার সময় সেবক কালীপ্রসাদ নীচতলায় মাষ্টার মশাইকে ডাকতে আসেন। কালীপ্রসাদ বলেন: 'পরমহংসদেব আপনাকে ডাকছেন— রামবাবু [ওঁর চিকিৎসা সম্বন্ধে] কি বললেন?' মাষ্টার মশায়: 'সব [রকম] ভাবনা [ভাবা] হয়েছে— আর সকালে [তাঁকে] খবর দিতে বললেন।' বিচক্ষণ ও কর্মপটু রামবাবুকে সকলেই বয়োজ্যেষ্ঠ বলে মান্য করতেন। রামবাবুও কাশীপুর বাগানবাড়ীর তত্ত্বাবধানে অঘোষিত নেতার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।[৩] মাষ্টার মশায় ঘরে এলে শ্রীরামকৃষ্ণ ধীরে ধীরে বলেন: 'এই আমার আর [আপনি] পূর্ণ অবতার— ইচ্ছা করেই [ব্যাধিধারণ] কচ্ছেন— ও সব [কথা] আর ভাল লাগে না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ একটু থেমে বলেন: 'আচ্ছা, শরীর ধারণ করলে এসব হয়, না?'

'কিসে কি হয় কে জানে? বলে কলিকাল —লোকের জপ নাই, তপ নাই, তীর্থ নাই,— তাদের হাওয়া [গায়ে লাগছে, তাদের কর্মফল নিতে হচ্ছে।] সেই সব ভুগতে হচ্ছে।'

কিছুক্ষণ পরে তিনি বলেন: 'তা না হয় হলো, আমার তো ভোগের বাকী নেই। [মনে যা উঠেছিল]—পাল্কী [চড়া], [গরদের] কাপড়

১ স্বামী সারদানন্দ: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৫।৩৮৭

২ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজমুখে বলেছিলেন: 'আমার বাবা রামের উপাসক ছিলেন। আমিও রামমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলাম।' (শশিভূষণ ঘোষ: শ্রীরামকৃষ্ণদেব, পৃ: ৪৫)

৩ মহেন্দ্রনাথ দত্ত: ভক্তপ্রাণ রামচন্দ্রের অনুধ্যান, পৃ: ৪২: 'রামদার নেতৃত্বেই কাশীপুরের বাগান একরকম চলিয়াছিল, যদিও সঙ্গে সঙ্গে অপর প্রধান ভক্তেরাও থাকিতেন। এস্থলে নেতৃত্ব বলিলে ঠিক হয় না, ভালবাসার রাজ্যে উচ্চ-নীচ বলিয়া কিছু থাকে না।'

[পরা], সোনার [গোটপরা], [এসবই তো] অনেক হয়েছে ।'[১]

মাষ্টার : '[ও সব] আমাদের [শিক্ষার] জন্যে ।'

শ্রীরামকৃষ্ণ : 'তাই যা [মনে উঠেছিল, মা পূরণ করে দিয়েছেন ।]'

ক্রমে রাত্রি গভীর হয়। দোতলার হল ঘরে সেবক ভক্তেরা লক্ষ্য করেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাধির উপসর্গ বেড়েই চলেছে। মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হয়।

এদিকে নরেন্দ্রের অন্তরে ভগবদ্-অনুরাগের ঝড় চরম এক আকার ধারণ করে। তাঁর মানসিক আবেগের আঁধি পরিবেশের বাস্তবতাকে দৃষ্টির অগম্য করে তোলে। নরেন্দ্রনাথ ভাবের ঘোরে 'রাম' 'রাম' শব্দ উচ্চারণ করতে করতে বসতবাটির চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করতে থাকেন।[২] তাঁর বাহ্যজ্ঞান লুপ্তপ্রায়। রাত্রি গভীরতর হয়, তাঁর কণ্ঠধ্বনিও যেন উচ্চতর হয়ে ওঠে। যুবক ভক্তদের কেউ কেউ তাঁকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। নিশুতি রাতে নরেন্দ্রনাথের উচ্চ কণ্ঠস্বর দোতলায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে ভাবিত করে তোলে। দীর্ঘ সময় চলে যায়, তবুও নরেন্দ্রনাথের ভাবোন্মাদনা কমছে না দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক কালীপ্রসাদকে বলেন : '[যা ওকে ডেকে আন্] ওতে আমার বড় কষ্ট হয়।' (৭৯৩)।

[ক্রমশঃ]

---

১ শ্রীরামকৃষ্ণ অন্যত্র ও বলেছেন, '...যা যা মনে উঠতো অমনি করে নিতাম।' তাঁর একবার বড়বাজারের রং করা সন্দেশ খাবার সাধ হয়েছিল। আবার সাধ হয়েছিল খনেখালির খইচুর ও কৃষ্ণনগরের সরভাজা খাবেন। সাধ হয়েছিল কোমরে সোনার গোট পরবেন, খুব ভাল জরীর সাজ পরবেন, রূপার গড়গড়াতে তামাক খাবেন। ইচ্ছা হয়েছিল শম্ভুর চণ্ডী ও রাজনারায়ণের চণ্ডী শুনবেন। আবার সাধ হয়েছিল, দক্ষিণেশ্বরে সমাগত সাধুদের জন্য আলাদা একটি ভাঁড়ার হয়। তাঁর সব সাধই শ্রীজগদম্বা অচিরে পূর্ণ করেছিলেন। (কথামৃত ৪।২০।২ দ্রষ্টব্য)

২ বিভিন্ন জনের লেখায় বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। আমরা এখানে মাষ্টার মশায়ের ডায়েরী অনুসরণ করলাম। প্রমথনাথ বসুর মতে ঠাকুরের রোগ উপশমের জন্য দৈব সাহায্য লাভের আশায় নরেন্দ্র ঐরূপ করেছিলেন। অপর একটি মতে রামমন্ত্র ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট লাভ করেই নরেন্দ্রনাথ তীব্র এক আধ্যাত্মিক প্রেরণায় ঐরূপ করেছিলেন। (Eastern & Western Disciples : The Life of Swami Vivekananda, p. 130) এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে অপর একটি মত। তদনুসারে 'রামনামে উদ্যান পূরিত করিয়া উন্মত্তবৎ' বিচরণকারী নরেন্দ্রনাথকে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের কাছে ডেকে আনেন ও 'তারকব্রহ্ম রামনাম' প্রদান করেন। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত, পৃঃ ১৯৭) প্রায় অনুরূপ তথ্য যোগীনমার সূত্রে পেয়ে ভগিনী দেবমাতা লিখেছেন : 'The night on which Naren took Mantram from Thakur he was like a madman. It was at Cossipore Garden and all night he walked excitedly round and round the house. Finally he went to Thakur and said, 'Give me peace.' Thakur said to him : 'How little you can bear ! The fire that is lighted in your heart I bore in mine for twelve years and you cannot bear it for one night, but come crying for peace. What do you want ?' Narendra said ; 'Give me Nirvikalpa Samadhi...' (Sri Ramakrishna & his disciples, pp. 159-60)

আমরা দেখেছি নরেন্দ্রনাথ পূর্বেই রামমন্ত্র লাভ করেছিলেন। সম্ভবতঃ স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও পীড়িত ঠাকুরের আরোগ্য কামনা—এই দুটি কারণেই নরেন্দ্রনাথ তারস্বরে রামনাম উচ্চারণ করেছিলেন দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা ধরে।

অদ্বৈতবেদান্তে ভক্তির স্থান

স্বামী স্মরণানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীশঙ্করের ছয় বা সাত শতাব্দীর পরে শ্রীধরস্বামী, অপ্পয়্য দীক্ষিত এবং মধুসূদন সরস্বতীর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত শংকরানুবর্তী অদ্বৈতবাদীরা ভক্তিমার্গের প্রতি বিশেষ কোন অনুরাগ দেখিয়েছেন বলে মনে হয় না। এই সময়ের মধ্যে অদ্বৈতবাদীরা সকলেই শ্রীরামানুজাচার্য ও মধ্বাচার্য প্রমুখ দ্বৈতবাদী দার্শনিকদের প্রবল আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেদের মতবাদ সমর্থন করার কাজে স্পষ্টতই ব্যস্ত ছিলেন। ভক্তিমতবাদ অবশ্য উপরোক্ত আচার্যদের এবং এঁদের বহু পরে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারের ফলেই প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু তাঁদের মতবাদগুলি কার্যতঃ প্রায় সম্পূর্ণ ভক্তি-আশ্রিত হওয়ায় জ্ঞানের যৎসামান্য প্রভাবই তাঁদের মধ্যে দেখা যায়। তৎসত্ত্বেও ভক্তির মহান প্রবক্তা শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন যে, তিনি স্বীয় অন্তরে অদ্বৈতজ্ঞানে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, যদিও জগতের মঙ্গলের জন্য তিনি ভক্তি প্রচার করেছিলেন। (লীলাপ্রসঙ্গ, রাজসং, ১৩৫৮, সাধকভাব পৃঃ২৪৭) ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রে ভক্তি-আন্দোলনের ফলে নামদেব, তুকারাম, একনাথ এবং জ্ঞানদেবের মতো অতীন্দ্রিয় অনুভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষদের আবির্ভাব ঘটে। এঁদের মধ্যে শেষোক্ত জ্ঞানদেব (আনুমানিক ১২৭৫—১৩০৬ খ্রীঃ) জ্ঞান ও ভক্তির মহান সমন্বয়কারীরূপে বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। মারাঠী ভাষায় রচিত তাঁর জ্ঞানেশ্বরী নামক গীতাভাষ্যটি চিন্তার মহত্ত্ব, ভক্তির গভীরতা এবং ভক্তির ওপর জ্ঞানের মহনীয় প্রভাবের জন্য প্রসিদ্ধ। জ্ঞানেশ্বরী জ্ঞান ও ভক্তির শোভন মিলনভূমি। উদাহরণস্বরূপ গীতার শেষ অধ্যায়ের ৫৫তম শ্লোকটির ব্যাখ্যার উল্লেখ করা যেতে পারে: 'আমাতে মিলিত হইবার সময় কর্মযোগী এই ভক্তি লাভ করেন,...সকল সাধ্য ও সাধনের অতীত আমার যে স্বরূপ তাহার সহিত তিনি ঐক্য প্রাপ্ত হন এবং আত্মানন্দ উপভোগ করেন;... যে মুহূর্তে দর্পণ সরাইয়া লওয়া হয়, সেই মুহূর্তেই প্রতিবিম্ব অদৃশ্য হয়, ইহাও তদ্রূপ। তখন তিনি একাই স্বরূপানন্দ আস্বাদন করেন। যাহারা মনে করে কোনও বস্তুর সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হইলে, আনন্দ উপভোগ করা যায় না, তাহাদের আমি জিজ্ঞাসা করি: "শব্দের দ্বারা কি করিয়া শব্দের উচ্চারণ করা হয়?"...যদিও অদ্বৈততত্ত্বের মধ্যে ক্রিয়ার কোনও স্থান নাই, তথাপি ভক্তির স্থান আছেই। ইহা অনুভব করা যায়, কিন্তু বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।'

চতুর্দশ শতকে আমরা আবার এই জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ের পুনরাবির্ভাব অদ্বৈত-আচার্যগণের মধ্যে দেখতে পাই, যেমন শ্রীধরস্বামীতে—তিনিও পশ্চিম ভারতের। তাঁর লেখা গীতার টীকা ও ভাগবতের মূল্যবান সংক্ষিপ্ত টীকার জন্যে তিনি সর্বকালের ভক্তদের কাছে সমাদৃত। শাস্ত্রের বহু অংশের ব্যাখ্যায় তিনি যেমন জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করেছেন তেমনি বর্ষণ করেছেন ভক্তি-সুধা। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়—গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের টীকা তিনি আরম্ভ করেছেন এভাবে: 'ভগবান বলেছিলেন, তিনি ভক্তগণকে সংসারসাগর থেকে উদ্ধার করেন। সুতরাং সেই বাক্যকে প্রমাণিত করার জন্যেই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ করেছেন।' এভাবে শ্রীধর বলছেন যে, তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির উপায় এবং ত:

ঈশ্বরে নিষ্কাম ভক্তির দ্বারা লাভ করা যায়।

পূর্ব ভারতে শ্রীচৈতন্যদেব যখন প্রেমভক্তি প্রচারে নিরত, তখন মধুসূদন (আনুমানিক ১৫২৫-১৬৩২ খ্রীঃ) অল্পবয়স্ক বালকমাত্র। যখন তাঁর বয়স বার বছরও পূর্ণ হয়নি তখনই সংসার-জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ মধুসূদন পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপে চলে আসেন শ্রীচৈতন্যের শিষ্য হবার জন্যে। যদিও চৈতন্যদেব তৎপূর্বেই নবদ্বীপ ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন, বালক মধুসূদন সেখানে ন্যায়দর্শন অধ্যয়নের জন্য থেকে গেলেন। কয়েক বৎসর পরে তিনি অদ্বৈত-বেদান্ত-দর্শন আয়ত্ত করবার জন্যে বারাণসীতে যান এবং এই উভয় দর্শনে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হন। তাঁর গুরু কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে তিনি তাঁর মহান গ্রন্থ 'অদ্বৈতসিদ্ধি' রচনা করেন, তাতে শঙ্করাচার্যের সময় থেকে অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে যত আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে, তিনি তা খণ্ডন করেছেন।এই গ্রন্থটি অদ্বৈতমতবাদকে সর্বকালের জন্য দৃঢ়রক্ষিত করেছে। কিন্তু মধুসূদন নিছক পণ্ডিত ছিলেন না। তিনি সন্ন্যাসী হয়েছিলেন এবং তাঁর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তীব্র আধ্যাত্মিক সাধনা সম্মিলিত করেছিলেন। তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক সিদ্ধির জন্যে সমগ্র উত্তর ভারতে সম্মানিত হয়েছিলেন। আর এই সকল অর্জিত গুণাবলীর মধ্যে অদ্বৈত-বাদের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও আমরা দেখি তাঁর ভক্তির গভীরতা।

তিনি যে একজন পরম ভক্ত ছিলেন, তাও তাঁর লেখা বা তাঁর লেখা বলে প্রচলিত বহু স্তবক বা শ্লোকাবলী দেখলে বোঝা যায়। উদাহরণ-স্বরূপ তাঁর গীতার টীকা থেকে উল্লেখ করছি :

'যদ্ভক্তিং ন বিনা মুক্তির্যঃ সেব্যঃ সর্বযোগিনাম্।
তং বন্দে পরমানন্দঘনং শ্রীনন্দনন্দনম্ ॥'

(গীতা, ৭ম অধ্যায় : টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ)

— যাঁকে ভক্তি না করলে মুক্তি হয় না, যিনি সকল যোগিগণের সেব্য, সেই পরমানন্দঘন শ্রীনন্দনন্দনকে আমি বন্দনা করি।

'ধ্যানাভ্যাসবশীকৃতেন মনসা তন্নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং
জ্যোতিঃ কিঞ্চন যোগিনো যদি পরং
পশ্যন্তি পশ্যন্তু তে।
অস্মাকং তু তদেব লোচনচমৎকারায় ভূয়াচ্চিরং
কালিন্দীপুলিনেষু যৎ কিমপি তন্নীলং
মহো ধাবতি ॥'

(গীতা, ১৩শ অধ্যায় : টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ)

— ধ্যান অভ্যাসে বশীকৃত মনে সেই নির্গুণ নিষ্ক্রিয় পরজ্যোতি, যদি কোন কোন যোগী দেখেন তো তাঁরা তা দেখুন ; আমাদের কাছে কিন্তু যমুনাপুলিনে ক্রীড়ারত সেই নীল জ্যোতি (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ) যেন চিরকালের জন্য নয়নানন্দ হয়েই থাকে।'

কিংবদন্তী আছে যে, বারাণসীর বেদান্তবাদী সন্ন্যাসিগণ যাঁরা জ্ঞানমার্গের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন— মধুসূদনকে বালগোপালের সেবাপূজায় ব্যস্ত দেখে অবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা দলবদ্ধ হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে এর কারণ জানতে চান। মধুসূদনের উত্তরটিতে ভক্তের বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠেছে :

'অদ্বৈতসাম্রাজ্যপথাধিকঢ়া-
স্তৃণীকৃতাখণ্ডলবৈভবাশ্চ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥'

— (সত্য বটে) অদ্বৈতসাম্রাজ্যের পথে সম্যক্ আরূঢ় হয়েছি এবং ইন্দ্রের ঐশ্বর্যও তৃণবৎ তুচ্ছ করেছি, তথাপি কোন এক শঠ গোপবধূ-লম্পট বলপূর্বক আমাদের দাসী করেছে।

তাঁর গীতা-টীকা শেষ করে তিনি লিখেছেন :

'বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে ॥'

— বংশী-বিভূষিত-হস্ত, নবজলধর সদৃশ নীলবর্ণ, পীতাম্বর, বিম্বারক্তিম-অধরোষ্ঠ, রাকাচন্দ্র-সমানন, কমললোচন কৃষ্ণ থেকে পরমতত্ত্ব – আমি আর কিছু জানি না।

সর্বশেষে— এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে মধুসূদনের রচনা বলে প্রচলিত যে শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ জ্ঞানের শিখরসমূহে পৌঁছেও, ভক্তিকে চূড়ান্তভাবে আস্বাদন করতে পারে।

মধুসূদন তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিরূপে কয়েকজন ভক্তশ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানিশ্রেষ্ঠকে লাভ করেছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই প্রতি তাঁর ছিল পরম ও চরম শ্রদ্ধা। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে রাম-ভক্তির পরমোৎকর্ষের আদর্শ তুলসীদাসের কথা। তিনি তখন বারাণসীতে বাস করতেন— মধুসূদনের বাসস্থানের অনতিদূরে। এক সময় কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত তাঁর কাছে গিয়ে জানতে চান, তিনি পণ্ডিতজনসেবিত সংস্কৃত ভাষায় না লিখে কেবল স্থানীয় কথ্য ভাষা হিন্দীতেই লেখেন কেন। তুলসীদাস কবির ভাষায় জবাব দিয়েছিলেন :

হরি হর যশ সুর নর গিরা, বরনহি সন্ত সুজান।
হণ্ডী হাটক চারুচীর, রান্ধে স্বাদু সমান ॥

— জ্ঞানী সন্তজন হরি অথবা হরের যশোগান দেবভাষায় বা মানবভাষায় করুন— ফল একই; যেমন সোনার বা মাটির হাঁড়িতে রান্না পায়েসের স্বাদ একই।

যখন এই কথা মধুসূদনকে জানানো হয়, তাঁর জবাবটি ছিল শ্রদ্ধাপূর্ণ। এবারে তা এল সংস্কৃত ছন্দে তুলসীতরু ও তুলসীদাসের ব্যঞ্জনাময় তুলনায় সমৃদ্ধ হয়ে :

পরমানন্দপত্রোঽয়ং জঙ্গমস্তুলসীতরুঃ।
কবিতামঞ্জরী যস্য রামভ্রমরচুম্বিতা ॥

— এই তুলসীতরু সচল। এর পত্রগুলি পরমানন্দময়; এর কবিতামঞ্জরী রামরূপ ভ্রমরের দ্বারা চুম্বিত। [ক্রমশঃ]

সমালোচনা

অনন্তের তুমি অধিকারী : শ্রীপ্রতুলচন্দ্র চৌধুরী। লেখক কর্তৃক প্রকাশিত। পরিবেশক : সাহিত্যশ্রী; ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯; (১৯৭১) পৃঃ ২০২; মূল্য : সাত টাকা মাত্র।

সর্বপ্রথমে এ বইয়ের উৎসর্গপত্রটি লক্ষণীয় —"জাতিকে যাঁরা ভালবাসেন, চিরন্তন জাতীয় আদর্শে যাঁরা আস্থাশীল, জাতির সুমহান ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাঁরা বিশ্বাস পোষণ করেন—বর্তমানের ও অনাগত ভবিষ্যতের সেই সব কর্মী ও জনসেবকের ও তাঁদের পূর্বসূরীদের উদ্দেশে"—লেখক বইটি উৎসর্গ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ- ভাব-ধারায় অভিস্নাত লেখকের এই মহৎ উদ্দেশ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেই এক সুন্দর কাহিনী হয়ে উঠেছে আলোচ্য উপন্যাসখানি।

অবশ্য উপন্যাস বলতে আমরা 'আলালের ঘরে দুলালে'র যুগ থেকে অবক্ষয়ের কথাই মূলতঃ ভেবে থাকি। মানবজীবনের জটিলতার আড়ালে যে সব মনোবৃত্তি ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারার কল্যাণে আজকালকার ঔপন্যাসিকদের অভিষ্ট, এ উপন্যাস-খানিতে তা নেই। তার বদলে রয়েছে এক আদর্শবাদী ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দময়-সত্তা কিশোরের যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হওয়ার আজীবন সেবা, সংগ্রাম ও তপস্যার কাহিনী। প্রচলিত উপন্যাসের অনেক কিছুই নেই, কিন্তু সমাজ ও জাতির কল্যাণব্রতী একটি

মানুষের সংগ্রামের মাধ্যমে কেমন করে সবার চোখের আড়ালে এক একটি গ্রাম, এক একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে— তার বাস্তব অথচ একান্ত আশাবাদী এক রূপ এ উপন্যাসে প্রকাশিত। অকৃতদার এ উপন্যাসের শিক্ষাব্রতী নায়ক চন্দনবাবু হয়তো লেখকেরই আত্মরূপ। আধুনিক উপন্যাস তো মূলতঃ আত্মজীবনীই। তবু এমন একটি জীবন আজকের দিনে আমাদের বড়ো বেশী আকাঙ্ক্ষিত।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবাদর্শের অনুগামীদেরও এক বিশেষ জীবনধারা এ যুগে গড়ে উঠছে। সেদিক থেকে বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবদের মতো এ পথের পথিকেরাও গল্প উপন্যাসের বিষয়বস্তু হয়ে উঠবেন সন্দেহ নেই। তবে তার এখনো অনেক দেরি। আলোচ্য গ্রন্থের লেখকই এই বিশেষ ভাবধারার পথিকদের একটি সমাজচিত্র আঁকার চেষ্টা করেছেন, আর শ্রদ্ধান্বিত এ প্রয়াসে তিনি অনেক পরিমাণে সফলতা অর্জন করেছেন—সেইটি আনন্দের কথা।

হয়তো এ কাহিনীরচনায় লেখক আদর্শ-বাদকেই প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন। কিন্তু একটু একটু করে গ্রামবাংলার ও মফস্বল শহরের জীবনের নানান ছবি ও নানা ধরনের মানুষে মিলে কখন যে একটি গল্পরসের আমেজ গড়ে উঠেছে, তা হয়তো লেখক নিজেও লক্ষ্য করেন নি। তবু গ্রন্থ-সমাপ্তির পরে মহত্তম জীবন-বোধের স্পর্শ পাওয়ার সাথে সাথে এমন একটি উপন্যাসের সন্ধান পাওয়া গেল, যা নিশ্চিত-ভাবে শ্রেয়সত্যকে অবলম্বন করেই সাহিত্যগুণে সার্থক। গ্রন্থটির নামকরণে স্বামী বিবেকানন্দের 'সখার প্রতি' কবিতার অংশটুকু ব্যঞ্জনাময়।

ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

"বিদ্যার্থীরঞ্জন"—৭ম বর্ষ। ১০/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯।

বিদ্যার্থীরঞ্জন শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক মাসিক পত্রিকা। 'সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্' —সত্য ও জ্ঞানের শিখাটি অনন্তকাল অনির্বাণ রাখাই পত্রিকাটির মূল লক্ষ্য। বিষয়বস্তু নির্বাচনে সুধী সম্পাদক-মণ্ডলী বিশেষ যত্নশীল। সুনির্বাচিত প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প পত্রিকাটির অঙ্গসৌষ্ঠবই শুধু বৃদ্ধি করে নাই, উহার জাতীয় উন্নয়ন ও সংহতির প্রয়াসে একনিষ্ঠতার যে আদর্শ তাহাও সম্পূর্ণরূপে সফল করিয়াছে।

মহৎ উদ্দেশ্যের ধারক এই পত্রিকাটি আর্থিক সংকটের সম্মুখীন। সংস্কৃতিবান ও রুচিশীল পাঠক স্বেচ্ছায় গ্রাহক হইয়া পত্রিকাটিকে বাঁচাইয়া রাখিতে সচেষ্ট হইবেন—ইহাই আমাদের কামনা। **শ্রীধনেশ মহলানবীশ**

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

বাংলাদেশে সেবাকার্য: বাংলাদেশের সেবাকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে জানুআরি ১৯৭৫-এর শেষ পর্যন্ত মোট ৩৪,১৪,১০১ টাকা খরচ করা হয়। বিতরিত দ্রব্যাদির মূল্য উক্ত হিসাবের অন্তর্ভুক্ত নহে। অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ১৯৭৪-এ কৃত সেবাকার্যের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল:

ঢাকা কেন্দ্র (ডিসেম্বর): চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ৪,২৮৯। বিতরিত হয়: গুঁড়ো দুধ ৮,৮৩১ পাঃ, বিস্কুট ২০ কেজি, কম্বল ৩২৮, নূতন বস্ত্রাদি ৭৭১, পুরাতন বস্ত্রাদি ২২০, বাসনপত্র ৩২, সাবান ২২ খণ্ড।

বাগেরহাট কেন্দ্র (অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর) : চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ১৪,৮৮০। বিতরিত হয় : গুঁড়ো দুধ ৭,৫৪৬ পাঃ, বস্ত্রাদি ২১৫, কোদাল ৪৩৫।

দিনাজপুর কেন্দ্র (অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর) : চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ৫,২৮৯। বিতরিত হয় : গুঁড়ো দুধ ৫,৬০০ পাঃ, শাড়ী ৭২, লুঙ্গি ৫টি ও জুতা, পোশাক, ভিটামিন ট্যাবলেট।

শ্রীহট্ট কেন্দ্র (অক্টোবর ও নভেম্বর) : চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ১,৯৯০। বিতরিত হয় : গুঁড়ো দুধ ২১৮ পাঃ, শাড়ী ৩১৩, লুঙ্গি ৫, বস্ত্রাদি ও খাদ্যদ্রব্য।

বরিশাল কেন্দ্র (অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর) : চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ১,৫৮১। বিতরিত হয় : গুঁড়ো দুধ ১.৫৮৩ পাঃ।

নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্র (ডিসেম্বর) : চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ২.৪৭৪। বিতরিত হয় : গুঁড়ো দুধ ১,২৮৩ পাঃ।

ভারতে সেবাকার্য :

মনসাদ্বীপ কেন্দ্র হইতে অক্টোবর মাসে বিতরিত হয় : খাদ্যদ্রব্য ২০৯ কেজি, কম্বল ৪০০, ধুতি ১৩, শাড়ী ৫০, শিশুদের পোশাক ৬৮ এবং পুরাতন বস্ত্রাদি ৩০০। ডিসেম্বর মাসে বিতরিত হয় : কম্বল ৫৬০ এবং বস্ত্রাদি ২০৭০।

জলপাইগুড়ি কেন্দ্র (অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর) : বিতরিত হয় : শাড়ী ২৫২, ধুতি ১৯৯, শিশুদের পোশাক ৫৫৩ এবং অন্যান্য বস্ত্রাদি ও চটের থলি।

রায়পুর কেন্দ্র (অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর) : বিতরিত হয় : খাদ্যদ্রব্য ৬,৯২৪ কেজি, সব্জি ২,৩০৮ কেজি, পুরাতন বস্ত্রাদি ২৬৭, কম্বল ৬৬৭ ও লেপ ৪৯।

কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি কেন্দ্র দুইটির লঙ্গরখানায় প্রতিদিন যথাক্রমে ২৬,০০০ ও ১,০০০ সংখ্যক ব্যক্তিকে খাদ্য দেওয়া হয়। অপরাপর সকল লঙ্গরখানা নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে বন্ধ হয়। এতদ্ব্যতীত নিম্নের কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে বিতরিত হয় : **কাঁথি :** কম্বল ৩৬০ ও বস্ত্রাদি ১,৫০৩, **চণ্ডীপুর :** কম্বল ১০০ ও বস্ত্রাদি ৩০০; **রামহরিপুর :** কম্বল ৪৪০ ও বস্ত্রাদি ১,০৭১; **পুরুলিয়া :** কম্বল ৬৬০ ও বস্ত্রাদি ১,২৩৯; **সরিষা :** বস্ত্রাদি ১,১৫২।

রাজকোট কেন্দ্র ৫৫০টি কম্বল বিতরণ করে এবং ১লা জানুআরি ১৯৭৫-এ একটি লঙ্গরখানা খোলে। উহাতে প্রতিদিন ৬৫০ জনকে খাওয়ানো হইতেছে।

দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত আমরা তিনজন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ সংবাদ জানাইতেছি :

স্বামী হেরম্বানন্দ গত ৩রা ফেব্রুআরি রাত্রি ১২-৪০ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-প্রতিষ্ঠানে ৬৪ বৎসর বয়সে বহুমূত্র ও হৃৎ-শিরা সংক্রান্ত রোগে দেহত্যাগ করেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত ছিলেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে সংঘের তমলুক কেন্দ্রে যোগদান করিয়া ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের নিকট তিনি সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। তাঁহার জীবনের অধিকাংশকাল তমলুক কেন্দ্রেই অতিবাহিত হয়, যদিও কিছুকালের জন্য তিনি রাঁচী (মোরাবাদী) ও মেদিনীপুর কেন্দ্রেরও কর্মী ছিলেন।

স্বামী গৌরীশানন্দ গত ১২ই ফেব্রুআরি রাত্রি ১২-৩৫ মিনিটে বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে ৮৮ বৎসর বয়সে আন্ত্রিক ক্যান্সার রোগে দেহত্যাগ করেন। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে সংঘের

নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা) কেন্দ্রে যোগদান করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠাকালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। তিনি ঢাকা বেলুড় মঠ বম্বে এবং রেঙ্গুন সেবাশ্রম কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন এবং কয়েকটি ত্রাণমূলক সেবাকার্যও পরিচালনা করেন। গত কয়েক দশক ধরিয়া তিনি বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমে অবসর জীবন যাপন করিতেছিলেন।

স্বামী পারাশরানন্দ গত ১৯শে ফেব্রুআরি সেবাপ্রতিষ্ঠানে ৪১ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। মঠের বাগবাজার কেন্দ্রে (উদ্বোধনে) তিনি পূজারী ছিলেন। ঐ দিন সকালে সহসা অসুস্থ হইয়া পড়ায় অজ্ঞান অবস্থায় তাঁহাকে বেলা প্রায় ১২টায় সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভরতি করানো হয়। যথোচিত চিকিৎসা সত্ত্বেও বৈকাল ৩-২৫ মিনিটে তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে। তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে যোগদান করিয়া ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান প্রেসিডেন্ট শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। বেলুড় মঠ জলপাইগুড়ি এবং কামারপুকুর কেন্দ্রেরও তিনি কর্মী ছিলেন।

ইঁহাদের দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

আগরতলা শ্রীসারদা সংঘের ২য় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত ১২, ১৩ ও ১৪ই ডিসেম্বর (১৯৭৪) স্থানীয় তুলসীবতী স্কুলের মিলনায়তনে আয়োজিত ধর্মীয় সভায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় বহুভক্ত নরনারীর সমাবেশে স্বামী তত্ত্বানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর জীবন ও ভাবধারা সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীসুশান্ত চৌধুরী ও অধ্যাপক শ্রীমাধবলাল চট্টোপাধ্যায়।

নববারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ কর্তৃক পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১২২তম শুভ আবির্ভাব উৎসব ১২.১.৭৫ তারিখে 'সারদা ভবনে' সারাদিনব্যাপী এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। প্রত্যূষে স্তব ও প্রার্থনার পর শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও কথামৃত পাঠ হয়। পরে উপস্থিত ভক্তগণের মধ্যে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরিত হয়। অপরাহ্ণে কথামৃত পাঠ ও ভক্তিমূলক সংগীতের পর ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবন আলোচনা করেন স্বামী অমৃতত্বানন্দ।

ভূপাল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম কর্তৃক গত ২.১.৭৫ তারিখে স্বামী বিবেকানন্দের ১১৩তম জন্মতিথি উৎসব মহাসমারোহে পালিত হইয়াছে। বিশেষ পূজা হোম ভজন কীর্তন হয় ও একশত ভক্ত বসিয়া অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। ৯.২.৭৫ তারিখে সর্বসাধারণের মহোৎসব উপলক্ষে প্রায় ১৬০০ নরনারায়ণ বসিয়া অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। অন্ধ স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণ ভজন পরিবেশন করেন। আয়োজিত এক সভায় প্রায় দুই হাজার শ্রোতার উপস্থিতিতে সর্বশ্রী এ এম. শাস্ত্রী, কে. আর. মিনোচা, এস. ডি. আগরওয়াল, ঈশনারায়ণ যোশী, স্বামী পরানন্দ ও স্বামী চিন্ময়ানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন।

তেজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম কর্তৃক স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়। ভজন, কথামৃত পাঠ, বিশেষ পূজা এবং স্বামীজীর জীবন সম্বন্ধে আলোচনা উৎসবের অঙ্গ ছিল। ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী স্বামীজীর জীবনী ও বাণী সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন। এই উপলক্ষে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের নাটমন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। মধ্যাহ্নে সহস্রাধিক দরিদ্র-নারায়ণকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

পূর্ণিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২রা ফেব্রুআরি যুগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে মঙ্গলারতি উষা-কীর্তন পূজা হোম ও ভোগারতি হয়। প্রায় ৩৫০ জন ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালে স্বামীজীর জীবনী ও বাণী পাঠ ও সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর শিল্পিবৃন্দ কর্তৃক ভজনাদি হয়।

রাউরকেলা— রামকৃষ্ণ সংঘ কর্তৃক ২রা ফেব্রুআরি ১৯৭৫ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজীর ১১৩তম জন্মোৎসব মঙ্গলারতি পূজা হোম ভজন কীর্তনাদি এবং শাস্ত্রপাঠ ও স্বামীজীর জীবনী ও বাণীর আলোচনার মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় তিনশত ভক্ত খিচুড়ি প্রসাদ পান।

খিদিরপুর—স্বরবিতান গত ২রা ফেব্রুআরি, স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবতিথি উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রতিষ্ঠানের শিল্পিবৃন্দ ধর্ম-সংগীত পরিবেশন করেন এবং বিভিন্ন বক্তা স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু প্রধান বক্তা অনুষ্ঠানটির পরিচালনা করেন।

হুগলী জেলা—বিবেকানন্দ সংঘ কর্তৃক গত ডিসেম্বর ও জানুআরি মাসে পূর্ব-নির্ধারিত কার্যসূচী অনুযায়ী জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে শ্রীশ্রীসারদামাতার জন্মোৎসব ও কল্পতরু উৎসব সুষ্ঠুভাবে পালিত হইয়াছে।

পরলোকে জগদীশচন্দ্র ভৌমিক

গত ৩০.১.৭৫ তারিখে সকাল ৭-৫০ মিনিটে জগদীশচন্দ্র ভৌমিক তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে ৭৫ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে মরদেহ ত্যাগ করেন। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে মাত্র সতের বৎসর বয়সে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের অযাচিত-করুণায় দীক্ষা লাভ করিয়া ধন্য হন। পরবর্তীকালে তিনি টাঙ্গাইলের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন কর্মদক্ষতার জন্য তদানীন্তন সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হন। জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির-নির্মাণ ও মূর্তি প্রতিষ্ঠাকার্যে তাঁহার দান উল্লেখযোগ্য।

পরলোকে নীলকান্ত চক্রবর্তী

গত ২৩শে জানুআরি রাত্রিতে কসবানিবাসী নীলকান্ত চক্রবর্তী ৯৩ বৎসর বয়সে নিদ্রিত অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। তিনি শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য এবং স্বামী প্রেমানন্দ-প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের একান্ত স্নেহভাজন ছিলেন।

তাঁহার পূর্ব নিবাস টাঙ্গাইল (বাংলাদেশ)। সেইখানে রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন অন্যতম উদ্যোক্তা। তিনি সুদীর্ঘকাল ঐ মঠের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া উহার বহুপ্রকার উন্নতি সাধন করেন। বাংলা বিভাগের ফলে তিনি পূর্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং কসবায় তাঁহার কতিপয় গুরুভ্রাতা ও অন্যান্য ভক্ত বন্ধুদিগের সহযোগিতায় দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীশ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষকতাই ছিল তাঁহার উপজীবিকা এবং ইহার মাধ্যমে বহু ছাত্রকে তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করেন। তাঁহার কয়েকটি ছাত্র সংসারত্যাগ করিয়া বেলুড় মঠে যোগদান করেন। তাঁহার সরলতা এবং উদারতার জন্য তিনি সর্বধর্মাবলম্বী ভক্তদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র ছিলেন।

ইঁহাদের দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীশ্রীমায়ের চরণে চিরশান্তি লাভ করুক, এই প্রার্থনা।

[পুনর্মুদ্রণ]

উদ্বোধন

[১ম বর্ষ] ১লা শ্রাবণ। (১৩০৬) [১৩শ সংখ্যা]

মহাভাষ্যম্।

(পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভাষ্য-মূল।—যথা লৌকিকবৈদিকেষু।

প্রিয়তদ্ধিতা দাক্ষিণাত্যাঃ। যথা লোকে বেদে চেতি প্রয়োক্তব্যে যথা লৌকিক-বৈদিকেষ্বেতি প্রযুঞ্জতে।

বঙ্গানুবাদ—যেমন লৌকিক ও বৈদিক বিষয়েতে।

দক্ষিণপ্রদেশবাসিগণ তদ্ধিত ভালবাসেন। "যেমন লোকে বেদে" এইটী প্রয়োগের বিষয় হইলেও "যেমন লৌকিক বৈদিক বিষয়ে" এইরূপ ব্যবহার করেন। [ক্রমশঃ]

———*———

ভগবদ্গীতা

শাঙ্করভাষ্যানুবাদ।

(পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত।)

[২য় অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকের ভাষ্য হইতে ১৮ শ্লোকের শ্লোকার্থ পর্য্যন্ত।—বর্তমান সম্পাদক]

[১ম বর্ষ] ১৫ই শ্রাবণ। (১৩০৬) [১৪শ সংখ্যা]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

(শ্রীম—লিখিত।)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সহিত নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ), কাপ্তেন, বলরাম, অধর ইত্যাদির কথোপকথন।

শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা প্রতিপদ তিথি। ইংরাজী ১৯এ আগষ্ট ১৮৮৩ সাল, আজ রবিবার।

ভক্তদের অবসর হইয়াছে, তাই দলে দলে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীতে আসিতেছেন। সকলেরই অবারিত দ্বার। যিনি আসিতেছেন, তাঁহারই সহিত কথা কহিতেছেন। সাধু, পরমহংস, হিন্দু, খৃষ্টান, ব্রহ্মজ্ঞানী ; শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব ; পুরুষ, স্ত্রীলোক *সকলেই আসিতেছেন। ধন্য রাণী রাসমণি! যাঁহার সুকৃতিবলে এই সুন্দর দেবালয় প্রতিষ্ঠিত* হইয়াছে ; আবার এই চঞ্চল প্রতিমা এই মহাপুরুষকে লোকে আসিয়া দর্শন ও পূজা করিতে পাইতেছে।

মধ্যাহ্নকালে শ্রীশ্রীপরমহংসদেব তাঁহার ঘরে ছোট তক্তাপোষের উপর বসিয়া আছেন। আহারের পর একটু বিশ্রাম হইয়াছে। এমন সময়ে মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিলেন। পরমহংসদেব তাঁহাকে বসিতে অনুজ্ঞা করিলেন ও অনেক কুশল প্রশ্ন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার সঙ্গে বেদান্তসম্বন্ধে কথা হইতে লাগিল।

(বেদান্তবাদীদিগের মত।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। "দেখ, অষ্টাবক্রসংহিতায় আত্মজ্ঞানের কথা আছে। আত্মজ্ঞানীরা বলেন 'সোঽহং' অর্থাৎ 'আমি সেই পরমাত্মা'। এসব বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীর মত, সংসারীর পক্ষে এমত ঠিক নয়। সবই করা যাচ্চে, অথচ আমিই সেই নিষ্ক্রিয় পরমাত্মা, এ কিরূপে হতে পারে?

"বেদান্তবাদীরা বলে, আত্মা নির্লিপ্ত। সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য এসব আত্মার কোনও অপকার কর্‌তে পারে না, তবে দেহাভিমানী লোকদের কষ্ট দিতে পারে। যেমন ধোঁয়া, দেয়াল ময়লা করে, কিন্তু আকাশের কিছু কর্‌তে পারে না।

"কৃষ্ণকিশোর বল্‌তো আমি 'খ'—অর্থাৎ আকাশবৎ। তা সে পরম ভক্ত, তার মুখে ও কথা বরং সাজে, কিন্তু সকলের মুখে নয়।

(পাপ পুণ্য।)

"কিন্তু 'আমি মুক্ত' এ অভিমান খুব ভাল। 'আমি মুক্ত' 'আমি মুক্ত' একথা বল্‌তে বল্‌তে সে ব্যক্তি মুক্তই হয়ে যায়। আবার 'আমি বদ্ধ' 'আমি বদ্ধ' একথা বল্‌তে বল্‌তে সে ব্যক্তি বদ্ধ হয়ে যায়।

"যে কেবল বলে 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' সেই শালাই পড়ে যায়। বরং বল্‌তে হয়, আমি তাঁর নাম করিছি, আমার আবার পাপ কি, বন্ধন কি?"

(মায়া না দয়া?)

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। "দেখ আমার মনটা বড় খারাপ হয়েছে, হৃদে* চিঠি লিখেছে, তার ভারি অসুখ। একি মায়া না দয়া?"

---

* হৃদয় মুখোপাধ্যায় পরমহংসদেবের অনেক দিন ১৮৮১ সাল পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে সেবা করিয়াছিলেন। সম্পর্কে হৃদয় তাঁহার ভাগিনেয়। তাঁহার জন্মভূমি হুগলীজেলাস্থিত শিওর গ্রাম। এই গ্রাম শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের জন্মভূমি কামারপুকুর হইতে দুই ক্রোশ। ১৩০৬ সালের বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি প্রায় ষিয়ষ্টি বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁর জন্মভূমিতে পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে।

মাষ্টার কি বলিবেন স্থির করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। "মায়া কাকে বলে জান? বাপ, মা, ভাই, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, ভাগিনা, ভাগিনী, ভাইপো, ভাইঝি এই সব আত্মীয়ের প্রতি ভালবাসা। আর দয়া মানে সর্ব্বভূতে সমান ভালবাসা। আমার এটা কি হলো—মায়া না দয়া?

"হৃদে কিন্তু আমার অনেক করেছিল—অনেক সেবা করেছিল—হাতে করে করে গু পরিষ্কার করতো—আবার তেমনি শেষে শাস্তিও দিয়েছিল—এত শাস্তি দিত যে, পোস্তার উপর গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে দেহত্যাগ করতে গিছ্‌লুম—এখন সে কিছু টাকা পেলে আমার মনটা স্থির হয়। কিন্তু কোন্ বাবুকে আবার বল্‌তে যাব?—কে বলে বেড়ায়?"

(অধর সেন ও বলরামের প্রবেশ।)

বেলা দুইটা তিনটার সময় ভক্তবীর শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত বলরাম বসু আসিয়া উপনীত হইলেন ও পরমহংসদেবকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কেমন আছেন? শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "হাঁ শরীর ভাল আছে, তবে আমার মনে একটু কষ্ট আছে।" তিনি হৃদয়ের পীড়া সম্বন্ধে কোন কথাই উত্থাপন করিলেন না।

(প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ।)

বড়বাজারের মল্লিকদের সিংহবাহিনীনামক দেবীবিগ্রহের কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। "সিংহবাহিনী আমি দেখ্‌তে গিছ্‌লুম। চাষাধোপা পাড়ার একজন মল্লিকদের বাড়ীতে ঠাকুরকে দেখ্‌লুম। পোড়ো বাড়ী। তারা গরীব হয়ে গেছে। এখানে পায়রার গু, ওখানে শেয়লা, এখানে ঝুরঝুর্ করে বালী সুরকি পড়্‌ছে, অন্য মল্লিকদের বাড়ী যেমন দেখেছি, এবাড়ীর সে শ্রী নাই। (মাষ্টারের প্রতি) আচ্ছা, এর মানে কি বল দেখি?"

মাষ্টার চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। "কি জান, যার যা কর্ম্মের ভোগ আছে, তার তা করতে হয়। সংস্কার প্রারব্ধ এসব মান্‌তে হয়।

(মৃন্ময় আধারে চিন্ময়ী দেবী।)

(মাষ্টারের প্রতি) "আর পোড়ো বাড়ীতে দেখ্‌লুম যে, সেখানে যে সিংহবাহিনীর মুখের ভাব জ্বল জ্বল করছে। আবির্ভাব মান্‌তে হয়।

"বিষ্ণুপুরে গিছ্‌লুম। রাজার বেশ সব ঠাকুরবাড়ী আছে, সেখানে ভগবতীর মূর্ত্তি আছে, নাম মৃন্ময়ী। ঠাকুরবাড়ীর সম্মুখে বড় দীঘি। (মাষ্টারের প্রতি) আচ্ছা দীঘিতে আব আঠার* গন্ধ কেন পেলুম বল দেখি? আমি তো জান্‌তুম না যে, মেয়েরা মৃন্ময়ীদর্শনের সময় আব আঠা তাঁকে দেয়। আর দীঘির কাছে আমার ভাব সমাধি হল—তখন বিগ্রহ দেখিনি—আবেশে সেই দীঘির কাছে মৃন্ময়ীদর্শন হল—কোমর পর্য্যন্ত।"

---

* মেয়েদের মাথাঘষা।

(ভক্ত ও সুখ দুঃখ।)

এতক্ষণে আর সব ভক্ত আসিয়া জুটিতে লাগিলেন। কাবুলের রাজবিপ্লব ও যুদ্ধের কথা উঠিল। একজন বলিলেন যে, ইয়াকুব খাঁ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন। তিনি পরমহংসদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, ইয়াকুব খাঁ কিন্তু একজন বড ভক্ত।"

শ্রীরামকৃষ্ণ। "কি জান সুখ দুঃখ দেহধারণের ধর্ম্ম। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে যে, কালুবীর জেলে গিছ্‌লো। তার বুকে পাষাণ দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু কালুবীর ভগবতীর বরপুত্র। দেহ ধারণ করলেই সুখ দুঃখ ভোগ আছে।

"শ্রীমন্ত কত বড ভক্ত। আর তার মা খুল্লনাকে ভগবতী কত ভালবাসতেন, কিন্তু সেই শ্রীমন্তের কত বিপদ। মশানে কাট্‌তে নিয়ে গিছ্‌লো।

"একজন কাঠুরে—পরম ভক্ত—ভগবতীর দর্শন পেলে —তিনি কত ভালবাসলেন—কত কৃপা করলেন। কিন্তু তার কাঠুরের কাজ আর ঘুচ্‌লো না। সেই কাঠ কেটে আবার খেতে হবে।

"দেবকীর কারাগারে চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভগবান দর্শন হল। কিন্তু কারাগার ঘুচ্‌লো না।"

মাষ্টার। "শুধু কারাগার ঘোচা কেন? দেহই ত যত জঞ্জালের গোডা, দেহটা ঘুচে যাওয়া উচিত ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। "কি জান প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ। তাই যে কদিন আছে, দেহ ধারণ কর্ত্তে হয়। যেমন একজন কানা গঙ্গাস্নান করলে। তার পাপ সব চলে গেল। কিন্তু কানা চোক আর ঘুচ্‌লো না। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মভোগ।"

মাষ্টার। "যে বাণটা ছোঁডা গেছে, সে বাণের উপর আর কোনও আয়ত্ত থাকে না।"

শ্রীরামকৃষ্ণ। "দেহের সুখ দুঃখ যাই হোক, ভক্তের জ্ঞান ও ভক্তির ঐশ্বর্য্য থাকে, সে ঐশ্বর্য্য কখন যাবার নয়। দেখনা পাণ্ডবদের অত বিপদ, কিন্তু এ বিপদে তারা চৈতন্য একবারও হারায় নাই। তাদের মত জ্ঞানী ও ভক্ত কোথায়?"

(কাপ্তেন ও নরেন্দ্রের [বিবেকানন্দের] প্রবেশ।)

এমন সময় নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ) ও শ্রীযুত বিশ্বনাথ উপাধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বনাথ নেপালের রাজার Resident। পরমহংসদেব তাঁহাকে কাপ্তেন বলিয়া ডাকেন, তাই ভক্তেরা সকলে তাঁহাকে কাপ্তেন বলিত। বিবেকানন্দের বয়স বছর বাইশ, B. A., পডিতেন। প্রায় মাঝে মাঝে, বিশেষতঃ রবিবারে দর্শন করিতে আসেন। তাঁহারা প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলে পরমহংসদেব নরেন্দ্রকে গান গাইতে অনুরোধ করিলেন। ঘরের পশ্চিম দেয়ালে তানপুরাটী ঝুলান ছিল, বিবেকানন্দ সেই তানপুরাটী লইয়া তাহার কান মলিয়া সুর বাঁধিতে লাগিলেন, বাঁয়া ও তবলার সুর বাঁধা হইতে লাগিল। সকলে এক দৃষ্টে গায়কের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কখন গান হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিবেকানন্দের প্রতি)। "দেখ্‌, এ আর তেমন বাজে না।"

কাপ্তেন। "পূর্ণ হয়ে বসে আছে। তাই শব্দ নাই। পূর্ণকুম্ভ।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (কাপ্তেনের প্রতি)। "কিন্তু নারদাদি?"

কাপ্তেন। "তাঁরা পরের দুঃখে কথা কয়েছিলেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ। "হাঁ নারদ, শুকদেব এঁরা সমাধির পর নেবে এসেছিলেন- দয়ার জন্য, পরের হিতের জন্য তাঁরা কথা কয়েছিলেন।"

বিবেকানন্দ গান আরম্ভ করিলেন।

(গান।)

সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদি মন্দিরে। (সেদিন কবে বা হবে)
নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপসাগরে!
জ্ঞান মলয়রূপে পশিবে নাথ মম হৃদে,
অবাক হইয়া অধীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে,
আনন্দ অমৃতরূপে উদিবে হৃদয় আকাশে,
চন্দ্র উঠিলে চকোর যেমন ক্রীড়য়ে মনহরষে,
আমরাও নাথ তেমনি করে মাতিব তব প্রকাশে।
শান্তং শিব অদ্বিতীয় রাজরাজচরণে,
বিকাইব ওহে প্রাণ-সখা সফল করিব জীবনে।
এমন অধিকার কোথা পাব আর স্বর্গ ভোগ জীবনে। (সশরীরে)
শুদ্ধমপাপবিদ্ধং রূপ হেরিয়ে নাথ তোমার,
আলোক দেখিলে আঁধার যেমন যায় পলাইয়ে সত্বর।
তেমনি নাথ তোমার প্রকাশে পলাইবে পাপ আঁধার।
ওহে ধ্রুবতারাসম হৃদে জলন্ত বিশ্বাস হে,
জ্বালি দিয়ে দীনবন্ধু পুরাও মনের আশ,
আমি নিশিদিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে,
আপনারে ভুলে যাব তোমারে পাইয়ে হে। (সেদিন কবে হবে হে।)

'আনন্দ অমৃতরূপে' এই কথা বলিতে না বলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর ভাব সমাধিতে নিমজ্জিত হইলেন। আসীন হইয়া করযোড়ে বসিয়া আছেন। পূর্ব্বাস্য—দেহ উন্নত। আনন্দময়ীর রূপসাগরে মগ্ন হইয়াছেন। বাহ্যজ্ঞান একেবারে নাই—শ্বাস বহিছে কি না বহিছে—দেহ স্পন্দহীন—নিমেষশূন্য—চিত্রাপিতের ন্যায় বসিয়া আছেন। যেন এরাজ্য ছাড়িয়া কোথায় গিয়াছেন।

(সমাধিভঙ্গের পর।)

সমাধি ভঙ্গ হইল। ইতিপূর্ব্বে বিবেকানন্দ সমাধিদৃষ্টে কক্ষত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকের বারাণ্ডায় চলিয়া গিয়াছেন। সেখানে হাজরা মহাশয় কম্বলাসনে হরিনামের মালা হাতে করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহারি সঙ্গে বিবেকানন্দ আলাপ করিতে লাগিলেন, এদিকে ঘরে একঘর লোক হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিভঙ্গের পর ভক্তদের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন—দেখেন যে, বিবেকানন্দ নাই। শূন্য তানপুরা পড়িয়া রহিয়াছে, আর ভক্তগণ সকলে তাঁর দিকে ঔৎসুক্যের সহিত তাকাইয়া রহিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। "আগুন জেলে গেছে এখন থাকলো আর গেল।"

(সচ্চিদানন্দলাভের উপায়।)

(ভক্তদিগের প্রতি) "চিদানন্দ আরোপ কর, তোমাদেরও আনন্দ হবে। চিদানন্দ আছেই, কেবল আবরণ ও বিক্ষেপ।

"বিষয়াসক্তি যত কম্‌বে ঈশ্বরে রতি মতি তত বাড়্‌বে।"

কাপ্তেন। "কলিকাতার বাড়ীর দিকে যত আস্‌বে কাশী থেকে তত তফাৎ হবে। আবার কাশীর দিকে যত যাবে, বাড়ী থেকে তত তফাৎ হবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ। "শ্রীমতী যত কৃষ্ণের নিকট এগুচ্চেন, ততই কৃষ্ণের দেহগন্ধ পাচ্ছিলেন। ঈশ্বরের নিকট যত যাওয়া যায় ততই তাঁতে ভাব ভক্তি হয়। সাগরের নিকট নদী যত যায়, ততই জোয়ার ভাটা দেখা যায়।"

(জ্ঞানী ও ভক্তের প্রভেদ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। "জ্ঞানীর ভিতর একটানা গঙ্গা বহিতে থাকে। তাহার পক্ষে সব স্বপ্নবৎ, তিনি স্বস্বরূপে সর্ব্বদা থাকেন। ভক্তের ভিতর একটানা নয়, জোয়ার ভাটা হয়, ভক্ত হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়। ভক্ত তাঁর সঙ্গে বিলাস কর্ত্তে ভালবাসে—কখন সাঁতার দেয়, কখন ডোবে, কখন ওঠে—জলের ভিতর বরফ যেমন 'টাপুর টুপুর', 'টাপুর টুপুর' করে।

(সচ্চিদানন্দ ও সচ্চিদানন্দময়ী—ব্রহ্ম ও শক্তি।)

"কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ—যিনি সচ্চিদানন্দ তিনিই সচ্চিদানন্দময়ী। যেমন জ্যোতিঃ ও মণি; জ্যোতিঃ বল্লেই মণি বুঝায়, মণি বল্লেই জ্যোতিঃ বুঝায়, তুমি মণি না ভাবলে জ্যোতিঃ ভাব্‌তে পার না—জ্যোতিঃ না ভাবলে মণি ভাব্‌তে পার না।

"এক সচ্চিদানন্দ শক্তিভেদে উপাধিভেদ—তাই নানারূপ—'সেও তুমিই গো তারা'। যেখানে কার্য্য—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, সেইখানেই শক্তি। কিন্তু জল স্থির থাক্‌লেও জল, তরঙ্গ ভুড়্‌ভুড়ি হলেও জল। সেই সচ্চিদানন্দই আদ্যাশক্তি—যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন, যেমন কাপ্তেন যখন কোন কাজ করেন না তখনও যিনি, আর কাপ্তেন পূজা কর্‌চেন তখনও তিনি, আর কাপ্তেন লাট সাহেবের কাছে যাচ্ছেন, তখনও তিনি—কেবল উপাধিবিশেষ।"

কাপ্তেন। "হাঁ, মহাশয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ। "আমি এই কথা কেশব সেনকে বলেছিলুম।"

কাপ্তেন। "মহাশয়! কেশব সেন ভ্রষ্টাচার, স্বেচ্ছাচার তিনি সাধু নন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদিগের প্রতি)। "কাপ্তেন আমায় বারণ করে কেশব সেনের ওখানে যেতে।"

কাপ্তেন। "তা আপনি যাবেন তা আর কি করবো!"

শ্রীরামকৃষ্ণ। "তুমি লাট সাহেবের কাছে যেতে পার টাকার জন্য, আর আমি কেশব সেনের কাছে যেতে পারি না? সে ঈশ্বর চিন্তা করে—হরিনাম করে! তবে না তুমি বল ঈশ্বর মায়াজীবজগৎ—যিনি ঈশ্বর তিনিই এই সব জীব, জগৎ হয়েছেন!!"

এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ হঠাৎ ঘর হইতে উত্তর পূর্ব্বের বারাণ্ডায় চলিয়া গেলেন। কাপ্তেন ও অন্যান্য ভক্তেরা ঘরেই বসিয়া তাঁর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কেবল মাষ্টার তাঁহার সঙ্গে বাহিরে ঐ বারাণ্ডায় আসিলেন।

উত্তর পূর্ব্বের বারাণ্ডায় বিবেকানন্দ হাজরার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জানেন, হাজরা বড় শুষ্ক জ্ঞান বিচার করে—বলে জগৎ স্বপ্নবৎ—পূজা নৈবিদ্য এসব মনের ভুল—আর আমিই সেই,—কেবল স্বস্বরূপকে চিন্তা করাই উদ্দেশ্য।

(জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। "কি গো! তোমাদের কি সব কথা হচ্ছে?"

বিবেকানন্দ (হাসিতে হাসিতে)। "আমাদের কত কি কথা হচ্চে—'লম্বা' 'লম্বা' কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। "কিন্তু শুদ্ধ জ্ঞান আর শুদ্ধ ভক্তি এক। শুদ্ধ জ্ঞান যেখানে নিয়ে যায়, শুদ্ধ ভক্তিও সেইখানেই নিয়ে যায়। ভক্তি পথ বেশ সহজ পথ।"

বিবেকানন্দ। " 'আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে দে মা পাগল করে' (মাষ্টারের প্রতি) দেখুন Hamilton-এ পড়্লুম—লিখ্ছেন 'A learned ignorance is the end of philosophy and the beginning of religion.' "

শ্রীরামকৃষ্ণ। "এর মানে কি গা?"

বিবেকানন্দ। "ফিলাজফী (দর্শন শাস্ত্র) পড়া শেষ হলে মানুষটা পণ্ডিত-মূর্খ হয়ে দাঁড়ায়; তখন ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে—তখন ধর্ম্মের আরম্ভ হয়!"

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। "Thank you! Thank you!" (সকলের হাস্য)।

কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া অধিকাংশ লোক বাটী গমন করিলেন। বিবেকানন্দও বিদায় লইলেন।

ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিতে লাগিল, সন্ধ্যা হয় হয়। ঠাকুরবাড়ীর ফরাস চারিদিকে আলোর আয়োজন করিতে লাগিল। কালীঘরের ও বিষ্ণুঘরের দুইজন পূজারি গঙ্গায় অর্দ্ধনিমগ্ন হইয়া বাহ্য ও অন্তর শুচি করিতেছেন, কেননা শীঘ্র গিয়া আরতি ও রাত্রিকালীন অন্যান্য সেবা করিতে হইবে। দক্ষিণেশ্বর গ্রামবাসী যুবকবৃন্দ কাহারও হাতে stick, কেহ বন্ধু সঙ্গে বাগান বেড়াইতে আসিয়াছে। তাহারা পোস্তার উপর বিচরণ করিতেছে ও পুষ্পগন্ধবাহী নির্ম্মল সন্ধ্যা-সমীরণ সেবন করিতে করিতে শ্রাবণ মাসের খরস্রোত ঈষৎ বীচিবিকম্পিত গঙ্গাপ্রবাহ দেখিতে-ছিল, তন্মধ্যে হয়ত একজন অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল পঞ্চবটীর বিজন ভূমিতে পাদচারণ করিতেছেন। ভগবান রামকৃষ্ণও পশ্চিমের বারাণ্ডা হইতে কিয়ৎকাল গঙ্গা দর্শন করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা হইল। ফরাস আলোগুলি জ্বালিয়া দিয়া গেল। পরমহংসদেবের ঘরে আসিয়া দাসী প্রদীপ জ্বালিল ও ধুনা দিল। এদিকে দ্বাদশ মন্দিরের শিবের আরতি আরম্ভ হইল। তৎপরেই বিষ্ণুঘরের ও কালীঘরের আরতি আরম্ভ হইল। কাঁসর ঘড়ি ও ঘণ্টা মধুর ও গম্ভীর নিনাদ করিতে লাগিল—কেননা মন্দিরের পার্শ্বেই কলকলনাদিনী গঙ্গা।

শ্রাবণের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া। কিয়ৎক্ষণ পরেই চাঁদ উঠিল। বৃহৎ উঠান ও উদ্যানস্থিত বৃক্ষ-

শীর্ষ ক্রমে চন্দ্রকিরণে প্লাবিত হইতে লাগিল। এদিকে জ্যোৎস্নাস্পর্শে ভাগীরথীসলিল যেন কত আনন্দ করিতে করিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতাকে নমস্কার করিয়া হাততালি দিয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। কক্ষ মধ্যে অনেকগুলি ঠাকুরদের ছবি—শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্কীর্ত্তনের ছবি, যশোদা ও গোপালের ছবি, বাগ্‌বাদিনীর ছবি, মা কালীর ছবি, ধ্রুব প্রহ্লাদের ছবি, রামরাজার ছবি, রাধাকৃষ্ণের ছবি—সকল ঠাকুরকে উদ্দেশ করিয়া ও তাঁহাদের নাম করিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন, আবার বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্মাত্মা ভগবান; ভাগবত, ভক্ত, ভগবান; ব্রহ্ম শক্তি, শক্তি ব্রহ্ম; বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, গীতা, গায়ত্রী; শরণাগত শরণাগত; নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু, আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী; ইত্যাদি। নামের পর করযোড়ে জগন্মাতার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দুই চারিজন ভক্ত সন্ধ্যাগমে বেড়াইতেছিলেন। তাঁহারা ঠাকুরদের আরতির কিয়ৎক্ষণ পরে পরমহংসদেবের ঘরে ক্রমে ২ আসিয়া জুটিতে লাগিলেন।

পরমহংসদেব খাটে উপবিষ্ট। মাষ্টার, অধর, কিশোরী ইত্যাদি সম্মুখে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। "নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ), রাখাল, ভবনাথ এরা সব নিত্যসিদ্ধ। এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ। দেখ না নরেন্দ্র কাহাকেও care (গ্রাহ্য) করে না। আমার সঙ্গে কাপ্তেনের গাড়ীতে যাচ্ছিল—কাপ্তেন ভাল জায়গায় বস্‌তে বল্লে, তা চেয়েও দেখ্‌লে না। আবার যা জানে তাও বলে না, পাছে আমি লোকের কাছে বলে বেড়াই যে, নরেন্দ্র এত বিদ্বান্‌। মায়া মোহ নেই, যেন কোন বন্ধন নেই। খুব ভাল ব্যবহার। একাধারে অনেক গুণ—গাইতে, বাজাতে, লিখ্‌তে, পড়্‌তে—এদিকে জিতেন্দ্রিয়—বলেছে বিয়ে করবে না। নরেন্দ্র আর ভবনাথ দুজনে ভারি মিল্‌। নরেন্দ্র বেশী আসে না। সে ভাল। বেশী এলে আমি বিহ্বল হই।"

জৈমিনি ও কর্ম্ম মীমাংসা।

(পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।)

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বৈদেশিক পণ্ডিতগণের মধ্যে বেদের অনুশীলন একপ্রকার বিচিত্র দৃশ্য! ইউরোপের জ্ঞানবৃদ্ধ অথচ বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিতগণ দৃঢ়তর অধ্যবসায়সহকারে আমাদের বেদের অনুশীলনে জীবনের বহুমূল্য সময় অতিবাহিত করিয়াছেন ও করিতেছেন ইহা কে অস্বীকার করিবে? রথ, উইলসন্‌, ম্যাক্‌সমূলার প্রভৃতি মহা ধীশক্তিসম্পন্ন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের অতি জীর্ণ বেদশাস্ত্রকে নূতন ছাঁচে সংস্কার করিবার প্রযত্ন ভারতের হিন্দুসমাজের পক্ষে কোন সুফল প্রসব করিবে কি না তাহা বিচার করিবার উপযুক্ত সময় এখনও উপস্থিত না হইতে পারে, কিন্তু যে প্রণালীতে ঐ সকল পণ্ডিতগণ আমাদের অতি পুরাতন জীর্ণ বেদগ্রন্থের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বেদ-সম্বন্ধে নূতন নূতন মতসকল আবিষ্কার করিতেছেন ও সাধারণের ঔৎসুক্য বৃদ্ধির জন্য সেই সকলের প্রচার করিতেছেন, সেই সকল মতের বৈচিত্র্য ও নূতনত্ববিষয়ে আলোচনা করিবার যে উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি না থাকিতে পারে। [ক্রমশঃ]

দিব্য বাণী

উপাদানং প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মণোঽন্যন্ন বিদ্যতে।
তস্মাৎ সর্বপ্রপঞ্চোঽয়ং ব্রহ্মৈবাস্তি ন চেতরৎ॥
ব্যাপ্যব্যাপকতা মিথ্যা সর্বমাত্মেতি শাসনাৎ।
ইতি জ্ঞাতে পরে তত্ত্বে ভেদস্যাবসরঃ কুতঃ॥
শ্রুত্যা নিবারিতং নূনং নানাত্বং স্বমুখেন হি।
কথং ভাসো ভবেদন্যঃ স্থিতে চাদ্বয়কারণে॥

—শংকরাচার্য : অপরোক্ষানুভূতি, ৪৫-৪৭

উপাদান জগতের ব্রহ্মবস্তু তাই,
সব কিছু ব্রহ্মমাত্র, অন্য বস্তু নাই।
'সবই আত্মা'—এই হ'ল শ্রুতির বচন ;
ব্যাপ্য-ব্যাপকতা মিথ্যা হয় এ-কারণ।
এই সে পরম তত্ত্ব জ্ঞাত যদি হয়—
অভেদ-দর্শন হ'লে, ভেদ কোথা রয় !
বহুত্ব যা দেখি মোরা তাহা নিবারিত,
শ্রুতিমুখে বার বার ইহা সুনিশ্চিত।
অদ্বিতীয় ব্রহ্মমাত্র রয়েছেন যেথা—
প্রকাশ কিভাবে হবে অন্য বস্তু সেথা !

কথাপ্রসঙ্গে

ব্রহ্মবাদীর জবাব

যদিও আচার্য শংকর তাঁহার রচনাবলীর মাধ্যমে আমাদের নিকট নিত্য বিরাজমান এবং ভবিষ্যতেও যুগ যুগ ধরিয়া স্বমহিমায় বিরাজিত থাকিবেন, তথাপি আজ যদি তিনি সশরীরে আমাদের সম্মুখে থাকিতেন এবং চলতি বাংলায় কথা বলিতেন, তাহা হইলে— তিনি মায়াবাদী —এই অপবাদের প্রতিবাদে তাঁহার জবাবটি সম্ভবতঃ নিম্নরূপ হইত :

'একমেবাদ্বিতীয়ম্', 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' — এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই আছেন, এখানে নানা কিছু নেই— উপনিষদের এই বাণীই তো আমি তোমাদের বলেছি বার বার! তবু অনাদিকাল থেকে জীব ও জগৎ দেখতে অভ্যস্ত তোমরা তোমাদের প্রাচীন সংস্কারের বশে বার বারই প্রশ্ন করেছো— জগতের সৃষ্টি কিভাবে হ'ল? — জীব কোথা থেকে এল? তোমাদের বুদ্ধির দৌড় দেখে, আমাকেও অগত্যা টেনে আনতে হয়েছে— মায়ার কথা। এক নির্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মই আছেন, আর কিছুই নেই, এ কথা বলা সত্ত্বেও যদি সৃষ্টিতত্ত্ব জানবার আগ্রহ থেকেই যায়, যদি ঈশ্বর জীব ও জগতের বিশেষ সম্বন্ধীয় জিজ্ঞাসা থেকেই যায়, তাহলে সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব বুদ্ধিতে আরূঢ় করবার আর কী উপায় থাকতে পারে, বলো? তোমাদেরই তো গানে আছে, 'কিছু ··· নিলে না, খেলে না— সে দোষ কি আমারই?', 'যদি ·· নিতে খেতে, দিতাম খাওয়াতাম তোমারই!' যে জ্ঞানের কথা আমি বলেছি, তাতে আমার মালিকানা নেই— নেই একচেটিয়া অধিকার। তোমাদের সকলেরই নিজস্ব সম্পত্তি তা। কিন্তু তোমরা সে জ্ঞানামৃত আস্বাদন করলে না— দোষটা কি আমার? যদি আমার কথা নিতে, যদি অধিকারী হতে, তাহলে যা বলেছিলুম, তা আত্মসাৎ ক'রে ভরপুর হয়ে যেতে।

কোপারনিকাস্-গ্যালিলিওর কথা বাপের মুখে বারংবার শুনেও ছেলে যদি প্রশ্ন করে: 'সূর্য কোন্ দিকে ওঠে, বাবা? আর কোন দিকে অস্ত যায়?' তাহলে বাপ আর কি বলবে, বলো? বাপ বলে— 'পুব দিকে ওঠে, পশ্চিম দিকে অস্ত যায়।'

আমি বলে গেলুম: 'নিমেষার্ধং ন তিষ্ঠন্তি বৃত্তিং ব্রহ্মময়ীং বিনা।'— জ্ঞানীরা ব্রহ্মময়ী বৃত্তি ছেড়ে নিমেষার্ধও থাকেন না। তোমরা সে-কথায় কর্ণপাতও করলে না। উল্টে আমায় মায়াবাদী ব'লে অপবাদ দিলে; ভাবটা এই যে, আমি যেন লিখেছি— নিমেষার্ধং ন তিষ্ঠন্তি কথাং মায়াময়ীং বিনা! কথায় বলে— 'যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর!' তোমাদেরই জন্যে বাধ্য হয়ে মায়ার কথা বলতে হল— যাতে কোন রকমে নির্মায় ব্রহ্মবস্তুটিকে বুঝিয়ে দিতে পারি। আর তোমরাই কি না আমাকে ব্রহ্মবাদী না বলে মায়াবাদী— অপবাদ দিচ্ছ!

তোমাদেরই বা দোষ কি! ঐ যে পণ্ডিতজী সারাজীবন দর্শনগুলোর টীকাই লিখে গেল— কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ করলে না, তারপর একদিন কি খেয়াল হল, আমার ভাষ্যের ওপর টীকা লিখে টীকাটারই নাম 'ভামতী' রেখে দিলে— তারও আক্কেল দেখে অবাক্ হচ্ছি! বলে কিনা, জীব হচ্ছে মায়ার আশ্রয়!—সব উল্টোপাল্টা কথা! আরে বাবা, ব্রহ্ম যদি মায়া

আশ্রয় না হন, তাহলে জীব কি আকাশ থেকে পড়বে!

কিন্তু আবার বলি, সত্যিই কি ব্রহ্ম মায়ার আশ্রয়? না তা নয়—একেবারেই নয়। ব্রহ্ম নির্মায়— 'প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম।' জীব ও জগৎ যে দেখছে, যে তাদের কারণ খুঁজছে, তাকেই প্রথমে বলা হয়— ব্রহ্মই মায়ার আশ্রয় ও বিষয়। এরই নাম তো বলেইছি— অধ্যারোপ'— অর্থাৎ বস্তুতে অবস্তুর আরোপ। ব্রহ্মে কোন বিশেষ নেই, তবু জীব ও জগতের বিশেষকে তাঁতে আরোপিত করা হচ্ছে, মন্দ-বুদ্ধিদের জন্যে; পরে ঐ অধ্যারোপেরই 'অপবাদ' অর্থাৎ খণ্ডন ক'রে বলা হয়— ব্রহ্মে জীব-জগৎ কস্মিন্ কালেই নেই। সূর্য স্থির আছে, পৃথিবী আদি গ্রহের দল তাকে কেন্দ্র ক'রে ভিন্ন ভিন্ন গতিতে আবর্তিত হচ্ছে— এ তত্ত্ব অল্পবুদ্ধি বালক শুনেও বোঝে না। তাই সূর্যেই গতি আরোপ করে বলতে হয়— সূর্য পুব দিকে ওঠে, পশ্চিম দিকে অস্ত যায়, তাই দিন আর রাত হয়। পরে বড় হলে, বুদ্ধি পাকলে, তাকেই বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে, সূর্য স্থির আছে, গ্রহগুলিই ঘুরছে।

এই 'অধ্যারোপ' আর 'অপবাদে'র দ্বারাই নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব তোমাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছি। এটা একটা প্রণালী মাত্র। তোমরা অপবাদটার দিকে নজর দিলে না, অধ্যারোপ-টাকেই সত্যি ব'লে মেনে নিয়ে মায়াবাদী ব'লে নিন্দা করছো!

তোমাদের হয়েছে বিকার। বিকারের রোগী 'এক হাঁড়ি ভাত খাবো, এক জালা জল খাবো' ব'লে চেঁচায়। তোমরাও তাই করছো! নিত্য নির্বিকার ব্রহ্মেও যারা বিকার দেখে, তারা বিকারের রোগী ছাড়া আর কী? 'দুধের বিকার দই-এর মতোই ব্রহ্মের বিকার জগৎ'-- এ-কথা বলাও যা, 'এক হাঁড়ি ভাত খাবো, এক জালা জল খাবো' ব'লে চীৎকার করাও তা-ই। ভেবে দেখলুম কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। তাই বিকারবাদকে— পরিণামবাদকে উৎখাত করতে বললুম বিবর্তবাদের কথা। কিন্তু দুটোই তো কাঁটা! ও-দুটো ফেলে দিলেই, যিনি আছেন, তিনিই থাকেন— তাঁকে বুদ্ধিগম্য করবার জন্তই ঐ বিবর্তবাদের বা মায়াবাদের অবতারণা। কোনও বাদ দিয়েই, বুদ্ধির এলাকার কোন কিছু দিয়েই তো ব্রহ্মকে পুরোপুরি বোঝানো যাবে না— ঠারেঠোরেই তো বোঝাতে হবে।

আমার পূজ্য গুরুরও পরম পূজ্য গুরু গৌড়পাদ, যাঁর চরণে বার বার লুটিয়ে বন্দনা গাইলুম— 'পূজ্যাভিপূজ্যং পরমগুরুমমুং পাদপাতৈ র্নতোঽস্মি' ব'লে— তাঁর কথা, 'সা চ মায়া ন বিদ্যতে' আর আমার কথা কি আলাদা?* আমিও তো ওর ব্যাখ্যায় লিখেছি: মায়া নাম বস্তু তর্হি? নৈবম্। সা চ মায়া ন বিদ্যতে। মায়া ইতি অবিদ্যমানস্য আখ্যা, ইতি অভিপ্রায়ঃ'— মায়া নামে কোন বস্তু তাহলে আছে কি? না। অভিপ্রায় এই যে, মায়া তারই নাম, যা বিদ্যমান নয়।

মায়া সৎ-ও নয়, অসৎ-ও নয়— অনির্বচনীয় — এ-সব বলা শুধু তোমাদেরই জন্য— তোমরা যারা সৃষ্টির ব্যাখ্যা খুঁজছো। পরমগুরু বললেন: 'এতৎ তদ্ উত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিদ্ ন জায়তে'

* 'Doctrinally, there is no difference whatsoever between what is taught by Gauḍapāda in the kārikā and what is expounded by Śaṅkara in his extensive works.'—Dr. T. M. P. Mahadevan: Gauḍapāda: A Study in Early Advaita (University of Madras, 1954), pp. 231-2.

— আসলে সায় কথা হ'ল সৃষ্টিই নেই, তা তার আবার ব্যাখ্যা! কথায় বলে, মাথা নেই, তার মাথা-ব্যাথা! বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যে এই কথাই তো বলেছি আমি— ব্রহ্মের একদেশে মায়া টায়া কিছুই নেই।

আবার ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্যে বলেছি: 'ন··· অস্মাভিঃ কদাচিৎ কচিদ্ অপি সতোঽন্য অভিধানম্ অভিধেয়ং বা বস্তু পরিকল্প্যতে'- ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও নাম বা নামের প্রতিপাদ্য বস্তু আমরা কখনও কোথাও কল্পনা করি না।

এর পরও কি বলবে, আমি মায়াবাদী ব্রহ্মবাদী নই ?

শ্রীশ্রীমায়ের অপ্রকাশিত পত্র

(১)

[তরলাবালা সেনগুপ্তকে লিখিত]

শ্রীশ্রীহরি শরণং

জয়রামবাটী
২রা অগ্রহায়ণ

কল্যাণবরেষু

মা, তোমার পত্রে তোমাদের সকলের কুশল পেয়ে সুখী হইলাম। আমার [শরীর] এখন ভাল আছে। রাধারাণী সেইরূপ আছে— খোকাটী ভাল আছে। অপরাপর সকলের শরীর প্রায় ভাল নাই—এখানে ভীষণ ম্যালেরিয়া আরম্ভ হইয়াছে। রাধুর কাছে কোনও ডাক্তার বা কবিরাজ আনাইয়া দেখাইবার যো নাই। সে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকে। কি হইবে তাহা ঠাকুরই জানেন। আশা করি তোমরা সকলে কুশলে আছ। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

আঃ তোমাদের
মাতাঠাকুরাণী।

* পোস্টকার্ডটিতে কলমা। ঢাকা) ডাকঘরের ছাপ আছে: 11 DEC 19 (11th December 1919)—যদিও ছাপটি অস্পষ্ট। —সঃ

(২)

[শ্রীযুক্তা ইন্দুবালা দাশগুপ্তকে লিখিত]

৺রী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপদভরসা।

১৫ই †
কলিকাতা

চিরজীবেষু

বিশেষ পরে আমার আশীর্ব্বাদ জানিও। তোমার কন্যা এখন আর আসে নাই, যখন আসবে বলিব। গোলাপমা পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু ভাল আছেন। আমার শরীর একপ্রকার আছে। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিও। অধিক আর কি লেখিব। এখানের মঙ্গল। মালতি ভাল আছে।

তোমার মা

† পোস্টকার্ডটিতে বাগবাজার ডাকখানার ছাপ আছে—2 SEP 18 (2nd Sept 1918)— সঃ

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা

স্বামী সারদেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী-পরিত্যক্তা বা বালবিধবা মেয়েদের দুঃখকষ্টের কথা শুনিলে মা ব্যথিতা হইতেন। পতিহীনার বৈধব্যব্রত সন্ন্যাসের মতোই অতি মহৎ— উন্নত সমাজের শীর্ষদেশে শোভনীয়। কিন্তু উহার জন্য প্রস্তুতি, উপযুক্ত শিক্ষা-সাধনা চাই। মা, তোমার দুরবস্থাপন্ন সন্তানগণকে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ শিক্ষা দিবার জন্যই কি তোমার 'পবিত্রতা-স্বরূপিণী'-রূপে আবির্ভাব? ভোগ সুখের কারণ নহে, দুঃখের হেতু; সংযম, ত্যাগই সুখশান্তিলাভের একমাত্র উপায়— এ শিক্ষা তুমি না দিলে আর কে শিখাইবে, মা? তোমার সন্তানদের তো ইহাই শিখাইয়াছ, মা। বেলুড় মঠ যাহাতে হয়, সেজন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা করিয়াছ; নিবেদিতা স্কুল, জগদম্বা আশ্রম প্রভৃতি তুমি স্বহস্তে প্রতিষ্ঠা করিয়াছ। আশীর্বাদ কর মা, যেন আমরা তোমার শিক্ষা না ভুলি!

এই প্রসঙ্গে আমাদের মায়ের বাড়ীর বাগাল (গরু চরাইবার জন্য বালকভৃত্য) অনাথ বালক গোবিন্দের কথা মনে আসিতেছে। মায়ের নূতন বাড়ী হওয়ার পর মায়ের সেবার দুধের অভাব দূর করার জন্য জ্ঞানানন্দ মহারাজ দুইটি ভাল গাই খরিদ করিয়া আনিয়াছেন। শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত গরুর খরচ বহন করেন। মা সংসারে থাকিয়াও সন্ন্যাসিনী, কোন ঝঞ্ঝাট বাড়াইতে নারাজ। এমন কি তাঁহার জন্য একটি বাড়ী হইবে, তাও ইচ্ছা করেন নাই। প্রথমে তো দেশে আসিলে বড় মামার (প্রসন্ন মুখুজ্যে) ঘরে থাকিতেন, সেখানেই জগদ্ধাত্রীপূজাও হইত। রাজা মহারাজ মায়ের বাড়ী আসিয়া সেই ঘরেই ছিলেন ও আনন্দে নৃত্যগীত করিয়াছিলেন, শুনিয়াছি। মামারা আলাদা হইয়া পৃথক্ বাড়ী করিলেন। কালীমামা দিদির (মায়ের) সহায়তায় ভাল বাড়ী বৈঠকখানা করিলেন। তদবধি তাঁহার বৈঠকখানাতেই ৺জগদ্ধাত্রীপূজা, ভক্ত অতিথির অবস্থান হইতেছিল। ভক্তসন্তানের আগমন বাড়িতেছে, বড় মামার সংসারে মায়ের থাকার খুব অসুবিধা হইতেছে। সারদানন্দ মহারাজের সম্মতিক্রমে ভক্তগণের চেষ্টায় মামাদের প্রদত্ত ছোট এক টুকরা জমির উপর মায়ের আজ্ঞা ও আশীর্বাদ গ্রহণান্তর খড়ের চাল, মাটির দেওয়াল, ছোট ছোট চারখানি ঘর লইয়া মায়ের নূতন বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে। মাষ্টার মহাশয় বিশেষভাবে অর্থসাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুত বিভূতি বাবু কাজ দেখিতেছিলেন, কিন্তু বাঁকুড়ায় থাকেন, চাকুরী করেন, সর্বদা উপস্থিত থাকা সম্ভব হয় না; কাজেই তদারকের অভাবে কাজ অগ্রসর হইতেছিল না। ইতিমধ্যে মায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে কলিকাতা হইতে জিনিসপত্র লইয়া শ্রীযুত রাসবিহারী মহারাজ ও হেমেন্দ্র মহারাজ আসিলেন এবং তাঁহাদেরই প্রাণপাত পরিশ্রমে নূতন বাড়ী নির্মিত হইল। মায়ের বিশ্বস্ত অভিজ্ঞ সন্তান কোয়ালপাড়া আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীযুত কেদারনাথ বাড়ীর প্ল্যান করিয়া দিয়াছিলেন। বিশেষ সমারোহে গৃহপ্রবেশ হইল। সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জোগাড়যন্ত্র করিয়া মায়ের সুখে-স্বচ্ছন্দে অবস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মা কিন্তু বড় মামার সেই গলির ভিতরে ঘুপসির মধ্যে আড়ালে অবস্থিত

পুরাতন অন্ধকার ঘরটি ছাড়িয়া প্রকাশ্য স্থানে নূতন সাজানো গোছানো বাড়ীতে, রাস্তার উপর সকলের চোখের সামনে—আসিতে অনিচ্ছুক। কয়েক দিন গেল, উৎসাহ উদ্দীপনা একটু ঠাণ্ডা হইবার পরে সন্তানগণের আগ্রহে ও পারিপার্শ্বিক নানা কারণে মা অবশ্য সেখানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন; চুপি চুপি কেহ টের না পায়। রাসবিহারী মহারাজ কলিকাতা ফিরিয়া যাইবেন, নূতন বাড়ীর রক্ষক কে থাকিবে? নবাসন হইতে জ্ঞানানন্দ মায়ের সেবার জন্য জিনিসপত্র লইয়া প্রায়ই যাতায়াত করিতেন; মায়ের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও সেবার ভাব এবং মায়েরও তাঁহার উপর স্নেহ-অনুকম্পা দেখিয়া রাসবিহারী মহারাজ তাঁহাকেই রাখিয়া গেলেন। জ্ঞানানন্দ কর্মঠ লোক, মায়ের বাড়ীর উন্নতির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারই উদ্যমে পুণ্য-পুকুর ক্রয় ও সংস্কার করা হইল, ভক্তদের থাকার জন্য বিছানাপত্র যোগাড় হইল। সুরেনবাবুর সাহায্যে জ্ঞানানন্দ একটি গাই কিনিলেন। ললিতবাবুর অর্থসাহায্যে ও আগ্রহে ঔষধালয়, নৈশ পাঠশালাও স্থাপিত হইল।

মা আড়ম্বর একদম পছন্দ করিতেন না; কিন্তু কি করিবেন, ছেলেরা করিতে চায়, প্রয়োজনও আছে, লোকের বিশেষ উপকারও হইতেছে। নূতন বাড়ীতে উঠানে বর্ষায় কাদা হইয়াছে, উঠান পাকা করিবার প্রস্তাব আসিলে মা অমত করিলেন। গ্রামে মাটির ঘরই ভাল, সব লোক মাটির ঘরেই থাকে—জাঁকজমকে লোকের মনে ঈর্ষা হয়—শত্রুতা বাড়ে। দু-তিন বৎসর পরে কিন্তু মায়ের মতামতের অপেক্ষা না করিয়াই বাড়ীর দরজা পাকা করা হইল, ঘরের মেঝে বাঁধান হইল। মা জানাইয়া দিলেন, তাঁহার শোয়ার ঘরখানা অন্ততঃ যেন বাঁধান না হয়,—পাকা মেঝেতে বসিতে আরাম নাই,— গ্রীষ্মে বেশী গরম, শীতে বেশী ঠাণ্ডা। মা পাড়াগেঁয়ে সেকেলে মেয়ে, যখন তখন ঘরে বারান্দায় আসন না বিছাইয়াই মাটিতে বসিয়া পড়িতেন, পা মেলিয়া। ঘরের মেঝে বাঁধান হইল, কিন্তু সে ঘরে আর তিনি বাস করেন নাই।

জ্ঞানানন্দ তাহার অনেক পূর্বে জয়রামবাটী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ম্যালেরিয়ায় খুব অসুস্থ হইয়া তিনি কাটিহারে মায়ের সন্তান ডাক্তার অঘোরবাবুর বাসায় চিকিৎসা ও জলবায়ু পরিবর্তনে গিয়াছিলেন। কিছুকাল পরেই ফিরিয়া আসার কথা ছিল, কিন্তু পুলিশ তাঁহাকে ষড়যন্ত্রকারী রাজনৈতিক দলের লোক সন্দেহ করিয়া আটকাইয়া রাখে। জ্ঞানানন্দ যতদিন ছিলেন, গরুর খুব যত্ন করিতেন, মায়ের কোন ভাবনা ছিল না,—চলিয়া যাওয়ার পরেও তিনি সুরেশবাবুর সহায়তায় গরুর সব ব্যবস্থা করিতেন, এমন কি গোয়ালঘরও ক্রয় করিয়া দেন। কিন্তু তাঁহার অবর্তমানে মায়ের গরুর জন্য অশেষ ভাবনা হইত এবং সময় সময় বলিতেন, 'জ্ঞান গরু করে আবার হাঙ্গামা বাড়িয়ে দিয়ে গেল।'

গোবিন্দকে বাগাল রাখার পর গরুর হাঙ্গাম কিছু কমিয়াছিল সন্দেহ নাই। অল্পবয়সে মা-বাপ মারা যাওয়ায় সে খুব দুঃখকষ্টে মানুষ হইয়াছে। তাহার চেহারা সে-কথার সাক্ষ্য দিতেছে। তাহার দূর সম্পর্কীয় জনৈক আত্মীয় মায়ের বাড়ীতে বাগালের কাজে তাহাকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন; মাহিনা সামান্য, খাওয়া-পরায় সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিবে। রাত্রে নৈশ পাঠ-শালায় লেখাপড়াও শিখিতে পারিবে, পাড়ার চাষী-বাসী ছেলেবুড়ো অনেকেই সেখানে পড়িতে আসে। ৯।১০ বৎসরের বালক আপনার কাজকর্ম ভালই করে এবং মার ও সকলের যত্নে স্নেহে আদরে বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দেই তাহার দিন কাটে। রাত্রে তাহাকে পড়িতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু

উহাতে তাহার মনোযোগ ছিল না। কিছুকাল পরে তাহার শরীরে খোস-পাঁচড়া দেখা দিল, চিকিৎসা-ঔষধপত্রের ব্যবস্থা হইল, কিন্তু বিশেষ উপশম হইল না। সে তাহার কাজকর্ম করিয়া যাইতেছে—এদিকে অসুখেও ভুগিতেছে।

খোস-পাঁচড়া হয় যায়, তেমন সাংঘাতিক অসুখ নহে, সেজন্য কেহ মনোযোগ করে নাই। একদিন রাত্রে গোবিন্দের ভীষণ যন্ত্রণা, অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিল, কাপড়ের নীচে খুব খোস বাড়িয়াছে—লজ্জায় দেখায় নাই। এখন রাত্রে আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেছে না। কি করা যায়, প্রবোধ দিয়া শান্ত করার চেষ্টা হইল। পরদিন ভোরবেলাই দেখা গেল, মা তাহাকে বাড়ীর ভিতর ডাকিয়া লইয়া গিয়াছেন এবং স্বহস্তে শিল-নোড়াতে নিমপাতা-হলুদ বাটিয়া দিতেছেন। গোবিন্দ মায়ের পাশে দাঁড়াইয়া। মা নিমহলুদ বাটিয়া বাটিয়া তাহার হাতে একটু একটু দিতেছেন। কিভাবে লাগাইতে হইবে দেখাইয়া দিতেছেন, সে সেভাবে লাগাইতেছে। মায়ের স্নেহ-আদরে বালকের মন প্রফুল্ল। তাহার চোখে মুখে আনন্দ। ছেলের ক্রন্দনে রাত্রে মায়ের ভাল ঘুম হয় নাই, তাই আজ ভোর হইতে না হইতেই ঔষধের আয়োজন নিজেই করিয়াছেন। মাকে পাইয়া মায়ের স্নেহে মাতৃহীন বালকের রোগের যন্ত্রণার অনেক লাঘব হইয়া গিয়াছে মাও ছেলের প্রসন্ন মুখ দেখিয়া খুশী। উভয়ের মুখ দেখিয়া কথাবার্তা শুনিয়া কে বুঝিবে— নিজের ছেলে নয়? 'আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং' দেখা, 'পরকে আপন করা'— শিক্ষা দিবার জন্যই তো তুমি এসেছ, মা। কিন্তু আমরা, দেখিয়াও দেখি নাই, শেখা তো দূরের কথা! [ক্রমশঃ]

পুণ্য স্মৃতি

স্বামী প্রভবানন্দ

স্বামী অখণ্ডানন্দজীর স্মৃতি

আমেরিকায় তের বছর থাকার পর আমি ভারতবর্ষে যাই। আমার সঙ্গে ছিলেন মিসেস ওয়াইকফ (সিস্টার ললিতা)। ইনি ছিলেন মীড ভগিনীদের অন্যতমা এবং দক্ষিণ প্যাসেডেনায় এঁদের বাড়ীতে স্বামীজী ছয় সপ্তাহ ছিলেন। এই বাড়ীটি এখন বেদান্ত সোসাইটি অব সাদার্ন ক্যালিফর্নিয়ার অন্তর্গত।

আমি স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজকে দর্শন করতে সারগাছি যাই। সিস্টার ললিতা আমার সঙ্গে যাননি। আমার সঙ্গে ছিল গঙ্গেশানন্দ ও গণেশানন্দ (অমিয়)। যখন পৌঁছলুম তখন সন্ধ্যা। ধু ধু করছে মাঠ। আমরা দেখলুম আশ্রমে খুব বাজি পোড়ান হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম: "মহারাজ এসব কি?" তিনি বললেন: "কেন, আমার ভাইপো বহু বছর পরে আসছে। আমি কি তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করব না?" তারপর তিনি আমাকে চেয়ারে তাঁর পাশে বসতে বললেন। আমি বললুম: "সে কি মহারাজ! আমাকে আপনার সামনে চেয়ারে বসতে হবে?" আমি মেজেতে বসে তাঁর পায়ে হাত বুলুতে লাগলুম।

পরদিন রাতে আমরা তাঁর ঘরে গেলুম। আমি

তাঁকে তিব্বত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলতে অনুরোধ করলুম। তিনি বললেন যে, তিনি স্বামীজীর প্রতি বিশেষ অনুগত ছিলেন। এবং স্বামীজীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে ভালবাসতেন। একবার হল স্বামীজী দূর থেকে ঢিল ছুঁড়ে তাঁকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেন। স্বামীজী বলেন, "গঙ্গা, তুই আমার সঙ্গ ছেড়ে একা একা যা।"

এক সময় গঙ্গাধর মহারাজ স্বামীজীকে চিঠি লেখেন। তাতে ছিল যে, তিনি এক জমিদারের সঙ্গে আছেন। লোকটি খুবই উদার ও দানশীল এবং পরোপকারী। তারপর তিনি ঐ জমিদারের কাছ থেকে অন্যত্র চলে যান। স্বামীজী গঙ্গাধর মহারাজকে ঐ জমিদারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বলায় তিনি বললেন, "না স্বামীজী, ঐ জমিদারের চরিত্র ভাল নয়।" প্রত্যুত্তরে স্বামীজী বলেন, "সবাই তোমার মতো শুকদেব হয়ে জন্মাবে ?"

আর একটি কাহিনী বললেন। তিনি তখন হিমালয়ে ভ্রমণ করছেন। একটা সরু রাস্তা দিয়ে চলছেন। হঠাৎ পড়ে যান এবং গড়াতে গড়াতে একটা উপত্যকায় নেমে আসেন। তাঁর সারা শরীর ধুলোকাদায় ভর্তি। গ্রামের চাষীরা তাঁর সেবা শুশ্রূষা করে।

রাজা মহারাজের কাছে পুরীর শশি-নিকেতনে গঙ্গাধর মহারাজের সম্বন্ধে আর একটা কাহিনী শুনেছি। গঙ্গাধর মহারাজ তখন রাজপুতনায় বেড়াচ্ছেন। সেখানকার গ্রামবাসীরা একটা বাড়ীর দোতলায় তাঁকে থাকতে দেয়। সেই বাড়ীটা ছিল একটা ভুতুড়ে বাড়ী। সারারাত ভূতের উপদ্রব। তিনি বসে সারারাত জপ করতে লাগলেন। ভূত কিছুই করতে পারল না। তার পরদিন গ্রামবাসীরা দেখতে এল— সাধুটি মৃত না জীবিত। ঐ বাড়ীতে যারাই আশ্রয় নিত, দেখা যেত তারা মৃত হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু গ্রামবাসীরা যখন দেখল সাধুটি জীবিত, তখন খুব শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে গ্রামে থাকতে অনুরোধ করল। গঙ্গাধর মহারাজ বললেন, "না, আর না। আমি অন্যত্র যাব।"

আর একবার বেলুড় মঠে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। তখন আমি ও সিস্টার ললিতা মঠে রয়েছি। গঙ্গাধর মহারাজ বললেন, "আমি হচ্ছি যশোদা।" তিনি একটা শাড়ি পরলেন। তারপর আমাকে ডান পাশে এবং সিস্টারকে বাঁ পাশে বসালেন। তখন একটা ছবি নেওয়া হয়।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর স্মৃতি

আমার ব্রহ্মচর্যদীক্ষার পর রাজা মহারাজ একদিন আমাকে বলেন, "আমার ইচ্ছা তুই কিছুদিন এলাহাবাদ আশ্রমে বিজ্ঞানানন্দের কাছে থাক। একটা বড় গাছের ছায়ায় কিছুদিন থাকা ভাল।" মহারাজ আমাকে আরো বলেছিলেন, "বিজ্ঞানানন্দ গুপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানী এবং রামকৃষ্ণানন্দের পর সে শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত।" এই প্রসঙ্গে মহারাজ নিম্নোক্ত ঘটনাটি বলেন :

"আমি তখন এলাহাবাদ আশ্রমে রয়েছি। একদিন একটি কলেজের ছাত্র আমার কাছে উপদেশপ্রার্থী হয়ে আসে। আমি তাকে বললুম, 'আমি এখানে অতিথি হয়ে এসেছি। তুমি এই আশ্রমের মোহান্ত স্বামী বিজ্ঞানানন্দের কাছে যাও।' কিন্তু বিজ্ঞান ছেলেটিকে আমার কাছে ফেরত পাঠায়। আমি আবার তাকে বিজ্ঞানের কাছে পাঠালুম এই বলে যে, একমাত্র সে-ই এ মঠে উপদেশ দিতে পারে। সে সেই বেচারা ছেলেটিকে আবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিল। যখন আমি তৃতীয়বার আবার তাকে বিজ্ঞানের কাছে পাঠালুম, তখন সে বলল, 'আচ্ছা, মহারাজ চান আমি

তোমাকে উপদেশ দিই। দাঁড়াও এক মিনিট।' এই বলে সে তার বাক্স খুলে আমার একখানি ছবি বের করে তাকে দিয়ে বলল, 'এই ছবির সামনে রোজ প্রার্থনা করবে এবং সাহায্য চাইবে। যদি তুমি এটি করতে পার তবে অবশ্যই লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। আমি এর চেয়ে বড় উপদেশ কিছু জানি না'।" এই ঘটনাটি বলে মহারাজ মন্তব্য করলেন: "দেখলি, বিজ্ঞান ঠাকুরের কত বড় ভক্ত!" মহারাজ ঠাকুর ছাড়া আর কিছু জানতেন না এবং তাঁর সত্তায় সত্তাবান ছিলেন। গুরুভাইয়েরাও তাঁকে ঠাকুরের প্রতিভূ বলেই মনে করতেন।

মহারাজ শেষে মত পাল্টে আমাকে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু মহারাজের ইচ্ছা পরবর্তী কালে অদ্ভুতভাবে কার্যে পরিণত হয়েছিল। আমেরিকায় তের বছর থাকার পর আমি যখন ভারতে যাই তখন পূজনীয় মহারাজের দিব্য সান্নিধ্যে কিছুদিন কাটাবার সৌভাগ্য হয়েছিল।

বিজ্ঞান মহারাজ তখন ভাইস-প্রেসিডেণ্ট এবং বেলুড় মঠে ছিলেন। আমি বিষ্ণুপুরে আমার বৃদ্ধা মাকে দেখতে যাব এবং ঐ পথে জয়রামবাটী ও কামারপুকুরও দর্শন করব, মনস্থ করলুম।

যাবার আগে আমি বিজ্ঞান মহারাজের কাছে অনুমতি চাইতে গেলুম। তাঁর সামনে উপস্থিত হতেই তিনি বলে উঠলেন: "এ মূর্তির কোত্থেকে আবির্ভাব?" আমার তখন পরনে গেরুয়া কাপড়, কিন্তু মাথায় সুবিন্যস্ত লম্বা চুল। ওঙ্কারানন্দ তখন সেখানে উপস্থিত ছিল। সে-ই আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল যে, সম্প্রতি আমি আমেরিকা থেকে এসেছি এবং মহারাজের শিষ্য। আমি বিজ্ঞান মহারাজকে প্রণাম করলুম এবং মাতৃদর্শন ও জয়রামবাটী-কামারপুকুর দর্শনের ইচ্ছা জানালুম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "ওহে, আমি কখনও ওসব জায়গা দেখিনি। তুমি আমায় নিয়ে যাবে?"

"নিশ্চয়ই মহারাজ। এ তো আমার পরম সৌভাগ্য।" কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে তিনি বিমর্ষ হয়ে আমাকে ডেকে বললেন, "অবনী, আমি দুঃখিত। তোমার সঙ্গে আমার যাওয়া হবে না। ভরত বললে যে, ঐ সময় দূর থেকে কয়েকজন দীক্ষাপ্রার্থী আমার কাছ থেকে দীক্ষা নিতে আসছে।"

আমি ভরত মহারাজকে বলে দীক্ষার দিন পরিবর্তনের ব্যবস্থা করলুম ও তাদের টেলিগ্রাম করে দিতে বললুম এবং তার খরচও দিলুম। বিজ্ঞান মহারাজ সব শুনে খুশী হয়ে বললেন, "তুমি তো বেশ বুদ্ধিমান। সহজেই ব্যবস্থা করে ফেলেছ।"

নির্দিষ্ট দিনে বিজ্ঞান মহারাজের সঙ্গে স্বামী অপূর্বানন্দ, সিস্টার ললিতা ও আমি যাত্রা করলুম। যাত্রার পূর্বে আমি আমার ছোট ভাইকে টেলিগ্রামে জানাই বিজ্ঞান মহারাজকে যথোচিত সাদর সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করতে। আমার ভাই ছিল স্থানীয় স্কুলের হেডমাস্টার। তিনশত ছাত্র এবং তাদের শিক্ষকেরা রেলস্টেশনে আমাদের অভ্যর্থনা করতে এসেছিল। মেয়েরা দুপাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগল। বিষ্ণুপুরের রাস্তা ধুলোয় ভরা, কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটি আমাদের রাস্তায় জল ছিটিয়ে বেশ সুন্দর ব্যবস্থা করেছিল। দুখানি ঘোড়ার গাড়ী নির্দিষ্ট ছিল। বিজ্ঞান মহারাজ একখানিতে বসলেন এবং আমি তাঁর পায়ের কাছে বসেছিলুম। ছেলেরা গাড়ীর ঘোড়া খুলে দিয়ে নিজেরাই টেনে নিয়ে গেল, আমাদের বারণ সত্ত্বেও।

আমাদের জন্য একটা নির্দিষ্ট বাড়ী ঠিক ছিল এবং আমার বোন রান্নাবান্নার ভার নিয়েছিল। আমাদের বাড়ীর ছোট ঠাকুরঘরে বসে বিজ্ঞান মহারাজ কয়েকজনকে দীক্ষা দেন।

যা হোক, আমাদের জয়রামবাটী ও কামারপুকুর

যাবার ব্যবস্থা হোল। খাওয়াদাওয়ার পর আমার মা কথাপ্রসঙ্গে বিজ্ঞান মহারাজকে বললেন, "আমি আপনার সঙ্গে জয়রামবাটী যাব।" বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, "গাড়ীতে জায়গা হবে না।" মা জেদভরে বললেন, "মহারাজ, আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যেতেই হবেক।" তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন "আচ্ছা তুমি আমার মাথায় বসে যাবে।" আমার মা গলায় কাপড় জড়িয়ে পায়ে মাথা দিয়ে বিনীতভাবে বললেন, "মহারাজ, আমি আপনার পায়ের কাছে বসে যাব।" বিজ্ঞান মহারাজ হেসে বললেন, "তুমিই জিতলে।"

আমরা একখানি মোটর ও একখানি বাস ভাড়া করলুম। মোটরের পিছনের সিটে বিজ্ঞান মহারাজ ও সিস্টার ললিতা বসলেন এবং সামনের সিটে বিভূতি ঘোষ, আমি ও ড্রাইভার। বাসে বাঁকুড়ার অন্যান্য সাধু ব্রহ্মচারী ও আমার মা ভাই ও তাদের পরিবারবর্গ চললেন।

এ ছিল একটি অপূর্ব তীর্থযাত্রা। শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদের সঙ্গে চলেছি কামারপুকুর জয়রামবাটী! উভয় স্থানেই বিজ্ঞান মহারাজ চোখবুঁজে ধ্যান-মগ্ন—এই অপূর্ব স্মৃতিটি আমার মানসপটে অম্লান হয়ে রয়েছে। যা হোক, এত লোকের বাসস্থান কামারপুকুর জয়রামবাটীতে সম্ভব ছিল না, তাই আমাদের সেই দিনই বিষ্ণুপুরে ফিরতে হোল।

আমরা বিষ্ণুপুরে ফিরলে পর বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, "সিস্টার ললিতা সত্যিই অপূর্ব মহিলা। যাতায়াতকালে আমরা একসঙ্গে কয়েকঘণ্টা বসেছিলাম, কিন্তু তিনি একটা কথাও বলেননি। কী শান্ত!"

পূর্বে বিজ্ঞান মহারাজ যে সব আমেরিকান মহিলার সঙ্গে মিশেছেন তারা ছিল কথাপ্রিয়। কথার দ্বারা লোককে আদর-আপ্যায়িত করা তাদের স্বভাব। কিন্তু সিস্টার ললিতা ছিলেন স্বতন্ত্র প্রকৃতির। তিনি স্বামীজী ও স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গ করেছিলেন। মুখবুজে সেবায় দ্বারা তাঁদের আপ্যায়িত করেছিলেন। স্বামীজী একদিন তাঁকে বলেছিলেন, "সিস্টার, তুমি নিঃশব্দে ভগবানের কাজ করবে।" আর তিনি স্বামীজীর সেই আদেশ পালন করেছিলেন। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার বেদান্ত সোসাইটি তাঁরই কুটীরে জন্মলাভ করে। এটি স্বামীজীর প্রতি তাঁর নীরব ভক্তির স্বাক্ষর।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমি বিজ্ঞান মহারাজকে বললুম, "মহারাজ, আপনার মহত্ত্বের বিষয় রাজা মহারাজের কাছে অনেক কিছু শুনেছি।" তিনি উত্তরে বললেন, "অবনী, ওসব কথা শুনো না। মহারাজ বিন্দুতে সিন্ধু দেখতেন।"

বাঁকুড়া মঠের অধ্যক্ষ স্বামী মহেশ্বরানন্দজী বিষ্ণুপুরে এসে বিজ্ঞান মহারাজকে অনুরোধ জানালেন তাঁকে বাঁকুড়ায় যাবার জন্য। কারণ সেখানে বহু ভক্ত দীক্ষাপ্রার্থী। তাঁর অনুরোধের উত্তরে বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, "অবনী না বললে আমি যেতে পারি না।" এভাবে দু-তিন দিন চলল।

মহেশ্বরানন্দজী এসে আমাকে বিজ্ঞান মহারাজের কথা বললেন। আমি মহা ফাঁপরে পড়লুম। আমি বললুম, "আমি কোন্ মুখে বিজ্ঞান মহারাজকে যেতে বলি? আমরা এখানে তাঁর দিব্য সান্নিধ্যে ভরপুর। তা ছাড়া তিনি আমাদের বাড়ীতে অতিথি।" মহেশ্বরানন্দজী কিন্তু নাছোড়বান্দা এবং আমাকে জোর করে ধরে কেঁদে বললেন যে, একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। "আচ্ছা, দেখি—কী করতে পারি"—বলে বিজ্ঞান মহারাজের কাছে গিয়ে জোড়হাতে দাঁড়ালুম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তাহলে তুমি আমাকে যেতে বলছ?"

"না মহারাজ। বাঁকুড়ায় প্রতীক্ষারত ভক্তদের আপনি মুক্তি দিন— এই নিবেদন আমার।" সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর ব্যবস্থা হলো। তিনি

বাঁকুড়ায় অধ্যক্ষের সঙ্গে যাত্রা করলেন। তিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ এবং অপরকে মুক্তি দিতে সক্ষম —আমি এটি অনুভব করলুম।

বিজ্ঞান মহারাজ কদাচিৎ নিজের দিব্য দর্শনাদির কথা অপরকে বলতেন। একবার তিনি আমায় বলেন :

"আমি সারনাথ দর্শনে গিছলাম। হঠাৎ আমি দেহবুদ্ধি হারালাম এবং আমার মনও নিঃশেষিত হবার উপক্রম। আমি একটি জ্যোতিঃসমুদ্রে নিমজ্জিত হলাম এবং সেই জ্যোতিঃ থেকে শান্তি আনন্দ ও জ্ঞানের তরঙ্গ বইতে লাগল। আমি জীবন্ত বুদ্ধের ভাবে ভরপুর হয়ে গেলাম। কতক্ষণ ঐ ভাবে ছিলাম তা আমার স্মরণ নেই। Guide (প্রদর্শক) মনে করেছিল যে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। দেরী হচ্ছে দেখে সে আমাকে জাগাতে চেষ্টা করল, ফলে আমার বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল। পরে কাশীতে আমি ৺বিশ্বনাথ দর্শন করতে যাই। সেখানে আমার মনে হয়েছিল : আমি এখানে কেন এলাম? কী একখণ্ড পাথর দেখতে? আবার সেই দিব্যদর্শন শুরু হল। ৺বিশ্বনাথ যেন আমায় বলছেন, 'এখানকার ও সেখানকার জ্যোতিঃ একই— সত্য এক'।"

মনকে করেছি পাখী

শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য

আমি মনকে করেছি পাখী।
হে নাথ, তোমার নামের নভে
উড়বে থাকি' থাকি'।
এ-সংসারের মায়ার খাঁচায়
সমান যে তার মরা-বাঁচায়,
তাই, নতুন আলোর পথের দিশায়
ফিরবে শূন্যে ডাকি'।
বলেছি তার কানে কানে পরম-ধনের কথা,
যারে পাওয়ার তরে কোটি জীবের আকুলতা।
বলেছি তায়, গুপ্ত সে-ধন
অন্বেষণে দাও প্রাণ, মন,
তারে, না পাও যদি হবে জীবন
শুধুই মিথ্যা ফাঁকি।

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

(শ্রীবদরীনারায়ণ-স্তুতি)

স্বামী ধীরেশানন্দ

গত মাঘ সংখ্যা হইতে 'উদ্বোধন'-পত্রিকায় শঙ্করাচার্য-বিরচিত 'হরিমীড়ে'-স্তোত্রটি সটীক, সানুবাদ প্রকাশিত হইতেছে। পাঠকবর্গের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য এই স্তোত্রটির রচনার বিবরণ বিদ্বৎপ্রবর রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ প্রণীত 'আচার্য শংকর ও রামানুজ'-গ্রন্থ হইতে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

তীর্থদর্শন করিতে করিতে দ্বাদশবর্ষীয় সন্ন্যাসী আচার্য শংকর বদরীক্ষেত্রাধীশ্বর পরম-পাবন শ্রীশ্রীনারায়ণের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তপ্তকুণ্ডে স্নানাদি সারিয়া সশিষ্য ভগবদ্দর্শনের জন্য মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন যে, বিগ্রহের পরিবর্তে শালগ্রাম-শিলায় অর্চনা হইতেছে। আচার্য যথাবিধি অর্চনা সমাপনান্তে মন্দিরের বহির্ভাগে আসিয়া চিন্তাকুল চিত্তে উপবিষ্ট হইলেন। ক্রমে এই অপূর্ব-দর্শন সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য অর্চকগণসহ জনতার সমাবেশ হইল। আচার্য তাঁহাদিগকে বলিলেন : 'মহাত্মগণ! এই মন্দির ভগবদ্‌বিগ্রহ-শূন্য কেন? চারি যুগেই তো এই স্থানে ভগবদ্-বিগ্রহটির থাকিবার কথা।' পূজকগণ উত্তর দিলেন যে, চীনদেশীয় অভিযানের ভয়ে তাঁহাদের পূর্ব-পুরুষগণ সমীপস্থ কোন এক কুণ্ডমধ্যে ভগবদ্-বিগ্রহটিকে রাখিয়াছিলেন কিন্তু পরে তাঁহারা বিগ্রহটির পুনরুদ্ধার করিতে পারেন নাই এবং তদবধি শালগ্রাম শিলাতেই ভগবানের পূজা করিতেছেন।

ইহা শুনিয়া আচার্য তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যদি সেই বিগ্রহ পুনরায় পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহারা উহাতে যথাবিধি পূজা করিতে প্রস্তুত আছেন কিনা।

পূজকগণ উত্তর দিলেন যে, পূর্বে বহু চেষ্টা করা হইয়াছে, বিগ্রহটি পাওয়া যায় নাই এবং উহার প্রাপ্তির আশাও তাঁহাদের নাই, তথাপি যদি উহা পাওয়া যায়, তাহা হইলে পূজার কোনই ত্রুটি হইবে না।

আচার্য তখন ধীরে ধীরে নারদকুণ্ডের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং জলে নিমগ্ন হইয়া একটি শিলাফলক হস্তে লইয়া উঠিলেন। দেখিলেন— ঐ ফলকে পদ্মাসনবদ্ধ চতুর্বাহু বিষ্ণুমূর্তি রহিয়াছে, কিন্তু দক্ষিণ কোণটি ভাঙ্গিয়া গিয়া যেন হস্তের কয়েকটি অঙ্গুলিরও ক্ষতি করিয়াছে। বদরীনারায়ণ-মূর্তি কখনও খণ্ডিত হইতে পারে না ভাবিয়া আচার্য শিলাটি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় কুণ্ডে অবতরণ করিলেন। কিন্তু এবারও তিনি সেই বিগ্রহ লইয়াই উঠিলেন। এইরূপ তিনবার ঘটিল। আচার্য ভাবিতেছিলেন, কি করিবেন। ক্ষণমধ্যে দৈববাণী হইল : 'শংকর' ভ্রান্ত হইও না; কলিতে এই মূর্তিরই পূজা হইবে। আচার্য তখন ভক্তি-গদ্‌গদচিত্তে মূর্তিটিকে স্বয়ং স্কন্ধে করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং যথাবিধি অভিষেকাদি করিয়া অর্চকগণের উপর সেবাভার অর্পণ করিলেন। এইরূপে আচার্য শংকর কর্তৃক বিগ্রহে শ্রীশ্রীবদরী-নারায়ণের পূজা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল।

অতঃপর ব্যাসতীর্থে চারি বৎসর অতিবাহিত করিয়া আচার্যদেব প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য রচনা করেন। তদনন্তর প্রায় ষোড়শ বৎসর সমগ্র ভারতের বিভিন্ন স্থানে অদ্বৈতবেদান্তের প্রচার-

কার্যে নিরত থাকেন।

জীবনসায়াহ্নে তিনি পুনরায় পবিত্র বদরী-ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হন এবং বদরীনারায়ণের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া নারদকুণ্ড হইতে উদ্ধৃত স্বপ্রতিষ্ঠিত সেই ভগবদ্‌বিগ্রহ দর্শন করিলেন। দেখিলেন - ভগবানের সেবাপূজা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে। "ভক্তিভাবের অবলম্বন ভগবানকে দেখিয়া আচার্যের হৃদয়ে ভক্তির প্রস্রবণ ছুটিল এবং তাহা নৃত্যশীলা অলকানন্দার সুর ও তানে মিলিত হইয়া আচার্যের বদনকমল হইতে একটি স্তোত্রাকারে নির্গত হইল। কবিকুলচূড়ামণি আচার্য শংকর চিন্মাত্রস্বরূপে থাকিয়াও 'হরিমীড়ে' — অর্থাৎ 'হরিকে ভজনা করি'—এইরূপ বাক্য-শেষযুক্ত একটি অদ্বৈতজ্ঞানপূর্ণ স্তোত্র সুললিত ছন্দে সদ্যঃ সদ্যঃ রচনা করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভগবানের পূজা করিলেন। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে যে যে ব্যক্তি ইহা শুনিল, সকলেই যেন ভগবানকে নিজ নিজ আত্মার সহিত অভেদে সাক্ষাৎকার করিল। ভগবদ্‌ভাবে সকলেই বিভোর হইয়া গেল। স্তোত্রসঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় সকলেই যেন মূচ্ছিতপ্রায় হইল।"

এখান হইতে কেদারনাথতীর্থে গমন করিয়া আচার্য শংকর মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে লীলা-সংবরণ করেন।

দেখা গেল এই 'হরিমীড়ে' স্তোত্রটি দুর্গম হিমালয়ে অবস্থিত তীর্থরাজ শ্রীবদরীধামের অধি-পতি শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণের উদ্দেশে আচার্য শংকর কর্তৃক রচিত একটি মহতী স্তুতি। ভক্তি ও জ্ঞানের দুইটি ধারা যেন এখানে একত্র মিলিত হইয়া পরমানন্দ-সাগর অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। বাহ্যতঃ ভগবানের শ্রীবিগ্রহপূজাকে নিমিত্ত করিয়া অদ্বৈতবেদান্তের তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তসমূহের কি অপূর্ব সমন্বয়ই না আচার্য এখানে দেখাইয়াছেন, তাহা ভাবিলে হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে। পদসৌষ্ঠব, ভাবের ব্যঞ্জনা ও অর্থগাম্ভীর্যে সমগ্র স্তোত্রটি নিরুপম। সুমধুর 'মত্তময়ূর' † ছন্দে রচিত এই স্তোত্রটি সুর ও লয় সহকারে গীত হইলে মন স্বভাবতই অন্তর্মুখ হইয়া সমাহিত হইয়া পড়ে।

বহু বৎসর পূর্বে হিমালয়ের অভ্যন্তরস্থিত সৌম্য উত্তরকাশীক্ষেত্রে নিবাসকালে অধুনা বিদেহমুক্ত, সদা তত্ত্বচিন্তনমগ্ন, বেদান্তনিষ্ণাত, অপরোক্ষ-অনুভবসমুজ্জ্বল, সদানন্দ পুরুষপ্রবর স্বামী শ্রীদেবী-গিরিজী মহারাজের পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়া সটীক এই গ্রন্থটি শ্রবণ করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম। পূজ্য স্বামীজীর হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইতাম। তদবধি উহা যেন কর্ণে নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে। মুমুক্ষুগণের শংকা নিরসনের জন্য স্বামীজীর কি আকুল আগ্রহই না দেখিয়াছি! বেদান্তসিদ্ধান্তমর্ম ব্যাখ্যানকালে শ্বেতকেশশ্মশ্রুবিমণ্ডিত তাঁহার শান্ত স্নিগ্ধ সৌম্য মুখমণ্ডলে কি দিব্য মাধুর্যময় শোভারই না বিস্তার হইত! আচার্য শংকর সত্যই বলিয়াছেন:

'শান্তা মহান্তো নিবসন্তি সন্তো
বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ।
তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনা-
নহেতুনান্যানপি তারয়ন্তঃ॥' (বিঃ চূঃ ৩৯)

— স্বয়ং ভয়াবহ সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইয়া এবং সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে অপর মুমুক্ষুগণকেও উদ্ধার করিয়া লোককল্যাণসাধনে নিরত শান্তচিত্ত মহা-পুরুষগণ (সর্বজন-সুখপ্রদ ঋতুরাজ) বসন্তের ন্যায় জগতে বাস করিয়া থাকেন।

এই পুস্তকটি প্রস্থানত্রয়োক্ত ব্রহ্মবিদ্যারই

† এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৩টি অক্ষর। প্রথম ৪টি অক্ষর গুরু, তাহার পর ২টি লঘু ও ২টি গুরু অক্ষর; তাহার পরও ২টি লঘু ও ২টি গুরু অক্ষর। ৪র্থ অক্ষরের পর যতি।

সূচক এবং শ্রবণ- ও মনন-রূপ বলিয়া ব্রহ্মবিচারাত্মক গ্রন্থসমূহের মধ্যে ইহার স্থান অতি উচ্চে। শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রের বহু প্রকরণ ইহাতে বিচারিত হইয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থ-বিচার যথার্থ অধিকারীকে অচিরেই ব্রহ্মাববোধ উৎপন্ন করিয়া মোক্ষফল প্রদান করিয়া থাকে, ইহা নিঃসন্দেহ। তবে মনে হয়, প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য পাঠ করিবার পর টীকাসহ এই স্তুতিটি বিচার করিলে মুমুক্ষুগণ ইহার মাধুর্য অধিকতর উপভোগ করিতে পারিবেন। উত্তরাখণ্ডনিবাসী অদ্বৈতবেদান্তনিষ্ঠ প্রাচীন সাধুগণের এই গ্রন্থটি বড়ই প্রিয়। তাঁহারা ইহার পঠন-পাঠন করিয়া থাকেন অতি সশ্রদ্ধচিত্তে।

স্বয়ংপ্রকাশ-যতি বিরচিত 'হরিতত্ত্বমুক্তাবলী'-টীকাসহ 'হরিমীড়ে'-স্তোত্রটি বহু বৎসর পূর্বে বোম্বাই 'নির্ণয় সাগর' প্রেসে ১৯৪৪ বিক্রমাব্দে মুদ্রিত ও স্বামী অচ্যুতানন্দ গিরি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। বর্তমানে এই পুস্তক নিতান্তই দুষ্প্রাপ্য। টীকা ও মূল গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিতে আমরা নির্ণয়সাগর প্রেসের উপরি-উক্ত সংস্করণই অনুসরণ করিতেছি। গ্রন্থশেষে শুদ্ধিপত্রে যে ষোলটি অশুদ্ধি সংশোধিত হইয়াছে, তাহার অতিরিক্ত যে-সকল অশুদ্ধি আছে, সেগুলি কলিকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য, ন্যায়-তর্ক-ব্যাকরণ-পুরাণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক সংশোধিত করিয়া দিতেছেন। অধিকন্তু বর্তমানে সংস্কৃত রচনায় যে-সকল যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হইতেছে, টীকায় সেগুলি তিনিই সন্নিবেশিত করিয়া দিতেছেন আশা করি ইহাতে টীকাটি আরও সহজবোধ হইবে।*

* জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা হইতে মূলগ্রন্থটি সটীক সানুবাদ পুনরায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।—সঃ

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও ইংরেজীভাষা

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

[পূর্বানুবৃত্তি]

'কথামৃতে'র পাতায় পাতায় শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্যক্তিত্বের পরেই যে চরিত্রটি সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে, স্বাভাবিকভাবেই তিনি নরেন্দ্রনাথ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় 'খাপখোলা তলোয়ার' এই চরিত্র স্বভাবতই কারু মুখাপেক্ষী হতে পারেন না। শ্রীরামকৃষ্ণসান্নিধ্যে দক্ষিণেশ্বরে যে তরুণেরা তখন সমবেত হতেন, তাঁদের প্রসঙ্গে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, "নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল এরা সব নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটী। এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ। দেখ না, নরেন্দ্র কাহাকেও কেয়ার[১] (গ্রাহ্য) করে না। আমার সঙ্গে কাপ্তেনের[২] গাড়ীতে যাচ্ছিল—কাপ্তেন ভাল জায়গায় ব'সতে বললে—তা চেয়ে দেখলে না। আমারই অপেক্ষা করে না।" (কথামৃত: ১ম: ১৯শে অগস্ট, ১৮৮৩) আপাত অনপেক্ষ নরেন্দ্রনাথ অবশ্য সারাজীবন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কেয়ার (গ্রাহ্য) করেছেন, সেই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণশক্তি শ্রীমা সারদাদেবীকেও।

১ Care ২ Captain নেপালের রাজকর্মচারী বিশ্বনাথ উপাধ্যায়।

তবু তরুণ নরেন্দ্রনাথের দ্যুতিময় ব্যক্তিত্ব ওই 'কেয়ার' না করার ভঙ্গীতে অসামান্য সার্থকতা লাভ করেছে।

ইংরেজী শব্দ প্রয়োগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি বিশিষ্টতা 'ডাইলিউট' [৩] শব্দটির ক্ষেত্রে। গলে যাওয়া অর্থে ব্যবহৃত এই শব্দটি পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির ক্ষেত্রে তিনি যেভাবে প্রয়োগ করেছেন, তাতে রয়েছে ভক্তিতন্ময়তার দ্বারা ব্যক্তিচরিত্রের সম্পূর্ণ রূপান্তরের ব্যঞ্জনা। পণ্ডিত শশধর সেদিন (কথামৃত : ৩য় : ৩০শে জুন, ১৮৮৪) দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্নিধানে এসেছিলেন তাঁর অপূর্ব কথামৃতপানের আশায়। শ্রীরামকৃষ্ণকণ্ঠে মাতৃসঙ্গীত শুনে চোখের জলে ভেসেছেন। এও শুনেছেন — 'পড়ার চেয়ে শুনা ভাল,— শুনার চেয়ে দেখা ভাল।'— শ্রীরামকৃষ্ণব্যক্তিত্বে তখন শাস্ত্রের সারাৎসার মূর্তিমন্ত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সব কথার শেষে, ফিরে যাবার আগে পণ্ডিতকে আবার আসতে বলছেন, 'গাঁজাখোর গাঁজাখোরকে দেখলে আহ্লাদ করে'। পণ্ডিত চলে যাওয়ার পর বলছেন, 'ডাইলিউট হয়ে গেছে একদিনেই ![৪]— দেখলে কেমন বিনয়ী— আর সব কথা লয়!' শাস্ত্রাতীত বিদ্যার জীবনময় প্রকাশে সেদিন শশধর একান্ত জিজ্ঞাসু ভক্তে পরিণত।

আবার 'ডাইলিউট' কথাটি একান্ত বিষয়াসক্ত অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথোপকথনে। আপন একান্ত প্রিয় বাল্যসঙ্গী শ্রীরাম সম্বন্ধে বলছেন— "সেদিন এসেছিল, দুদিন এখানে ছিল। শ্রীরাম ব'ললে, ছেলেপিলে হয় নাই। ভাইপোটিকে মানুষ করছিলাম, সেটি মরে গেছে। বলতে বলতে শ্রীরাম দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লে, আবার বল্‌লে, ছেলে হয় নাই ব'লে স্ত্রীর যত স্নেহ ঐ ভাইপোর উপর পড়েছিল; এখন সে শোকে অধীর হয়েছে। আমি তাকে বলি, ক্ষেপি! আর শোক কর্‌লে কি হবে? তুই কাশী যাবি? বলে, 'ক্ষেপি';— একেবারে ডাইলিউট হয়ে গেছে! তাকে ছুঁতে পারলাম না! দেখলাম তাতে আর কিছু নাই।" সেদিনের শ্রোতাদের মধ্যে সদ্য কন্যাবিয়োগে ব্যথাতুরা 'শোকাতুরা ব্রাহ্মণী' অন্যতম। বিষয়-সংসারে একান্ত মগ্ন ব্যক্তিদের যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কী চোখে দেখতেন, সেকথা মনে রেখে 'ঈশ্বরই সত্য'— এ আদর্শের অনুপ্রেরণাদানই সেদিনের কথোপকথনের লক্ষ্য। (কথামৃত : ৩য় : ১৩ই জুন, ১৮৮৫)

'কুইন'[৫] এবং 'কোম্পানি'[৬] শব্দ দুটি সেকালে শাসকশ্রেণী প্রসঙ্গে প্রায়ই ব্যবহৃত হতো। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ভারতশাসনের ভার প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করেন রাণী ভিক্টোরিয়া। অবশ্য ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রাণী পার্লামেন্টের দ্বারাই পরিচালিত। তবু ভিক্টোরিয়া কুইন বা রাণী হিসাবে এ দেশে বিশেষ মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন। মানুষ হিসাবে তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ইতিহাসস্বীকৃত।

শশধরপণ্ডিতের সঙ্গে পূর্বোক্ত আলোচনা-প্রসঙ্গেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, 'তুমি তো গীতা পড়েছ,— যাকে সকলে গণে মানে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে।... তোমার ভিতর অবশ্য তাঁর শক্তি আছে।' 'শক্তি মানতে হয়। ...কুইন ভিক্টোরিয়ার এত মান, নাম কেন— যদি শক্তি না থাকতো?'

---

[৩] Dilute—বিগলিত।

[৪] এ ঘটনার ছয়দিন আগে রথযাত্রার দিন পণ্ডিত শশধরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম দেখা হয়।

[৫] Queen   [৬] Company (East India Company—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি)

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালকে লোকে বলতো 'কোম্পানির আমল'। তখন রাজাদেশ অর্থে কোম্পানির আদেশ। এই কোম্পানির (Company) আদেশের কার্যকারিতাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টান্তস্থাপনের ও রঙ্গরসের অন্যতম সেরা উদাহরণ— "ও-দেশে হালদারপুকুর ব'লে একটা পুকুর আছে। পাড়ে রোজ সকালবেলা লোকে বাহ্যে ক'রে রাখতো। যারা সকালবেলা আসে তারা খুব গালাগাল দেয়। আবার তারপর দিন সেই-রূপ। বাহ্যে আর থামে না। (সকলের হাস্য)। তখন লোকে কোম্পানীকে জানালে। তারা একটা চাপরাসী পাঠিয়ে দিলে। সেই চাপরাসী যখন একটা কাগজ মেরে দিলে, 'বাহ্যে করিও না' তখন সব বন্ধ হলো। (সকলের হাস্য)।" (কথামৃত : ১ম : ২৭শে অক্টোবর, ১৮৮২)

কোম্পানির আদেশ এ গল্পে ঈশ্বরাদেশের প্রতীক। ঈশ্বরাদেশ না পেলে প্রচার করতে যাওয়া যে বৃথা, এই ছিল সেদিনের আলোচনার তাৎপর্য। মুখ্য শ্রোতা কেশবচন্দ্র।

সেকালে কোম্পানির কাগজ বা শেয়ার বিত্তশালী লোকেদের অন্যতম সম্পদ। যারা বাবুর সম্পত্তি সম্বন্ধে কৌতূহলী, তাদের পক্ষে সবচেয়ে ভালো উপায় বাবুর সঙ্গে আলাপ করা। যারা ঈশ্বরের সঙ্গেই আলাপ করেছে, তারাই তাঁর জগৎসংসারময় ঐশ্বর্যের যথার্থ সন্ধান পায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপমায় 'কোম্পানির কাগজ' কথাটি দেখা দিয়েছে। "যদু মল্লিকের কখানা বাড়ী, কত কোম্পানীর কাগজ আছে এসব আমার কি দরকার! আমার দরকার যো সো করে বাবুর সঙ্গে আলাপ করা।"[৭]

তাঁর ভাষায় ঈশ্বর কখনো বড়বাবু, কখনো 'গ্যাসকোম্পানী'[৮], কখনো 'সার্জন'।[৯] "প্রার্থনা কর—সেই পরমাত্মার সঙ্গে সব জীবেরই যোগ হ'তে পারে। গ্যাসের নল সব বাড়ীতেই থাটানো আছে। গ্যাস কোম্পানীর কাছে গ্যাস পাওয়া যায়। আরজি কর, করলেই গ্যাস বন্দোবস্ত করে দেবে— ঘরেতে আলো জ্বলবে। শিয়ালদহে আপিস[১০] আছে।" (কথামৃত : ২য় : ৮ই এপ্রিল, ১৮৮৩)

"কৃপা হ'লেই দর্শন হয়। তিনি জ্ঞানসূর্য। তাঁর একটি কিরণে এই জগতে জ্ঞানের আলো পড়েছে, তবেই আমরা পরস্পরকে জানতে পারছি, আর জগতে কত রকম বিদ্যা উপার্জন করছি! তাঁর আলো যদি একবার তিনি নিজে তাঁর মুখের উপর ধরেন, তা হ'লে দর্শন লাভ হয়। সার্জন সাহেব রাত্রে আঁধারে লণ্ঠন হাতে ক'রে বেড়ায়, তার মুখ কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু ঐ আলোতে সে সকলের মুখ দেখতে পায়; আর সকলে পরস্পরের মুখ দেখতে পায়।

"যদি কেউ সার্জনকে দেখতে চায়, তা হ'লে তাকে প্রার্থনা করতে হয়। বলতে হয়—সাহেব, কৃপা ক'রে একবার আলোটি নিজের মুখের উপর ফিরাও, তোমাকে একবার দেখি।

"ঈশ্বরকে প্রার্থনা ক'রতে হয়, ঠাকুর, কৃপা ক'রে জ্ঞানের আলো তোমার নিজের উপর একবার ধর, আমি তোমায় দর্শন করি।" (কথামৃত : ১ম : ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮২)

ঈশ্বর আর ঈশ্বর-ধারণার যোগ্য অধিকারী-প্রসঙ্গে সেকালের আধুনিকতম বিজ্ঞানও দেখা দিয়েছে ফটো[১১] এবং ফটোগ্রাফের[১২] উপমায়। সাকারপূজার অর্থ কি, এ জিজ্ঞাসার উত্তরে তাঁর উক্তি—"যেমন বাপের ফটোগ্রাফ দেখলে বাপকে

---

৭ কথামৃত : ৩য় : ৩০শে জুন, ১৮৮৪ ৮ Gas Company ৯ Sergeant ১০ Office
১১, ১২ Photo, Photograph

পড়ে, তেমনি প্রতিমায় পূজা করতে করতে সত্যের রূপ উদ্দীপন হয়।" (কথামৃত: ৪র্থ: ১লা জানুআরি, ১৮৮৩)

ঈশ্বরপ্রসঙ্গ যথার্থ ধারণার অধিকারীপ্রসঙ্গে— "যার কাঁচা ভক্তি, সে ঈশ্বরের কথা, উপদেশ, ধারণা করতে পারে না। পাকা-ভক্তি হ'লে ধারণা করতে পারে। ফটোগ্রাফের কাচে যদি কালি[১৩] মাখানো থাকে, তা হ'লে যা ছবি পড়ে তা রয়ে যায়। কিন্তু শুধু কাচের উপর হাজার ছবি পড়ুক একটাও থাকে না— একটু স'রে গেলেই, যেমন কাচ তেমনি কাচ। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা না থাকলে উপদেশ ধারণা হয় না।" (কথামৃত: ১ম: ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮২)

আর একদিন প্রসঙ্গ ছিল— 'এক ঈশ্বর, তাঁর নানা নাম।' 'সব পথ দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়।' এই প্রসঙ্গেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুকুরের উপমাটি বারে বারে কথামৃতে দেখা গিয়েছে। "…ভক্তেরা তাঁকেই নানা নামে ডাকছে, এক ব্যক্তিকেই ডাকছে। এক পুকুরের চারটি ঘাট। হিন্দুরা জল খাচ্ছে এক ঘাটে বলছে জল, মুসলমানরা আর এক ঘাটে খাচ্ছে বলছে পানি[১৪]; ইংরাজরা আর এক ঘাটে খাচ্ছে বলছে ওয়াটার[১৫], আবার অন্য লোক এক ঘাটে বলছে aqua (একোয়া)[১৬]।" (কথামৃত: ৫ম: ১৩ই অগস্ট, ১৮৮২) এই কথারই মূল বক্তব্য - "তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ডাকে। কেউ বলে গড্[১৭], কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে কৃষ্ণ, কেউ বলে শিব, কেউ বলে ব্রহ্ম।" (কথামৃত: ৩য়: ২১শে জুলাই ১৮৮৩)

অধ্যাত্মপ্রসঙ্গতন্ময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টিতে এক সময় এই কলকাতা শহরই ঈশ্বরের প্রতীক-স্বরূপ। কলকাতার মিউজিয়াম, মনুমেণ্ট, সোসাইটি (Asiatic Society), ফুটপাথ, এ সবই নানাভাবে ঈশ্বরপ্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত।

"আমি একবার মিউজিয়ামে[১৮] গিছলুম, তা দেখালে ইট পাথর হয়ে গেছে, জানোয়ার পাথর হ'য়ে গিয়েছে। দেখলে, সঙ্গের গুণ কি! তেমনি সর্বদা সাধুসঙ্গ করলে তাই হ'য়ে যায়।" (কথামৃত: ৫ম: ৯ই মার্চ ১৮৮৪)

"ভক্ত, ঈশ্বরের সাকার রূপ দেখতে চায় ও তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চায়,—প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। তবে ঈশ্বর ইচ্ছাময়, তাঁর যদি খুশি হয়, তিনি ভক্তকে সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী করেন। ভক্তিও দেন, জ্ঞানও দেন। কলকাতায় যদি কেউ একবার এসে পড়তে পারে তা হ'লে গড়ের মাঠ, সুসাইটি, সবই দেখতে পায়। কথাটা এই, এখন কলকাতায় কেমন ক'রে আসি।" (কথামৃত: ১ম: ২৫শে জুন, ১৮৮৪)

এই কলকাতায় আসাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপমায় ভগবানের কাছে আসা। ভাবতে আশ্চর্য লাগে বৈ কি!

এসিয়াটিক সোসাইটির যাদুঘরে কঙ্কাল দেখার সূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একবার একটি প্রার্থনা মনে জেগেছিল। "অনেক দিন হলো যখন পেটের ব্যামোতে বড় ভুগছি, হৃদে বললে— মাকে একবার বল না,—যাতে আরাম হয়। আমার রোগের জন্য বলতে লজ্জা হলো। বললুম, মা সুসাইটিতে মানুষের হাড় দেখেছিলাম, তার দিয়ে জুড়ে জুড়ে মানুষের আকৃতি, মা! এরকম ক'রে শরীরটা একটু শক্ত করে দাও, তা হলে তোমার

১৩ Silver Nitrate (কথামৃত দ্রষ্টব্য)

১৪ পানি—মূলতঃ সংস্কৃত পানীয়। হিন্দীতে প্রচলিত পানী, তা থেকেই মুসলমানেরা নিয়েছেন।

১৫ Water ১৬ লাটিন শব্দ। ১৭ God ১৮ মিউজিয়াম বা যাদুঘর তখন এশিয়াটিক সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নাম গুণকীর্তন করবো।" (কথামৃত: ৩য়: ২রা মার্চ, ১৮৮৪)

ঈশ্বরকে জানলেই সব জানা সম্ভব। যেমন কলকাতায় যে এসেছে সেই জানে এখানকার কোথায় কি আছে। একজন প্রশ্ন করেছিলেন—'আচ্ছা, তিনি সাকার না নিরাকার?'

শ্রীরামকৃষ্ণ— "দাঁড়াও আগে কলকতায় যাও তবে ত জানবে, কোথায় গড়ের মাঠ, কোথায় এসিয়াটিক সোসাইটি, কোথায় বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক[১৯]।

"খড়দা বামুনপাড়া যেতে হলে আগে ত খড়দায় পৌঁছুতে হবে।" (কথামৃত: ৫ম: ২২শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩)

আবার কলকাতার মনুমেণ্ট,[২০] তার উচ্চতা, সেই উচ্চতা থেকে নিচের দৃশ্য এবং উর্ধ্বলোকের অবাধ মুক্তি এ সবই অধ্যাত্মরাজ্যের বিভিন্ন স্তরের ব্যঞ্জনা নিয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর মনোহর সংলাপে। "অনেকে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কয়, কিন্তু নীচের জিনিষ লয়ে থাকে। ঘরবাড়ী, টাকা, মান, ইন্দ্রিয়সুখ। মনুমেণ্ট-এর নীচে যতক্ষণ থাকা যায় ততক্ষণ গাড়ী ঘোড়া সাহেব মেম— এই সব দেখা যায়। উপরে উঠলে কেবল আকাশ সমুদ্র, ধূ ধূ কচ্ছে!— তখন বাড়ী, ঘোড়া, গাড়ী, মানুষ এ সব আর ভাল লাগে না; এ সব পিঁপড়ের মত দেখায়!" (কথামৃত: ৫ম: ১লা জানুআরি, ১৮৮৩)

ঈশ্বরের জন্য চাই সম্পূর্ণ আসক্তিশূন্যতা; 'ষোল আনা মন', যে মনের আর এক উপমা স্থচে পরাবার সুতো, যাতে এতটুকু আঁশ থাকবে না। এমন নিরাসক্তির উদাহরণেই এসেছে টেলিগ্রাফের[২১] তারের উপমা। "তুমি যদি ষোল আনায় কাপড় চাও, তা হলে কাপড়ওয়ালাকে ষোল আনা তো দিতে হবে। একটু বিঘ্ন থাকলে আর যোগ হবার যো নাই। টেলিগ্রাফের তারে যদি একটু ফুটো থাকে, তা হ'লে আর খবর যাবে না।" (কথামৃত: ২য়: ১১ই অক্টোবর, ১৮৮৪)

মনের এই গঠনপর্বে প্রয়োজন নির্জন নিঃসঙ্গ সাধনা। কলকাতার ফুটপাথের ধারে লাগানো চারাগাছের বেড়া থেকে শ্রীরামকৃষ্ণমানসে আর একটি উপমা দেখা দিলো— "ফুটপাতের[২২] গাছ দেখেছ? যতদিন চারা, ততদিন চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। না হ'লে ছাগল-গরুতে খেয়ে ফেলবে। গাছের গুঁড়ি মোটা হ'লে আর বেড়ার দরকার নাই। তখন হাতী বেঁধে দিলেও গাছ ভাঙবে না।" (কথামৃত: ১ম: ২৮শে নভেম্বর, ১৮৮০)

জ্ঞানলাভের পর যে মহাপুরুষেরা নিজের মুক্তিতে সন্তুষ্ট না থেকে মানুষের কল্যাণের জন্য অধ্যাত্মজ্ঞান বিতরণ করে যান, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপমায় তাঁরা কলকাতার গঙ্গায় ভাসমান বাহাদুরি কাঠ বা স্টীমবোটের মতো। "হাবাতে কাঠ যখন ভেসে যায়, পাখী একটি বসলে ডুবে যায়, কিন্তু বাহাদুরী কাঠ যখন ভেসে যায়, তখন গরু, মানুষ, এমন কি হাতী পর্যন্ত তার উপর যেতে পারে। স্টীমবোট[২৩]আপনিও পারে যায়, আবার কত মানুষকে পার করে দেয়। নারদাদি আচার্য বাহাদুরী কাঠের মত, স্টীমবোট-এর মত।" (কথামৃত: ১ম: ২শে অক্টোবর ১৮৮৫) প্রসঙ্গত মনে জাগে বুদ্ধ, শংকর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ এঁদের উপমা কি তবে জাহাজ?

এমনিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথোপকথনে আরো অনেক ইংরেজী শব্দই হয়তো সন্ধান করলে পাওয়া যাবে। ভাষাতত্ত্বের বিচারে আপাত-সাধারণ মানুষের ভাষায়ও বিদেশী শব্দের অনুপ্রবেশের দৃষ্টান্ত হিসাবে এরা নিশ্চয়ই কৌতূহলের সামগ্রী। কিন্তু ইংরেজী শব্দ ব্যবহারের

---

১৯ Bank ২০ Monument ২১ Telegraph ২২ Footpath ২৩ Steamboat

এই সব উদাহরণে তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনায় শ্রীরামকৃষ্ণ যে অধ্যাত্মপরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন সেইটিই সাহিত্যের বিচারে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে এসে কেশবচন্দ্রের পরিবর্তন প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন বলেছিলেন, 'কেশব সেন এত বদলালো কেন বল দেখি? এখানে কিন্তু খুব আসতো।' এ পরিবর্তনের গূঢ়তম কারণ যে তিনি নিজে, সেই কথার আভাস দিয়ে বলেছেন, "হরিশ বেশ বলে, 'এখান থেকে সব চেক[২৪] পাশ করে নিতে হবে; তবে ব্যাঙ্কে টাকা পাওয়া যাবে।' ... মণি অবাক হইয়া এই সকল কথা শুনিতেছেন। বুঝিলেন, গুরুরূপে সচ্চিদানন্দ চেক পাশ করেন।" (কথামৃত: ২য়: ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষার প্রসঙ্গে ইংরেজী ভাষারও চেক পাশ হয়ে গেছে।

২৪ Cheque

অদ্বৈতবেদান্তে ভক্তির স্থান

স্বামী স্মরণানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

মধুসূদনের সমসাময়িক অপ্পয্য দীক্ষিত[১] ও তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য বহু-সম্মানিত ছিলেন। সকল শাস্ত্রে পরিনিষ্ণাত—'সর্ব-তন্ত্র-স্বতন্ত্রাচার্য' ব'লে মধুসূদন তাঁর উল্লেখ করেছেন। উত্তর-ভারতে মধুসূদনের মতো দক্ষিণ-ভারতে অপ্পয্য দীক্ষিত অটল ভিত্তিতে অদ্বৈতবেদান্তকে প্রতিষ্ঠিত করেন 'কল্পতরু'র[২] উপর 'পরিমল' টীকা ও 'সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ' রচনা করে। 'সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ' ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যের উপর পরবর্তী কালের অদ্বৈতবেদান্তের সকল যুক্তি ও মতবাদের সঙ্কলন-গ্রন্থ।

অপ্পয্য দীক্ষিত কিন্তু শুষ্ক পণ্ডিতমাত্র ছিলেন না। তিনিও একজন উচ্চকোটির সাধক ছিলেন এবং মনে হয়, ব্যক্তিগত সাধনক্ষেত্রে তিনি ভক্তি-মার্গকে বরণ করেছিলেন—যা তাঁর রচিত কয়েকটি অপূর্ব স্তোত্র থেকেই প্রমাণিত হয়। তিনি কেবল ভগবান শিবেরই ভক্ত ছিলেন না, কাঞ্চীর বরদরাজ নারায়ণের এবং জগজ্জননীরও ভক্ত ছিলেন। তাঁর ভক্তির এই দিকগুলির উদাহরণ হিসেবে তাঁর 'আত্মার্পণস্তুতি', 'শ্রীবরদরাজ-স্তব' এবং 'দুর্গা-চন্দ্রকলা স্তুতি'র উল্লেখ করা যেতে পারে। এই স্তবগুলি তাঁর অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি ও স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তির পরিচায়ক। 'আত্মার্পণস্তুতি'তে তিনি তাঁর ইষ্টদেব শিবের উদ্দেশে বলছেন: 'ত্রিভুবনের কোন কিছুই আমি আকাঙ্ক্ষা করি না। আমার কর্মবশতঃ সুখ বা দুঃখ যা-ই আমার ভাগ্যে আছে তা আসুক—তার জন্য আমি উদ্বিগ্ন নই। আমার প্রার্থনা কেবল এই যে, আমার মন যেন কেবল প্রস্ফুটিত কমলগর্ভ-কেশর থেকেও অধিক সুন্দর তোমার পাদপদ্মে লগ্ন থাকে।' (আত্মার্পণস্তুতি, ৪৭)

অধিকন্তু, প্রসিদ্ধ 'শিবাপরাধক্ষমাপণ-স্তোত্র'

১ ১৫২০-১৫৯২ খ্রীঃ—ভারতকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৬

২ ব্রহ্মসূত্রের শাংকরভাষ্যের উপর বাচস্পতি মিশ্রের টীকার নাম 'ভামতী'। 'ভামতী'র উপর অমলানন্দ-কৃত টীকার নাম 'বেদান্তকল্পতরু'—সংক্ষেপে 'কল্পতরু'। 'কল্পতরু'র উপর অপ্পয্য দীক্ষিতের টীকার নাম 'বেদান্তকল্পতরু-পরিমল'—সংক্ষেপে 'পরিমল'

যা সাধারণতঃ শঙ্করাচার্য-রচিত বলে বলা হয়, মনে হয় তা অপ্পয্য দীক্ষিতের রচনা। এই অনুমানের সমর্থনে প্রচুর যুক্তি রয়েছে; যদি তা সত্য হয় তবে, এই আশ্চর্য স্তোত্রটি অপ্পয্যের ভক্তির আরো একটি দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে।

'শ্রীবরদরাজস্তবে' অপ্পয্য বলছেন: হে ভগবন্, যে তার হৃদয় তোমাতে অর্পণ করে এবং মুক্ত হয় সে আর তা ফিরে পায় না। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তুমি রমণীগণের হৃদয় চুরি কর [কৃষ্ণাবতারে গোপীগণের] আর পর্বতশীর্ষে আত্মগোপন করে থাক [নয়নাভিরাম বরদরাজরূপে]। (শ্রীবরদরাজস্তব, ১৯)

আঠারো শতকে তামিলনাড়ুর প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদী সাধু তায়ুমানওয়ারে আমরা দেখি উচ্চতম জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির মধুর মিলন। যথা: 'সৈকতপ্লাবী সমুদ্রের মতো আনন্দাশ্রু আমার নয়ন থেকে ঝরে পড়লো, আর দিব্যপ্রেমে বিগলিত-হৃদয় আমাকে তিনি রোমাঞ্চিত-কলেবর করলেন।'

ঐ 'আনন্দ-আবেশ'-স্তবেই তিনি বলেছেন: "সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দের অনন্ত মহিমা-দীপ্তি দর্শনের পর আর 'সেখানে' বা 'এখানে' বলে কথা থাকে? তখন কি বলা চলে 'এক' বা 'দুই' আছে?"

এইভাবে জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়ের ধারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতের সর্বপ্রান্তেই চলতে থাকলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দে ভক্তি ও জ্ঞানের একীকরণ

আমরা দেখি এই সমন্বয় গত শতাব্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দে চরম রূপলাভ করেছে।

একথা সর্বজনবিদিত যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন একাধারে পরম ভক্ত ও পরম জ্ঞানী। তিনি কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ভক্তি-পথের লক্ষ্যেই পৌঁছাননি, পরন্তু তোতাপুরীজীর তত্ত্বাবধানে সর্বোচ্চ অদ্বৈতবেদান্তের সাধনাও করেছিলেন। গুরু পুরীজীকে পরম বিস্মিত করে তিনি তিন দিনেই নির্বিকল্প সমাধির অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সে যাই হোক্, একথা মনে রাখা দরকার যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রধান উপাস্যা ছিলেন জগন্মাতা—৺কালীরূপে। কিন্তু, তাঁর কালী ছিলেন 'ব্রহ্মময়ী'—ব্রহ্মের মূর্ত বিগ্রহ। তিনি বলতেন: 'ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ। ব্রহ্ম যখন ক্রিয়াশীল, তখন তাঁকে শক্তি বলি এবং যখন নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি।' এই সিদ্ধান্ত অদ্বৈতবেদান্তের মৌল তত্ত্বের সহিত কোনমতেই বিরুদ্ধ নয়। কারণ, শঙ্করাচার্য স্বয়ং বলেছেন যে, শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। কার্যতঃ সকল প্রকার তন্ত্র-সাধনার ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের সকল পদার্থে সমবুদ্ধি এসেছিল। (লীলাপ্রসঙ্গ, ১৩৭৭ সং, ২।১১) শ্রীশ্রীজগদম্বার পাদপদ্মে দেহ মন প্রাণ আহুতি প্রদান করে তিনি এই সমদৃষ্টি লাভ করেছিলেন। এভাবে তিনি দেখিয়েছেন যে, ভক্তির দ্বারাও জ্ঞানলাভ হয়, যেমন বিপরীতক্রমটিও সত্য।

অদ্বৈত-জ্ঞানের ফল যে কেবল নির্বিকল্প সমাধির সর্বভাবাতীত অনুভূতিই নয়, পরন্তু সেই একেরই সর্বত্র অনুস্যূতির নিত্যকাল উপলব্ধি—শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে তা সম্পূর্ণ প্রমাণিত। অদ্বৈত অনুভূতিই ভাবমুখে অনন্ত প্রেমরূপে প্রকাশ পায়। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদাই বলতেন: 'নেতি' 'নেতি' ক'রে আপেক্ষিক সব কিছু বাদ দিয়ে আগে নিত্যে পৌঁছাতে হয়, পরে আবার লীলায় নেমে আসতে হয়। কিন্তু নিত্য থেকে লীলায় ফিরে এসে সে আর নানা দেখে না। সে দেখে, একই

বহুরূপে প্রকাশিত হচ্ছেন এবং এই উপলব্ধির ফল-শ্রুতি সর্বজীবে নিষ্কাম প্রেম। কারণ সবই ত সেই একই। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন : '...বিশ্বাসে অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয় এবং একমাত্র বিশ্বাসই মানুষকে পরিত্রাণ করিতে পারে...; কিন্তু এতে আবার গোঁড়ামি আসবার ও ভবিষ্যৎ উন্নতির দ্বার রুদ্ধ হবার আশঙ্কা আছে।

'জ্ঞানমার্গ খুব ঠিক, কিন্তু এতে আশঙ্কা এই—পাছে তা শুষ্ক পাণ্ডিত্যে পর্যবসিত হয়। প্রেম ও ভক্তি খুব বড় ও ভাল জিনিস, কিন্তু নিরর্থক ভাবপ্রবণতায় আসল জিনিসটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এগুলির সামঞ্জস্যই দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এরূপ সমন্বয়পূর্ণ ছিল।' (বাণী ও রচনা—তৃতীয় সংস্করণ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৯৭)।

স্বামী সারদানন্দ তাঁর মহান্ গুরু সম্পর্কে বলেছেন : 'তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, অদ্বৈতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই সর্ববিধ সাধন ভজনের চরম উদ্দেশ্য। কারণ ভারতের প্রচলিত প্রধান প্রধান সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মতাবলম্বনে সাধন করিয়া তিনি ইতঃপূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, উহারা প্রত্যেকেই সাধককে উক্ত ভূমির দিকে অগ্রসর করে।' (লীলাপ্রসঙ্গ, রাজসংস্করণ ১৩৭৭, সাধকভাব, পৃঃ ৩০৬-৭)

ধর্মোপদেশ-কালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সর্বসাধারণ ভক্তদের ভক্তিপথ অনুসরণ করতেই বলতেন, কারণ তা এই যুগের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের মতো অদ্বৈতজ্ঞানের যোগ্য অধিকারী পেলে, তিনি তাঁদের উচ্চতম অদ্বৈততত্ত্বই শিক্ষা দিতেন।

স্বামী বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে শ্রীগুরুর পদাঙ্কই অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু, শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বাইরে ভক্তির উপরই বেশী জোর দিতেন, প্রচারকালে স্বামীজী তেমনি দিতেন অদ্বৈত-জ্ঞানের উপর জোর। কারণ তাঁদের প্রচারক্ষেত্র ছিল বিভিন্ন সে বিভিন্নতা এত বেশী যে তা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু অনেক সময়েই স্বামীজীর অন্তর্নিহিত ঈশ্বরপ্রেমের প্রাবল্য ও তাঁর প্রেমিক প্রকৃতি প্রকাশিত হত। তিনি একবার বলেছিলেন : তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) বাইরে ছিলেন পুরোপুরি ভক্ত কিন্তু ভেতরে পূর্ণ-জ্ঞানী ; আর আমি বাইরে পুরোপুরি জ্ঞানী, কিন্তু ভেতরে আমার সবটাই ভক্তি।

এভাবে জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে যুগ যুগ ধরে যে আপাত-বিরোধ ছিল, তার অবসান হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দে।

শ্রীরমণ মহর্ষির ভক্তি

বিংশ শতকে ভারতের ধর্মক্ষেত্রে জ্ঞান-ভক্তির এই বিরোধের কোন প্রধান ভূমিকা আমরা লক্ষ্য করি না। অরুণাচলের মহাজ্ঞানী শ্রীরমণ মহর্ষি (১৮৭৯-১৯৫০ খ্রীঃ) উচ্চতম জ্ঞান যে গভীরতম ভক্তিতেও পরিণত হতে পারে তা আমাদের প্রত্যক্ষতঃ দেখিয়েছেন। 'অরুণাচল-অক্ষর-মণ-মালা'[১] নামক স্তোত্রে তিনি বলছেন : "আমি তোমার ধ্যান করছিলাম আর তোমার সুষমায় বাঁধা পড়ে গিয়েছিলাম ; আমাকে তুমি আটকে রেখেছিলে তোমার সময় মত আমাকে তোমাতে গ্রহণ করার জন্য, যেমন উর্ণনাভি করে থাকে। মধুমক্ষিকার মতো তুমি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললে : 'আহা, তুমি এখনও প্রস্ফুটিত হতে বাকি!'... তোমার সঙ্গে আমায় মিলিয়ে এক করে দাও নাহলে আমি অশ্রুনদীর জলধারায় শরীরসহ গলে বিলীন হয়ে যাবো।"

কথাপ্রসঙ্গে মহর্ষি একবার বলেছিলেন : এ (মহর্ষির বাণী) হচ্ছে কর্মযোগের সার, ভক্তিযোগের

১ মণ—তামিল শব্দ ; ইহার অর্থ বিবাহ।

সার, এমন কি জ্ঞানযোগেরও সার—কারণ যদিও প্রারম্ভে পথগুলি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, তারা সকলেই শেষে এই অবস্থায় (আত্মজ্ঞানে) পৌঁছে দেয়।[১]

ভক্তি ও জ্ঞানের সমুচ্চয় সম্ভব কিনা

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় দেখা যায় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অদ্বৈতবাদিগণ ভক্তিকে কখনই জ্ঞানের বিরোধী বলে মনে করতেন না।

এখন দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে: এই দুই-এর সমুচ্চয়ে আমাদের কি কি সুবিধা হবে? এবং এ কি প্রত্যেকেরই পক্ষে সম্ভব? আমরা এই প্রশ্ন দুইটির উত্তর দিতে চেষ্টা করবো।

মানুষ প্রায় সর্বদাই দেহ-সচেতন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত দেহবোধ ও অহংবোধ থাকবে ততক্ষণ মন রাগ-দ্বেষে চঞ্চল হতে বাধ্য। যতক্ষণ না মন এই সকল বৃত্তি থেকে মুক্ত হচ্ছে ততক্ষণ সে কিছুতেই অদ্বৈতের সমশান্ত অবস্থা লাভ করতে পারবে না। তা হলে কি আমরা এই অবস্থায় অধ্যাত্মপ্রচেষ্টা ছেড়ে দেব? না। প্রাত্যহিক জীবনের সকল অবস্থার মধ্যে আমরা আমাদের এই পরমান্বেষা যদি না চালাই তবে সে লক্ষ্যে পৌঁছানো প্রায় অসাধ্য।

ভক্তিপথ খুবই কার্যকরী একারণে যে, এতে মনের স্বাভাবিক রাগবৃত্তিকে আমাদের কোন গভীর ভালবাসার পাত্রে সহজেই চালিত করা যায়। আর পরমাত্মা, যাঁকে 'অস্তি ভাতি প্রিয়' অথবা 'সচ্চিদানন্দ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁকে ভিন্ন ভালবাসার আর কি-ই বা থাকতে পারে? সত্য ও জ্ঞানের অন্বেষক প্রেম, ও আনন্দেরও অন্বেষক। প্রেম বা আনন্দ ইন্দ্রিয়গত অনুভূতি নয়, মনোগত অনুভূতি, আর মন যখন তার পশ্চাতে যে পরম সত্য বর্তমান, তার সন্ধান পায় তখন বুঝতে পারে, আনন্দ বাইরে থেকে প্রাপ্তব্য কোন জিনিস নয়, তা ভেতরেই রয়েছে।

আমাদের অন্তরে নিত্য প্রকাশিত পরম-সত্যের এই আনন্দাংশের সঙ্গে মনের যোগ স্থাপন করার সুযোগ ভক্তিতেই আছে। সুতরাং ভক্তি ও জ্ঞানের—প্রেম ও বিচারের সমুচ্চয়ের ফলে অধ্যাত্মসাধকের পক্ষে সারাক্ষণ অধ্যাত্মচেতনায় ব্যাপৃত থাকা সম্ভব হয়।

এই সমুচ্চয় কি সম্ভব? হাঁ, সর্বশ্রেষ্ঠ সাধকগণের জীবনে তা প্রদর্শিত হয়েছে। বস্তুতঃ জ্ঞান ও ভক্তির সমুচ্চয়, জ্ঞানের শুষ্ক বৌদ্ধিক কসরতে এবং ভক্তির নিছক ভাবলুতায় পর্যবসিত হওয়া—এই দুই বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করে। যে সাধক জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বিত পথে চলেন, তাঁর হৃদয়াবেগ ও বিচার এই উভয় বৃত্তিরই পূর্ণ প্রকাশের সুযোগ আছে।

কিভাবে এই সমুচ্চয় অনুশীলিত হতে পারে তা শ্রীরামচন্দ্রের মুখ্য কিঙ্কর শ্রীহনুমানের উক্তি বলে কথিত একটি প্রসিদ্ধ শ্লোকে সুন্দরভাবে বলা হয়েছে:

> দেহবুদ্ধ্যা তু দাসোঽহং জীববুদ্ধ্যা ত্বদংশকঃ।
> আত্মবুদ্ধ্যা ত্বমেবাহং ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥

—দেহবোধ থাকলে আমি তোমার দাস (দেহবোধ চলে গিয়ে) জীববোধ জাগলে আমি তোমার অংশ, (সে-বোধও চলে গিয়ে) আত্মবোধ হলে, তুমিই আমি—এই আমার নিশ্চিত সিদ্ধান্ত।

---

১ 'K': *Sat-Darshana Bhashya and Talks with Maharshi* (Published by Sri Ramanasramam, Tiruvanamalai, S. India, 1968), p. xxvi.

এই পথ অবলম্বন করেই আমাদের বর্তমান ভাবধারা অনুসারে ঈশ্বরের সঙ্গে বিভিন্ন সম্বন্ধ পাতিয়ে আমরা আমাদের সকল শক্তিকে আধ্যাত্মিক লক্ষ্যলাভের জন্ত নিয়োজিত করতে পারি।

এইভাবে ভক্তিপথ অদ্বৈতবেদান্তের ভিত্তির উপর স্থাপিত করা যেতে পারে, এবং তা করার পর যুক্তিবিচারের সঙ্গে সময়ে সময়ে যে-সব সংঘর্ষ সাধককে ভক্তি-সাধনার পথে উত্যক্ত করে, সেগুলি এই দৃঢ় প্রত্যয়ে নিবারিত হতে পারে যে, ভগবানের নিকট কৃত সকল প্রার্থনাই কার্যত সাধকেরই উচ্চতর আত্মসত্তার কাছে তাঁর নিম্নতর সত্তার নিবেদন মাত্র। এমন কি ঈশ্বরাবতার, যিনি ভ্রান্ত মানবের উদ্ধারের জন্ত পরিপূর্ণ-জ্ঞানময় মুক্তিদাতা হয়ে অবতীর্ণ হন, তিনিও যে অনন্ত করুণার দ্বারা প্রেরিত হয়ে কার্য করেন, তা 'অস্তি-ভাতি-প্রিয়ে'র 'প্রিয়'-অংশ থেকে ভিন্ন নয়।

ভেদদৃষ্টি সাধারণ মানুষকে মৃত্যু থেকে মৃত্যুতে নিয়ে যায়। কিন্তু পরাভক্তির কাষ্ঠায় উপনীত পুরুষ স্বাত্মার ও পরমপ্রেমাস্পদের মধ্যে যে ভেদ দেখেন, তা তাঁর পূর্বোপলব্ধ অদ্বৈতবোধকে মধুময় করে তোলে। তাঁর এ ভেদ-দৃষ্টি কেবল প্রেমাস্পদের সঙ্গে পুনরায় মিশে যাবার আকুলতার প্রকাশ মাত্র, যে পরিপূর্ণ মিলন বা ঐকাত্ম্য তিনি পূর্বে সমাধিতে উপলব্ধি করেছিলেন। সুতরাং এ ভেদ-দৃষ্টি আর বন্ধনের কারণ হয় না।*

* Prabuddha Bharata, August 1974-সংখ্যায় প্রকাশিত 'The Place of Dhakti in Advaita Vedanta'-শীর্ষক প্রবন্ধের অনুবাদ।—সঃ

ড্রাগনের দেশ ভুটান

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দে

এসিয়ার মানচিত্রে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের সংলগ্ন হিমালয়ের ক্রোড়ে অবিকল গণ্ডারের আকৃতিবিশিষ্ট যে ভূখণ্ড চিহ্নিত আছে, সারা বিশ্বে তাহাই ভুটান নামে পরিচিত। ভুটানীরা নিজেদের দেশকে বলে ড্রুক ইউল বা ড্রাগনের দেশ। ক্ষমতার প্রতীক হিসাবে ভুটানের জাতীয় পতাকায় ও রাজমুকুটে ড্রাগনের প্রতিকৃতি বিদ্যমান। ভুটান স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য। একটি স্থলবেষ্টিত পর্বতময় দেশ যাহার অনুমিত পরিধি প্রায় আঠারো হাজার বর্গমাইল। লোকসংখ্যা এগারো লক্ষ। ভুটানের ভৌগোলিক সীমা— সারা উত্তর জুড়িয়া রহিয়াছে তিব্বতের মালভূমি। পশ্চিমে সীমারেখা টানিয়া তিব্বতের চুম্বি উপত্যকা যাহা বহুকাল ভারত-তিব্বত বাণিজ্য-পথ বলিয়া বিখ্যাত ছিল। তিব্বত চীনাদের অধিকারে আসিবার পূর্বে এক বাণিজ্যিক সন্ধি অনুযায়ী তিব্বতের ইয়াটুং শহরে একটা ট্রেড মিশন প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং ইহাই লাসার সহিত বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিত। প্রচুর তিব্বতী পশম এই পথেই দারজিলিং জেলার ক্যালিম্পং শহরে আমদানী ও বেচা কেনা হইত। বস্তুতঃ ক্যালিম্পং শহরের নামই ছিল পশমের শহর। চীনারা এই বাণিজ্য-পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। পূর্বে ভারতের অরুণাচল প্রদেশ। ভুটানের পূর্ব-সীমান্তের শেষ শহর ইয়াংসি অরুণাচলের টোয়াং শহরের নিকটবর্তী। দক্ষিণে ক্রান্তীয় তরাই অঞ্চল মিশিয়াছে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও আসামের সমতলভূমির সহিত। ভুটানের বনজ

সম্পদ এই অঞ্চল হইতে পাওয়া যায়।

ভুটানের প্রাকৃতিক গঠনের কথা বলিতে যাইলে প্রথমেই বলিতে হয়, ভুটান হিমালয়ের সন্তান। সকল প্রকার উচ্চতা—সাগরপৃষ্ঠের সমতল হইতে আরম্ভ করিয়া কুড়ি হাজার ফুট উচ্চতার মালভূমি এখানে লক্ষিত হয়। আসলে ভুটান পর্বতময় উত্তরবঙ্গ ও আসামের সমতল হইতে ধাপে ধাপে উঠিয়া গিয়া তিব্বতের সু-উচ্চ মালভূমির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। পশ্চিম সীমারেখায় তিব্বতের চুম্বি উপত্যকা ভুটানকে সিকিম হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। ভুটানের সু-উচ্চ পর্বত শৃঙ্গগুলি সবই উত্তরে অবস্থিত। বিখ্যাত চোমোলহারি শৃঙ্গ ভুটানের পশ্চিম-উত্তর অংশে অবস্থিত, উচ্চতা ২৩,৯৯৭ ফুট। রায়ঢাক ও তোরসা নদী এই অঞ্চল হইতে উঠিয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে ভুটান পার্বত্য দেশ। ইহার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২০।২৪ হাজার ফুট পর্যন্ত উঠানামা করে। জলবায়ুর ক্রান্তীয় হইতে আল্পসীয় পর্যন্ত তারতম্য হয়। জলবায়ুর সহিত বৃক্ষলতাদি ও জীব-জন্তুরও বৈচিত্র্য দেখা যায়। উত্তরাঞ্চল বৃক্ষশূন্য অনুর্বর পর্বতময়। চীর ও ফার গাছ কোথাও কোথাও দেখা যায়। ইয়াকের প্রচুর দেখা মেলে। ইহারাই অধিবাসীদের সম্পদ। মেষপালন হয়, তবে তাহার বাণিজ্যিক মূল্য কম। নদীর উপত্যকায় কিছু যব ও গম হয়। সীমান্ত শহর লিংসী ও গাসা সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। লোকসংখ্যা বিরল।— এখানকার সংস্কৃতি প্রায় তিব্বতীয়।

আরও দক্ষিণে নামিয়া মধ্য ভুটানে আসুন বার্চ ফার ও পাইনের দেশে। শরতের আকাশে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে রডোডেনড্রনের রক্তশিখা; কচিৎ সোনালী আভা এই জমাট রক্তরাগে ছেদ ঘটায়। এই সব অঞ্চল অপেক্ষাকৃত অবন্ধুর—বৃষ্টিপাতও কিছু হয়। পাইন ও ফারের বনভূমির মধ্যে মধ্যে বরফ-গলা নদীর উপত্যকায় যব, গম হয়। আপেলও জন্মায় প্রচুর। রাস্তার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এইসব ফলের ব্যবসায়ের উন্নতি হইবে। মেষপালনও চলে। এখানেও ইয়াক দেখা যায়। মরুভূমির উটের মতো ইয়াকের উপকারিতা বিশেষ অনুভূত হয়। ভারবহন, দুগ্ধদান, ও খাদ্য হিসাবে ইহার মাংস স্থানীয় ভুটানীদের বিশেষ সম্বল। ভুটানের মেষপালন ব্যবসায়িক পর্যায়ে আসে নাই। পুনাখা, টোংসা, লুংসী প্রভৃতি এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য শহর। ভুটানের এই সব অঞ্চলের গড় উচ্চতা পাঁচ হাজার ফুট। এবং জলহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অনুরূপ। পাইন, ফার, বার্চ বৃক্ষশ্রেণীর তলদেশে রডোডেনড্রনের প্রাচুর্য। মূল্যবান বনৌষধি, বর্ণাঢ্য প্রিমরোজ পুষ্প, দুষ্প্রাপ্য ব্লু-পপি, জেনটিয়ান, রাশি রাশি নানাবর্ণের বন্য গোলাপ রংয়ে রংয়ে রঙ্গীন করিয়া তোলে সারা উপত্যকা। হিমালয়ের বুরহাল কস্তুরী মৃগ, নীল মেষ, আন্টিলোপ জাতীয় ছাগ ও ইয়াক পালে পালে যত্রতত্র বিচরণ করে। চিতা, ভল্লুক, সম্বর, বন্যশূকর প্রচুর পাওয়া যায়। কত রকমের পাখী, নানাবর্ণের প্রজাপতির অপূর্ব সমাবেশ হয় এইসব স্থানে। ফুলের সন্ধানে বিখ্যাত আমেরিকান উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানী নুটাল (Nuthal) সাহেব ভুটানে আসেন এবং তাঁহার আবিষ্কার সুবৃহৎ "রডোডেনড্রন নুটালী" তাঁহারই নাম বহন করিয়া রহিয়াছে।

ভুটানের সর্ব দক্ষিণ অংশ যাহা জলপাইগুড়ি জেলা ও আসামকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে, তাহার সমস্তটাই ক্রান্তীয় বনভূমি অঞ্চল। শাল, পলাশ, বাঁশ প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষের দুর্ভেদ্য বনরাজি, শাখায় শাখায় রাশি রশি পুষ্পিত অর্কিডের শোভা, মধ্যে মধ্যে খরস্রোতা গিরিনদী কেমন এক ভয়াল অথচ সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। নানাজাতীয় মৃগ, ব্যাঘ্র, হস্তী, বন্যমহিষ, বায়সন, গণ্ডার

অধ্যুষিত এই বনভূমি শিকারীর স্বর্গ। এই সমস্ত বনজসম্পদ হইতে যথেষ্ট রাজস্ব অর্জিত হয়।

ভুটানের জনসংখ্যা প্রায় এগার লক্ষ। সমগ্র ভুটানের অধিবাসী তিনটি মানবগোষ্ঠিতে বিভক্ত। প্রথম বিভাগে পড়ে ভুটানের আদি বাসিন্দারা, যারা Sharchops নামে পরিচিত। ভুটানের প্রথম ইতিহাস হইতে জানা যায়, এরা তিব্বতের পূর্বাঞ্চল খাম হইতে আগত বলিষ্ঠ আক্রমণকারীদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিল। দক্ষিণ দেশ হইতে আগত আক্রমণকারীদের হস্তেও এরা প্রায় পর্যুদস্ত হইত। ফলে খামের তিব্বতীয়েরা অচিরেই ভুটানের পশ্চিমাঞ্চল দখল করিয়া লইল। এদের বংশধরেরা দ্বিতীয় গোষ্ঠির অন্তর্গত। ভুটানের অধিবাসীদের তৃতীয়াংশ নেপালী বংশোদ্ভুত। এদের দেখা যায় সাধারণতঃ ভারতের সংলগ্ন গ্রীষ্মপ্রধান দক্ষিণ অঞ্চলে। কিছুসংখ্যক লেপচাও এই অঞ্চলে বসবাস করে। তিব্বতী উদ্বাস্তুরা ভুটানের উত্তরাঞ্চলে বসবাস করে।

মধ্যযুগের ভুটানের সহিত পৃথিবীর যোগাযোগ ছিল না বা ভুটান তিব্বতের মত নিষিদ্ধ দেশ ছিল, ইহা বাস্তবিক সত্য নহে। পাহাড়ী রাজ্য সাধারণতঃ দুরধিগম্য হইয়া থাকে। প্রতিবেশী রাজ্যের সহিত ভুটানের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান ছিল এবং ভুটান-তিব্বত বাণিজ্য-কেন্দ্রস্থল ছিল কোচবিহার। পর্তুগীজরাই প্রথম ইউরোপীয়, যাহারা ভুটানে আসে। এরা রাজাকে একটি দুরবীন ও কিছু বন্দুক ও গোলা বারুদ উপহার দেয়। র‍্যালফ ফিস্ নামক ভূপর্যটকের মতে ভুটানের অবস্থা অন্যসব মধ্যযুগীয় দেশের মতই ছিল। ভুটানের যাহা কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন ছিল সবই তদানীন্তন রাজধানী পুনাখা জংএর অগ্নিকাণ্ডে ও ভূমিকম্পে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভুটানে জং (Dzong) অর্থে দুর্গ বুঝায় অর্থাৎ যে স্থান হইতে রাজ্যশাসন ও ধর্মের অনুশাসনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

যাহা কিছু তথ্য পাওয়া যায় তাহাতে জানা যায়, ভুটান রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে। ভুটানে অস্পষ্ট মধ্যযুগীয় পটভূমিকায় যিনি বিরাট ব্যক্তিত্বের ছায়াপাত করিয়াছিলেন তাঁহার নাম ছিল Rimpochi, the peerless। সাধারণ্যে তাঁহার নাম ছিল Shabdrung Ngawang Namgyal। তিনি ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে তিব্বত হইতে ভুটানে প্রবেশ করেন। ইহার পর দীর্ঘ ৩৫ বৎসর ব্যাপিয়া বহু যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে একাধারে রাজ্যের কর্ণধার ও ধর্মনেতারূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময়ের মধ্যে তিব্বত বহুবার অভিযান চালাইয়াছিল ভুটান জয় করিবার জন্য, কিন্তু প্রত্যেকবারই বিতাড়িত হইয়াছিল। Ngawang Namgyal-এর সময়েই ভুটানে অধিকাংশ জং বা দুর্গ ও মঠ নির্মিত হইয়াছিল। তিনি দেশে আইন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম দেশে দেবরাজার বা Dug Desi-র উপর রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিলেন এবং নিজে ধর্মরাজা নামে দেশের ধর্মীয় প্রধান হইয়া রহিলেন। এইরূপে শাসনব্যাপারে, যুদ্ধবিগ্রহে, এবং শাস্ত্রকার ও সংস্কারক হিসাবে ইনি একাধারে আদর্শস্থানীয় হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশ কিছুদিনের জন্য গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল এবং দেশের বৈদেশিক সম্পর্কের যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছিল। ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতের মঙ্গল অধিপতি Lhabzang Khan-এর ভুটান আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছিল। অনুরূপ বিফল অভিযান ঘটিয়াছিল ১৭৩০ সালে। পরে তিব্বতের সঙ্গে স্থায়ী বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল এবং লাসায় একজন ভুটানী বাণিজ্য-দূত পাঠান হইয়াছিল। এই ব্যবস্থা ১৯৫৯ খ্রীঃ অবধি বলবৎ ছিল। ইহার অবসান ঘটে চীনাদের তিব্বত জয়ের

পর। ভারতের বৃটিশ শাসকদের সহিত ভূটানের সম্পর্কের অবনতি ঘটায় ১৮৬৫ সালে এক যুদ্ধ হইয়াছিল। ইহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল Sinchula সন্ধির মাধ্যমে। ফলে দুয়ার অঞ্চল ভূটানের হস্তচ্যুত হইয়া গেল একটা বার্ষিক করের বিনিময়ে। এই সময়ে সিপাহী যুদ্ধের বহু পলাতক সিপাহী ভূটানে আশ্রয় পায়।

ভূটানের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল ১৯০৭ সালে। সেই বৎসর Uggen Wangchuk প্রথম বংশাবলীক্রমে রাজা হন। ইহার অভিষেকে তদানীন্তন সিকিমের বৃটিশ অফিসার উপস্থিত ছিলেন। ১৯৫২ সালে ২৫ বৎসর বয়সে Jigme Dorji Wangchuk সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে ইনি পরলোক গমন করিলে ইহার পুত্র Singe Dorji Wangchuk মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে ভূটানের রাজা হন। ভূতপূর্ব মহারাজ Jigme Dorji অতিশয় প্রগতিপন্থী ছিলেন। তাঁহার প্রধান প্রধান কীর্তির মধ্যে আছে ১৯৫৩ সালে National Assembly-র প্রতিষ্ঠা, ১৯৫৬ সালের ভূমিসংস্কার ও ভূমিদাসদিগের মুক্তি, ১৯৬৫ সালে Royal Advisory Council স্থাপন, ১৯৬৮ সালে Council of Ministers ও High Court প্রতিষ্ঠা, আইনের প্রবর্তন এবং বিচার ও শাসন বিভাগের পৃথকীকরণ। ইহা ব্যতিরেকে পুলিশ ও সৈন্য বিভাগের সংস্কারসাধন এবং পারো হইতে থিম্পুতে রাজধানী স্থানান্তরিতকরণ তাঁহার অবিস্মরণীয় কীর্তি। তাঁহার সুযোগ্য শাসনে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে ভূটানের সহস্র বৎসরের বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটিল। অতঃপর নানাবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ভূটান ১৯৬২ সালে কলম্বো প্ল্যানের সভ্য হইল, Co-operative Economic Development-এর কার্যসূচীগ্রহণ এবং ১৯৬৯ সালে Universal Postal Union-এ যোগদান করিল। ভূটান এক্ষণে যে কোন আন্তর্জাতিক কার্যকলাপে যোগদান করিতে প্রস্তুত। জাতীয় সংসদে ব্যবস্থা আছে যে, জনমত যদি রাজার বিরুদ্ধে যায় তাহা হইলে মহারাজ তাঁহার ভেটো প্রয়োগে তাহা বাতিল করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু জনমত-সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া মহারাজ তাঁহার ভেটো প্রয়োগক্ষমতা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কোন দেশের রাজার পক্ষে এরূপ উদারতার পরিচয় দিতে দেখা যায় নাই। মহারাজ আরও একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে রাজার গদীর স্থায়িত্ব নির্ভর করিবে জাতীয় পরিষদের রাজানুগত্যের উপর এবং এই আস্থাসূচক ভোট প্রতি তিন বৎসর অন্তর গ্রহণ করা হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া মহারাজ Jigme Dorji Wangchuk দেশের লোকের স্বাধীন মত পোষণের অনুকূলে যে প্রেরণা দিয়াছিলেন তাহার দৃষ্টান্ত অতি বিরল।*[ক্রমশঃ]

* লেখককে ভূটান সরকারের অধীনে কর্মরত অবস্থায় কয়েক বৎসর ভূটানে বাস করিতে হইয়াছিল। এই দীর্ঘ সময়ে ভূটান সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং রাজকীয় তথ্যপুস্তক হইতে সংগৃহীত মালমশলা হইতে বর্তমান প্রবন্ধ সংকলিত।—সঃ

বিশ্বনিয়ন্তার প্রতি

শ্রীতপনকুমার চট্টোপাধ্যায়

সীমাহীন ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় কর্ণধার পরম-ঈশ্বর।
দেব দৈত্য যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর
তোমার বিচিত্র সৃষ্টি। আয়োজন কী বিশাল তব
বর্ণাঢ্য চিত্রিত বেশে সাজাতেছ প্রকৃতিকে নিত্য নব নব,
সুমহান কীর্তি মাঝে আপনারে রাখিয়া জড়িত,
অথচ রহিয়া সদা বাক্য আর মনের অতীত।

ওতপ্রোত আছো তুমি সবের মাঝারে
জড় ও চৈতন্যে আছো, বিশ্বের প্রতিটি স্তরে স্তরে
আদি অন্ত মধ্য তুমি, সৃষ্টি স্থিতি লয়,
কখনো মৃন্ময় রূপে, কভু বা চিন্ময়
জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, আলো-অন্ধকার
মহিমা যে অপার তোমার।
পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে মোরা অভিনেতা
বিজিত কেহ বা হেথা, কেহ বা বিজেতা,
কেহ রাজা কেহ মন্ত্রী কেহ সেনাপতি
কেহ বা অসতীসাজে, কেহ সাজে সতী—
কেহ বা ভিখারীসাজে দ্বারে দ্বারে করাঘাত করে
রাজপুত্র হইয়াও সব ছাড়ি চলি আসে ঘরের বাহিরে।
জীবনের প্রেক্ষালয়ে নিত্য নব ধরিয়া আকার
সাজে সবে নানাবেশে—অভিনেতা, প্রযোজক, চিত্রনাট্যকার।

তোমার ঐশ্বর্য ব্যাপ্ত দিক হতে দূর দিগন্তর
সূর্য চন্দ্র নীহারিকা ছায়াপথ নক্ষত্র ভাস্বর।
মহারুদ্র ধরো রূপ প্রাবৃটের শরজালে, মত্ত প্রভঞ্জনে
কখনো বা চিরশান্ত অচঞ্চল নিস্তব্ধ অরণ্যে
বিশালত্ব ধরিয়াছ সমুদ্র গিরির রূপ ধরি,
গড়িয়াছ ইন্দ্রধনু, রৌদ্র-ছায়া, দিবস-শর্বরী।

রহস্যের দুর্গ তুমি—বেশ ধরো তুষার ধবল,
কভু কুল্ল গোলাপের, কখনো বা শুভ্র শতদল,
কী অপূর্ব রঙ ধরো অস্তরাগ গোধূলি বেলায়।
কত জীব, কত প্রাণ, ক্ষণে ক্ষণে আসে আর যায়।
পাখীর কাকলি আর শিশুদের হাস্য কলতান
সব প্রভু তোমারই তো দান।

কী আনন্দ মোর আজি বর্ণিব কেমনে
বিন্দু আজ একাকারে মিশে সিন্ধু সনে
শিরায় শিরায় এক অব্যক্ত স্পন্দন
প্রতি লোমকূপে মোর করিছে নর্তন।
সৃষ্টির প্রদীপ জ্বালি আছো তুমি নিঃশঙ্ক, নির্ভয়
হেরিতেছি সব তোমাময়।

যদিও বিধৃত আছি তোমার সত্তায় অনুক্ষণ
কিন্তু যে বিচ্যুত দেখি মোদের জীবন—
সাময়িক হলেও তা। আছে রাগ, দ্বেষ, অভিমান—
পদে পদে করিতেছি তব অসম্মান।
মুক্ত কর কাঁটা হতে পুষ্পিত গোলাপ
শতদলে জড়ায়ো না বিষধর সাপ।
জাগতিক মলিনতা দাও মুক্ত করি
মৃত্যু হতে অমৃতত্বে যেন যেতে পারি,
তমসার বক্ষ ভেদি। হোক আলোকিত
এই প্রাণ, এই মন, হোক সুরভিত।
তুচ্ছ করি হাসিকান্না, ক্ষণিকের সাজানো বাগান
তব ক্রোড়ে পেতে চাই স্থান—
দিনশেষে ক্লান্ত হয়ে বিহঙ্গেরা যথা ফিরে যায়
আপন কুলায়ে, নিরালায়॥

ফ্লু

ডক্টর জলধি কুমার সরকার

'ফ্লু' (Flu) শব্দটির সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত। মাঝে মাঝে খবরের কাগজের শিরোনামায়ও এর নাম দেখা যায়। আসলে এটি কি ধরনের অসুখ তা-ই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখতে গেলে, এটা বলা যেতে পারে যে, জনসাধারণ, সংবাদপত্রপত্রিকা, এমন কি চিকিৎসক-সম্প্রদায়ও শব্দটিকে ভাসা ভাসা অর্থে ব্যবহার করেন। যে কোন দুচার দিনের জ্বর, সর্দি অথবা সর্দিজ্বর, জ্বর-জ্বর ভাব, গায়ে হাতে ব্যথা, হাঁচি সর্দি—সব কিছুকেই 'ফ্লু' বলে চালান হয়। এমন কি ডেঙ্গুজ্বর (Dengue), যার সম্বন্ধে আমি পূর্বে আলোচনা করেছি,[১] সেও 'ফ্লু'র মধ্যে পড়ে গেছে। কারণ এ জ্বরও চার-পাঁচ দিনের জ্বর, এবং এতে গায়ে হাতে খুব ব্যথা হয়। তা ছাড়া, কারণ না জানা অনেক রকম ক্ষণস্থায়ী জ্বরকেও 'ফ্লু' বলে চালান হয়। এর মধ্যে ব্যাকটিরিয়া (Bacteria) বা জীবাণু-ঘটিত টন্‌সিলাইটিস (Tonsilitis), ফ্যারিনজাইটিস (Pharyngitis) ইত্যাদি ত আছেই। এই সব অসুখে রোগনির্ণয়ের যাথার্থ্য সম্বন্ধে কেউ প্রশ্ন করতে চায় না, কারণ তা করতে গেলে বড় রকমের ল্যাবরেটরির প্রয়োজন [illegible] এবং ব্যাপারটি সময়সাপেক্ষ। চিকিৎসককে রোগীর কাছে ব্যাধির একটা নামকরণ করতেই হয়, কারণ তা না শুনলে রোগী খুশি হয় না। কাজেকাজেই 'ফ্লু' শব্দটির এত বেশী প্রচলন।

এখন দেখা যাক, সত্যিকার 'ফ্লু' বলতে কি বুঝায়। 'ইনফ্লুয়েঞ্জা (Influenza) অসুখের আর এক নাম 'ফ্লু'। ইনফ্লুয়েঞ্জা একটি ভাইরাস (Virus) জনিত অসুখ। কিছুদিন আগে আমি ভাইরাস সম্বন্ধে আলোচনা করেছি।[২] ইহা অতি ক্ষুদ্রকায় প্রাণী, এবং ব্যাকটিরিয়া বা জীবাণু অপেক্ষা অনেক ছোট বলে একে জীবপরমাণু বলেছি। ভাইরাস-জনিত বিভিন্ন অসুখের ভাইরাস আলাদা আলাদা। ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ফ্লুর ভাইরাস-এর নাম 'ইনফ্লুয়েঞ্জা' ভাইরাস। এই ভাইরাসের তিনটি প্রকার ভেদ আছে—'এ' 'বি' ও 'সি' (Types A, B, & C)। 'এ' ভাইরাস পৃথিবীতে অতীতে বড় বড় মড়কের সৃষ্টি করেছে। 'এ' ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের মধ্যে আবার অনেক জাতিভেদ আছে, যাদের মধ্যে শারীরিক গঠনের পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য আমাদের অনেক মুস্কিলের সৃষ্টি করেছে। আপনারা জানেন যে, কোন জীবাণু-বা জীবপরমাণু-ঘটিত অসুখ হতে সুস্থ হবার পর আমাদের শরীরে সেই জীবাণু বা জীবপরমাণুর পুনরাক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-ক্ষমতা (Resistance) জন্মে, যার ফলে বেশ কিছুদিন বা কয়েক বৎসর আমাদের শরীরে সেই অসুখের পুনরাক্রমণ ঘটে না। কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জার বেলায় সে কথা খাটে না। তার প্রধান কারণ, এই ভাইরাসের বিভিন্ন প্রকারভেদ এবং তাদের ঘন ঘন গঠন পরিবর্তন করবার ক্ষমতা। ভাইরাস যদি পরিবর্তিত চেহারা নিয়ে শরীরে প্রবেশ করে, তাহলে শরীরে আগেকার তৈরী প্রতিরোধ-ক্ষমতা

---

১ উদ্বোধন, আশ্বিন, ১৩৮১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।—সঃ

২ উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৮০ ও আশ্বিন, ১৩৮১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।—সঃ

কার্যকরী হয় না। সেজন্য ইনফ্লুয়েঞ্জা অনেকের বারে বারে হয়। আবার দেখা গেছে যে, কয়েক বৎসর অন্তর পৃথিবীর কোন অংশে নূতন প্রকারের 'এ' ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের আবির্ভাব হয়ে মড়ক সৃষ্টি করেছে এবং তার নবরূপ হওয়ার জন্য মড়ক দেশ হ'তে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। এরূপ হয়েছিল ১৯০৩, ১৯৪৬, ১৯৫৬ ও ১৯৬৯ সালে। ১৯৫৬ সালের মড়ক 'এশিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা' নামে অভিহিত এবং এর ভাইরাস জন্ম নিয়েছিল চীনদেশে। ১৯৬৯-এর মড়কের ভাইরাসকে 'হংকং ভাইরাস' বলে, কারণ এটির নূতনত্ব প্রথম ধরা পড়েছিল হংকং-এ। বর্তমানে আমাদের দেশে 'এশিয়ান' ও 'হংকং'—ছু'রকম ভাইরাসই পাওয়া যাচ্ছে, তা ছাড়া 'বি' ভাইরাস ত আছেই, 'সি' খুব কম। মড়ক-সৃষ্টিকারী নূতন ধাঁচের ভাইরাস কোথা হতে আসে, এ নিয়ে মতভেদ আছে। তবে বহু বিশেষজ্ঞের মতে, পশু-পক্ষীদের, বিশেষ করে শূকরদের মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা মড়ক সৃষ্টি করার পরে সেই ভাইরাস মানুষের শরীরে প্রবেশ ক'রে নূতন ধরনের ভাইরাস বংশের সৃষ্টি করে, যার প্রতিরোধক্ষমতা আমাদের শরীরে আগে ছিল না। বলা বাহুল্য, পৃথিবীতে মানুষ ও পশুপক্ষী শুধু পাশাপাশি বাস করে না, পশুপক্ষীর অনেকপ্রকার অসুখেরও আমাদের অংশীদার হতে হয়। কুকুর শিয়ালের কামড়ের ফলে জলাতঙ্ক (Rabies) রোগের ভাইরাস যে আমাদের শরীরে ঢোকে, সে কথা ত সকলেই জানেন।

ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রতিকারক কোন ওষুধ আজ পর্যন্ত বের হয়নি। সেইজন্য ডাক্তারের কাছে গেলেও তিনি গায়ে ব্যথা মাথাধরা প্রভৃতি উপসর্গ কমাবার জন্য ওষুধ দিতে পারেন, তবে অসুখ আরোগ্য করার ব্যাপারে কিছুই করতে পারেন না। কথাতেই আছে, ইনফ্লুয়েঞ্জা হলে "ওষুধ খেলে সাতদিন, না খেলে এক সপ্তাহ লাগে।" এই অসুখে মৃত্যু প্রায় হয় না, তবে শিশু ও বৃদ্ধদের নিউমোনিয়া প্রভৃতি সৃষ্টি হয়ে মারাত্মক হতে পারে। যাই হোক, মৃত্যুর হার কম হলেও সমগ্র জাতির দিক হতে এই অসুখকে অবহেলা করা যায় না, কারণ প্রতিদিন হাজার হাজার লোককে এই ব্যাধির জন্য কর্ম হতে বিরত থাকতে হয়। সেইজন্য রাশিয়া, আমেরিকা, ইউরোপ প্রভৃতি দেশে ইনফ্লুয়েঞ্জার ওপর প্রচুর গবেষণা চলছে। এর প্রতিরোধক টিকা আছে এবং মড়কের মুখে এই টিকা নিয়ে অনেকে ইনফ্লুয়েঞ্জাকে এড়াতে পারেন। তবে সাধারণতঃ এই টিকার খুব প্রচলন নেই, কারণ টিকার কার্যকারিতা শরীরে বেশীদিন থাকে না। তা ছাড়া আগেই বলেছি, যে ভাইরাস দিয়ে টিকা তৈয়ারী হয়, মড়কের ভাইরাস যদি তা হতে পৃথক গোত্রের হয়, তবে টিকার কাজ খুব ভাল হবে না। সেইজন্য পৃথিবীর কোথাও নূতন ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস জন্ম নিচ্ছে কিনা, তা তাড়াতাড়ি জানবার জন্য বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা (World Health Organisation) নানাদেশে ইনফ্লুয়েঞ্জা-গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেছে।

ফ্লুর প্রায় সমপর্যায়ের অসুখ হচ্ছে 'কমন কোল্ড' (Common Cold), যাকে আমরা সর্দি বা সর্দিজ্বর বলতে পারি। এতে হাঁচি হয়, নাক দিয়ে খুব জল ঝরে, গা ম্যাজম্যাজ করে, তবে ইনফ্লুয়েঞ্জার মত জ্বর হয় না। এও তিন চার দিন পরে ভাল হয়ে যায়, যদি অন্যান্য ব্যাকটিরিয়া সর্দির সুযোগ নিয়ে নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি উপসর্গ না করে বসে। 'কমন কোল্ড'ও একটি ভাইরাস-জনিত অসুখ এবং আজ পর্যন্ত প্রায় পঁচাত্তর রকমের ভাইরাস ধরা পড়েছে এই অসুখে। সেগুলিকে রাইনোভাইরাস (Rhinovirus) বলে। অবশ্য এর সবগুলিই এই অসুখের কারণ কি না অথবা এদের কয়েকটি স্থায়িভাবে

গলায় ছিল, ঘটনাচক্রে ধরা পড়েছে, তা বলা যায় না। যাই হোক, এই অসুখেরও কোন প্রতিকারক ওষুধ নেই এবং ডাক্তার কেবল উপসর্গ কমাবার ওষুধ দিতে পারেন। এর প্রতি-রোধক টিকা আছে, সেটা বিশেষ কার্যকরী নয় বলে, এর বহুল প্রচার নেই। এখানে একটা কথা বলা দরকার যে, অনেক সময় 'এলার্জি'র (Allergy) জন্য হাঁচি, নাক দিয়ে জল পড়া প্রভৃতি হয়ে 'কমন কোল্ড'-এর মত দেখায়। অবশ্য সে ক্ষেত্রে এলার্জির ওষুধ দিলেই বেশ সুফল পাওয়া যায়।

উপরি-উক্ত দুটি অসুখই—যা লোকমুখে 'ফ্লু' নামে চলে, একই ভাবে বিস্তার লাভ করে। রোগীর হাঁচি, কাশি এমন কি কথা বলার সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থুতুর কণা বার হয়ে নিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে অন্যের শরীরে প্রবেশ করে। তার মধ্যে নিহিত থাকে অসংখ্য জীবপরমাণু। গলায় আট-চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে বংশবৃদ্ধি করে তারা রোগের সৃষ্টি করে। সেইজন্য পরিবারের মধ্যে এইসব রোগ এত তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। বাসে ট্রামে সিনেমা-হাউসে অনবরত এক হতে অন্যের মধ্যে এই অসুখের বিস্তার ঘটছে। আগে যে ডেঙ্গুজ্বরের উল্লেখ করেছি, তার ভাইরাস মশার কামড়ের দ্বারা ছড়ায়, সোজাসুজি এক হতে অন্যে যেতে পারে না। ডেঙ্গুজ্বরেরও কোন ওষুধ বার হয়নি।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, যাকে আমরা চলিত কথায় 'ফ্লু' বলি, তা আসলে ইনফ্লুয়েঞ্জা, কমন কোল্ড, ডেঙ্গু বা অন্য কোন ভাইরাস-জনিত অসুখই হোক না কেন, এর কোন প্রতিকারক ওষুধ নাই। সেইজন্য এই অসুখে তাড়াতাড়ি চিকিৎসকের কাছে না যেয়ে ধৈর্য ধরে তিন চার দিন অপেক্ষা করা অযৌক্তিক নয়। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে—অসুখটা যে 'ফ্লু' এবং অন্য কোন সাংঘাতিক রোগের সূত্রপাত নয়, সাধারণ লোক তা জানবে কি করে?

কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী প্রভানন্দ

দ্বিতীয় পর্ব

[পূর্বানুবৃত্তি]

কালীপ্রসাদ নীচে গিয়ে নরেন্দ্রনাথকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্বেগের বিষয় জানাতে চেষ্টা করেন। ভাবোন্মত্ত নরেন্দ্রর কানে সে-কথা পৌঁছায় কিনা সন্দেহ। অবশেষে জনকয়েক মিলে তাঁকে প্রায় জোর করে ধরে নিয়ে যান ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে। শ্রীরামকৃষ্ণ স্নেহ-বিগলিত কণ্ঠে তাঁকে বলেন: 'হ্যারে, তুই ওরকম কচ্ছিল কেন? ওতে কি হবে?' কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আবার বলেন: 'ভাখ, তুই এখন যেমন কচ্ছিস্ এমনি বারটা বছর (আমার) মাথার উপর দিয়ে ঝড়ের মতন বয়ে গেছে। তুই আর এক রাত্তিরে কি করবি বাবা!' (প্রমথনাথ বসু: স্বামী বিবেকানন্দ, প্রথম ভাগ, ৩য় সং, পৃ: ১০৬)

নরেন্দ্রনাথ ক্রমে প্রকৃতিস্থ হন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চিন্ত বোধ করেন।

১৪ই জানুআরি, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ। বৃহস্পতিবার,

ভগ্নানবমী, ২রা মাঘ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে দারুণ যন্ত্রণা। ভক্তগণ সকলেই উদ্বিগ্ন। ঠাকুরের শরীরের অবস্থা ও ভক্তদের উদ্বেগ অনুমান করা যায় মনোমোহন মিত্রের ১৪।১।৮৬ তারিখে লেখা পত্রাংশ হতে। তিনি তাঁর স্ত্রীকে লিখেছেন: '…আজ বাটী যাইতে পারিব না, প্রভুর পীড়ার অবস্থা বড় মন্দ। রামের পত্রপাঠে সমস্ত জানিতে পারিবে। আমার জন্য ভাবিও না—কবে বাটী যাইব জানি না।…পুনশ্চঃ …আমার সময় ভয়ানক মন্দ পড়িয়াছে নচেৎ প্রভু কেন আমাদের ছাড়িয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন।'

কাশীপুর বাগানবাটিতে পূর্ব পরিচিত শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর। ঘরে উপস্থিত কালাচাঁদ ডাক্তার প্রভৃতি। কালাচাঁদ ডাক্তার রাখালের এক আত্মীয়ের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয় শুনে তাঁকে দেখতে এসেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ: 'বেশ চোখ, যেন ঘাড় এমনি করে রয়েছে, প্রতিভা বুদ্ধি আছে।'

কালাচাঁদ: 'আজ্ঞে, আপনার নাম শুনতে পেরেছি [আপনাকে দেখতে এসেছি]।'

শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেন: '[রোগ] সারবে কি?'

কালাচাঁদ ডাক্তার তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন: 'এখনও সারতে পারে।'

কালাচাঁদ ডাক্তার বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হন। উপস্থিত একজন সেবক ডাক্তারকে লক্ষ্য করে বলেন: '[ওঁর] খাওয়াটা দেখে যান না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ: 'আর কষ্ট দেখে কি হবে।'

কালাচাঁদ ডাক্তার চলে যান। কিছুক্ষণ পরে মাষ্টার মশাই লক্ষ্য করেন তাঁর স্ত্রী নিকুঞ্জদেবী ঠাকুরের ঘরে বসে রয়েছেন।

নিকুঞ্জদেবী পুত্রের অকালমৃত্যুতে উন্মাদিনীপ্রায় হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ঠাকুরের আদেশে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমাতাঠাকুরাণীর কাছে কয়েকদিন বাস করেছিলেন। ক্রমে তাঁর হৃদয়ের জ্বালা দূর হয়েছিল, মন শান্ত হয়েছিল। কিন্তু মাঝে মাঝেই পুত্রশোকের স্মৃতি তাঁকে অস্থির করে তুলত। ইদানীং ঠাকুরের ব্যাধির অত্যধিক বাড়াবাড়ি। নিকুঞ্জদেবী একদিন স্বপ্নে দেখেছিলেন ঠাকুরের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তিনি আজ ঠাকুরকে দেখতে এসেছেন। মাষ্টার মশায় তাঁকে বলেন: 'তুমি যাও, নীচে [যাও]।'

শায়িত ঠাকুর নিকুঞ্জদেবীকে দেখতে পাননি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন: 'কে?'

মাষ্টার: 'বাড়ীর [লোকেরা]।'

শ্রীরামকৃষ্ণ: 'কে?'

মাষ্টার: 'পরিবারেরা'…

নিকুঞ্জদেবী নীচে নেমে শ্রীমায়ের কাছে যান। কিছুক্ষণ পরে ঘরে এসে ঢোকেন কিশোরী, তাঁর হাতে Smelling Salt-এর শিশি। নিকুঞ্জদেবীর জন্য এনেছিলেন বোধ হয়। মাষ্টার মশায় একান্তে কিশোরীকে বলেন: 'এখানে কেন? [এখানে নয়, নীচে]।'

কিশোরী চলে যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলে ওঠেন: 'কি কি?'

মাষ্টার: 'কিশোরী আপনাকে দেখতে এসেছিল। শুনেছে কিনা আপনার ব্যামো।' তিনি সত্য গোপন করেন।

সন্ধ্যা সাতটা। শীতের সন্ধ্যা, মনে হয় যেন রাত অনেক হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে উপস্থিত রামচন্দ্র দত্ত, নিত্যগোপাল, দেবেন্দ্রনাথ, দানা কালী, মাষ্টারমশাই প্রভৃতি। ঠাকুরের অসুখের বাড়াবাড়ি দেখে ভক্তদের অনেকেই বিষণ্ণ চিন্তাগ্রস্ত। বালকস্বভাব ঠাকুর নিজের গুরুতর পীড়ার যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে ভক্তদের নিয়ে হাসির মজলিস বসান। ভক্তগণ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণ দেখে বিস্মিত হন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কপটভক্তি

নকল করে দেখান এবং বলেন :—'[দেখনি, বাড়ীর গিন্নী সামনে এসে ব'সে বলে] ঐ আলুটি খাও। আহা তুমি কি কিছু খেলে না।' শ্রীরামকৃষ্ণ কান্নার নকল করে দেখান।

ঠাকুরের শরীর জীর্ণ শীর্ণ। গলা দিয়ে স্বর প্রায় বের হয় না। তাঁর সুপটু অভিনয় দেখে ঘরে হাসির ফোয়ারা ছুটে। শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বলেন : [···বাড়ীতে দেখনি ? পরিবারের মেয়েদের কাণ্ড। খাবার সময় সামনে এসে বসবে।] হাতে কুলি। [আর বলবে] ঐটে খাও [এটা একটু নাও]'। ভক্তদের, বিশেষতঃ যুবক ভক্তদের হাসির ফুৎকারে বিষাদের কুয়াসা সাময়িকভাবে হলেও অপসৃত হয়। লীলারসিক কোন কোন ভক্ত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত লীলাবিলাস দেখে মুগ্ধ হন। ভাবেন, অবতারপুরুষের আচরণ-বিচরণ সত্যই দুরধিগম্য।

কিছুক্ষণ সময় চলে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন : '[ঈশ্বর] বিষয়াতীত'। পরে বলেন : 'রামদত্ত ডাক্তার, মাথায় পাগড়ী দিয়ে কর্ম করে, সে ঠিক বলেছে [আমি] ঈশ্বর।'

দৈব ও দৈববাণীর প্রসঙ্গে কথা ওঠে। শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলেন : 'এখন আর জপাদি [হয় না। ঈশ্বরীয় রূপ প্রভৃতি] কিছুই দেখি না। কেবল দেখি অখণ্ড তাঁর মধ্যে এই সব রয়েছি।'

রামচন্দ্র প্রশ্ন করেন, 'তাহলে দর্শনাদি কি মিথ্যা ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ : 'না, সব মিথ্যা কেন ?'

রামচন্দ্র ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের ঘটনাবলীর সঙ্গে পরিচিত। তিনি ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনেছেন তাঁর অলৌকিক দর্শনাদির কাহিনী। ভক্তিপথের সাধক রামচন্দ্রের মনে সংশয় জেগেছে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সে সংশয় নিরসন করেছেন রামচন্দ্রের রুচি ও বোধসামর্থ্যানুযায়ী।

রামচন্দ্র : 'এখন দৈবীকার্য হয় না কেন ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ : '[ওসব] সাধকাবস্থায় হয়।

'[যেমন] যখন পঞ্চবটীতে বাঁকারির ঝাড় দরকার হ'ল পেলাম।

'[আবার] যখন বললাম মা রামধন যেন সেধে কথা কয়, অমনি হ'ল। এখন আর [এসব] কেন ?'

পাঠকের বোধ-সৌকর্যার্থে প্রথম ঘটনাটি স্বামী সারদানন্দের ভাষাতেই উদ্ধৃত করা যেতে পারে। 'সাধনকালে ঠাকুরের স্বহস্তরোপিত পঞ্চবটীর চারাগাছগুলি ছাগল-গরুতে মুড়াইয়া খাইয়াছে দেখিয়া ঐ স্থানের চতুর্দিকে ঠাকুরের বেড়া দিবার ইচ্ছা হওয়া এবং তাহার কিছুক্ষণ পরেই গঙ্গায় বান ডাকিয়া ঐ বেড়া নির্মাণের জন্য আবশ্যকীয় যত কিছু দ্রব্যাদি কতকগুলি গরাণের খুঁটি, বাখারি, নারিকেল দড়ি, মায় একখানি কাটারি পর্যন্ত -- সেইগুলি ভাসিয়া আসিয়া লাগা ও তাঁহার কালীবাটীর ভর্তাভারি নামক মালির সাহায্যে ঐ বেড়া নির্মাণ···।'

দ্বিতীয় ঘটনাটির উল্লেখ পাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের মধ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'বিশ্বাসেই সব হয়। আমি বলতুম অমুককে যদি দেখি, তবে বলি সত্য। অমুক খাজাঞ্চি যদি আমার সঙ্গে কথা কয়। তা যেটা মনে করতুম. সেইটেই মিলে যেত।' (কথামৃত ২।৬।৪)। কামারপুকুরের অদূরবর্তী দেশড়া গ্রামের রামধন ঘোষ রাণী রাসমণির একজন সুদক্ষ কর্মচারী ছিলেন। কর্মদক্ষতায় ইনি রাণীর সুনজরে পড়েছিলেন এবং ক্রমে দেওয়ান পর্যন্ত হয়েছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একবার ইচ্ছা হয়েছিল মানী রামধন ঘোষ তদানীন্তন সামান্য বেতনভোগী মন্দিরের পূজারী তাঁর সঙ্গে যেচে কথা বলবেন। শ্রীজগদম্বা তাঁর সে-ইচ্ছা পূরণ করেন।

আবার শোনা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতময়

বাণী। তিনি বলেন: '[তবে] তিনি [ঈশ্বর] কি অধীন? যে এমন কর বল্লেই এমন, আর অমন কর বল্লেই অমন [করবেন]?'

শ্রীরামকৃষ্ণ বহু প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ঈশ্বর তাঁর মায়া দিয়ে সব কিছু ঢেকে রেখেছেন; সেই মায়া সত্যবস্তুকে জানতে দেয় না।

ঠাকুরের পথ্য আহারের সময় হয়েছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দুধ-সুজি আহারের চেষ্টা করেন। অনেক চেষ্টাতেও প্রায় কিছুই আহার করতে পারেন না। এই সময়কার ঠাকুরের আহার সম্বন্ধে শ্রীমা পরবর্তী কালে বলেছিলেন: 'এক একদিন নাক দিয়ে গলা দিয়ে সুজী বেরিয়ে পড়ত —অসহ্য কষ্ট হত।' সেবকেরা ঠাকুরের আহার দেখে হতাশ হন। তাঁরা বোঝেন না কি করবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বোধ করি সেবকদের সান্ত্বনা দেবার জন্যই বলেন যে শরীর ক্ষণ-বিধ্বংসী। একটু পরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: 'কি করবেন তিনি? কিনা সুজী ময়দা থেকে হয়, তাই পেটে ঢুকছে না।'

বোধ হয়, রামচন্দ্র প্রমুখ ভক্তদের উৎসাহিত করার জন্য তিনি আবার বলেন: 'দেখছি সারতেও পারে, না সারতেও পারে।' আশা-নিরাশার আলো-আঁধার ভক্তগণের মানস-পটে বিচিত্রভাবের সৃষ্টি করে। ঠাকুর শ্রীরাম-কৃষ্ণের ব্যাধি তাঁদের অনেকেরই মনে হয় রহস্যময়, কিন্তু তাঁদের সকলেরই একান্ত আকাঙ্ক্ষা যেকোন উপায়ে মাধুর্যময় ঠাকুরের দেহের কষ্টের নিবৃত্তি হোক। সেজন্য তাঁদের চেষ্টারও বিরাম নাই।

রাত্রি গভীর হয়। ঠাকুরের রোগের অত্যধিক বাড়াবাড়ি। গৃহী ভক্তদের কয়েকজন বাগানবাড়ীতে রাত্রিযাপন করেন। সকলেরই হৃদয়ে উদ্বেগ, মনে উৎকণ্ঠা, মুখে আতঙ্কের ছায়া।

মাঘ মাসের শীত। কিন্তু ঠাকুরের শরীরে তীব্র জ্বালা। মশারির ভিতর বসে শায়িত ঠাকুরকে পাখার বাতাস করেন সেবক শশী। মশারির বাইরে মাষ্টার বসে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেন, 'কে?' উত্তর পেয়ে মাষ্টারকে মশারির ভিতরে ডাকেন। মাষ্টার ভিতরে যান। শ্রীরামকৃষ্ণ ক্ষীণকণ্ঠে বলেন: 'ঘুম হচ্ছে না,—এতবার বাহ্য হল তবু কি তিনভাগ শ্লেষ্মা? এমন ঔষধ নেই যাতে ওটা যায়?'*

---

* ৭৬তম বর্ষের উদ্বোধন পত্রিকায় 'কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ' এবং 'রামকৃষ্ণ মঠে প্রথম কালী-পূজা' প্রবন্ধ দুইটির মধ্যে মাষ্টার মশায়ের ডায়েরী ইত্যাদি হইতে কিছু কিছু অংশ বিচ্ছিন্নভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। সেগুলি মিলাইয়া দেখা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। সেগুলির আক্ষরিক যাথার্থ্যের জন্য আমরা দায়ী নই।—সঃ

সমালোচনা

অতীতের স্মৃতি (স্বামী বিরজানন্দ ও সমসাময়িক স্মৃতিকথা) : স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রণীত : উদ্বোধন কার্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা —৭০০-০০৩ থেকে প্রকাশিত : পৃষ্ঠা ৩৯৫ + ৪৩ + ১৭ : তৃতীয় সংস্করণ (ফাল্গুন, ১৩৮১) : মূল্য ১৩'৫০ টাকা মাত্র।

গ্রন্থের প্রতিটি সংস্করণই কিছু-না-কিছু উন্নয়ন সাধনের সুযোগ এনে দেয়। গ্রন্থকার এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করলে তবেই সংস্করণটি সার্থক হয়ে উঠতে পারে। এদিক দিয়ে 'অতীতের স্মৃতি'র তৃতীয় সংস্করণ সত্যিই সার্থক এবং বলা যায় যে, এখানেই সংস্করণটির সমালোচনার সার্থকতা। কারণ, সাধারণত প্রথমোত্তর সংস্করণের কোন সমালোচনা করা হয় না।

গ্রন্থখানি ঠিক জীবনী নয়, আবার ইতিহাসও নয়— একজন সাধারণোত্তর পুরুষকে কেন্দ্র করে সমসাময়িক ঘটনার আলেখ্য রচনা। কিন্তু সমসাময়িক সমাজদর্শনের দিক দিয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমান তৃতীয় সংস্করণে কিছু কিছু নতুন তথ্য ছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের কয়েকজন বিশিষ্ট সন্ন্যাসীর সংক্ষিপ্ত পরিচায়িকা প্রদান করা হয়েছে। এর দরুন গবেষণার দিক দিয়ে গ্রন্থখানির যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে এবং তাঁকে কেন্দ্র করে যে আধ্যাত্মিক আন্দোলন চলেছে, সে-সম্পর্কে গবেষণা করবার আর কিছু নেই— এরকম ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

শুধু গবেষণার জন্যে নয়, অতি সুখপাঠ্য বলে গ্রন্থখানি বহু প্রচারের দাবি রাখে। তা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে বিখ্যাত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের সম্বন্ধে জ্ঞানের যে ফাঁক তা পূরণের বিশেষ সম্ভাবনাও গ্রন্থটির মধ্যে নিহিত। এই দুর্মূল্যের বাজারে দাম মোটেই বেশী নয়, তা পৃষ্ঠাসংখ্যা এবং কাগজ-ছাপা-বাঁধাই-এর দ্বৈত মাপকাঠিতে তুলনা করলেই বোঝা যাবে।

ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ ও স্বামী কৈলাসানন্দজী মহারাজ ১লা এপ্রিল ১৯৭৫ হইতে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহাধ্যক্ষ (ভাইস্-প্রেসিডেন্ট) নির্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব

বেলুড় মঠে গত ১লা চৈত্র ১৩৮১, ১৫ই মার্চ ১৯৭৫, শনিবার শুভ শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪০তম জন্মতিথি আনন্দময় ভাবগম্ভীর পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারাত্রিক বেদপাঠ ও উষাকীর্তন এবং পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজা হোম শ্রীশ্রীচণ্ডী-পারায়ণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ পাঠ ও আলোচনা কালীকীর্তন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ শোভাযাত্রা কীর্তন ও জয়ধ্বনি করিতে করিতে মঠ প্রদক্ষিণ করে। রহড়া বালকাশ্রমের বালকগণ বিভিন্ন ধর্মের ইষ্টদেবতার প্রতিকৃতি সহ তত্তৎ ধর্মোচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সর্বধর্ম সত্য-রূপ মহান ভাবের প্রতীক এক অনুপম শোভাযাত্রা সহকারে মঠ-প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণে তাহাদের ভক্তি-শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে। মধ্যাহ্নে প্রায় ২৫,০০০ নর-নারায়ণ হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। ২৩শে সাধারণ উৎসবে ৩০,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

১৫ই অপরাহ্নে মঠ-প্রাঙ্গণে আয়োজিত ধর্মসভায় স্বামী ভাষ্যানন্দ, শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার ও স্বামী চিদাত্মানন্দ (সভাপতি) ভাষণ দেন। উদ্বোধনী ও সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীবাণীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

স্বামী ভাষ্যানন্দ বলেন: বন্ধুগণ, সর্বাগ্রেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ভক্ত শত শত নারী ও পুরুষ, যাঁরা চিকাগো কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের অভিনন্দন আমি আপনাদের জানাচ্ছি। গত ২রা ফেব্রুআরি চিকাগো কেন্দ্রে আমরা স্বামীজীর জন্মোৎসব পালন করেছিলুম। পরদিন আমি ভারতের উদ্দেশে রওনা হই। সেদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যপূজার পর শত শত ভক্ত এসে আমাকে অনুরোধ করলো, আমি যেন বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুর মা ও স্বামীজীর চরণে তাদের ভক্তিপ্রণতি নিবেদন করি, শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব যাতে সুষ্ঠুভাবে পালিত হয় সেজন্য তাদের প্রার্থনা এবং এখানকার ভক্তদের জন্য অভিনন্দন যেন আমি বহন করে নিয়ে যাই। আমি বল্লুম: 'হ্যাঁ, আমি অবশ্যই সানন্দে তা করবো।' আজকের এই অপরাহ্নে আমি সেই অভিনন্দনই আপনাদের জানাচ্ছি।

ক্রমবিকাশের পথে মানুষের যখন আত্মসচেতনতা জাগলো, তখন থেকেই সে তিনটি প্রশ্ন করে আসছে: (১) আমি কে? (২) কোথা থেকে এসেছি? (৩) কোথায় যাবো? এই প্রশ্ন তিনটি মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে করে এসেছে এবং তার উত্তরও পেয়েছে। সেই উত্তরগুলিই সাধারণতঃ ধর্ম ও দর্শন নামে অভিহিত।

ভারতবর্ষে আমরা দেখি, এই সব প্রশ্ন, তাদের উত্তর ও আলোচনা কোনও বিশেষ প্রতিষ্ঠানভুক্ত ধর্মের অন্তর্গত হয়নি। তবু দেখি, যথার্থ জিজ্ঞাসুরা আসছেন, একত্রে গিয়ে আচার্যের কাছে প্রশ্ন করছেন—যেমন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শুরুতেই জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে: কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা / জীবাম কেন ক্ব চ সংপ্রতিষ্ঠাঃ—ব্রহ্মই কি জগতের কারণ? আমরা কোথা থেকে জাত হয়েছি? স্থিতি ও প্রলয়-কালে আমরা কিসে অবস্থান করি?

আমরা দেখি, এই সব জিজ্ঞাসু ও তাঁদের আচার্যের মধ্যে পারস্পরিক গভীর সম্প্রীতি, লক্ষ্য করি তাঁদের পবিত্রতা ও সত্যানুসন্ধিৎসা। ক্রমে তাঁরা এই সব প্রশ্নের গভীরে প্রবেশ করেন। আরও প্রশ্ন জাগে: কাল স্বভাব নিয়তি আকস্মিক ঘটনা পঞ্চভূত ইত্যাদি জগতের কারণ হতে পারে কিনা? ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে তপস্যা ও আত্মশুদ্ধিও চলতে থাকে। ফলে, ধ্যানযোগে তাঁরা সমাধান পেলেন যে, অদ্বিতীয় পরমাত্মার স্বাত্মভূতা ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিই জগতের কারণ।

উপনিষদগুলিতে এই সব প্রশ্ন বারংবার হতে দেখা যায়। কঠোপনিষদে নচিকেতা যমরাজকে বলছেন: যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে/অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে/এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহহং / বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ।—মানুষ মরে গেলে, এই যে সংশয় উপস্থিত হয়—কেউ বলেন, আত্মা থাকেন, কেউ বলেন, থাকেন

না—আপনার উপদেশে আমি এই আত্মবিদ্যা জানতে চাই। বরসমূহের মধ্যে এই আমার তৃতীয় বর।

সাধনপ্রণালী হিসাবে সব জিজ্ঞাসুই সত্য ও তপস্যা অবলম্বন করেছিলেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে: তপো ব্রহ্মেতি—তপস্যাই ব্রহ্ম। বাস্তবিক প্রকৃত তপস্যা ও আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই। দার্শনিক আলোচনার সঙ্গে সমান তালে তপঃপূত জীবনচর্যা না চললে এই সব প্রশ্নের সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনেও আমরা দেখি এই অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা আর তার সঙ্গে সঙ্গে তপঃ-পূত একটি পবিত্র মন। দেখি, দক্ষিণেশ্বরে জগন্মাতাকে নিয়ে আর একটি শুদ্ধ মন নিয়ে তিনি সেই প্রাচীন জিজ্ঞাসাই চালিয়ে যাচ্ছেন। কোনও সম্প্রদায়গত মতবাদ নয়, কোনও বিশেষ ধরনের জীবনযাত্রা, আচার-অনুষ্ঠান নয়—তাঁর চাই সত্যকে; জগন্মাতার কাছ থেকে সরাসরি তিনি তাঁর সব আধ্যাত্মিক প্রশ্নের উত্তর চান। মাসের পর মাস তীব্র ব্যাকুলতায় কেটে গেছে—জগন্মাতাকে ছাড়া সব তিনি ভুলেছেন, সব অর্থহীন মনে হয়েছে। চাই শুধু জগন্মাতার দর্শন। মার দেখা বোধ হয় কোন কালেই পাবো না—ভেবে যন্ত্রণায় তিনি ছট্‌ফট্ করতে লাগলেন—তারপর যখন মায়ের অসি দিয়ে জীবনাবসান করতে চাইলেন, তখন মা অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃসমুদ্ররূপে দর্শন দিলেন। এইভাবে উপনিষদে যে জিজ্ঞাসা, তপস্যাসহায়ে যে তত্ত্বনির্ণয়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনেও তা অভূতপূর্বভাবে রূপায়িত হতে দেখি।

তবুও তাঁর জিজ্ঞাসার অন্ত ছিল না। একের পর আর ধর্মগুরুরা তাঁর কাছে আসতে লাগলেন। এলেন জটাধারী, এলেন ভৈরবী ব্রাহ্মণী, এলেন তোতাপুরী। জগদম্বার প্রথম দর্শনেই তিনি যে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, এঁদের কাছে শিক্ষা পেয়ে এবং সাধনা করে তিনি সেই সত্যেরই নূতন করে সমর্থন পেলেন। জানলেন যিনিই সাকার, তিনিই নিরাকার, যিনিই সগুণ, তিনিই নির্গুণ, শক্তিই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই শক্তি—সত্য একমেবাদ্বিতীয়ম। তারপর এই তত্ত্ব তিনি বিশ্ববাসীকে জানালেন। খ্রীষ্টধর্ম ও মুসলমানধর্ম সাধন করেও তিনি একই সত্যে উপনীত হয়েছিলেন—ঈশ্বর আছেন, বহু নামে তাঁকে ডাকা হলেও, তিনি এক এবং অদ্বিতীয়।

যে তত্ত্ব তিনি জগৎকে দিয়ে গেছেন, তা মুখ্যত: চারটি ভাগে বিভক্ত:

(১) ঈশ্বর আছেন—তিনিই একমাত্র সত্তা। যে তাঁকে অবিশ্বাস করে সে নিজেরই সত্তাকে অবিশ্বাস করে। ঈশ্বর সাকার ও নিরাকার উভয়ই। সাকাররূপে তিনি আমাদের পিতা, মাতা ইত্যাদি।

(২) প্রত্যেকটি জীবই সচ্চিদানন্দস্বরূপ। মানুষ স্বরূপত: পাপী নয়। তাকে নিজের স্বরূপের জ্ঞান লাভ করতে হবে, নচেৎ জীবনই বৃথা।

(৩) বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক। পার্থক্য যা দেখা যায়, তা মনেরই সৃষ্টি। কোশাকুশি থালা ঘটি বাটি সবই চিন্ময়।

(৪) সব ধর্মই সত্য। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম একটিই অনেক নয়। যেমন আল্লা গড্‌ ঈশা কালী সব এক ঈশ্বরেরই বিভিন্ন নাম, সেই রকম ধর্মগুলিরও নাম আলাদা আলাদা হলেও, তাদের বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে ভেতরের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়—ধর্ম একটিই।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই উদার ভাব পাশ্চাত্য দেশবাসীদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে ও করছে। আমি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে থেকে এর যথেষ্ট পরিচয় পাচ্ছি। আপনারা শুনে বিস্মিত

হবেন যে, ক্যাথলিক চার্চেও আমাকে 'Mass' অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে দিয়েছে এবং খ্রীষ্টান ধর্মযাজকরাও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করছেন। একটা প্রচণ্ড পরিবর্তন ওদেশে আসছে—যদিও তা ধীরে ধীরে। একজন ক্যাথলিক ধর্মযাজককে আমি কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গের ইংরাজী অনুবাদ-গ্রন্থ দুটি পাঠ করতে বলেছিলুম। তা পাঠ করে কয়েক বছর পরে তিনি বলেছিলেন—'স্বামীজী, আমি আমার সব প্রশ্নের জবাব শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে পেয়েছি।' বাস্তবিক, তাঁর উপদেশ শুধু হিন্দুদের খ্রীষ্টানদের বা মুসলমানদের জন্য নয়—তাঁর উপদেশ সকল জাতির সকল ধর্মের লোকেরই জন্য—অনাগত কালের সকল মানুষের জন্য।

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার বলেন: শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ঈশ্বর যদিও সর্বত্র আছেন, তবু ভক্তের হৃদয় তাঁর বৈঠকখানা। আজকে এই শুচিশুভ্র স্নিগ্ধ বৈঠকখানায় এসে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আমার প্রণাম নিবেদন করতে পারছি—এটি আমার পরম সৌভাগ্য।

ঠাকুর বলতেন, 'যাবৎ বাঁচি, তাবৎ শিখি'—আমাদের সারাজীবনই শিখতে হয়, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই শেখার কোন শেষ নেই। কিন্তু এই শেখাটা কি পুঁথির ভেতর দিয়ে শেখা? না, ধীরে ধীরে নিজেকে আবিষ্কার করে শেখা?—সেইটি আজকে আমাদের বিশেষ করে ভাবিয়ে তুলছে। পুঁথি তো আমরা অনেক পড়েছি, বহু শাস্ত্রের টীকা টিপ্পনী ভাষ্য তৈরী হয়েছে—কিন্তু তাতে পৃথিবীর মানুষের কতটুকু অভ্যুদয় ঘটেছে, কতটুকু নিঃশ্রেয়স লাভ হয়েছে? আজকে সারা পৃথিবীতে এইটিই প্রশ্ন।

মানুষে মানুষে বিভেদ—মানুষের মনের ভেতরে অবিশ্বাস হিংসা দ্বন্দ্ব সন্দেহ—এমনভাবে বাসা বেঁধেছে যে, আজকে সারা পৃথিবীর চিন্তাশীল মানুষ এই সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা করছেন। আজকে সভ্যতা এবং সংস্কৃতির যে সঙ্কট, যে বিপর্যয়ের মধ্যে আমরা বাস করছি—তাতে প্রত্যহ আমরা এইটাই ভাবছি যে, যদি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না হয়, তাহলে মানব-সভ্যতা একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে এবং এরই জন্যে নানারকমের প্রচেষ্টা হয়েছে। আমরা দেখেছি লীগ অব নেশনস্, আমরা দেখেছি ইউনাইটেড নেশনস্—আমরা বহু সংস্থা দেখেছি—কিন্তু এখনও পৃথিবীর মানুষ নিশ্চিন্ত হতে পারেনি, তার মনে নিরাপত্তাবোধ জাগেনি। সেই জন্যে আজকে সারা পৃথিবীতে আর একটি আন্দোলন, আর একটি ভাবধারা, আর একটি চিন্তা পরিব্যাপ্ত হয়েছে,—চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া মানুষের মনকে যা আকৃষ্ট করছে—সেইটিকে বলা হয়ে থাকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আন্দোলন বা ভাবধারা।

আমরা সেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুগের ভেতর বাস করছি, সেই চিন্তাধারায় আমরা অবগাহন করছি, সেই চিন্তা আমাদের দিনের চিন্তা এবং রাতের স্বপ্ন হয়ে উঠেছে। এটা শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র—যে-কথা একটু আগে স্বামী ভাস্বানন্দজীর বক্তৃতার শেষাংশে শুনলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের প্রাক্‌কালে, ধর্ম আমাদের প্রাত্যহিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। আমরা দেখতে পাচ্ছি, দুটি ভিন্ন ধারার—একটি ভক্তি এবং একটি জ্ঞানের—মধ্যে বিরোধ ছিল। যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা ভক্তদের হয়তো একটু অবজ্ঞা করতেন, যাঁরা ভক্ত তাঁরা জ্ঞানীদের বলতেন যে, এঁরা আকাশচুম্বী কোন একটা অবস্থার মধ্যে রয়েছেন—পৃথিবীর সঙ্গে কোন যোগ নেই। আমরা দেখেছি, তখন খ্রীষ্টানরা কিভাবে হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করেছেন। আবার ব্রাহ্মধর্মের পত্র-পত্রিকায় কিভাবে খ্রীষ্টধর্মকে পাল্টা আক্রমণ করা হয়েছে। এই যে একটা যুগসন্ধিক্ষণ, সেই সময়

শ্রীরামকৃষ্ণ একটি অস্ত্র ধারণ করলেন। তাঁর কোন ডিবেটিং ক্লাব ছিল না, তাঁর দল ছিল না, প্রেস ছিল না, ছাপাখানা ছিল না, কিছুই ছিল না। যে অস্ত্রটি তিনি ধারণ করলেন, সেটির নাম 'প্রেম'। এই প্রেমের দ্বারা সতত বিবদমান যে ধর্ম, তারই মধ্যে একটি সামঞ্জস্য আনলেন। কিন্তু সেটা শাস্ত্রের ভাষ্য করে নয়, সেটা তাঁর সমস্ত জীবনকে উন্মোচিত করে। সেই জীবনে দিনের পর দিন যে পরীক্ষা চলল, সেই পরীক্ষার মূলে কিন্তু একটি মাত্র সত্য। সেই সত্যটি হল মা, জগজ্জননী—ভবতারিণী কালীকে তিনি বার বার বলছেন, 'মা, আরেকটা সন্ধ্যা কেটে গেল, তুই দেখা দিলিনি? —আমি যদি তোর দেখা না পাই, তাহলে আমার এই জীবন তোর এই খড়্গ দিয়ে শেষ করব।'

এই যে আকুল আর্তি মাকে দেখবার, মার সঙ্গে কথা কইবার, মার কাছে আত্মনিবেদন করবার,—এই আকুল আর্তি কিন্তু নিজের ব্যক্তি-মুক্তির জন্য নয়। নিজেকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে নয়। তারই প্রমাণ পাচ্ছি, যে মুহূর্তে তিনি মায়ের দর্শন পেলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই সম্পদকে জগতে বিলিয়ে দেবার জন্যে আবার ব্যাকুলতা। সন্ধ্যারতির সময় কুঠীর ওপর থেকে আকুল আমন্ত্রণ ছড়িয়ে দিয়েছেন আকাশে বাতাসে— 'ওরে তোরা কোথায় আছিস্, আয়! তোদের না দিয়ে, তোদের না দেখে তো থাকতে পারছিনে।'

ঈশ্বর আছেন। যদি তোমার ধর্ম ভুলও হয় —শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—তাহলে আন্তরিকভাবে সমস্ত আত্মাকে সেখানে সমর্পণ করে নিষ্ঠার সঙ্গে তুমি সাধনমার্গে এগিয়ে যাও। যদি ভুল হয়, সে ভুল তিনি একদিন সংশোধন করবেন— তোমার সে-দায়িত্ব নেবার প্রয়োজন নেই। একথা আর কোন ধর্মগুরুর মুখে আমরা কখনও শুনিনি। নোতুন একটি দৃষ্টিভঙ্গি আমরা পেলাম।

কিন্তু যে-কথাটা নিয়ে আমি শুরু করেছিলাম যে, আজকে জগতে যে শংকা, আজকে জগতের যে দ্বন্দ্ব, আজকে মানুষের মধ্যে যে অবিশ্বাস, মানুষের মধ্যে যে মৈত্রীর অভাব, সেটা শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা গ্রহণ করলে দূর হবে কি? এই প্রশ্ন। আজকে পাশ্চাত্যদেশে বহুলোক এই প্রশ্ন করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণ করেছেন। সামান্য কয়েকটি কথা বলে, আমি যেভাবে বুঝেছি, সেইটিই নিবেদন করব।

যেমন Paul Tillich-এর কথা বলছি। তিনি একজন খ্রীষ্টান, তাঁর নানা বই-এর ভেতরে, তাঁর Systematic Theology এবং অন্যান্য বই-এর ভেতরে বার বার এই একটি কথাই বলছেন, যে-কথা শ্রীরামকৃষ্ণের কথার প্রতিধ্বনি বলে মনে হবে। বলছেন, 'ঈশ্বরই তো বস্তু আর সব অবস্তু'। মানুষের জীবনের একমাত্র অভীষ্ট, একমাত্র লক্ষ্য ঈশ্বরকে পাওয়া। কিন্তু লক্ষ্য করুন, পাশ্চাত্য theology-র মতো এখানে ঈশ্বর আছেন কি না, সে-প্রমাণ দেবার কোন প্রয়াস নেই। কেন, প্রমাণ দেব কি,—আমি যে মায়ের সন্তান, মাকে কি আমি প্রমাণ করি? না, মা সন্তানকে চিনতে পারেন না—প্রমাণের অপেক্ষা রাখেন! যখন ভালবাসাই একমাত্র প্রমাণ, তখন অন্য কোন প্রমাণ লাগে না।

Paul Tillich বলেছেন, আমরা being বা সত্তার কথা যখন বলি তখন এটা তর্কবিদ্‌দের বা দার্শনিকদের খেলার বস্তু নয়। 'It is not a toy to play with.' এই being বা সত্তার অনুভূতি হয়েছে যুগে যুগে মরমী সাধকদের - mysticদের। সেইটি সব চাইতে বড় সাক্ষী—বড় প্রমাণ—সংশয়াতীত প্রত্যয়। এর চাইতে বড় কথা কিছু নেই এবং সেইটিই মানুষের অভীষ্ট, মানুষের লক্ষ্য।

সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য যাঁরা ক্রিশ্চিয়ান্ থিওলজিস্ট,

তাঁরা প্রশ্ন করেছেন যে, হিন্দুর অবতারবাদের সঙ্গে আমাদের এখানেই প্রভেদ, এখানে আমরা মিলতে পারছিনে যে, হিন্দু যেমন বহু অবতারের কথা বলেন, আমরা তেমনি যীশুখ্রীষ্টকে একমাত্র অবতার বলে মানি। তাঁকে অবলম্বন না করলে —তিনি সেতু ; সেই সেতুকে না ধরলে—ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না, এ-কথা আমরা বলি। কিন্তু কথাটা একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে—খ্রীষ্টধর্ম এবং হিন্দুধর্ম, এর মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। প্রভেদ নেই এইজন্যে যে, যাঁরা বহু অবতার মানেন তাঁদের কাছে কাল বা সময় গতিশীল। অর্থাৎ মানুষ কালের ভেতরে নয়—যে মানুষ সচ্চিদানন্দস্বরূপ। কাল বা সময় তাঁরই ভেতরে। সেইজন্যে বহু অবতারের কথা হতে পারে, কিন্তু আমরা Christian Theology-তে কালকে স্থিতিশীল Static বলে বুঝেছি, তাই একটিমাত্র অবতার মেনেছি। কিন্তু যদি Jesus Christ এবং Christ Consciousness এ-দুটিকে আলাদা করে নেওয়া যায়, তাহলে তোমাদের উপনিষদে যাকে তুরীয় অবস্থা বলেছে, আমাদের Christ Consciousnessও ঠিক সেই অবস্থা। সেই দিক থেকে যদি নোতুন অনুশীলন হয়, নোতুন অনুধ্যান হয়, নোতুন আবিষ্কার হয়, তাহলে এতকাল খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের যে বৈষম্য, যে পার্থক্য তোমরা দেখেছ, সে পার্থক্য বা বৈষম্য আর থাকবে না। Tillich আরও বলেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের Gospel পড়বার পরে আমাদের এই ধরনের দৃষ্টি এসেছে। যে জন্যে বলছিলাম যে, আমরা আজকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুগের মধ্যে বাস করছি।

একজনের কথা বললাম। ঠিক আর একজন লেখকের কথা বলছি—হালে একখানা বই আপনারা হয়তো অনেকে দেখে থাকবেন, God of All by Stark. God of All বইতে প্রশ্ন করেছেন, যাঁদের সন্দেহ তাঁরা বলছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ মাত্র তিনদিনের জন্যে মুসলমান হয়েছিলেন, চারদিনের জন্য খ্রীষ্টান হয়েছিলেন। অত সহজে কি ইসলাম খ্রীষ্টিয়ানিটি বোঝা যায় ? সমস্ত জীবন ধরে তিনি যদি সাধনা করতেন তাহলে বুঝতাম।

প্রশ্ন করেছেন যে, তাঁর তো প্রথমেই নির্বিকল্প সমাধি হয়েছে—অদ্বয়ভূমিতে তিনি বিচরণ করেছেন ; সে আস্বাদ তো তিনি পেয়েই গিয়েছেন। কাজেই নোতুন করে আবার ইসলাম সত্য, খ্রীষ্টধর্ম সত্য এ-বোধ আসবার অবকাশটা কোথায় ? অবকাশ তো নেই। কেননা যিনি যে-ভূমিতে আরোহণ করেছেন, সেখান থেকে যদি সবই সমান দেখে থাকেন, তাহলে আবার নোতুন করে এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তিনি গেলেন কেমন করে, আর এই যে সাম্য তাকে তিনি প্রমাণই বা করলেন কেমন করে ?

এই প্রশ্নের জবাবে Stark লিখেছেন যে, এইখানে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির ভুল। আমরা খণ্ড দৃষ্টি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, logic দিয়ে সেইটি বিচার করবার চেষ্টা করছি, যেটা বুদ্ধির অতীত —যেটা logic বা তর্ককে অতিক্রম করে গিয়েছে, সেইদিকটাকে আমরা দেখছি না। যে কথা ঠাকুর বার বার বলেছেন, পাঁজিতে বিশ আড়া জল লেখা আছে ; কিন্তু পাঁজির পাতা নিঙ্ড়োলে সে-জল বেরুচ্ছে না। তবলায় যে বোল তোলা হয়—তেরে কেটে তাক্—এ মুখে বলা সোজা, কিন্তু বোলটা তোলা অভ্যাসের ব্যাপার—অনুশীলনের ব্যাপার। সেই অনুশীলন এবং অভ্যাস যদি আমি করি, সে তিনদিনই হোক আর চারদিনই হোক—সেখানে দিনটা বড় কথা নয়, সেখানে বড় কথা, সত্য আমার কাছে কি ভাবে উদ্ভাসিত হচ্ছে ; আমি যেহেতু অদ্বয় ভূমিতে ইতিমধ্যে এসে পড়েছি, সেজন্যে কালের

যে বন্ধন, কালের যে ভাগ, division, সেটা আমাকে আর কোন রকমভাবে বাধা দেয় না। এবং এই যে অনুভূতি বা অনুভব এটা কিন্তু mystic, এটা অতীন্দ্রিয়, এটা অপরোক্ষানুভূতি, এটা যুক্তি-তর্কের রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে গিয়েছে। কাজেই যুক্তিতর্কের দ্বারা এটা যে বোঝাবো, সেটা সম্ভব হয় না।

আজকে দিন এসেছে, ডাক এসেছে, রামকৃষ্ণ-যুগের। একবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা যাক পৃথিবীতে শান্তি মৈত্রী এবং ভ্রাতৃত্ব আর একবার আনা যায় কি না। ঠাকুরের কথাই স্মরণ করছি, কৃপা বাতাস বইছে, তুই পাল তুলে দে। পালটা কিন্তু আমাকে প্রযত্ন করে, প্রচেষ্টা করে তুলে দিতে হবে। কিন্তু মনে রাখবেন, অনুকূল বাতাস বইছে। ঠাকুর আছেন, শুধু আপনার আমার জন্যে নয় পৃথিবীর সকল মানুষের জন্যে। এই বিশ্বাসের বর্ম বুকে রেখে যদি আমরা এগিয়ে যাই, তাহলে পৃথিবী থেকে হানাহানি-হাহাকার, অবিশ্বাস-সন্দেহ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং সংকট দূর করতে পারব। জগৎ আবার আনন্দময় সত্তা হয়ে উঠবে। তখন বলতে পারব, তিনিই সব হয়েছেন।

স্বামী চিদাত্মানন্দ বলেন : দুটি সুন্দর ভাষণ ঠাকুরের সম্বন্ধে শুনলাম। কেমন করে ঠাকুরের ভাবধারা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে, সমস্ত ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে, সর্বলোকের কল্যাণ সাধন করছে, সে-কথা স্বামী ভাস্করানন্দ এবং অমিয়বাবু সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বললেন।

ঠাকুরের প্রসঙ্গ করতে ও শুনতে আমরা বহু স্থানে এই ভাবে মিলিত হই বহুবার বহুদিন থেকে এবং তাঁর সম্বন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা আলোচনাদি করি ও শুনি। যতবারই আমরা এইভাবে সম্মিলিত হই, আমাদের মনে হয় যেন আমরা আমাদের নিজেদের আরও শক্তিসম্পন্ন করছি; আমাদের মনে হয় যেন আমাদের কিছু একটা এমন জিনিস লাভ হল, যার অভাব আমাদের মধ্যে এতদিন ছিল। কেন এরকমটা আমাদের মনে হয়? সেই কথাই এখুনি আমরা শুনলাম অন্য ভাবে। মানুষ যতক্ষণ না স্বরূপে স্থিত হয়, ততদিন অভাবের একটা অনুভূতি তার মধ্যে থেকেই যায়। এবং এই অভাবের অনুভূতি আমাদের সত্যি সত্যি আধ্যাত্মিক অনুভূতি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই এই শাশ্বত অভাবটি—জিজ্ঞাসাটি চিরকাল ধরে রয়েছে, যে-কথা স্বামী ভাস্করানন্দজী বললেন। এই যে শাশ্বত জিজ্ঞাসা, এইটিই আমাদের সত্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। স্বামীজী তাই বলছেন, এই অভাবের অনুভূতি, এই feeling of want-এর দ্বারাই সর্বকালের জন্য, আমাদের সকল অভাব সর্বভাবেতে দূরীভূত হতে পারে।

ঠাকুর, স্বামীজী, মা বার বার আমাদের বলে দিয়ে গেলেন 'বাপু, কিছু কর!' এই 'করা'র তিনটি ধাপ—(১) শ্রোতব্য (২) মন্তব্য (৩) নিদিধ্যাসিতব্য।

শ্রোতব্য— ধর্মের কথা শুনতে হবে। অনেক কথা শুনছি। আমি কি করে কোন্ কথাটা আমার কাজে লাগাব—'মন্তব্য'—চিন্তা করতে হবে। অপরের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে, নিজের অল্প বুদ্ধিতে যদি আমরা বিচার করে ঠিক করতে না পারি—কোন্‌টা আমি গ্রহণ করব আর কোন্‌টা আমি ছাড়ব। আমার পক্ষে কোন্‌টা ভাল, আর কোন্‌টা ভাল নয়, কোন্ পথে গেলে আমার সুবিধা বা অসুবিধা, এসব আমাদের চিন্তা করতে হবে, বিচার করতে হবে। সেইজন্য 'শ্রোতব্য, মন্তব্য' খুব ঠিক, কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা 'নিদিধ্যাসিতব্য'। ঠাকুর তাই বার বার বলেছেন, 'তাঁতে মগ্ন হও—ডুবে যাও, আমি ষোল টাং করেছি, তোমরা এক টাং কর; করে তার পরে বল যে, আমি যা বলছি তা সত্যি

না মিথ্যা; আমি যা বলছি তা ঠিক না বেঠিক।' তাই, করে দেখতে হবে আর তাহলেই যে অভাব নিরন্তর আমাদের কষ্ট দিচ্ছে, আপাত-সুখের মধ্যে, আপাতসম্পদের মধ্যে, আপাত-সর্বপ্রকার প্রাপ্তির মধ্যে, তা দূরীভূত হবে। ধন জন পুত্র কন্যা সম্পদ নাম যশ সবই আমাদের রয়েছে, কিন্তু তার মধ্যেও মন যেন কেঁদে কেঁদে উঠছে—বলছে 'হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে!' এই অভাব মিটে যাবে যদি আমরা সৎ-চিৎ-আনন্দের সঙ্গে যোগযুক্ত হতে পারি।

ঠাকুর নিজে বলেছেন, ওরে, আমি পড়াশুনা করিনি, এ কথা ঠিক, কিন্তু আমি অনেক শুনেছি। কোথায় শুনলেন তিনি? শুনেছেন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার পরে দক্ষিণেশ্বরে যখন তিনি ছিলেন। দেশ দেশান্তরের বহু পণ্ডিত সাধু দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। মা নিয়ে এসেছেন যাঁকে দরকার তাঁকে, তাঁর কাছে। তাঁদের সঙ্গে তিনি শাস্ত্রচর্চা করেছেন, নানারকম আলোচনা করেছেন, তাঁদের নানা সন্দেহ ভঞ্জন করেছেন। বেদান্ত যখন চর্চা হচ্ছে, তিনি বলেছেন, দিনরাত কেটে যাচ্ছে সেই এক চর্চায়। অসুস্থ শরীর তবু সেই আলোচনা চলেছে। অনেক তিনি শুনেছেন, অনেক তিনি চিন্তা করেছেন, তা আমরা কথামৃত পড়লেই বুঝতে পারি। কিন্তু আসল তিনি যেটি করেছেন নিজ জীবনে সেটি হল 'নিদিধ্যাসন'। প্রথম বার বছর তাঁর জীবন সাধনাময় জীবন। আর সেই সাধনা করার সঙ্গে সঙ্গে মা তাঁকে সাহায্য করেছেন। তাই ঠাকুর যে সব কথা বলেছেন তা সোজা কথা, সাদা কথা। মনে হয় যেন আমাদের পাশে বসে ঘরের লোক, নিতান্ত আপন জন, পরম হিতৈষী কথা বলছেন। ঠাকুরের কথা শুনলে, ঠাকুরের কথা পড়লে, ঠিক এই কথা মনে হয়। বাইরের কোন লোক বলছে, platform-এ দাঁড়িয়ে ছুটো মাইক লাগিয়ে কেউ বক্তৃতা দিচ্ছে, ঠাকুরের কথা শুনলে, পড়লে সে-কথা মনে হয় না। তিনি বলেছেন হয়তো মাষ্টার মশাইকে, শশধর পণ্ডিতকে, বঙ্কিমবাবুকে বা কেশব সেনকে; কিন্তু আমি যখন পড়ি, মনে হয় যেন আমাকেই সেই কথাটি বলছেন। ঠাকুর যেন নিতান্ত আমার জন্যই এসেছেন এবং আমাকেই এই কথাটি বলছেন। এটি কেন মনে হয়? এটি মনে হয় এইজন্য যে, ঠাকুর সর্বকালের সর্বভাবে ভাবান্বিত মানুষের জন্য এসেছেন। আর তিনি সব সময় মূল কথাগুলি বলতেন যা সকলের basic কথা, basic প্রশ্ন। সঙ্গে সঙ্গে আবার তত্ত্বকথাও আছে, বেদান্তের কথা আছে, উচ্চ বেদান্তের কথা।

আমাদের শিক্ষা দেবার জন্য, আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি, বর্তমান অবস্থার মধ্যে আমরা কেমন ক'রে ঈশ্বরকে পাবো, তা বোঝাবার জন্যই ঠাকুর এত সাধনা করলেন, এত ভাবে তিনি ঈশ্বরকে পেতে চেষ্টা করলেন। তাঁর নিজের কোন প্রয়োজন ছিল না। তিনি অদ্বৈতসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। সেখানেতে তো তিনি সব দেখেছিলেন এক। তিনি নিজে বলেছেন, উপরে উঠে গেলে তেঁতুল গাছ, নিম গাছ, আম গাছ সব এক হয়ে যায়, কোন ভেদ থাকে না। তিনি সেই অভেদের স্থিতিতে গিয়েছিলেন। তাঁর আবার এত সাধনা করবার কি প্রয়োজন ছিল? এই জন্য ছিল যে, তিনি অনেক কথা বলবেন অনেক লোকের জন্য, যে লোক সেই অদ্বৈতস্থিতিতে পৌঁছতে পারেনি, যারা ভেদাভেদের পারে যেতে পারেনি, যারা ছোট ছোট grooves-এর মধ্যে নিজেদের বদ্ধ করে রেখেছে, যারা একটি ভাবে ভাবিত হয়ে মতুয়ার বুদ্ধির মধ্যে বদ্ধ হয়ে রয়েছে দুর্ভাগ্যবশতঃ। সেইজন্য ঠাকুর এসেছিলেন সকলকে সব কথা বলবার জন্য। সেই জন্য তিনি সর্বভাবের সাধনা করলেন। আর

বললেন কি? বললেন, ওরে, আমি যা বলছি, আমি শুধু শুনেই বলছি না, আমি শুধু ভেবেই বলছি না, আমি শুধু বিচার করেই বলছি না, আমি আমার অনুভূতি থেকে বলছি। ঠাকুর সব কথা তাঁর অনুভূতির দৃঢ় ভূমিতে দাঁড়িয়ে তবে বলেছেন। কোন কথা এমন তিনি বলেননি যে-কথা তাঁর অনুভূতি থেকে নয়।

ঠাকুর বললেন, ঈশ্বর সত্য, তিনি রয়েছেন; তাঁর অনন্ত নাম, তাঁর অনন্ত ভাব; আর তাঁকে পাবার অনন্ত রাস্তা। অনেক ভাবে তাঁর কাছে যাওয়া যায়। এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া যায়, এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া যায় না, এমন নয়। কী আশ্চর্য ব্যাপার ঠাকুরের দেখুন! এমন অনেক রাস্তা আছে, যে-রাস্তা ধর্ম-রাজত্বে সত্যি সত্যি বড় ছোট রাস্তা—পতনের ভয় সেখানে খুব বেশী—আমাদের ধর্মে এমন সব নানা রকম সাধন-পথ রয়েছে। ঠাকুর সেগুলোকে 'রাস্তা নয়' বলছেন না। সেগুলোও রাস্তা, কিন্তু সেগুলো নোংরা রাস্তা; যেমন বাড়ীর ভিতরে ময়লা সাফ করবার রাস্তা হয়, সেই রকম রাস্তা। রাস্তা সেগুলোকেও বলছেন। মজা দেখুন! এ কথা তিনি বললেন না, 'না ওগুলো মিথ্যে, ছেড়ে দাও, ঐ সাধনা একেবারে ভুল সাধনা।' আমি যা বলছি এটাই ঠিক, এটাই কর—যা চিরকাল আগে আগে বলে এসেছে, আমারটা ঠিক আর সকলেরটা ভুল। ঠাকুর সে-কথা বললেন না। বললেন, সবই ঠিক; তবে তোমার পক্ষে কোনটা ঠিক তুমি সেটা ঠিক করে নাও, তুমি সেইখানে চল। অনন্ত নাম তাঁর, অনন্ত ভাব তাঁর, তাঁকে পাবার অনন্ত পথ। তাঁর কাছে যাবার চেষ্টা করো। জ্ঞান ভক্তি কর্ম—যে-পথ উপযোগী মনে করো, সেই পথেই এগিয়ে যাও। তবে শর্ত একটি করে দিলেন। সে শর্তটি কি? সেটি হচ্ছে আন্তরিকতা। 'ভাবের ঘরে চুরি কখনও কোরো না'—বার বার ঠাকুর এই কথা বলেছেন। 'নিজের কাছে ঠিক থাক, মন মুখ এক রেখে কাজ কর; দেখবে সব হবে।'

ঠাকুরের প্রথম সাধনা—অনুরাগের সাধনা। তিনি কি ব্রহ্মসূত্র পাঠ করছেন ভাষ্যাদির সঙ্গে?—তা তো করছেন না; কিংবা গীতার নানারকম ভাষ্য টীকা পড়ছেন?—তা তো পড়ছেন না। উপনিষদ পাঠ করছেন? না; শুধু মাকে বলছেন, মা তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারছি না; তুমি আমায় বলে দাও কেমন করে তোমায় পাবো। বলছেন, আমি মন্ত্র জানি না, পুজো জানি না, উপচার জানি না মা, তুমি আমায় কৃপা করে দেখা দাও; বলে দাও আমি কেমন করে তোমায় ডাকব। মা বলে দিলেন। এই হচ্ছে ঠাকুরের পূজা। আমাদের মধ্যে তো ভগবানকে পাবার অত ইচ্ছা, বা আকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহ নেই; তাই আমাদের শুনে বিশেষ করে সেই জিজ্ঞাসা জাগাতে হবে। আমাদের সেই জন্য শোনা দরকার ঠাকুরের কথা। ভাবা দরকার ঠাকুরের কথা; লীলাপ্রসঙ্গ, কথামৃত সব সুন্দর বই, সেই সৎসঙ্গ আমাদের করা উচিত, ঠাকুরের কথা পড়া ও চিন্তা করা উচিত। আমাদের মধ্যে জিজ্ঞাসা, আর্তি, ভগবানকে পাবার ইচ্ছা, এইগুলোকে বর্ধিত করতে হবে। নানা রকম অভাব অভিযোগের মধ্যেও, নানা রকম বাধা বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও এই কথা বার বার মনকে বলতে হবে, দেখ বাপু, এতেই সব হবে না—যদি সত্যি সত্যি আনন্দ চাও, শান্তি চাও, শাশ্বত সুখ চাও, দুঃখের পারে যদি সত্যি যেতে চাও, তবে ভগবানকে ধরতে হবে। কিন্তু একেবারে ত আমরা ছাড়তে পারছি না। ঠিক আছে, সে-কথাও ঠাকুর বলে গেছেন,—যতটুকু পার ততটুকু কর; তারপরে দেখবে তোমার ইচ্ছা যদি ঠিক হয়, আর্তি সত্য হয়, আকাঙ্ক্ষা যদি বাস্তবিক হয়,

ভগবানই সব সুযোগ করে দেবেন, সব দুর্যোগ তিনি কাটিয়ে দেবেন, সকল রকম সাহায্য তিনি এনে দেবেন তোমার সাধনপথে। তখন দেখবে নৌকো তোমার তরতর করে এগিয়ে চলেছে কৃপা বাতাসে ভর করে। যে-কৃপা বাতাস শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় এখন বইছে। পাল আমাদের তুলতে হবে চেষ্টা আমাদের করতে হবে। এই সাধন, এই হচ্ছে ভজন। ঠাকুর আমাদের সেই কথাই বলে গেলেন।

তাঁর জীবন থেকে যতটুকু পারি শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের নিজেদের জীবনে তা কর্মে পরিণত করবার চেষ্টা করতে হবে। এই হচ্ছে ঠাকুরের প্রতি ভক্তি। এই হচ্ছে তাঁর উপর বিশ্বাস। তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে তিনি সে-প্রার্থনা শুনবেন, পথ তিনি বলে দেবেন।

আজ এই মহা পবিত্র দিনে ঠাকুর দয়া করে তাঁর শ্রীচরণের ছায়ায় আমাদের এনেছেন, তাঁর কথা ভাববার ইচ্ছা তিনি আমাদের মধ্যে জাগ্রত করেছেন। প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের মনকে সুসংস্কৃত করুন; আমাদের মধ্যে যে সমস্ত মালিন্য রয়েছে সে সমস্ত তিনি দূর করে দিন। তাঁর কথা আমরা যেন আরো বেশী করে চিন্তা করতে পারি এবং তিনি যে-বস্তুটি বলে গেছেন সেই বস্তুটি লাভ করে আমরা যেন তাঁর কৃপায় কৃতকৃত্য হতে পারি।*

উৎসব

ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মঠে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের শুভ আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে গত ১৩ই হইতে ১৬ই ফেব্রুআরি পর্যন্ত চারদিন-ব্যাপী বার্ষিক উৎসব পালিত হয়:

১৩ই ভোরে মঙ্গলারতি ও ভজন; পূর্বাহ্নে পূজা শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভক্তিমূলক সঙ্গীত ও 'ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ' হইতে পাঠ করা হয়। দ্বিপ্রহরে প্রায় দুই হাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান। অপরাহ্নে শ্রীরাধানাথ রথের সভাপতিত্বে জনসভা হয়। ভাষণ দেন স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ, ও শ্রীরামচন্দ্র পণ্ডা। সভান্তে ধন্যবাদ জানান শ্রীসুনীল চন্দ্র পালিত।

১৪ই বিবেকানন্দ-দিবস পালিত হয়। স্বামী নিরাময়ানন্দের সভাপতিত্বে আহূত এক জনসভায় ভাষণ দেন শ্রীসীতাকান্ত মহাপাত্র, প্রধান অতিথি শ্রীকালিন্দীচরণ পানিগ্রাহী, পদ্মভূষণ। সভান্তে ধন্যবাদ জানান ডাঃ ঘনশ্যাম মহাপাত্র ও সমাপ্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করেন ভুবনেশ্বর কলাকেন্দ্র।

১৫ই উদ্‌যাপিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণ-দিবস। এই দিন স্বামী ত্রিগুণাতীতের জন্মতিথিপূজাও ছিল। অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত জনসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ। স্বামী ত্রিগুণাতীত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটি হিন্দী ভাষণে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাষণ দেন ডঃ কৃষ্ণপ্রসাদ মিশ্র ও প্রধান অতিথি শ্রীরজনাথ মিশ্র। ধন্যবাদ প্রদান করেন—শ্রীবিনোদ ত্রিপাঠী। সভান্তে ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

১৬ই ছিল শ্রীশ্রীমায়ের দিবস। শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে এই দিনের জনসভায় বলেন শ্রীমতী স্নেহময়ী মহাপাত্র, অধ্যাপিকা মনোরমা মহাপাত্র এবং শ্রীসুনীল চন্দ্র পালিত—শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের কয়েকটি চিত্র তাঁহারা ব্যাখ্যাসহ সুললিত ভাবায় তুলিয়া ধরেন। সভাপতি স্বামী নিরাময়ানন্দ বলেন, শ্রীশ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজই করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের জীবনব্রত ছিল অভিন্ন।

---

* ভাষণ তিনটি শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত ও শ্রীসমীরকুমার রায় কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত। অনুলিখিত ভাষণগুলি সংকেপিত আকারে মুদ্রিত। প্রথম ভাষণটি মূল ইংরাজী হইতে বাংলায় অনূদিত।—সঃ

সভাশেষে ধন্যবাদ জানান শ্রীনাগরী মোহন পট্টনায়ক।

সভার পরে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের ছাত্ররা 'ভীষ্মশরশয্যা' গীতিনাট্য অভিনয় করে।

মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের নবনির্মিত শ্রীমন্দিরে গত ১৫ই মার্চ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪০তম জন্মোৎসব ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যূষে মঙ্গলারতি, বেদপাঠ ও পরে বিশেষ পূজা পাঠ ও হোম অনুষ্ঠিত হয়। সকালে স্বামী রামানন্দ কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং সন্ধ্যায় ডক্টর গোবিন্দ-গোপাল মুখোপাধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পরে সুরশিল্পী শ্রীঅমিয়কুমার দাস রামায়ণ গান করেন। পরদিন সন্ধ্যায় শিল্পী রথীন ঘোষ ও সম্প্রদায় সুমধুর কীর্তন গান করেন। ২৩শে মার্চ 'নরনারায়ণ' সেবা হয়। সন্ধ্যায় ধর্মসভায় স্বামী মুমুক্ষানন্দ ভাষণ দেন। সভাশেষে পশ্চিমবঙ্গ লোকরঞ্জন সংস্থার সদস্যবৃন্দ কর্তৃক তরজা গান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানসমূহে প্রভূত লোকসমাগম হইয়াছিল এবং প্রায় ৬ হাজার ভক্ত নরনারী অন্ন প্রসাদ পান।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

শিকড়া কুলীনগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দ আশ্রমে গত ৩০শে মাঘ বৃহস্পতিবার (১৩।২।৭৫) স্বামী ব্রহ্মানন্দের পুণ্য জন্মভূমিতে স্বামী ব্রহ্মানন্দের ১১৩তম জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। পূর্বাহ্ণে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা ও হোম এবং শ্রীশ্রীমহারাজের বাল্যলীলা-ভবনে শ্রীশ্রীচণ্ডীপূজা ও পাঠ হয়। আশ্রম-প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত মণ্ডপে স্থানীয় সুর-শিল্পিবৃন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশন রহড়া বালকাশ্রম কর্তৃক সকাল হইতে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা পর্যন্ত ভজন, কীর্তন ও শ্রীশ্রীরামনাম-সংকীর্তন পরিবেশিত হয়। পূর্বাহ্ণে শ্রীশ্রীঠাকুর মা স্বামীজী ও মহারাজের পুষ্পমাল্যদামে সুসজ্জিত প্রতিকৃতি লইয়া স্থানীয় স্কাউট দল ও স্কুলের ছাত্রছাত্রীসহ প্রায় এক সহস্র নরনারী ব্যাণ্ড বাদ্য ও ভজন কীর্তনের মাধ্যমে পল্লী পরিক্রমা করেন। বেলা ১২টা হইতে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা পর্যন্ত আশ্রমসংলগ্ন শ্রীশ্রীদুর্গাবাড়ীর বিশাল প্রাঙ্গণে প্রায় পাঁচ সহস্র নরনারায়ণকে বসাইয়া খিচুড়ি ও পায়েস প্রসাদ পরিতোষ সহকারে ভোজন করানো হয়। অপরাহ্ণ সাড়ে চার ঘটিকায় শ্রীমৃগাঙ্কমোহন সুরের পৌরোহিত্যে ধর্মসভার অধিবেশন হয়। প্রধান অতিথি স্বামী রমানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবনের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করেন। সভায় সুরশিল্পী শ্রীভূপেন চক্রবর্তী উদ্বোধন সঙ্গীত ও অধ্যাপক শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সন্ধ্যারতির পর সহস্র সহস্র নরনারীর সমক্ষে রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দির কর্তৃক 'ঠাকুর হরিদাস' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় ও রাত্রে কালীপূজা হয়।

পশ্চিম রাজাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ কর্তৃক গত ৯ই ফেব্রুআরি, বাঘাযতীন পাবলিক হলে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব পালিত হয়। উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীবৈদ্যনাথ দাস। সভাপতিত্ব করেন শ্রীতনু পাল। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন—অধ্যাপক সমর গুহ, অধ্যাপক ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা ও শ্রীতুষার বসু। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক ও ভক্তি-মূলক সংগীত পরিবেশন করেন- শ্রীসুখময় রায়, শ্রীসজল চক্রবর্তী ও শ্রীমতী যূথিকা দত্তের ছাত্রী-বৃন্দ। সঙ্গতে ছিলেন শ্রীঅরূপ চক্রবর্তী। পরিশেষে শ্রীহরিপদ গোস্বামী ও সহ-শিল্পিগণ কর্তৃক বিবেকানন্দ-গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

ভাগলপুর যোগসরস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪০তম জন্মতিথি উপলক্ষে গত মার্চ মাসে দুইদিনব্যাপী উৎসবে প্রাতে মঙ্গলারতি ও ভজন এবং সায়াহ্নে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন। বক্তৃতাশেষে বিশিষ্ট কলাবৎগণ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সভাশেষে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দ পুরী সকলকে ধন্যবাদ জানান। উৎসবের দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্নে স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ মন্দির-ভবনের দ্বিতলে পরিকল্পিত শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তি-প্রতিষ্ঠার স্থানে পূজা করেন।

পাণ্ডু (গৌহাটি) বিবেকানন্দ পাঠচক্রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব মহাসমারোহে পালিত হয়। ১২ই মার্চ ভোরে মঙ্গলারাত্রিক, পূর্বাহ্নে ষোড়শোপচারে পূজা হোম এবং সন্ধ্যায় আরাত্রিক, কথামৃত পাঠ ও কালীকীর্তন হয়। ২১শে মার্চ শ্রীসুধীর কুমার চৌধুরী রামায়ণ গান করেন। ২২শে স্থানীয় কলেজ ও স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর বিষয়ে আবৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতা হয়। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের কথা আলোচনা করেন শ্রীযুক্তা রেণু বসু, স্বামী অমলানন্দ ও ডাঃ কে. শর্মা। রাত্রে রামায়ণ গান করেন শ্রীসুধীর কুমার চৌধুরী। ২৩শে শ্রীশ্রীঠাকুরের মঙ্গলারাত্রিকের পর বিশেষ পূজা ও গীতা পাঠ হয়। পরে নামকীর্তন ও 'নিমাই সন্ন্যাস' পালা কীর্তন হয়। ঐদিন প্রায় ছয় হাজার ভক্ত প্রসাদ পান। সান্ধ্য আরাত্রিকের পর শ্রীশম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন শ্রীনিমাই চন্দ্র মহাপাত্র, প্রফেসার শ্রীনিখিলেশ পুরকায়স্থ, স্বামী অমলানন্দ ও স্বামী প্রণবাত্মানন্দ মহারাজ। ২৪শে মার্চ সান্ধ্য আরাত্রিকের পর শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন শ্রীভবানী সরকার, শ্রীআশুতোষ গিরি ও স্বামী অমলানন্দ। পরে স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ছায়াচিত্রের সাহায্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন।

উত্তর কলিকাতায় অখিল ভারত নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ১৪, ১৫, ও ১৬ মার্চ ভগিনী নিবেদিতার স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ই এণ্টালীর সারদা শিশু বিদ্যাভবনে শিক্ষণ-শিবিরের উদ্বোধন করা হয়। ১৫ই সকালে শিক্ষার্থিনীরা বেলুড় মঠ ও সারদা মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মতিথি উৎসবে যোগদান করেন এবং শিবিরের সান্ধ্য অধিবেশনে 'আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষ' ও 'আজকের দিনে বিবেকানন্দ কি প্রাসঙ্গিক?'—এ দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। ১৬ই বিবেকানন্দ সোসাইটি ভবনে ব্রতী সংঘের বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। সকালে বিবেকানন্দ রোডে বিবেকানন্দ-মূর্তির পাদদেশে ব্রতী মেয়েরা জমায়েত হন। পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘ-পতাকা উত্তোলিত হয়। এরপর তাঁরা পদব্রজে স্বামী বিবেকানন্দের পৈত্রিক বাসভবন দর্শনে যান। সোসাইটি ভবনে সঙ্ঘের প্রভাতী অধিবেশন শুরু হয় উপনিষদ পাঠ ও ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে। এই সম্মেলনে সারাদিন ধরে যেসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, তার মধ্যে শিক্ষার্থীদের বক্তৃতা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ও শিশুদের নাটকাভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৈকালে নিবেদিতার স্মরণ-সভায় ভক্তিগীতি পরিবেশিত হয় ও সঙ্ঘ সভানেত্রী ডঃ রমা চৌধুরী প্রমুখ বক্তাগণ ভাষণ দেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত। সর্বশেষে রামায়ণ গান হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ব্রতী বোনেরা ও নিবেদিতা স্কুলের ছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

কলিকাতাঃ গত ১ ই মার্চ, 'অন্তরঙ্গ' সমিতির বিভাগীয় কার্যালয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪০তম শুভ আবির্ভাব উৎসব পরম ভক্তির

সহিত উদ্‌যাপিত হয়। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্যামলী দাঁ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত হইতে পাঠ করেন শিবনাথ চক্রবর্তী, রাধাকিশোর বসু ও বংশী দে। বহু বিশিষ্ট বক্তা শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। 'খণ্ডন ভব-বন্ধন' সমবেত কণ্ঠে গীত হয়। উপস্থিত সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীমোহিনী মোহন দাঁ।

বড় আন্দুলিয়া লোকসেবা শিবির কর্তৃক গত ২৬শে ফেব্রুআরি হইতে নয়দিন ধরিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের সম্মুখস্থ মাঠে সাড়ম্বরে গদাধরের মেলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্বামী রমানন্দ মেলার উদ্বোধন করিয়া পরমহংসদেবের জীবন-দর্শন বিষয়ে আলোচনা করেন। মেলার বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠান-সূচীতে ছিল ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা যাত্রা-প্রতিযোগিতা লোকসঙ্গীত কবি-সম্মেলন নাট্যাভিনয় তরজা গান এবং ছায়াচিত্র প্রদর্শনী।

হুগলী জেলা বিবেকানন্দ সঙ্ঘ কর্তৃক গত ২রা ফেব্রুআরি হইতে ২রা মার্চ পর্যন্ত পূর্ব-নির্ধারিত কার্যসূচী অনুযায়ী জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে পালিত হইয়াছে।

ধানবাদ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে ২.২.৭৫ তারিখে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব মহাসমারোহে মঙ্গলারতি চণ্ডীপাঠ পূজা হোম ভজন এবং প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে পালিত হয়। বৈকালে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ এক বিরাট শোভাযাত্রা গ্রাম পরিক্রমা করে।

এই উপলক্ষে ৯ই ফেব্রুআরি অপরাহ্নে শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে এক ধর্মসভায় ডঃ সি. ঠাকুর, শ্রীহীরা প্রসাদ, স্বামী শিবাত্মানন্দ ও অন্যান্য বক্তাগণ স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন এবং সাঁওতালি ভাষায় রচিত স্বামীজীর জীবনী ও বাণী সংকলিত পুস্তিকা আদিবাসী জনতার মধ্যে বিতরণ করা হয়।

ফলতা (২৪ পরগনা) শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমন্দিরে রবিবার ১৬ই মার্চ, শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি উৎসব মহাসমারোহের সহিত পালিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী পূজাপাঠ ভজন-কীর্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দুই হাজার ভক্ত নরনারী ও দরিদ্র-নারায়ণ প্রসাদ পান। স্থানীয় এবং দূরাগত ভক্তগণ উৎসবে সানন্দে যোগদান করেন। গ্রামাঞ্চলের যুবকবৃন্দ শ্রমদান করিয়া উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলেন।

খিদিরপুর "সুরবিতান" গত ১৬ই মার্চ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের আবির্ভাবতিথি উৎসব উপলক্ষে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বন্দনা'-শীর্ষক এক আকর্ষণীয় ভক্তিমূলক সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। শিল্পী শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু এটি প্রযোজনা ও পরিচালনা করেন ও ভাষণ দেন।

পূর্ণিয়া (বিহার): গত ১৫ই মার্চ, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে পরমহংসদেবের ১৪০তম শুভ জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। প্রত্যুষে মঙ্গলারতি ও উষা-কীর্তন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় ৭০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। সমস্ত দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের ও অন্যান্য ভক্তি-মূলক গান পরিবেশিত হয়। সন্ধ্যারতির পর 'ছবি ঘোষাল সঙ্গীত' সংস্থার সভ্যগণ কর্তৃক কীর্তন ও ভক্তিমূলক গান পরিবেশিত হয়। সর্বশেষে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী বিজয়ানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ করেন।

আলিপুরদুয়ার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৫ই মার্চ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১০০তম জন্ম-তিথি মঙ্গলারতি বিশেষ পূজা হোম ভজন কথামৃত পাঠ ইত্যাদির মাধ্যমে পালিত হয়। দুপুরে প্রায় এক হাজার ভক্তকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাগীতি পরিবেশন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত-সমাজ, আলিপুরদুয়ার।

কলিকাতা গোয়াবাগান সারদামাতা উদ্যানে স্বামী বিবেকানন্দের ১১৩তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতির উদ্যোগে গত ১২ই জানুআরি হইতে ১০ই ফেব্রুআরি পর্যন্ত ৩০ দিনব্যাপী বিবেকানন্দ মেলার অনুষ্ঠান হয়। এই মেলায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বহস্ত-লিখিত স্বাক্ষরের প্রতিলিপি, স্বামী বিবেকানন্দের সমসাময়িক দেশী ও বিদেশী শিষ্যশিষ্যাদের চিত্র, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ লিখিত 'ধর্ম' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের ছবি, রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত-লিখিত বিবেকানন্দ সম্বন্ধে প্রশস্তি-লিপি, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদামাতা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ঘটনাবলী অবলম্বনে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর অঙ্কিত দুষ্প্রাপ্য চিত্রাবলী, বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর স্বহস্ত-লিখিত ভগিনী নিবেদিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা-লিপির ছবি, প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীটি সর্বশ্রী ধীরাজ বসু, সুনীল ঘোষ ও অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর সহায়তায় পরিচালিত হয়। বিবেকানন্দ কেন্দ্র, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য, কারা এবং কুটীর শিল্প বিভাগও এই মেলার বিভিন্ন স্টলে শিক্ষামূলক এবং আকর্ষণীয় দ্রব্য প্রদর্শন করেন।

বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রতিদিনই সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদামাতা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন।

গীতি-আলেখ্য, পাঁচালী, ভক্তিমূলক সঙ্গীত, যাত্রা, নাটক, তর্জা, যোগব্যায়াম, শরীরচর্চা, ম্যাজিক প্রভৃতির অনুষ্ঠানে বহুলোক আকৃষ্ট হন। এই মেলায় শিশু-উৎসব, ছাত্রদিবস ও যুবদিবসও উদ্‌যাপিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন যাত্রাদল, ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ ও বেতার শাখা প্রভৃতি বিভিন্ন দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আরারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪০তম শুভ জন্মোৎসব ১৮ হইতে ২০ মার্চ পর্যন্ত বিশেষ পূজা, পাঠ, হোমাদি এবং অষ্ট-প্রহর নাম-সংকীর্তন, ভাগবত পাঠ ও ধর্ম-সভাধিবেশনের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন সভাপতি স্বামী বিবিক্তানন্দ ও স্বামী প্রভানন্দ।

পরলোকে মন্মথনাথ রায়

বিগত ১২ই মাঘ, ১৩৮১ সন, ইং ২৬.১.৭৫ ভক্ত মন্মথনাথ রায় রামকৃষ্ণ নাম করিতে করিতে তাঁহার নবদ্বীপের বাড়ীতে ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। মন্মথবাবু বোলপুর শান্তিনিকেতনে অধ্যয়নরত থাকাকালে জয়রাম-বাটীতে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর নিকট হইতে মন্ত্র-দীক্ষা লাভ করেন। তিনি পূর্ববঙ্গের টাঙ্গাইল মহকুমার আলিসাকান্দা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। টাঙ্গাইল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মন্মথবাবু প্রতি বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসবে বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী মহারাজগণকে লইয়া যাইয়া উৎসবকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিতেন। নবদ্বীপ শ্রীরাম-কৃষ্ণ সেবা সমিতি তাঁহার পরিচালনা ও অক্লান্ত চেষ্টায় বিশেষ উন্নতি লাভ করে। বারাসাত শ্রীরামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও তিনি নানাবিধ ধর্মীয় ও জনহিতকর কার্যে যোগদান করিয়াছেন।

পরলোকে শশীভূষণ রায়

গত ১৫ই জানুআরি, ১৯৭৫ রাত্রি ১টায় শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য, ডাক্তার শশীভূষণ রায় ৭৩ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের নাম করিতে করিতে হৃদ্‌রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন।

১৬।১৭ বৎসর বয়সে তিনি পূজ্যপাদ সারদানন্দ মহারাজের কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে ইঁহাদের দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক, এই প্রার্থনা।

[পুনর্মুদ্রণ]

উদ্বোধন

[১ম বর্ষ] ১৫ই শ্রাবণ। (১৩০৬) [১৪শ সংখ্যা]

জৈমিনি ও কর্ম্মমীমাংসা।

(পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

যে বেদের নামে বামদেব, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র প্রভৃতি অতি প্রাচীন মহর্ষিবৃন্দের হৃদয়তন্ত্রী ঝঙ্কার দিয়া উঠিত, বেদব্যাস, জৈমিনি, গৌতম, পতঞ্জলি প্রভৃতি মধ্যযুগের মহর্ষিবৃন্দ যে বেদের অনুশীলনে সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়াও বেদের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হইলাম না বলিয়া আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন; দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, অসীম অভিনিবেশ ও ঐকান্তিক বিশ্বাস সহকারে যে বেদের নিরন্তর অনুশীলন করিয়া মহামুনি বেদব্যাস মহাভারতরূপ অমৃতময় ফল আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; যে বেদের সার হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে অগ্রে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ প্রভৃতি দুরবগাহ শাস্ত্রসমুদ্রের দীর্ঘকালব্যাপী অনুশীলন একান্ত প্রয়োজনীয়, যে বেদের একাংশ উপনিষদের গুটিকয়েক বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া জগতের সর্ব্বপ্রধান দার্শনিক পণ্ডিতগণ মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনের দুর্লক্ষ্য সিদ্ধান্তসমূহের সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, দর্শন বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ যে বেদসমূহের অন্তর্নিহিত সমুজ্জ্বল রত্ন বলিয়াই প্রাচীন ভারতে ইহা সবিশেষ গৌরবের পাত্র হইয়াছিল, পারলৌকিক বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সভ্য হিন্দুসমাজ পরলোকের স্পৃহনীয় ফল লাভ করিবার জন্য যে বেদ ছাড়া অন্য কোন উপায়ের প্রতি একবারও দৃক্‌পাত করিত না, জর্ম্মনী ফ্রান্স বা ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত সংস্কৃত ভাষার নূতন ধরণের ব্যুৎপত্তির বলে যাস্ক সায়ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণের দুষ্প্রবেশ গ্রন্থরাশির পারমন্থন করিয়া নবাবিষ্কৃত বেদানুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে সেই বিরাট সর্ব্বজ্ঞানময় ও সর্ব্বাশ্চর্য্যময় বেদের সূক্ষ্ম তত্ত্বসকলের মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিদ্বেষী ও ঊনবিংশ শতাব্দীর জড়বাদের চিরসেবক পণ্ডিতগণ যে সকল নবসুধাময় সিদ্ধান্ত বর্ষণ করিতেছেন ও ইংরাজী ভাষার সাহায্যে তাহা আকণ্ঠ পান করিয়া ভারতের নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশীয় ভাষায় যাহা উদ্গার করিতেছেন, তাহার সৌরভে অদ্য বৈদিক জগতে ব্যাস জৈমিনি প্রভৃতি সু-প্রসিদ্ধ বেদানুশীলনকারী ঋষিগণের নামের সৌরভ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে; পমেটম ল্যাবেণ্ডারের তীব্র গন্ধে নাসিকাছিদ্র প্রায় বুজিয়া আসিল! চামেলি বা গোলাপের আদর এ দেশ হইতে চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইতে চলিল।

পাশ্চাত্যশিক্ষামদে উন্মত্ত কোন কোন দেশের সুসন্তান ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি মনীষিগণের সিদ্ধান্তগুলির চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতে গিয়া অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যঙ্গোক্তিসহকারে দেশের বৈদিক শিক্ষাসম্প্রদায়ের উপর মধ্যে মধ্যে বেশ সুমিষ্ট গালি বর্ষণ করিতেছেন, করুন্; তাহাতে আমাদের ক্ষোভ বা রোষ নাই তাঁহাদের মত খণ্ডন করিবার জন্যও আমাদের প্রযত্ন নাই, কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এ হেন বেদালোচনার দিনে বেদসম্বন্ধে মহর্ষি জৈমিনি কি বলিয়াছেন, বেদের অনুশীলন বিষয়ে কোন্ উপায় অবলম্বনীয়, এই বিষয়ে মহর্ষি জৈমিনি যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সে বিষয়ে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না, এই জন্য আমরা বেদ ও জৈমিনি সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

হিন্দুধর্ম্মের অন্তস্তত্ত্বে প্রবেশ করিতে হইলে বেদ ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই, একথা চিরদিন সকলেই জানেন। উপনীত হইয়া ত্রৈবর্ণিকসন্তান গুরুগৃহে বাস করিয়া দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য ও নানাবিধ ব্রতনিয়মসহকারে বেদপাঠেই অনেক বৎসর অতিবাহিত করিয়া বেদের প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য মীমাংসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিত, ইহা ভারতের প্রাচীন ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বিদিত আছেন। মীমাংসাশাস্ত্রের ব্যুৎপত্তি না হইলে বেদ বুঝিতে পারা যায় না; বেদের প্রতিপাদ্য কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করিতে হইলে মীমাংসাশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়; ইহা—আমরা নহে—ব্যাস, গৌতম, কণাদ, শঙ্কর প্রভৃতি ভারতের আচার্য্যগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; সেই মীমাংসা শাস্ত্রের মূল সূত্র সমষ্টির প্রণেতা মহর্ষি জৈমিনির বেদবিষয়ে কি প্রকার ধারণা ছিল এবং কিপ্রকারে বিভাগ করিয়া বেদের অর্থ গ্রহণ করা আবশ্যক এই বিষয়ে তিনি যে প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই বিষয়ের আলোচনা প্রথমে করা যাইতেছে, মীমাংসাদর্শনের প্রথমে জৈমিনি বলিয়াছেন যে—

অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা। জৈমিনিসূত্র ১।১।১।

এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, উপনীত ত্রৈবর্ণিকগণ গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুর নিকটে সমগ্র বেদশাস্ত্রের অধ্যয়ন করিয়া পরে সমুদয় বেদের তাৎপর্য্যার্থ ধর্ম্মের স্বরূপ নিশ্চয় করিবার জন্য বেদবিচাররূপ মীমাংসাশাস্ত্রের অনুশীলন করিবে। ইহার পরেই জৈমিনি বলিতেছেন—

চোদনালক্ষণোঽর্থোধর্ম্মঃ। জৈমিনিসূত্র ১।১।২।

তাৎপর্য্যার্থ।—পারলৌকিক ইষ্টলাভ ও অনিষ্ট নিবৃত্তির উপায়কেই ধর্ম্ম কহা যায়, সেই ধর্ম্মে বেদই প্রমাণ অর্থাৎ সকল বেদের প্রতিপাদ্য অর্থ ধর্ম্মব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে।

মহর্ষি জৈমিনিপ্রণীত এই সূত্র দুইটির নিগূঢ় অর্থের প্রতি প্রণিধান করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়—যে সময় মহর্ষি জৈমিনি মীমাংসাদর্শন প্রণয়ন করেন, তখন বেদ এই শব্দটি যে অর্থে প্রযুক্ত হইত, তাহা সমগ্র হিন্দুসমাজের অবলম্বনস্বরূপ ধর্ম্মের একমাত্র প্রমাণ অর্থাৎ হিন্দুর যাহা কর্ত্তব্য এবং হিন্দুর যাহা পরিহরণীয়, তাহা বুঝিতে হইলে বেদ ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই।

(ক্রমশঃ।)

ভাব্‌বার কথা*।

লক্ষ্ণৌ সহরে মহরমের ভারী ধুম। বড় মসজেদ্ ইমামবাড়ায় জাঁকজমক রোশ্‌নির বাহার দেখে কে। বেশুমার লোকের সমাগম। হিন্দু, মুসলমান কেরাণী, য়াহুদী, ছত্রিশ বর্ণের স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, ছত্রিশ বর্ণের হাজারো জাতের লোকের ভীড় আজ মহরম দেখ্‌তে। লক্ষ্ণৌ সিয়াদের রাজধানী, আজ হজরত ইমাম্ হাঁসেন হোঁসেনের নামে আর্ত্তনাদ গগন স্পর্শ কর্‌ছে —সে ছাতি ফাটান মর্সিয়ার কাতরাণি কার বা হৃদয় ভেদ না করে? হাজার বৎসরের প্রাচীন কারবালার কথা আজ ফের জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এ দর্শকবৃন্দের ভিড়ের মধ্যে দূর গ্রাম হ'তে ছুই ভদ্র রাজপুত তামাসা দেখ্‌তে হাজির। ঠাকুর সাহেব্‌দের—যেমন পাড়াগেঁয়ে জমীদারের হয়ে থাকে—বিদ্যাস্থানে ভয়ে বচ; সে মোসলমানি সভ্যতা, কাফ্ গাফের বিশুদ্ধ উচ্চারণসমেত লম্বরী জবানের পুষ্পবৃষ্টি, আবা কাবা চুস্ত পায়জামা তাজ মোড়াসার রঙ্গ বেরঙ্গ সহর পসন্দ ঢঙ্গ অতদূর গ্রামে গিয়ে ঠাকুর সাহেবদের স্পর্শ করতে আজও পারে নি। কাজেই ঠাকুররা সরল সিধে, সর্ব্বদা শীকার করে, জমামরদ কড়াজান্ আর বেজায় মজবুত দিল।

ঠাকুরদ্বয় ত ফটক পার হয়ে মসজেদ মধ্যে প্রবেশোদ্যত, এমন সময় সিপাহী নিষেধ কর্‌লে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় জবাব দিলে যে, এই যে দ্বারপার্শ্বে মুরদ্ খাড়া দেখ্‌ছ, ওকে আগে পাঁচ জুতা মার, তবে ভিতরে যেতে পাবে। মূর্ত্তিটী কার? জবাব এলো, ও মহাপাপী ইয়েজিদের মূর্ত্তি। ও হাজার বৎসর আগে হজরৎ হাঁসেন হোঁসেনকে মেরে ফেলে, তাই আজ এ রোদন, এ শোক প্রকাশ। প্রহরী ভাব্‌লে, এ বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর ইয়েজিদমূর্ত্তি পাঁচ জুতার জায়গায় দশ ত নিশ্চিত খাবে। কিন্তু কর্ম্মের বিচিত্রগতি—উল্টা সমজ্‌লি রাম—ঠাকুরদ্বয় গললগ্নীকৃতবাস ভূমিষ্ঠ হয়ে ইয়েজিদ মূর্ত্তির পদতলে কুমড়ো গড়াগড়ি আর গদ্গদ স্বরে স্তুতি—"ভেতরে ঢুকে আর কাজ কি, অন্ত ঠাকুর আর—কি দেখ্‌ব? ভল্ বাবা অজিদ্ দেবতা তো তুঁহি হ্যায়, অস্ মারো শারো কো কি অভিতক্ রোবত।" (ধন্য বাবা ইয়েজিদ, এমনি মেরেচো শালাদের—কি আজও কাঁদছে!!)

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের গগনস্পর্শী মন্দির—সে মন্দিরে নিয়ে যাবার রাস্তাই বা কত! আর সেথা নাই বা কি? বেদান্তীর নির্গুণ ব্রহ্ম হ'তে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সূর্য্যিমামা, ইঁদুরচড়া গণেশ, আর কুচ দেবতা ষষ্ঠী, মাকাল প্রভৃতি—নাই কি? আর বেদ বেদান্ত দর্শন পুরাণ তন্ত্রে ত ঢের মাল আছে, যার এক একটা কথায় ভববন্ধন টুটে যায়। আর লোকেরই বা ভিড় কি, তেত্রিশ কোটী লোক সে দিকে দৌড়েছে। আমারও কৌতূহল হ'ল, আমিও ছুটলুম্। কিন্তু গিয়ে দেখি, এ কি কাণ্ড! মন্দিরের মধ্যে কেউ যাচ্ছে না, দোরের পাশে একটা পঞ্চাশ মুণ্ডু, একশতহাত, ছু'শ পেট, পাঁচ'শ ঠ্যাঙওয়ালা মূর্ত্তি খাড়া, সেইটার পায়ের তলায় সকলেই গড়াগড়ি দিচ্ছে। একজনকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেলুম যে, ওই ভেতরে যে সকল ঠাকুর দেবতা ওদের দূর থেকে একটা গড় বা ছুটী ফুল ছুঁড়ে ফেল্লেই যথেষ্ট পূজা হয়। আসল পূজা কিন্তু

---

* স্বামী বিবেকানন্দ কর্ত্তৃক লিখিত। —বর্ত্তমান সম্পাদক

এঁর কয়া চাই যিনি যারদেশে ; আর ঐ যে বেদ বেদান্ত, দর্শন, পুরাণ, শাস্ত্রসকল দেখ্‌ছ, ও মধ্যে মধ্যে শুন্‌লে হানি নাই, কিন্তু পাল্‌তে হবে এঁর হুকুম। তখন আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—তবে এ দেব-দেবের নাম কি ?—উত্তর এলো, এঁর নাম "লোকাচার"। আমার লক্ষ্ণৌএর ঠাকুর সাহেবের কথা মনে পড়ে গেল, "ভল্‌ বাবা লোকাচার অস্‌ মারো" ইত্যাদি।

গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্য্য মহা পণ্ডিত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খবর তাঁর নখদর্পণে। শরীরটী অস্থি চর্ম্মসার ; বন্ধুরা বলে, তপস্যার দাপটে, শত্রুরা বলে অন্নাভাবে। আবার দুষ্টেরা বলে, বছরে দেড়কুড়ি ছেলে হলে ঐরকম চেহারাই হয়ে থাকে। যাই হোক, কৃষ্ণব্যাল মহাশয় না জানেন এমন জিনিষটীই নাই, বিশেষ টিকি হ'তে আরম্ভ করে নবদ্বার পর্য্যন্ত বিদ্যুৎপ্রবাহ ও চৌম্বুকশক্তির গতাগতিবিষয়ে তিনি সর্ব্বজ্ঞ। আর এ রহস্যজ্ঞান থাকার দরুণ দুর্গাপূজার বেশ্যাদ্বার-মৃত্তিকা হ'তে মায় কাদা, পুনর্ব্বিবাহ, দশ বৎসরের কুমারীর গর্ভাধান পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কর্ত্তে তিনি অদ্বিতীয়। আবার প্রমাণ প্রয়োগ—সে তো বালকেও বুঝ্‌তে পারে, তিনি এমনি সোজা করে দিয়েছেন। বলি, ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যত্র ধর্ম্ম হয় না, ভারতের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছাড়া ধর্ম্ম বুঝ্‌বার আর কেউ অধিকারীই নয়, ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার কৃষ্ণব্যালগুষ্টি ছাড়া বাকি সব কিছুই নয়, আবার কৃষ্ণব্যালদের মধ্যে গুড়গুড়ে !!! অতএব গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল যা বলেন, তাহাই স্বতঃপ্রমাণ। মেলা লেখাপড়ার চর্চ্চা হচ্ছে, লোকগুলো একটু চম্‌চমে হয়ে উঠ্‌ছে, সকল জিনিষ বুঝ্‌তে চায়, চাক্‌তে চায়, তাই কৃষ্ণব্যাল মহাশয় সকলকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, মাভৈঃ, যে সকল মুস্কিল মনের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছে, আমি তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কর্‌ছি তোমরা যেমন ছিলে, তেম্‌নি থাক। নাকে সরিষার তেল দিয়ে খুব ঘুমোও। কেবল আমার বিদায়ের কথাটা ভুলো না। লোকেরা বল্লে— বাঁচলুম, কি বিপদই এসেছিল বাপু ! উঠে বস্‌তে হবে, চল্‌তে ফিরতে হবে, কি আপদ্‌ !! "বেঁচে থাক্‌ কৃষ্ণব্যাল" বলে আবার পাশ ফিরে শুলো। হাজার বছরের অভ্যাস কি ছোটে ? শরীর কর্ত্তে দেবে কেন ? হাজারো বৎসরের মনের গাঁট কি কাটে ? তাই না কৃষ্ণব্যালদলের আদর। ভল্‌ বাবা "অভ্যাস" অস্‌ মারো ইত্যাদি।

জন্মান্তর।

(বাবু সিদ্ধেশ্বর রায় লিখিত।)

এ জগৎ বৈষম্যময়—বৈষম্যই ইহার সৌন্দর্য্য। অনন্ত শক্তিমান পরমেশ্বরের অনন্ত সংসারে দুই বস্তু, সকল বিষয়ে, পরস্পর সমান নহে। বৃক্ষ পত্র ফল ফুল, সমুদ্র হ্রদ নদী নির্ঝর, মনুষ্য পশু পক্ষী পতঙ্গ, যে কোন জাতীয় পদার্থের দুইটী লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ না কেন, উভয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য লক্ষিত হইবে। যে বালুকাকণার মধ্যে স্থূল চক্ষে কোন প্রভেদই পরিলক্ষিত হয় না, অণুবীক্ষণ যন্ত্রসাহায্যে দেখিলে তাহাদিগের দুইটীর মধ্যে আকার, পরিমাণ ও বর্ণগত এতই পার্থক্য

লক্ষিত হয় যে, তদ্দর্শনে বিস্মিত হইতে হয়। চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ সকল জগতেই এই নিয়ম—রূপে, গুণে, পরিমাণে, সকল বিষয়েই বৈচিত্র্য আছে—বৈচিত্র্যই সংসারের নিয়ম, গুণাতীত পরব্রহ্মের একমাত্র গুণে সংসার সৃজিত, পালিত ও বিধ্বস্ত হয় না। এমত অবস্থায় মনুষ্যসমাজে সাম্যের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র, মনুষ্যের বিকৃতমস্তিষ্কের বিকৃতি ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। যাহা সৃষ্টির মূল-সূত্র মধ্যে নাই, যাহা সৃষ্টির আদি কারণে বিদ্যমান ছিল না, যাহা সংসারে কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। সকল মনুষ্যই সমান বা সমান গুণসম্পন্ন এবং সকলেরই সুখদুঃখের মাত্রা সমান বা সমপরিমিত, এবম্প্রকার সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রান্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। সংসারসৃজনে সাম্য বা সাদৃশ্য মন্ত্র আদৌ উচ্চারিত হয় নাই; সুতরাং সকল মনুষ্য কখনই সমান হইতে পারে না—এ কথা প্রতিপন্ন করিতে কিছু মাত্র আয়াস পাইতে হয় না। বাহ্যিক আকৃতিতে দুই ব্যক্তির মধ্যে সাদৃশ্য নাই—প্রকৃতিতেও পরস্পরের মধ্যে বহু প্রভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে। মনুষ্য যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। একজন রাজরাজেশ্বর, একজন দাসানুদাস, একজন সকল সুখৈশ্বর্য্যের অধিকারী, একজন পথের ভিখারী, একজন পরমানন্দ উপভোগী, একজন শোকতাপসন্তপ্ত। ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি, ভিন্ন ভিন্ন রুচি। কেহ ধর্ম্মপরায়ণ কেহ পাপনিরত, কেহ দানধ্যানপরায়ণ কেহ চোর দস্যু, কেহ কাম ক্রোধাদি ইন্দ্রিয়বিজয়ী কেহ সর্ব্বেন্দ্রিয়দাস, কেহ বেদবেদাঙ্গপারগ কেহ একেবারে নিরক্ষর। আকারগত, অবস্থাগত এবং প্রকৃতিগত পার্থক্য কাহার না চক্ষে পড়ে? তথাপি যদি মনুষ্যসমাজে সাম্যের নিশান উড়াইবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমি মনুষ্যের ও ঈশ্বরের শত্রু ব্যতিরেকে আর কি হইতে পারি?

এই প্রকার পার্থক্য দেখিয়া সহজেই স্থির করিতে হয় যে, সকল লোকেই সমভাবে সুখ-দুঃখের অধিকারী নহে। সংসারে প্রতিনিয়তই দেখা যায় যে, একজন পরম সুখে দিনযাপন করিতেছে, আর একজন দুঃখভারে অবনত। দুঃখনাশই জীবের চরম লক্ষ্য; কিন্তু কেহ তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, কেহ তাহার বিপরীত দিকে ধাবিত হইতেছে। এক সময় তুমি ও আমি সংসারে প্রবেশ করিলাম; কিন্তু তুমি রাজরাজেশ্বর হইলে, আমি পথের ভিখারী হইলাম, তুমি সংসারের যাবতীয় সুখের উপরে স্থান পাইলে আমি দুঃখ যন্ত্রণায় নিতান্ত প্রপীড়িত হইলাম। এই বিষম বৈষম্যের কারণ কি? যদি বল এ সকল ঘটনা ঐশ্বরিক, লীলাবশে লীলাময় পরমেশ্বর এই প্রকার ঘটনা ঘটাইতেছেন; তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি ইচ্ছা করিয়া তোমাকে সুখের ও আমাকে দুঃখের অধিকারী করিয়াছেন। কিন্তু তুমি তাঁহার কি প্রিয়কারী যে, তোমার প্রতি এত অনুগ্রহ এবং আমিই বা তাঁহার কি অপ্রিয় সাধন করিয়াছি যে, আমার প্রতি তাঁহার এত বিগ্রহ? আমাদিগের উভয়কে সমভাবে সুখদুঃখের অধিকারী না করিয়া তিনি কি পক্ষপাতদোষে দূষিত নহেন? যদি তাঁহার ইচ্ছাক্রমে আমাদিগের এবম্প্রকার পার্থক্য ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি নিশ্চিত পক্ষপাতদোষে দোষী এবং আমাকে দুঃখকষ্টের অধিকারী করাতে ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তিনি নির্দ্দয় ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বরে যদি সমদর্শন ও দয়ার অভাব হয়, তাহা হইলে আর কোথায় তাহা থাকিতে পারে? প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বর আমাদিগের সুখদুঃখের হেতু নহেন এবং তোমার সুখে ও আমার দুঃখে তাঁহার কিছু লাভালাভ নাই।

তিনি বিকারশূন্য, তাঁহার সুখও নাই দুঃখও নাই—আমাদিগের সুখদুঃখে তিনি বিচলিত হন না। আমরা স্বয়ংই আমাদিগের সুখদুঃখের হেতু—আমাদিগের কৃত কর্ম্মই সুখদুঃখরূপ ফলদাতা ; যে যে প্রকার কর্ম্ম করে, সে তদনুযায়ী সুখদুঃখের অধিকারী হয়। কর্ম্মই আমাদিগের সুখদুঃখের ফলদাতা, এবম্প্রকার সিদ্ধান্ত করিলে ঈশ্বরে পক্ষপাত দোষ বর্ত্তে না এবং তিনি যে সমদর্শী, তাহার মীমাংসায় কোন ব্যাঘাত জন্মে না। এক্ষণে দেখা যাউক, এই সুখ দুঃখ কোন্ সময়ে কৃত কর্ম্মের ফল। উহা কোন মতে এ জীবনের কৃত কর্ম্ম হইতে সম্ভূত হইতে পারে না—এ জীবনে কৃত কর্ম্মের ফল যে এ জীবনে একেবারে ভোগ হয় না, এমন নহে ; কিন্তু তাহার সহিত পূর্ব্ব সংস্কার সংযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলেই পূর্ব্বজন্ম মানিতে হয় পূর্ব্বজন্মের কৃত কর্ম্মের ফল এ জীবনে ভোগ হয় এবং পূর্ব্ব সংস্কার আমাদিগের আত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে, এবম্প্রকার না মানিলে কর্ম্মফল মানা হয় না এবং ঈশ্বরের পক্ষপাত ও দয়াহীনতা দোষ দূরিত হয় না। এ জীবনের সুখ দুঃখ যে সমস্তই এ জীবনের কৃত কর্ম্মের ফল নহে, তাহা সহজেই প্রমাণিত হইতেছে। অতি শৈশব অবস্থায় আমরা যে সুখ দুঃখ ভোগ করি তাহাতে সন্দেহ নাই এবং সেই সুখদুঃখের বশবর্ত্তী হইয়াই সদ্যজাত শিশুও হাস্য ক্রন্দন করে। সকল শিশুর সুখ দুঃখ সমান নহে—কেহ শীতাতপে কাতর, কেহ ক্ষুধায় ব্যাকুল, কেহ একেবারে নিরাশ্রয়, কেহ বা জন্মাবধিই নানা পীড়ায় পীড়িত। আবার কেহ বা ধন জন হইতে যত প্রকার সুখ সম্ভোগের সম্ভাবনা, সে সকলেরই অধীশ্বর এবং নিয়ত আত্মীয় স্বজনের স্নেহ যত্ন আদরে লালিত পালিত এবং ব্যাধিবর্জ্জিত। যে বয়সে মন বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হয় না এবং ইন্দ্রিয়গণও অনেক পরিমাণে বিকাশ প্রাপ্ত হয় না, তখনও যখন মনুষ্যমধ্যে এ প্রকার সুখদুঃখের তারতম্য দেখা যাইতেছে, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে, সেই তারতম্য পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলের উপর নির্ভর করিতেছে। এ জীবনে কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বেই যখন এই প্রকার কর্ম্মফল পরিদৃষ্ট হইতেছে, তখন সেই ফলোৎপাদক কর্ম্ম অবশ্যই এ জন্মের পূর্ব্বে কৃত হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আমরা এ জীবনে যে সকল কর্ম্ম করি, তাহা যে সমস্তই পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম-ফলভোগজন্য, এমন নহে ; পূর্ব্ব সংস্কার ও কামনার বশেও অনেক কর্ম্ম কৃত হইয়া থাকে এবং যে সকল প্রারব্ধ কর্ম্ম অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, তাহা জন্মান্তরে সম্পূর্ণ হয়। বহুকাল একাগ্রচিত্তে সাধনা করিলে এ জীবনেই যে এ জীবনের কৃত কর্ম্মের ফলভোগ হয়, শাস্ত্রে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পাতঞ্জল-দর্শনে একস্থানে উক্ত হইয়াছে "যদি অতিশয় যত্ন ও বিশেষ নিয়ম সহকারে নিরন্তর বহুকাল দেবতার আরাধনাদি করা যায়, অথবা ব্রহ্মবধাদি নিন্দনীয় কর্ম্ম করা যায়, তাহা হইলে ইহজন্মেই ঐ ঐ কর্ম্মের ফল ভোগ হয় সন্দেহ নাই ; যেমন মহাদেবের আরাধনা করিলে নন্দীশ্বরের বিশিষ্ট জন্মাদি এবং তপোবলে বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণজাতি প্রাপ্তিরূপ শুভকর্ম্মের ফল ইহজন্মেই ঘটিয়াছে এবং কুকর্ম্মবশতঃ নহুষ ও উর্ব্বশীর যথাক্রমে জাত্যন্তর ও কার্ত্তিকেয় বনে লতারূপে অবস্থান ঘটিয়াছে।" পূর্ব্বজন্মের কৃত কর্ম্মসকলের ফল এ জীবনে ভোগ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই এবং এ জীবনের কর্ম্ম আবার ভবিষ্যজীবনের ফলদাতা, তাহাও নিশ্চিত। যাঁহারা এ জীবনে কোন কর্ম্ম করেন না, তাঁহারা কেবল এ জীবনে পূর্ব্বজন্মের কৃত কর্ম্মের ফলভোগ করেন, কারণ প্রারব্ধ কর্ম্মের বিনাশ নাই ; তবে যদি এ জীবনে সমস্ত ফল ভোগ না হয়, তাহা হইলে আবার পরজন্মে তাহা ভোগ করেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সেই [ভোগ] সমাপ্ত হইলে আর জন্ম

পরিগ্রহ করিতে হয় না।

যেমন বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি, তেমনই কর্ম্মবীজ হইতে সুখদুঃখাদি ফলের উৎপত্তি নিশ্চিত এবং এক এক প্রকার বীজ হইতে যেমন এক এক প্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তেমনই বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম হইতে বিশেষ বিশেষ ফললাভ হয়। এই বীজ ধ্বংস না হইলে আর সুখদুঃখের নিবৃত্তি নাই। কামনাই কর্ম্মবীজের অন্তঃসার; যখন কোন মহাত্মার সর্ব্ব কামনা বিনষ্ট হয়, তখন তিনি অন্তঃসারশূন্য অথবা ভর্জ্জিত বীজের ন্যায় বিদ্যমান থাকেন মাত্র, তাঁহাকে আর জন্ম-মরণাদি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, মনুষ্যের মৃত্যুর পরে তাহার কৃত কর্ম্মের ফলভোগ জন্য সংস্কার কোথায় সঞ্চিত থাকে? বৃক্ষ হইতে পতিত বীজ যেমন পুনরুদ্গমসময় পর্য্যন্ত ভূমিতে পড়িয়া থাকে অথবা কৃষকের দ্বারা সঞ্চিত হইয়া তাহার গৃহে যত্নে রক্ষিত হয়, তেমনই কর্ম্মবীজও অবশ্য কোন স্থানে সঞ্চিত থাকে।

সংসারে চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ চৈতন্য ও জড় এই দুই পদার্থ আছে। জড় হইতে আমাদিগের শরীরের উৎপত্তি হয়, আর জীব স্বভাবতঃই চৈতন্যশক্তিবিশিষ্ট। শরীর দ্বিবিধ-স্থূল ও সূক্ষ্ম। শুক্রশোণিতসংযোগে যে শরীর উৎপন্ন হয়, তাহাই স্থূল শরীর। শোণিত হইতে মাংস রক্ত ও লোম এবং শুক্র হইতে অস্থি, মজ্জা ও স্নায়ু জন্মে। এই শরীর বার বার উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। সুখ দুঃখ ইহা ভোগ করিতে পারে না—ইহার দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে সংগৃহীত হইলেও ইহা সুখ দুঃখ ভোগ করে না, ভোগ করিবার শক্তিই ইহার নাই। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র অথবা পঞ্চ প্রাণ এবং মন এই ষোড়শ এবং কাহারও মতে বুদ্ধি ও অহঙ্কার সহিত যথাক্রমে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ পদার্থ মিলিত হইয়া সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হয়। ইহাকে লিঙ্গ শরীরও বলা হয়। ইহার বিনাশ নাই, ইহা মুক্তিপর্য্যন্ত স্থায়ী। সুখ দুঃখ যাহা কিছু এই সূক্ষ্ম শরীরই ভোগ করিয়া থাকে। ইহা পশু, পক্ষী, মনুষ্য, সকল প্রকার শরীর ধারণ করিতে পারে। ইহার গতি অব্যাহত অর্থাৎ সকল স্থানেই যাইতে পারে এবং ইহার শক্তিরও সীমা নাই। আমরা যাহা কিছু করি ও ভোগ করি, সে সমস্তই এই শরীর কর্ত্তৃক কৃত ও ভুক্ত হয়। আত্মা ইহার অতিরিক্ত যে চিৎশক্তি, তাহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তাহা কর্ত্তাও নহে, ভোক্তাও নহে। আত্মা কিছুতেই লিপ্ত নহে এবং তাহার বিকল্প নাই - সৎ, চিৎ ও আনন্দই তাহার প্রকৃতি। এই আত্মা প্রত্যেক জীবের অধিষ্ঠাতা; যত দিন জীব ইহার সহিত পরিচিত না হয়, তত দিন কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সংসারে ঘুরিয়া মরে; আত্মার সাক্ষাৎ পাইলে প্রারব্ধ কর্ম্মাবসানে জগতের আত্মার সহিত অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ হইয়া যায়, আর পুনঃ পুনঃ সংসারে আসিয়া কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইতে হয় না।

স্থূল শরীর উপলক্ষ হইলেও যাহা কিছু করিবার বা ভোগ করিবার তাহা সূক্ষ্ম শরীরই করিয়া থাকে; স্থূল জড় শরীর কিছুই করিতে বা ভোগ করিতে পারে না, ইহা কেবল সূক্ষ্ম শরীরের আজ্ঞাবহ যন্ত্র বা ভৃত্য। কাহাকেও কিছু দান করিতে হইলে স্থূল শরীর হাতে করিয়া দিলেও সেই দানকর্ম্মজনিত আনন্দ ইহা কিছুই অনুভব করিতে পারে না। ক্ষুধায় কাতর হইলে স্থূল শরীর আহার করে সত্য, কিন্তু আহারজন্য তৃপ্তি বা সুখ, তাহা ইহার কিছুই নহে, সমস্তই সূক্ষ্ম শরীরের। সূক্ষ্ম শরীরই সকলের কর্ত্তা ও ভোক্তা, স্থূল শরীরের সাহায্যে ইহা সকলই করে

ও ভোগ করে। ইহা হইতেই কামনার উৎপত্তি হয়। নতুবা স্থূল শরীরের মন নাই, সে কিছুই বাসনা করিতে পারে না। বাসনার দ্বারা স্থূল শরীর পরিচালিত হইলেও তাহার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, খড়্গের দ্বারা ছেদন কার্য্য সম্পন্ন হইলেও তাহার কোন কর্ত্তৃত্ব থাকে না। তবে কামনা অনুসারে সূক্ষ্ম শরীরের আজ্ঞা বহন করিবার জন্য স্থূল শরীরের প্রয়োজনীয়তা বিলক্ষণ আছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মন বুদ্ধি অহঙ্কারোৎপন্ন যে সূক্ষ্ম শরীর কামনা করে, তাহাতেই সমস্ত কর্ম্মের ফলাফল অঙ্কিত থাকে, মনুষ্যের মৃত্যুতে অর্থাৎ স্থূল শরীরের বিনাশে, তাহা লুপ্ত হয় না। আমরা যাহা কামনা করি, তাহা যাবৎ না উপভোগ হয়, তাবৎ তাহার বিনাশ নাই। যেমন কোন একটী সামগ্রীতে বলপ্রয়োগ করিলে যাবৎ সেই বলের কার্য্য সমাপ্ত না হয়, তাবৎ তাহার বিরাম নাই, তদ্রূপ সূক্ষ্ম শরীরে কোন কামনার উৎপত্তি হইলে সেই কামনার ভোগ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা বিনষ্ট হয় না। মনুষ্যের স্থূল শরীর প্রাকৃতিক নিয়মে সেই কামনার ভোগ পর্যান্ত বর্ত্তমান থাকা সর্ব্বথা সম্ভব নহে; সুতরাং সূক্ষ্ম শরীরকে আবার সেই কামনার অঙ্কুর পাইয়া তাহার ফল ভোগের উপযোগী স্থূল শরীর আশ্রয় করিতে হয়। এই প্রকারে যত দিন না কামনার বিনাশ হয়, ততদিন আমাদিগকে এক দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবেশ করিয়া মানবলীলা আরম্ভ ও শেষ করিতে হয়। আমরা যখন যে কর্ম্ম করি, তাহার অভ্যন্তরে একটী না একটী ফলের প্রত্যাশা থাকে, বিনা উদ্দেশ্যে আমরা কোন কাজ করি না। কিন্তু আমাদিগের স্থূল শরীর এত ক্ষণস্থায়ী যে, সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধি পর্য্যন্ত আমরা জীবিত থাকি না, সুতরাং জন্মান্তর পর্য্যন্ত সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বসিয়া থাকিতে হয়। এই জন্মান্তর অতিক্রম করিবার জন্য হিন্দুশাস্ত্রে নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। স্বয়ং ফলকামনাবিরহিত হইয়া কর্ম্ম না করিলে কামনার ধ্বংস হয় না; সুতরাং জন্মান্তরের হস্ত হইতেও অব্যাহতি পাওয়া যায় না। আমরা যাহা কিছু করি (না), সমস্তই, এমন কি পান ভোজন পর্য্যন্ত, ব্রহ্মের উদ্দেশে করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আর আমার আমিত্ব থাকে না, সুতরাং আমাকে আর বারম্বার জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না।

এক্ষণে কথা এই যে, ঘোর সংসারের মধ্যে থাকিয়া অহঙ্কারবিমুক্ত জীবের পক্ষে সকল কর্ম্মই নিষ্কাম ভাবে করা সম্ভব কি না? যাঁহাদিগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি সঞ্চিত থাকে, তাঁহাদিগের পক্ষে অসম্ভব না হইলেও সাধারণের পক্ষে অসম্ভব, তাহাতে সন্দেহ কি? সেই জন্য আমাদিগের কর্ত্তব্য যে, ক্রমে ক্রমে কামনা সকল সঙ্কুচিত করা—কূর্ম্ম যেমন আবরণের মধ্যে হস্তপদ সঙ্কুচিত করে। এবম্প্রকার করিতে অভ্যাস করিলে ইহজন্মেই তাহার ফল ফলিতে দেখা যায়। যদি একেবারে সর্ব্ব কামনাশূন্য না হই, অভ্যাসের দ্বারা যে কিয়ৎপরিমাণে কামনাশূন্য হওয়া যাইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা হইলে দুঃখ কষ্ট আমাদিগকে ক্লেশ দিতে পারে না; কামনাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলে তাহাতে বিফল হইলেও নৈরাশ্য-যন্ত্রণা আমাদিগকে ভোগ করিতে হয় না। কেহ কেহ এমন কথা বলিতে পারেন যে, কর্ম্ম করিলেই যখন তাহার ফলভাগী হইতে হয়, তখন একেবারে কর্ম্মত্যাগই কর্ত্তব্য। যিনি ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার আর কর্ম্ম নাই; কিন্তু যাঁহারা তাহা পারেন নাই তাঁহাদিগের পক্ষে কর্ম্মত্যাগ করা অসম্ভব। [ক্রমশঃ]

দিব্য বাণী

অখিল-ভুবন-জন্ম-স্থেম-ভঙ্গাদিলীলে
বিনত-বিবিধ-ভূতব্রাত-রক্ষৈকদীক্ষে।
শ্রুতিশিরসি বিদীপ্তে ব্রহ্মণি শ্রীনিবাসে
ভবতু মম পরস্মিন্ শেমুষী ভক্তিরূপা ॥

—রামানুজাচার্য : শ্রীভাষ্য, মঙ্গলাচরণ-শ্লোক, ১

নিখিল ভুবনের সৃজন-পালনের
কারণ যিনি—যিনি কারণ বিনাশের,
শরণ-আগতের রক্ষা ব্রত যাঁর
প্রমাণরূপা শ্রুতি ঘোষিছে কথা তাঁর।
সে পরব্রহ্মেতে, সদয় শ্রীপতিতে
ভক্তিরূপা মতি অস্তুক মোর চিতে।

কথাপ্রসঙ্গে

রামানুজের দৃষ্টিতে কর্মযোগ

ছান্দোগ্য উপনিষদের অন্তিম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, একদা প্রজাপতি বলিয়াছিলেন : যে আত্মা পাপহীন জরাহীন মৃত্যুহীন শোকহীন ক্ষুধাহীন পিপাসাহীন সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প, তাঁহার অনুসন্ধান করা উচিত তাঁহাকে বিশেষভাবে জানার জন্য আগ্রহান্বিত হওয়া উচিত।

রামানুজের মতে আত্মার বদ্ধাবস্থায় উপরি-উক্ত নিষ্পাপত্ব আদি আটটি আত্মগুণ সংকুচিত থাকে; আত্মদর্শন হইলে ঐ গুণগুলির স্বাভাবিক অসংকুচিত রূপ প্রকাশিত হয়।

এই আত্মদর্শন বা আত্মজ্ঞানের দুইটি প্রসিদ্ধ পথ— জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ রামানুজ বলেন, এই দুইটি পথই বৈকল্পিক পরস্পর-নিরপেক্ষ। এই মতটি রামানুজীয় মতবাদসমূহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, কারণ অধিকাংশ আচার্যের মতে জ্ঞানযোগ অঙ্গী, কর্মযোগ উহার অঙ্গ অর্থাৎ প্রথমে কর্মযোগ অবলম্বনে সাধন করিয়া পরে জ্ঞানযোগের সাধনা করিতে হয়।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, কর্মযোগ জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ ও রাজযোগ —এই চতুর্বিধ যোগের যে-কোন একটির দ্বারাই আমরা লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারি— ইহাদের প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র পথ। রামানুজের মতের সহিত স্বামীজীর মতের সর্বাংশে মিল দৃষ্টিগোচর না হইলেও, কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ — এই দুইটির যে-কোন একটি অবলম্বনেই যে মুক্তি লাভ সম্ভব, এই ঐকমত্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়, কারণ আচার্য শংকর শ্রীধরস্বামী মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি মহান আচার্যগণ কর্মযোগের এই স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন না।

রামানুজের মতে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ পরস্পর-নিরপেক্ষ সাধন হইলেও, জ্ঞানযোগ অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ। কারণ, কর্মযোগে মানুষ অভ্যস্ত কর্মে নিরত থাকায়, চিত্ত-বিক্ষেপের সম্ভাবনা কম। জ্ঞানযোগে সর্বকর্মসন্ন্যাস করিয়া আত্মধ্যানাদির প্রয়াস করিতে হয়, ইহা সর্ব-সাধারণের পক্ষে একটি স্বাভাবিক ব্যবস্থা হইতে পারে না। ফলতঃ জ্ঞানযোগে প্রমাদের সম্ভাবনা খুবই বেশী। সুতরাং জ্ঞানযোগে বহু কষ্টে এবং বহু ভুলভ্রান্তির শেষে বহু বিলম্বে লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারা যায়। অপরপক্ষে কর্মযোগ অবলম্বনে শীঘ্রই আত্মদর্শন সম্ভবপর হয়। এতদ্‌ব্যতীত জ্ঞানযোগী কর্মত্যাগ করেন বলিয়া তিনি আদর্শ পুরুষরূপে গৃহীত হইতে পারেন না। কর্মযোগীই আদর্শ পুরুষ।

রামানুজ আরও বলেন যে, যদি কেহ বাস্তবিকই জ্ঞানযোগের অধিকারী হন - অর্থাৎ যদি সম্পূর্ণ জিতেন্দ্রিয় হইয়া সর্বকর্মসন্ন্যাসপূর্বক আত্মধ্যান অভ্যাস করিবার যোগ্যতা তাঁহার থাকে, তাহা হইলেও তিনি কর্মত্যাগ করিবেন না, পরন্তু কর্মযোগ অবলম্বন করিয়াই আদর্শ স্থাপন করিবেন।

রামানুজের মতে যদিও জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ — এই উভয় যোগেই ভগবদ্‌ভক্তির স্থান অবশ্যই আছে, তথাপি জ্ঞানযোগীর সাধনা শুধু কৈবল্যেই পর্যবসিত হয়। কিন্তু কর্মযোগীর সাধনায় ভক্তি এত অধিক পরিমাণে সন্নিবিষ্ট থাকে যে, আত্ম-দর্শনে অর্থাৎ কৈবল্যেই উহার পরিসমাপ্তি ঘটে না— কর্মযোগী পরিশেষে পরিপূর্ণ ভক্তিযোগী

হইতে বাধ্য হন। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, গীতার 'ভক্তিযোগ'-অধ্যায়ের 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং' ইত্যাদি সাতটি শ্লোকে শ্রীভগবান তাঁহার প্রিয় ভক্তের যে-সকল লক্ষণের কথা বলিয়াছেন, রামানুজের মতে ঐগুলি যথার্থ কর্মযোগীরই লক্ষণ এবং ঐ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটিতে মাত্র ভক্তিযোগীর কথা বলা হইয়াছে। শঙ্করের মতে ঐ আটটি শ্লোকে সর্বকর্মত্যাগী পরম জ্ঞানীর কথাই বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে শ্রীধরাদি আচার্যগণের মতে শ্রীভগবান উক্ত শ্লোকসমূহে পরম ভক্তের লক্ষণাবলী বর্ণনা করিয়াছেন। ফলতঃ ভক্তিযোগের মহান প্রবক্তা হইয়াও, রামানুজ কর্মযোগকে যে কত উচ্চস্তরে উন্নীত করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

এতক্ষণ আমরা রামানুজের দৃষ্টিতে কর্মযোগের মহত্ত্বের কথা আলোচনা করিলাম। এখন তাঁহার দৃষ্টিতে কর্মযোগের স্বরূপের কথা বলা আবশ্যক। রামানুজের মতে কর্মের ফল, কর্মের প্রতি মমত্ববোধ এবং কর্তৃত্বাভিমান এই তিনটি ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া কর্ম করার নামই কর্মযোগ।

অধিকাংশ মানুষই ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া কর্ম করিয়া থাকে। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে অর্থ-সাহায্য করিয়া দাতা প্রত্যুপকারের আশা করে, অথবা প্রত্যুপকারের সম্ভাবনা না থাকিলে মনে করে যে, তাহার পুণ্যের পুঁজিতে কিছুটা জমা পড়িল, যাহার ফলে সে পরলোকে বা পরজন্মে ইহলোকে সুখভোগ করিবে। অপর পক্ষে ঐ দানই যদি কেবলমাত্র কর্তব্যবুদ্ধিতে করা হয় এবং উহার ফলস্বরূপ জ্ঞান বা ভক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই কামনা না করা হয়, তাহা হইলে কর্মটিকে নিষ্কাম অর্থাৎ ফলাসক্তি-বর্জিত বলা যায়।

আবার দেখা যায়, আমরা কোনও কর্ম করিতে করিতে তাহাতে এতই আসক্ত হইয়া পড়ি যে, সেই কর্মটি কোনক্রমেই ছাড়িতে প্রস্তুত হই না। ইহারই নাম কর্মে মমত্ববুদ্ধি বা আসক্তি। কর্মযোগীকে এই মমত্ববুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে হইবে। শ্রীভগবানই আমাকে এই কর্মে নিয়োজিত করিয়াছেন— কর্মটি তাঁহারই, আমার নয়—এই বুদ্ধিসহায়ে কর্ম করিয়া কর্মযোগী যে-কর্ম সমস্ত মন প্রাণ দিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ করিতেছেন, তাহাও যে-কোন মুহূর্তে সানন্দে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন।

তৃতীয়তঃ কর্মযোগীকে জানিতে হয়, তিনি কর্তা নন—ঈশ্বরই কর্তা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "'আমি করছি', এটি অজ্ঞান থেকে হয়; 'হে ঈশ্বর, তুমি করছ' এইটি জ্ঞান। ঈশ্বরই কর্তা আর সব অকর্তা।" নানাভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই প্রসঙ্গটি অসংখ্যবার তুলিয়াছেন— ইহা আমরা কথামৃতে লক্ষ্য করি। 'আমি কর্তা'— এই বোধ হইতে জীবের কি দুর্গতি হয়, তাহা তিনি বাছুরের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেন। কথামৃত-পাঠকমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। 'নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু'—তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত মহামন্ত্র। 'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি গাড়ী, তুমি ইঞ্জিনিয়ার; আমি ঘর, তুমি ঘরণী', ইত্যাদি কতভাবে যে তিনি ভক্তদের বলিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। রামপ্রসাদের একটি গানে আছে:

'তোমার কর্ম তুমি কর মা।
লোকে বলে করি আমি ॥'

এই গানটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রায়ই গাহিতেন। ঈশ্বরই কর্তা এবং কর্মও তাঁহারই— গানের প্রথমোক্ত কলিটিতে এই দুইটি তত্ত্ব সুপরিস্ফুট।

রামানুজও কর্মযোগীর ত্রিবিধ ত্যাগের মধ্যে এই শেষোক্ত কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। তাঁহার মতে এই ত্যাগটি করিতে পারিলে পূর্বোক্ত ফলাকাঙ্ক্ষা-ত্যাগ ও কর্মে মমত্ব

বুদ্ধিত্যাগ অনায়াসেই সিদ্ধ হইয়া যায়। তিনি বলেন, জীবের শরীর মন প্রাণ ইন্দ্রিয় আত্মা এই সকল নিজস্ব উপকরণের সাহায্যে শ্রীভগবানই তাঁহার লীলাহেতু কর্মসমূহ করিতেছেন, কর্মযোগীকে এই বৈদিকী বুদ্ধি অবলম্বন করিতে হয়। তিনি আরও বলেন, এইরূপ ত্রিবিধত্যাগযুক্ত ব্যক্তি আত্মজ্ঞান তো লাভ করেনই, অধিকন্তু পরিণামে তিনি পরাভক্তি লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হন।

বর্তমান যুগ কর্মের যুগ। সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনে সকলকেই আজ কর্মসমুদ্রে আকণ্ঠ নিমজ্জিত দেখা যায়। এই পরিস্থিতিতে মহান আচার্য রামানুজ কর্মযোগের যে বিশদ ব্যাখ্যা দিয়াছেন—যে মহিমোজ্জ্বল আদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য এবং অধিকাংশ লোকের নিকট উহা হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয় প্রতীয়মান হইবে বলিয়া মনে হয়। তাঁহার পুণ্য আবির্ভাবতিথি স্মরণে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় তাঁহারই ভাষ্যাশ্রিত এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের দ্বারা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের ভক্তি-প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা

স্বামী সারদেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

মাত্র অল্পদিন হইয়াছে মা খুব অসুখ হইতে সারিয়া উঠিয়াছেন, এখনও শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ সবল হয় নাই। পথ্যাদির ধরাবাঁধা নিয়ম এখনও রহিয়াছে। ইতিমধ্যে একদিন দুপুরের খাওয়ার সময় লোক বেশী হইল। ছেলেদের খাওয়ার পর মা মেয়েদের লইয়া খাইতে বসিয়াছেন। দুপুরের রান্না গরম ভাত কিছু কম পড়িবে, পান্তাভাত যথেষ্ট আছে। মেয়েরা ঠিক করিয়াছেন, আর রাঁধিয়া কাজ নাই। তাঁহারা দুটি দুটি পান্তাভাত খাইবেন, তাহা হইলেই চলিয়া যাইবে। আর তাঁহারা তো পান্তাভাত খাইতে অভ্যস্ত। পরিবেশনের সময় অপরের পাতে পান্তা দেওয়া হইলে মা-ও ধরিয়া বসিলেন, তাঁহাকে দুটি দিতে হইবে; সকলে পান্তা খাইবেন, আর তিনি শুধু গরম খাইবেন, এ কখনো হয়? তাঁহার মুখে সে-অন্ন যাইবে না। মেয়েরা, বিশেষ করিয়া তাঁহার আশ্রিতা অতি অনুগতা সেবিকা নবাসনের বৌ অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, জোড়হাতে প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু মাকে ক্ষান্ত করিতে পারিলেন না। তাঁহার স্নেহের পুতুলীদের সঙ্গে মা পান্তাভাত দুটি মুখে দিলেনই। আনন্দে গল্পগুজব করিয়া ভোজন শেষে মা মেয়েদের বলিলেন, 'ছেলেরা যেন একথা না জানে।'

কিন্তু পরে নবাসনের বৌ অত্যন্ত শঙ্কিতা হইয়া, কি জানি কি হয় ভাবিয়া সেখানকার দেখ্-ভাল্ (তদারক) কারী সন্তানকে একান্তে অশ্রুপূর্ণ-লোচনে সব ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'দাদা, আপনাকে আর না বলে পারলুম না, আমার হৃদয় ভেঙ্গে যাচ্ছে। কি হয়— সবে মা সেরে উঠেছেন এত ভুগে।' সন্তান বিস্মিত স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন. দিদি বলিয়া যাইতে লাগিলেন, দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে, 'মা গত পরশু দুপুরে পান্তাভাত খেয়েছেন— অনেক অনুনয় বিনয় করে জোড়-

হাতে বললুম, সকলে নিষেধ করলে, কারও কথা শুনলেন না। গরম ভাত কম পড়েছিল, পান্তা-ভাত ছিল। আমরা দুটি দুটি খেলুম, তিনিও দুটি খেলেন সকলের সঙ্গে। আমার ভয় হচ্ছে, কি জানি কি হয়, আবার না অসুখ করে।' সন্তান তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বিদায় দিলেন। মুখে যদিও বলিলেন, 'ভয় নাই, কিছু হবে না', কিন্তু কয়েকদিন পর্যন্ত শঙ্কিত হৃদয়ে রহিলেন। যদি অন্য কোন কারণেও শরীর একটু খারাপ হয়, আর এই পান্তা-ভাত খাওয়া প্রকাশ পায়, তবে তো আর মুখ দেখানো যাইবে না। নবাসনের বৌ অতি সৌভাগ্যশালিনী ছিলেন, মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার ন্যায় থাকিয়া শেষ কয়েক বৎসর তিনি যে সেবা করিয়াছেন, তাহা বলিবার নহে। মায়ের সর্বপ্রকার দৈহিক প্রয়োজন, সেবাশুশ্রূষা, বিশেষ অসুখে মলমূত্রাদি পরিষ্কার করা, কাপড়-চোপড় ধোওয়া-কাচা এমন ভক্তিশ্রদ্ধা ও প্রেমভক্তি লইয়া করিয়াছেন, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই শুধু জানেন। তিনি সত্য সত্যই জগদম্বাকে একাধারে মা ও মেয়েরূপে সেবা করিয়া নিজের মানবজীবন সার্থক করিয়াছেন। এ অধিকার তাঁহার বহু জন্মের সুকৃতির ফল, সন্দেহ নাই। এরূপ সেবার ভাগ্য অপর কাহারও হইয়াছিল বলিয়া জানি না।

মায়ের নিকটে তাঁহার যে-সকল পুত্রকন্যা কিছুকাল বাস করার সৌভাগ্য লাভ করিতেন, তাঁহাদের অন্তরে ভাই-বোনের সম্পর্ক দৃঢ় করিয়া দিয়া মা তাঁহাদের মনকে বিশুদ্ধ, দৃষ্টিকে পবিত্র রাখার উপায় করিয়া দিতেন। 'বেটা-ছেলে' 'মেয়ে-ছেলে'রা সর্বদাই দূরে থাকে, বিনা কাজে কথাবার্তা দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনার সুযোগ নাই এবং কদাচিৎ কাজের খাতিরে একত্র হইলেও চটপট তাড়াতাড়ি করিয়াই উপস্থিত কাজ শেষ করিতে হয়। তাহা হইলেও একই সংসারে একত্র খাওয়া, থাকা আর কখন কি কাজের প্রয়োজন পড়ে, তার কিছু কি ঠিক আছে? কাজেই ছেলেমেয়ের মেলামেশা এড়ান যায় না। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়! মায়ের উপস্থিতিতে, তাঁহার প্রভাবে মায়ের বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের মনে পরস্পরের প্রতি ভাইবোন ছাড়া অন্যভাব জাগে না। তাঁহারা পরস্পরকে দাদা দিদি ডাকেন। মা-ও ছেলেদের অন্তরে তাঁহার নিজের সম্পর্কে মাতৃত্ববোধ দৃঢ় এবং সঙ্কোচ দূর করিবার জন্য লাজুক ছেলেদের 'মা' ডাকাইতেন, তাঁহাদের মুখে 'মা'-ডাক শুনিতেন; কোনও কাজে কাহারও কাছে ছেলেকে পাঠাইতেছেন, বলিয়া দিলেন—'বলবে, মা বলেছেন'। ছেলে চুপ করিয়া শুনিল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি বলবে, বল তো?' লাজুক ছেলে বলিল, 'আপনি বলেছেন।' মা আবার শোধরাইয়া শিখাইয়া দিলেন, 'না, বলবে, মা বলেছেন।' ছেলে অগত্যা বলিতে বাধ্য হইল— বলিল, 'বলব, মা বলেছেন।' মা প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিলেন, ছেলেও আনন্দিত হইয়া কাজে গেল। এই ভাবে 'তোমার মেজ মামাকে বলে এসো', 'সেজো মামীকে দেখে এসো', 'দিদিকে ডাকো' ইত্যাদি এবং মেয়েদেরও ঠিক ঐরূপ 'তোমার দাদাকে ডাক', 'দাদাকে খেতে দাও'— ইত্যাদি সম্বোধন, ব্যবহার শিক্ষা দিয়া তাঁহাদের অন্তরে বিশুদ্ধভাব সুদৃঢ় করিয়া দিতেন। এমন কি ঝি-চাকরের সঙ্গেও নিকট সম্পর্ক পাতাইয়া দৈনন্দিন ব্যবহার চলিত। সমাজের এই প্রাচীন সুনিয়ম, সকলের প্রতি আত্মীয়তাবোধ লোপ পাওয়াতেই মানুষের অধোগতি দ্রুত হইয়াছে।

সন্ন্যাসী হইয়া বনে গেলেই বা কি, আর গৃহস্থ হইয়া ঘরে থাকিলেই বা কি — অন্তর শুদ্ধ, দৃষ্টি পবিত্র না থাকিলে মানুষ ইন্দ্রিয়ের আসক্তি

দূর করিতে পারে না। আমাদের পূর্ব পূর্ব চিন্তা ও কর্মই সংস্কাররূপে অন্তরে বর্তমান থাকিয়া আমাদের সর্বদা প্রেরণা জোগাইতেছে ও নাচাইতেছে। যদি আমরা চিন্তাপ্রণালী ও দৃষ্টিভঙ্গি বদল করিয়া লইতে শিখি, তাহা হইলে ক্রমশঃ চিত্ত শুদ্ধ হইয়া মনের আসক্তি হ্রাস পাইতে পারে। বর্তমান মনুষ্যসমাজে স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরের সহিত কর্মসূত্রে মিলিতে বাধ্য। সারা পৃথিবী এক পরিবার; শিক্ষা স্বাস্থ্য ব্যবসা রাজনীতি—সবক্ষেত্রে দেশে-বিদেশে স্ত্রীপুরুষ একত্র না থাকিলে চলে না। বন অরণ্য আজ জনপদ নগর-এ রূপান্তরিত হইতেছে, সর্বত্র সকলের যাতায়াত, নিঃসঙ্গ হইয়া জীবনধারণ করা কঠিন। সেজন্যই বুঝি মা, তোমার পুত্রকন্যাকে কালোপযোগী করিয়া গঠনের জন্য এই নূতন শিক্ষাপ্রণালী! সন্ন্যাসী বা গৃহী, যাই-ই হও না, অন্তরে নিজের ভাবস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া অগ্রসর হও, জীবন উন্নত কর। আমরা সকলে এক মায়ের সন্তান, ভাই-বোন, সর্বত্রই মায়ের বাড়ী। নিজের নিজের ভাবে থাকিয়া আমরা পরস্পরকে সহায়তা করিব; মা খাওয়াইতেছেন, 'যার পেটে যা সয়'। এইরূপে সুশিক্ষা দিয়া মা তাঁহার সন্তানদের দ্বারা কিরূপ অসম্ভব কার্য সম্ভব করাইয়াছেন, ভাবিলেও বিস্ময় জন্মে।

সেজো মামীর শরীর খুব অসুস্থ। ছোট ছেলে বিজয়ের জন্মের পর মামী আঁতুড় ঘরে। প্রসবের সময় দারুণ কষ্ট ও বিপর্যয় হইয়াছে। তারই জের—উদর ফুলিয়া গিয়াছে। চিকিৎসক ব্যবস্থা দিয়াছেন, তিসির পুলটিস্ গরম করিয়া সেক দিতে হইবে। লোকজন কম, সর্বক্ষণ সেক চাই। মা অত্যন্ত চিন্তিত, সর্বক্ষণ খোঁজ খবর রাখেন; শেষে গত্যন্তর না দেখিয়া তাঁহার একটি সন্তানকে বলিলেন, 'বাবা, তোমার সেজো মামীর বড় কষ্ট, সাংঘাতিক অসুখ, দেখবার লোক নাই, তুমি একটু সেবাশুশ্রূষা করলে রক্ষা পায়।' মায়ের অভিপ্রায় বুঝিয়া সন্তান আনন্দে সম্মত হইয়া মামীর সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। মা খুব প্রসন্না হইলেন, সেবকেরও মনে আনন্দ তৃপ্তি আসিল; ঠিক মনে হইতে লাগিল—নিজ গর্ভধারিণীর সেবা করিতেছেন। সারিয়া উঠিবার কয়েকদিন পর মামীর ফোড়া হইল। ভীষণ যন্ত্রণা। সেই সময়ে মায়ের একটি ডাক্তার ছেলে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। মায়ের অভিপ্রায় মত তিনিই অস্ত্রোপচার ও চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। এখন আর সেবায় অসুবিধা নাই; মা সেবার জন্য একটি গরীব মেয়েকে মাহিনা দিয়া নিযুক্ত করিয়াছেন।

মায়ের স্নেহদৃষ্টি সকল সন্তানের উপরই সমান হইলেও মাকে 'যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন, যখন যেমন তখন তেমন'—'যার পেটে যা সয়'—বুঝিয়া দেখিয়া, শুনিয়া ব্যবস্থা করিতে, খাওয়াইতে, পরাইতে হয়। কিন্তু এমন সাবধানে ও হুঁশিয়ারীর সহিত তিনি তাহা করেন যে, তাহা পরস্পরের ঈর্ষাদ্বেষের কারণ হয় না। কোয়ালপাড়া আশ্রমের অন্যতম প্রধান কর্মী স্বামী বিজ্ঞানন্দ (রাজেন মহারাজ) একদিন মায়ের বাড়ী আসিলেন। মাকে প্রণামান্তর আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া নিবেদন করিলেন যে, তাঁহার কাশী যাওয়ার ইচ্ছা, এখানে আশ্রমে ভাল লাগিতেছে না, মনোমালিন্য চলিয়াছে; শরীরও ভাল নহে। ঐ বিষয়ে মায়ের অনুমতি ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলে মা তাঁহাকে অন্যত্র না গিয়া জয়রামবাটী আসিয়া কিছুকাল তাঁহার কাছে থাকিতে বলিলেন। রাজেন মহারাজের মন প্রফুল্ল হইল এবং কয়েক দিন পরেই মায়ের বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি খুব কাজের লোক, সরলপ্রাণ নিষ্ঠাবান ভক্ত। তাঁহার উপস্থিতিতে মায়ের বাড়ীর কাজকর্মের নানা

প্রকার সুবিধা হইল এবং মায়ের মনও প্রফুল্ল হইয়াছিল। সেই সময়ে আর একটি সন্তান সেখানে থাকিয়া কাজকর্ম দেখাশুনা করিতেছিলেন, রাজেন মহারাজের সঙ্গে তাঁহার খুবই প্রীতিভাব, দুই বন্ধুতে পরমানন্দে একত্র বাস করিতে লাগিলেন। মা প্রত্যহ পূর্বাহ্নে ঠাকুরের পূজান্তে প্রসাদী মিশ্রির সরবৎ একটু খাইতেন, উহা তাঁহার বহুদিনের অভ্যাস, স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল। বলিতে কি, উহাই তাঁহার সকালের প্রধান জলযোগ— পিত্তরক্ষা। পূজান্তে এইটুকু মুখে দিয়া মা সন্তানদের জলখাবার খাওয়াইতেন। মনে পড়ে সেই সুমধুর আহ্বান, 'বাবা! বেলা হয়েছে, জল খাবে এসো!'—স্মরণ করিলে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে, ইচ্ছা হয় 'পাখী হয়ে উড়ে যাই' সেখানে সেই বারান্দায়, যেখানে আসন বিছাইয়া জলের গ্লাস ও কাঁসিতে গুড়-মুড়ি ও পাতায় প্রসাদী ফলমিষ্টি রাখিয়া দরজার দিকে মা চাহিয়া আছেন সস্নেহ নয়নে, ব্যগ্র হইয়া 'বৎসের প্রতীক্ষায় গাভীর ন্যায়'। কিন্তু হায়, আর তো সে ভাগ্য হইবে না, সারা সৃষ্টি খুঁজিলেও পাওয়া যাইবে না সে মাতৃস্নেহ।

ছেলেদের জল খাওয়া হইয়া গেলে মেয়েদের খাইতে দিয়া মা নিজেও একটু গ্রহণ করেন। ভক্তদের আনীত ফলমিষ্টি অপরেই পায়, তিনি সামান্য একটু মুখে দেন মাত্র। চারিটি মুড়িই জল খাওয়া, ইদানীং দাঁত গিয়াছে, চিবাইতে পারেন না। তাই আঁচলে করিয়া মুড়ি লইয়া একটি নোড়া দিয়া সেইগুলি গুড়াইয়া লন আর নবাসনের বৌকে ডাকিয়া বলেন, 'বৌমা, দাও তো একটু নুন-লঙ্কা।'

রাজেন মহারাজ ও অপর ছেলেটি উপস্থিত থাকিলে তাঁহারা ও অন্যান্য ছেলেরা প্রায়ই একসঙ্গে বসিয়া মুড়ি বা ভাত খায়, আনন্দে গল্পগুজব করে, কাজের খাতিরে কদাচিৎ ইহার ব্যতিক্রম— পৃথক্ খাওয়া হয়। কয়েক দিন পর, মা একদিন অপর সন্তানটিকে আড়ালে একলা পাইয়া বলিলেন, 'বাবা, রাজেনের মাথাটা একটু গরম হয়েছে আগুনের তাপে রেঁধে রেঁধে; আশ্রমে বনিবনাও হচ্ছিল না, শরীরটাও খারাপ হয়েছে—সেখানে সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, কাশী চলে যেতে চাইছিল, এখানে এসেছিল বিদায় নিতে। বলে কয়ে রেখেছি, কিছুকাল এখানে থাকলে মাথাটা ঠাণ্ডা হবে, শরীর একটু ভাল হলে আবার আশ্রমে গিয়ে কাজকর্ম ঠিক করতে পারবে; রোজ সকালে প্রসাদী সরবৎ একটু দিই, তাহলে দেহটা ঠাণ্ডা থাকবে।' মা স্নেহার্দ্র কাতর স্বরে এমনভাবে বলিলেন, শুনিয়া তাঁহার মনও বিগলিত এবং রাজেন মহারাজের প্রতি সহানুভূতিতে পূর্ণ হইল। তিনি এই কয়দিন জানিতেই পারেন নাই যে, রোজ মা পূজান্তে রাজেন মহারাজকে স্বয়ং ঘরের ভিতর ডাকিয়া নিয়া মিশ্রির সরবৎ খাওয়াইতেছেন। অপরেও বিশেষ কেহ টের পাইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। পরে তিনি লক্ষ্য করিলেন, মা রাজেনকে ঘরের ভিতর ডাকিয়া লইয়া স্বয়ং একটু সরবৎ মুখে দিয়াই রাজেনের মুখের কাছে সরবতের বাটি ধরেন। রাজেনও তৎক্ষণাৎ প্রসাদী সরবৎ পান করিয়া বাটিটি ধুইয়া আনিয়া যথাস্থানে রাখিয়া বাহির হইয়া যান। অপর সন্তানটি মায়ের স্নেহমমতা দেখিয়া অতীব মুগ্ধ হইলেন এবং মায়ের সরবৎ কম করিয়া খাওয়া তাঁহার মনোমত না হইলেও কিছু প্রতিবাদ করিলেন না। তাঁহার মনে যাহাতে দ্বিধাভাব না আসে, সেইজন্যই তো মা নিজেই বলিয়া কহিয়া তাঁহার মন ঠিক করিয়া দিলেন। রাজেন মহারাজ যেরূপ কঠোরী ও মায়ের প্রতি অপরিসীম ভক্তিনিষ্ঠ ছিলেন, তাহাতে তিনিও সহজে এইরূপে সরবৎ খাইতে রাজী হন নাই। কিন্তু মায়ের নির্দেশ আর খাওয়ার ব্যাপারে তাঁহার মমতার

হাত কেহই এড়াইতে পারেন নাই—কেহই পারিতও না। রাজেন মহারাজ দুই মাসের উপর থাকিয়া অনেকটা সুস্থ সবল হইয়া পুনরায় কোয়ালপাড়া আশ্রমে গিয়া গুরু কার্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মায়ের দেহত্যাগের পর তাঁহার জন্মস্থানে মন্দির নির্মাণের সময় রাজেন মহারাজ অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া আরব্ধ কার্য সুসম্পন্ন করিতে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিলেন। মন্দির প্রতিষ্ঠার পর তিনিই প্রথম সেবাইত নিযুক্ত হন এবং অতিশয় শ্রদ্ধা-ভক্তিসহ সকল কার্য সুপরিচালনা করিয়া বৎসরাধিক কাল পরে চিরতরে মায়ের পদপ্রান্তে মিলিত হন। অত্যধিক পরিশ্রমে ম্যালেরিয়াতে আহারাদির কঠোরতায় অল্প বয়সেই এই নিষ্ঠাবান কর্মী-সেবকের দেহত্যাগে সারদানন্দ মহারাজের গভীর দুঃখ হয়। মহারাজ তখন কাশীতে ছিলেন। ব্যথিত হৃদয়ে সেখানকার অধ্যক্ষগণকে বলেন, 'ছেলেদের খাওয়া-থাকার ভাল ব্যবস্থা করো, তাদের যত্ন করো। আপ, এমন ছেলেটি ভাল করে খেতে না পেয়ে অল্প বয়সে মারা গেল খেটে খেটে!' দেহত্যাগকালে রাজেন মহারাজের অত্যুচ্চ ভাবভক্তির পরিচয় প্রকাশ হওয়ায় উপস্থিত সকলের বিস্ময় ও পরম পুলক জন্মিয়াছিল। [ক্রমশঃ

কে তুমি 'রসিক'

ভীমপলশ্রী—একতাল

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

কে তুমি "রসিক" মেথরের বেশে বল বল মোরে ওগো ভাগ্যবান।
কোন্ শক্তিবলে ঠাকুরে চিনিলে, তাঁর পদতলে সঁপিলে পরাণ॥
কত গুণী জ্ঞানী যাঁহাকে দেখিয়া
চিনিতে নারিল বিদ্যা বুদ্ধি দিয়া
তুমি তো মূর্খ, কেমনে বুঝিলে, ঠাকুর যে নিজে ভগবান॥
গোপনে ধরিয়া প্রভুর চরণ
কাতরে মাগিলে তাঁহার শরণ
ভবভয়হারী শ্রীরামকৃষ্ণ তোমারে করিলা অভয় দান।
অন্তিমকালে তুলসী-তলায়
দিলা দরশন অশেষ কৃপায়
গাহি' আনন্দে "রামকৃষ্ণ" নাম, আনন্দধামে করিলে প্রয়াণ॥

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

অনুবাদক : স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

টীকা : **বিষ্ণুং** ব্যাপনশীলং ত্রিবিধপরিচ্ছেদশূন্যং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। **স্তোষ্যে** আরোপিতসকলাধিষ্ঠানতয়া সর্বাত্মকত্বেনানন্তকল্যাণগুণতয়া বস্তুতো নির্বিশেষচিন্মাত্র-স্বরূপতয়া চ কীর্তয়িষ্য ইতি প্রতিজ্ঞা। নন্থ লক্ষণপ্রমাণাভ্যাং বস্তুসিদ্ধেঃ কীর্তনীয়স্য বিষ্ণোঃ কিং লক্ষণং কিং চ প্রমাণম্ ইত্যাশঙ্ক্য জগৎকারণত্বম্—'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদিশ্রুত্যুক্তং লক্ষণমাহ—**জগদাদিম্** ইতি। জগতঃ বিয়দাদিপ্রপঞ্চস্য আদিং কারণং, সকলজগদুপাদানত্বে সতি তৎকর্তৃত্বমিতি বিবক্ষিতম্। ততশ্চাব্যাকৃত-প্রধান-পরমাণ্বাদৌ তটস্থেশ্বরে চ নাতিব্যাপ্তিঃ। নন্থ ইদম্ অভিন্ননিমিত্তোপাদানত্বং কুত্রাপ্য-প্রসিদ্ধম্, ঘটাদিষু সর্বত্র উপাদাননিমিত্তয়োর্ভেদস্যৈব দর্শনাৎ। সর্বোপাদানত্বমপ্যপ্রসিদ্ধং, মৃত্তিকাদেঃ একৈকোপাদানত্বস্যৈব দর্শনাৎ। ততঃ কথম্ অপ্রসিদ্ধং লক্ষণমুচ্যতে, প্রসিদ্ধ-স্যৈব লোকে লক্ষণত্বদর্শনাদিতি চেদ্ ? উচ্যতে,—পৃথিব্যপ্‌তেজোবায়বো বিপ্রতিপন্নাঃ, উৎপত্তিমন্তঃ, পৃথিবীত্বাদেঃ, মৃদুৎপন্নঘট-চন্দ্রকান্তোৎপন্ন-জলারণ্যোৎপন্নাগ্নি-ব্যজনোৎপন্ন-পবনবদ্ ইতি কার্যত্বমনুমায়, আকাশস্যাপি ভূতত্বহেতুনা কার্যত্বানুমানানন্তরং 'পৃথিব্যা-দীনি সদুপাদানানি, তদুপরক্ততয়া প্রতীয়মানত্বাদ্',—যন্নিয়মেন যদুপরক্ততয়া প্রতীয়তে, তৎ তদুপাদানং,যথা ঘটাদি মৃদাদ্যুপাদানমিতি লাঘবাৎ সর্বস্য জগত একসৎ-প্রকৃতি-কত্বসা তত এবাভিন্ন-নিমিত্তোপাদানকত্বস্যাপি সিদ্ধি ভবতি।

অনুবাদ : **'বিষ্ণুং'**—সর্বব্যাপক ত্রিবিধ-পরিচ্ছেদ-রহিত (দেশগত, কালগত ও বস্তুগত সীমাশূন্য) ব্রহ্মকে, ইহাই অর্থ। **'স্তোষ্যে'**—আরোপিত সববস্তুর অধিষ্ঠানরূপে তিনি সর্বাত্মক ও অনন্ত-কল্যাণগুণ-সম্পন্ন হইয়াও বস্তুতঃ নির্বিশেষ-চিন্মাত্র-স্বরূপে বিরাজমান এইভাবে তাঁহার স্তুতি-কীর্তন করিব—[* ইহাই প্রতিজ্ঞা, অর্থাৎ প্রস্তাবিত বিষয়।

(শঙ্কা) : লক্ষণ ও প্রমাণ প্রদর্শন দ্বারাই বস্তুসিদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব কীর্তনীয় বিষ্ণুর লক্ষণ ও প্রমাণ (তদ্বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ) কি আছে ?

(সমাধান) : পূর্বোক্ত শঙ্কার উত্তরে বলা যায় যে, জগৎকারণত্বই বিষ্ণুর লক্ষণ - ইহাই মনে রাখিয়া আচার্য 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' (তৈঃ উঃ ৩।১) 'যাহা হইতে এই ভূতসমূহ জাত হয়' ইত্যাদি শ্রুতি-কথিত (তটস্থ) লক্ষণ বলিতেছেন—], **জগদাদিম্**—জগৎ অর্থাৎ আকাশাদি প্রপঞ্চের আদি অর্থাৎ কারণ। সর্বজগতের উপাদান হইয়াও তিনি উহার কর্তা—ইহাই

---

* টীকার বিচারাংশের অনুবাদ [ ]—এইরূপ বন্ধনীর মধ্যে রাখা হইয়াছে, যাহাতে বন্ধনী-বহির্ভূত অংশ পাঠ করিয়াও সকলে মূল শ্লোকগুলির অর্থ সহজেই অবগত হইতে পারেন। —সঃ

এইস্থলে বিবক্ষিত। [অতএব (ব্রহ্ম জগতের অভিন্ন-নিমিত্ত-উপাদান কারণ বলাতে) অব্যাকৃত, (সাংখ্যোক্ত) প্রধান, (নৈয়ায়িক-সম্মত) পরমাণু আদি এবং তটস্থ (সগুণ) ঈশ্বরে (লক্ষণের) অতিব্যাপ্তি হয় না।

(শঙ্কা): এইরূপ অভিন্ন নিমিত্ত- ও উপাদান-কারণত্বের লোকে কোথাও প্রসিদ্ধি নাই। কারণ, ঘটাদি কার্য পদার্থের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ সর্বত্র ভিন্নই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সর্ব-পদার্থের একই উপাদান—এইরূপও দেখা যায় না (প্রসিদ্ধি নাই); কারণ, মৃত্তিকাদি এক একটি ভিন্ন ভিন্ন কার্যেরই উপাদান হয়. এইরূপই দেখা যায়। অতএব অপ্রসিদ্ধ লক্ষণ কিরূপে বলিতেছ ? কারণ, লোকে প্রসিদ্ধ কিছুরই লক্ষণত্ব দেখা যায়।

(সমাধান): এইরূপ শঙ্কার উত্তরে বলা হইতেছে, (চারিটি অনুমানের দ্বারা সিদ্ধান্তী বলিতেছেন) বিচার্য বিষয় পৃথিবী অপ্ তেজ ও বায়ু—উৎপত্তিমান,—পৃথিবীত্ব জলত্ব আদি হেতুবশতঃ—মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘট, চন্দ্রকান্ত মণি হইতে জল, অরণি (কাষ্ঠ) হইতে উৎপন্ন অগ্নি ও ব্যজন-সমুত্থিত বায়ুর ন্যায় (ইহারা দৃষ্টান্ত)। এইরূপে চারি ভূতের কার্যত্ব অনুমান করিয়া ভূতত্ব-হেতুবশতঃ আকাশও একটি কার্য -এইরূপ অনুমানসহায়ে বুঝিতে হইবে। তদনন্তর (পুনরায় অনুমান দেখাইতেছেন) পৃথিবী আদি (পঞ্চভূত) সত্তারূপ উপাদান-বিশিষ্ট, কারণ উহারা সত্তাসহ তাদাত্ম্যক অর্থাৎ অভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়। যাহা (যে বস্তু) নিয়মপূর্বক যাহার সহিত অভিন্নরূপে প্রতীত হয়, তাহা সেই পূর্বোক্ত বস্তুর উপাদান—যেমন ঘটাদি বস্তুর মৃত্তিকাই উপাদান। বহু উপাদান স্বীকার করা অপেক্ষা এক উপাদান স্বীকার করিলে লাঘব হয় (অন্যথা গৌরব-দোষ হয়) বলিয়া সর্বজগতের এক সৎ-ই প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান, এবং সেই লাঘবতার জন্যই সৎ-এর সর্বজগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদানত্বেরও সিদ্ধি হইয়া থাকে। [ক্রমশঃ]

মন চল নিজ নিকেতনে

শ্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়

ভেবে দেখ মন, কেন অকারণ সংসার-মদে মাতাল হ'লে !
কি কাজে আসিলে, কি কাজ করিলে, সেদিনের কথা গেলে কি ভুলে !
পদ টলমল, বুদ্ধি বিকল, নিজ ঘরে এবে ফিরিবে কিসে ?
পঙ্ক-কুণ্ড মাঝে আকণ্ঠ ডুবিয়ে হায় হায় তুমি হারালে দিশে।
জগতের পিতা, ভব-ভয়-ত্রাতা, চরণে তাঁহার শরণ নিলে,
ঘুচে যাবে ভয়, তিনি দয়াময়, প্রাণ, মন সবই তাঁহারে দিলে !
সব জ্বালা যায়, তাঁহারি কৃপায়, মনের বেদনা তাঁহারে বল,
সব তেয়াগিয়া, সকল ভুলিয়া, তাঁহার আলয়ে ফিরিয়া চল।

'মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না'

স্বামী বলরামানন্দ

পূর্বার্ধ

(১)

কলিকাতার অন্তর্গত শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের 'পরা ও অপরা বিদ্যা' বিষয়ে আলোচনা হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ জনৈক ভক্তকে ভক্তপ্রবর রামপ্রসাদের 'কে জানে মন কালী কেমন' গানটি গাহিতে বলিলেন। গীতের 'আমার প্রাণ বুঝেছে মন বোঝে না' এই অংশটি গাহিবার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ গায়ককে বাধা দিয়া বলিলেন, "উহুঁ, উল্টোপাল্টা হচ্ছে; 'আমার মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না'— এইরূপ হইবে, মন তাঁকে (ঈশ্বরকে) জানতে গিয়ে সহজেই বুঝে যে, অনাদি অনন্ত ঈশ্বরকে ধরা তার কর্ম নয়, প্রাণ কিন্তু ঐকথা বুঝিতেই চাহে না, সে কেবলি বলে— কি করে আমি তাঁকে পাব।"[১]

(২)

শ্রীরামকৃষ্ণের ঐরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া ডাঃ মহেন্দ্রলাল ঠাকুরের কথায় সায় দিয়া বলিলেন, "ঠিক্ বলেছ, মন ব্যাটা ছোট লোক, একটুতেই পারব না, হবে না, বলে বসে; কিন্তু প্রাণ ঐ কথায় সায় দেয় না বলেই ত যত কিছু সত্যের আবিষ্কার হয়েছে এবং হচ্ছে।"[২]

ডাঃ মহেন্দ্রলালের মন্তব্যটি চিন্তা করিলে মনে হয় যে, তিনি ঠাকুরের ঐ ব্যাখ্যা স্বীয় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির অনুরূপ একটু অন্যভাবেই বুঝিয়াছিলেন। তিনি 'প্রাণ বোঝে না' কথাটির অর্থে সাধারণ তত্ত্বজিজ্ঞাসু অথবা বৈজ্ঞানিকদের যে সত্য-জিজ্ঞাসার টান বা প্রেরণা (intellectual curiosity) থাকে উহাকেই বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার "প্রাণ ঐ কথায় সায় দেয় না বলেই ত যত কিছু সত্যের আবিষ্কার হয়েছে এবং হচ্ছে" এই কথা হইতেই ইহা অনুমান করা যায়। তিনি বৈজ্ঞানিকদের সত্যজিজ্ঞাসার আগ্রহ দেখিয়াই নিজমত প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার ধারণা যে, যদিও জগতের যাবতীয় সত্যান্বেষকগণ মনে মনে বুঝেন যে, সত্যের আবিষ্কার করা ছেলেখেলা নয়, তৎসত্ত্বেও তাঁহাদের প্রবল সত্যানুরাগ তাঁহাদের হতাশ হইয়া বসিয়া থাকিতে দেয় না। এজন্যই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দেশে বিজ্ঞানের যাবতীয় আবিষ্কার হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে।

(৩)

ডাঃ মহেন্দ্রলাল যদিও এইরূপ বুঝিয়াছিলেন, তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণ, পৃথিবীর যাবতীয় সাধকদের হৃদয়ে ভগবদ্দর্শন বা সত্যলাভের প্রতি যে প্রবল টান থাকে, সেই তীব্র জিজ্ঞাসা বা মুমুক্ষা-শক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই 'প্রাণ বোঝে না' কথাটির ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের মনে হয়। এইরূপ সত্যানুরাগ বা ভগবানের প্রতি টান সাধকের জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার ফল, এবং উহা বিবেক ও বৈরাগ্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাকেই 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' সূত্রে ভগবান

---

১ স্বামী সারদানন্দ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যভাব, পৃঃ ২৭৪

২ তদেব পৃঃ ২৭৩-৭৫

বাদরায়ণ ব্যাস নির্দেশ করিয়াছেন। যে প্রাণের টানে শ্রীরামকৃষ্ণ শাণিত খড়্গে নিজ দেহের নাশ করিতে চাহিয়াছিলেন, যে প্রাণের টানে স্বামী বিবেকানন্দ আত্মীয়-স্বজনকে দারিদ্র্যের কবলে ফেলিয়াও কঠোর সাধনায় চরম সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বব্যাপী কার্যে নিজেকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সে এই সত্যান্বেষণের প্রবল টান (Spiritual hankering for Truth)। বাস্তবিক, আমাদের প্রেমের ঠাকুর বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন 'পরা বিদ্যার' কথা, কিন্তু ডাঃ মহেন্দ্রলাল বুঝিলেন 'অপরা বিদ্যার' কথা।

তবে, তিনি যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহাও ভুল বলা যায় না। কেননা স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, মানুষ অগ্রসর হয় "অসত্য হইতে সত্যের দিকে নয়, নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যের দিকে…।" অতএব সাধারণ তত্ত্বজ্ঞ বা বৈজ্ঞানিকদের সত্যজিজ্ঞাসা, চরম সত্যজিজ্ঞাসারই প্রাথমিক অবস্থা বলা যাইতে পারে।

(৪)

উপরোক্ত আলোচনা শুনিয়া কোন ভক্ত-সাধক হয়ত বলিবেন, যাঁহারা জ্ঞানী শাস্ত্রাদি আলোচনা করেন, তাঁহাদের জন্য 'সত্য-জিজ্ঞাসা'র এই ব্যাখ্যা হইতে পারে; কিন্তু আমরা যাঁহারা 'বোঝা-বুঝির বুঁচকি' মাথায় বহিতে চাই না অর্থাৎ জ্ঞানবিচারের পাল্লায় পড়িতে চাই না, তাহাদের জন্য ঠাকুরের ভাব অনুসারে 'প্রাণ বোঝে না' কথাটির ব্যাখ্যা কি হইতে পারে না? ঠাকুর আমাদেরও ত বটে। তাঁহাদের বলি, ঠাকুর আমাদের সকলেরই। দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর ভগবানকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিবার পরে ভক্তেরও মন বুঝে যে, ভগবানকে পাওয়া মুখের কথা নয়, তবুও সে ভগবানকে বই সংসারকে ভালবাসিতে যায় না। খানদানী চাষার মতন সে আমরণ ভগবানকেই ডাকিতে থাকে। এই 'ভালবাসার টান' তাহাকে ক্রমে ক্রমে ভগবানের দিকে অগ্রসর করাইয়া, এবং তাহার অজ্ঞানের আবরণ ছিন্ন করিয়া ইষ্টের প্রসন্নমুখ দর্শন করাইয়া দেয়। সেইজন্য, ভক্তের মন বুঝিলেও তাহার 'প্রাণ' বা 'এই ভালবাসার টান' বোঝে না, অর্থাৎ তাহাকে হতাশ হইয়া সংসারাভিমুখী হইতে দেয় না; বরং ভগবানকেই আঁকড়াইয়া ধরিতে বাধ্য করে।

একজন পাশ্চাত্য ভক্তও বলিয়াছেন, "ভগবান বাক্য ও বুদ্ধি বর্ণনাতীত, কেননা, তিনি আমাদের ধারণাশক্তির বাহিরে। তাঁহাকে [বুদ্ধির মাধ্যমে] জানা যায় না বটে, কিন্তু প্রেমের দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়, জানা যায়, তাঁহার সঙ্গে একীভূতও হওয়া যায়।"[৩] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণও এই রকম কথা বলিয়াছেন।[৪] স্বামী বিবেকানন্দও বলিয়াছেন, "বুদ্ধি, বিচারশক্তি… আমাদিগকে কয়েক পদ অগ্রসর করাইয়া দেয় মাত্র, কিন্তু হৃদয়দ্বার দিয়াই মহাশক্তির প্রেরণা আসিয়া থাকে। প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে—জগতের সকল রহস্যই প্রেমিকের নিকট উন্মুক্ত।"[৫] তিনিই অন্যত্র বলিয়াছেন, "প্রাণের শেষ এবং সর্বোত্তম প্রকাশ হইল 'প্রেম'। যে মুহূর্তে প্রাণ হইতে প্রেম উৎপন্ন করিতে পারিবে, তখনই তুমি মুক্ত।"[৬] অতএব বুঝা যাইতেছে যে, ভক্তের এই প্রেমের

---

৩ Tr. Clifton Wolters, *The Cloud of the Unknowing*, Penguin, (1970), p.20

৪ গীতা, ১১।৫৪

৫ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, (১ম সং) পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১১৬

৬ তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৭৩

মহাশক্তিই প্রাণ। যে প্রেমের টানে গোপীগণ কুল-শীল, মান-মর্যাদা ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন-বিহারীর প্রেমে উন্মাদিনী হইয়াছিলেন; যে প্রেমের টানে মীরাবাঈ রাজবৈভব পর্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন; যে প্রেমের টানে দক্ষিণ আমেরিকা-নিবাসিনী সেন্ট রোজা অফ্ মেরী ভগবান যীশুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, সে এই অবুঝ প্রাণেরই টান।

(৫)

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, প্রাণের অর্থ 'সত্য জিজ্ঞাসার টান'ই হউক, 'ভালবাসার টান'ই হউক, বা তীব্র মুমুক্ষাই হউক, "যন্মনসা ন মনুতে", "অবাঙ্‌মনসগোচরম্", "অপ্রজ্ঞঃ", "সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ম্", "প্রভু বাক্যমনাতীত", "ঈশ্বর এ মনের ও বুদ্ধির গোচর নন", ইত্যাদি শত শত বাক্যে যখন শ্রুতি-স্মৃতি এবং অবতারগণ সেই পরম সত্য মানববুদ্ধির অগোচর এ কথাই বলিয়াছেন, তখন পৃথিবীর যাবতীয় সাধকগণের 'প্রাণ বোঝে না' কেন? তাঁহারা সত্য বা ভগবান লাভের জন্য অত ব্যাকুল হন কেন?

উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের ভিতরে এমন একটি প্রেরক-শক্তি আছে যাহার বলে সাধকগণ সাধন করিতে বাধ্য। সাধকেরা ত বেশ বুঝেন যে, সত্য বা ভগবানলাভ তাঁহাদের মন ও বুদ্ধির শক্তির বাহিরে; কিন্তু এই শক্তি তাঁহাদের ইষ্টলাভের জন্য পাগল করিয়া তুলে। "এই শক্তিই হইতেছে প্রাণ। সেই সত্য শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সত্য প্রাণে প্রতিষ্ঠিত।"[৭] এই প্রাণশক্তিযুক্ত সত্য অথবা পরমাত্মাই জীবমাত্রে প্রতিষ্ঠিত। এই শক্তি কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে ভূতমাত্রে অবস্থিত বলিয়া তান্ত্রিক ও যোগিগণ বলিয়া থাকেন। এই শক্তিই ঘড়ির প্যাঁক দেওয়া স্প্রিং-এর মত সাধকদের সাধনায় উৎস। জনসাধারণের হৃদয়ের বিবেক-তাড়না (prick of conscience or super-ego) ইহারই অতি অস্পষ্ট বাণী। "আমরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই বাণীর অনুসরণ করিতেছি।...যতক্ষণ সেই বাণীর অনুসরণ করি, ততক্ষণই আমরা নীতিপরায়ণ।...সমুদয় মানবজীবন, সমুদয় প্রকৃতি কেবল সেই মুক্তভাবকে অভিব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে মাত্র; ... সাধু সেই দিকে চলিয়াছেন, তিনি না গিয়া থাকিতে পারেন না, তাঁহার পক্ষে উহা কিছু প্রশংসার কথা নহে।"[৮] এই দৈবী মহাশক্তির অনুপ্রেরণার জন্যই 'প্রাণ বোঝে না' একথা বলা যাইতে পারে। এই অচিন্ত্যপ্রাণশক্তির বন্যার আবেগেই জ্ঞানী সাধকের 'বোঝাবুঝির বুঁচকি'টাও পরে কোথায় বহিয়া যায় কে জানে?

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "Each soul is potentially divine," অর্থাৎ 'আত্মামাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম'। সেই অনন্ত শক্তিমান ব্রহ্মসিংহ সকল ভূতমাত্রেই প্রতিষ্ঠিত। সেই পরমাত্মাকেই শ্রুতিতে প্রাণ বলা হয়।[৯] এবং এই প্রাণ বা প্রজ্ঞাত্মাই প্রকৃতির মায়াজাল ক্রমে ক্রমে ছিন্ন করিয়া সাধনার শেষ অবস্থায় পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হয়।[১০] কপিলাদির মতে এইরূপ ক্রম-বিকাশও প্রকৃতিরই ধর্ম।[১১] জীব আজ নিজেকে যতই দীনহীন মনে করুক না কেন, আন্তরিক সাধনার

৭ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৫।১৪।৪

৮ বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৮৮, ৮৯

৯ "স এষ প্রাণঃ এব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দঃ অজরঃ অমৃতঃ।" কৌষীতকী উপনিষদ্, ৩।৮

১০ বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ১২০ দ্রঃ

১১ সাংখ্যকারিকা, ১৭, ২২

বলে "ব্রহ্মসিংহ তার ভেতরে জেগে ওঠেন। ব্রহ্মজ্ঞানই হচ্ছে জীবের goal (লক্ষ্য)। তবে নানা পথ— নানা মত।··· নিজের স্বরূপ লাভে আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত সকলেই গতিশীল।··· মানুষজন্ম লাভ ক'রে মুক্তির ইচ্ছা প্রবল হ'লে ও মহাপুরুষের কৃপালাভ হ'লে—তবে আত্মজ্ঞান-স্পৃহা বলবতী হয়।...যে সব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, যে সুখ-দুঃখ ভালমন্দের চঞ্চল প্রবাহে ধীর স্থির শান্ত সমনস্ক···সেই 'নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী'—মহাবলে জগজ্জাল ছিন্ন ক'রে মায়ার গণ্ডি ভেঙ্গে সিংহের মতো বেরিয়ে পড়ে।"[১২]

এইভাবে জীবমাত্রেরই প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ হইতে থাকে, একথা স্বামীজী স্পষ্টভাবে বুঝাইয়াছেন। সেই বিকাশিনী শক্তিই প্রাণের বল। উহাই সত্য-জিজ্ঞাসা, তীব্রমুমুক্ষা বা ভগবদনুরাগরূপে সাধকদের জীবনে অভিব্যক্ত হয়। উহাই আমাদের অন্তর্নিহিতা, চিরন্তনী আত্মশক্তি, বা কুণ্ডলিনী শক্তি; কিন্তু জীববিশেষের বাসনা অনুসারে কম বা বেশী পরিমাণে অভিব্যক্ত।

অতএব, এইরূপ অনন্তশক্তিমান ব্রহ্মসিংহ যখন সকল জীবের ভিতরেই বিদ্যমান, তখন 'মন বুঝিলেও প্রাণ বুঝিবে' কি করিয়া? যে-শক্তি বিবেক-তাড়নায় (prick of conscience or censor) রুদ্র-স্বরূপে মানবমাত্রেই বিদ্যমান; যে-শক্তি সাধকের ভিতরে 'অন্য-সংস্কার-প্রতিবন্ধী নিরোধসংস্কার' এবং সত্যানুরাগরূপে নিহিত; যে-শক্তি জ্ঞাননিষ্ঠ সাধকদের সাধনপ্রসূত আত্মনিষ্ঠা-জনিত বীর্যে বলবান বেদান্ত-কেশরীর গর্জনরূপে অভিব্যক্ত; সেই মহাশক্তির প্রবল আবেগেই যে সাধকদের "মন বুঝিলেও প্রাণ বোঝে না" তাহা সুস্পষ্ট।

সুতরাং, 'মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না' এই গীতাংশের শ্রীরামকৃষ্ণকথিত ব্যাখ্যার এইরূপ অর্থই আমাদের নিকট সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

[ক্রমশঃ]

১২ বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ১৮০

ড্রাগনের দেশ ভুটান

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দে

[পূর্বানুবৃত্তি]

সংসদীয় আইন অনুযায়ী সমস্ত ক্ষমতা Druk Gyalpo বা ভুটানের মহারাজার উপর ন্যস্ত। কিন্তু সর্বময় কর্তা হইলেও মহারাজার নীতি হইল দেশের প্রচলিত ধর্মীয় রীতিনীতি ও আইনানুগ রাজ্যশাসন। ভুটানে একটি সুপ্রচলিত প্রবচন আছে, "যে রাজা ধর্মপথ নির্বাচন করিয়া লইবেন, তিনি কি ইহজন্মে, কি পরজন্মে উভয়ত্র সুখ ভোগ করিবেন।" প্রজারাও রাজার আচরিত কর্ম অনুসরণ করিতে সচেষ্ট হইবে, পক্ষান্তরে রাজাও ন্যায়পরায়ণ হইবেন।

পূর্বে বলা হইয়াছে, ভুটানের শাসনকার্য ধর্ম-ভিত্তিক ছিল। ধর্মরাজা একাধারে শাসক ও ধর্মীয় প্রধান ছিলেন। পরবর্তী কালে রাজ্যশাসন ও ধর্ম-পরিচালনা এই উভয় কার্য যথাক্রমে দেবরাজা ও ধর্মরাজার মধ্যে বণ্টন করা হইয়াছিল। এই দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটিল ১৯০৭ সালে। টোংসা

ত্সং-এর শাসনকর্তা Ugen Wangchuk প্রধান প্রধান সর্দার ও যাজকদিগের সহায়তায় বংশ-পরম্পরাগত রাজা হইয়া ভুটানের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এইরূপে রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব Druk Gyalpo বা ভুটানের রাজার উপর ন্যস্ত হইল।

ভূতপূর্ব মহারাজ Jigmi Dorji Wangchuk জাতীয় পরিষদের উপর প্রকৃত ক্ষমতা অর্পণ করিলেন যাহাতে জনসাধারণ দেশের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিতে পারে। এই পরিষদের উপর আইন প্রণয়ন, মন্ত্রিসহ প্রধান প্রধান কর্মচারী নিয়োগ এবং জাতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগ্রহণ ইত্যাদি কর্মসূচী নির্ভর করে। পরিষদের সভ্যদের বাক্‌স্বাধীনতা এমন কি রাজার কার্যের সমালোচনা করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। পরিষদের ১৫০ জন সভ্যের মধ্যে ১০০ জন সাধারণের দ্বারা নির্বাচিত, ১০ জন যাজক সম্প্রদায়ের ও বাকী ৪০ জন সরকারের মনোনীত সভ্য। যখন পরিষদ বন্ধ থাকে তখন যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাজা ও মন্ত্রিগণ রাজকীয় পরামর্শ সমিতির মত গ্রহণ করেন। এই সমিতির আট জন সভ্যের মধ্যে মাত্র একজন রাজার এবং বাকী সাত জন লামা ও জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত। রাজা শাসন পরিচালনা করেন পাঁচজন মন্ত্রীর সহায়তায়। এযাবৎ বৈদেশিক ব্যাপার রাজার নিজের অধীনে ছিল, কিন্তু সম্প্রতি একজন মন্ত্রীর উপর এই কার্যের ভার দেওয়া হইয়াছে। বর্তমান মহারাজাও পিতার সহিত গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্যে অংশগ্রহণ করিতেন। ১৯৭২ মে মাসে রাজকীয় আড়ম্বরের সহিত বর্তমান মহারাজকে Tongsa Penlop বা টোংসার শাসনকর্তা নিয়োগ করা হইয়াছিল। ভুটানে টোংসার পেনলোপ হওয়ার অর্থ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়া।

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সমগ্র ভুটানকে ১৫টি জেলায় বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক জেলায় আছেন একজন Dzongda বা কালেকটার এবং একজন Trimpon বা ম্যাজিস্ট্রেট। ইঁহাদের কার্য যথাক্রমে রাজস্ব আদায় ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা। জেলার মঙ্গল বিধান ও দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার ইঁহারা করেন। অবশ্য সমস্ত বিচার্য বিষয় প্রধান বিচারালয়ে প্রেরণ করা চলিবে। ভুটানের সাধারণ্যে এখনও গ্রামীণ ব্যবস্থা প্রচলিত। Gophu বা মণ্ডল গ্রামের ছোট ছোট বিবাদের মীমাংসা করেন এবং Dzongda-কে খাজনা আদায়ের সহায়তা করেন। গকু প্রথমে Chimmi বা Circle Headman-এর নিকট অভিযোগাদি পেশ করিবে। Chimmi রা Chhozang বা Parliament-এর অধিবেশনে যোগদানের অধিকারী এবং ইহার সিদ্ধান্ত জনসাধারণকে জ্ঞাপন করেন।

বৌদ্ধধর্ম ভুটানের রাষ্ট্রীয় ধর্ম। হীনযান ও মহাযান উভয় মতই এখানে প্রচলিত। তন্ত্রযান মতাবলম্বীর সংখ্যাও অল্প নহে। ভুটানে বৌদ্ধধর্ম প্রথম প্রচার করেন ভারতীয় প্রচারক শ্রীপদ্মসম্ভব। প্রায় খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি যে মতবাদ প্রচার করেন তাহার নাম Nyingma বা নির্বাণ-বাদ। ভুটানের অধিকাংশ অধিবাসী তিব্বতীয় "ড্রুকপা" সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহার প্রবর্তন করেন ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দে Drukgom Shigpo নামে এক তিব্বতীয় গুরু। ভুটানের দক্ষিণাঞ্চলে বসবাসকারী নেপালীরা অধিকাংশ হিন্দু মতাবলম্বী। অবশ্য কিছু সংখ্যক নেপালী বৌদ্ধমত পোষণ করে। ইঁহাদের মধ্যে লামা, তামাং, সেরপা এবং গুরুং-রাই প্রধান।

ভুটানে লামাসম্প্রদায়ের দুইটি বিভাগ —প্রথম গালোঙ লামা (Galong)। ইঁহারা সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী, স্ত্রীলোক বা গৃহীদের সংস্পর্শে আসেন না। ইঁহারা কেবল ধর্মচর্চা করেন

এবং রাজা ও রাজ্যের কল্যাণ কামনায় প্রয়োজন-মত পূজা ও প্রার্থনা করেন। ভারতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি গিরি যখন ভুটানে আসেন তখন এই লামাদের সমবেত প্রার্থনায় বৃষ্টিপাত রোধ হইয়াছিল। এইসব লামা বাল্যকাল হইতেই মঠজীবন যাপন করেন এবং বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র পাঠ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান শিক্ষা গ্রহণ করেন। গালোঙ লামা স্ত্রী পুরুষ উভয়েই হইতে পারে, তবে স্ত্রীলামাদের মঠ পৃথক্‌। দ্বিতীয় বিভাগে পড়েন লোপেন (Lopen) বা সাধারণ লামা। ইঁহারা আমাদের দেশের পুরোহিত সম্প্রদায়ের মত বিবাহ করিতে পারেন—গৃহস্থের পূজা পাঠ, শ্রাদ্ধ, নব জাতকের নামকরণ ইঁহারা করেন। ভুটানীরা বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে ভূতপ্রেতও মানে। তন্ত্র, মন্ত্র, ঝাড়, ফুঁক প্রভৃতিতে প্রায় সকলেই বিশ্বাসী। এ বিষয়ে তিব্বতীয়দের সহিত ইহাদের খুব মিল আছে। অসুখ হইলে চিকিৎসক অপেক্ষা লামাদের উপর ইহাদের বেশী আস্থা। লামারা সমাজের অপরিহার্য অংগ এবং জনসাধারণের উপর ইঁহাদের বিশেষ প্রভাব আছে। শিক্ষিতেরাও ইহার ব্যতিক্রম নহে। ভুটানে নব জাতকের নামকরণ করেন লামারা লক্ষণ দিন ক্ষণ তিথি বিচার করিয়া। পুত্রকন্যার নামে পিতৃমাতৃবংশের কোন পরিচয় থাকে না। ভুটানীদের উপাধি বা বংশ পরিচয় সংরক্ষণের রীতি নাই। এইজন্য নাম নির্বাচনের পরিধি বড়ই সীমিত। একই নাম বহু ব্যক্তির থাকা বিচিত্র নহে। তবে সাধারণতঃ ভুটানীরা নামের শেষে ড্রুকপা (ভুটানী) এই উপাধি ব্যবহার করে এবং মেয়েরাও নিজেদের ড্রুকপানী বলে। দোরজী নাম একটু সম্ভ্রমসূচক, এইজন্য ইহার ব্যবহার বেশী। দোরজী অর্থে বজ্রপাণি ইন্দ্রকে বোঝায়। জিগ্‌মি অর্থাৎ নির্ভীক, ওয়াংচুক অর্থাৎ প্রভুত্বব্যঞ্জক, এই সব নাম সাধারণতঃ রাজ-বংশীদের মধ্যে ব্যবহৃত হয়।

ভুটানে সাধারণতঃ এক বিবাহ প্রচলিত, তবে বহু বিবাহ, বিশেষ করিয়া শ্যালিকা বিবাহ নিন্দনীয় নহে। স্ত্রীরা পরস্পরের ভগ্নী হইলে তাহাদের মধ্যে মনোমালিন্য কম হইবে ইহা কারণ হিসাবে দেখান হয়। স্বামী-স্ত্রীর বনিবনা না হইলে গাফা (Gapha) বা মোড়ল শাস্তি বিধান করেন। Polyandry অর্থাৎ এক স্ত্রীর একাধিক স্বামী আজকাল বিরল। তিব্বত-সংলগ্ন অংশে এই প্রথা হয়তো আজও কিছু থাকিতে পারে। ভুটানীদের জমি বড়ই প্রিয়, যাহাতে জমি ভাইদের মধ্যে বিভাগ না হয় এইজন্য পাহাড়ী সমাজে Polyandry প্রথার সমধিক প্রচলন ছিল। বিবাহপ্রথা ভুটানে খুবই সরল। বিবাহ হওয়া ও বিবাহ-বিচ্ছেদ হওয়া দুইই ভুটানে কোনো সমস্যাই নহে। কিঞ্চিৎ অর্থের বিনিময়ে এ কার্য খুব সহজেই সম্পাদিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে পুত্র পিতার নিকট ও কন্যা মাতার নিকট থাকে অথবা সম্মতি থাকিলে মাতা পিতার যে কেহ সন্তানের ভার লইতে পারে। জ্যেষ্ঠের পক্ষে কনিষ্ঠের স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচার দোষণীয় এবং দণ্ডার্হ, তবে দেবরের সহিত সম্পর্ক ক্ষতিপূরণের দাবি রাখে না। ভুটানে মৃতদেহ দাহ করা হয়। শিশুদের প্রথমে কবর দেওয়া হয়, কিছুদিন পরে কবর হইতে উঠাইয়া দাহ করা হয় কিংবা নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। ভুটানীরা বলে, এইসব মৃতের বুদ্ধি পরিপক্ক হয় নাই, এজন্য কিছুদিন কবরে রাখিয়া পরে দাহ করা উচিত। বড়দের দাহ করা হয়, তবে ফসল পাকিবার পূর্বে মরিলে তাহাদের প্রথমে কবর দেওয়া হয় এবং ফসল তুলিবার পর দাহ করা হয়। কারণ হিসাবে বলে, সঙ্গে সঙ্গে দাহ করিলে ফসলের ক্ষতি হয়। ভুটানীরা অশৌচ পালন করে এবং পারলৌকিক ক্রিয়ার জন্য লামাদের প্রচুর পরিমাণে দক্ষিণা দেয়। ভূতপ্রেত

ভুটানীদের নিত্যসঙ্গী। ভূত তাড়াইবার ব্যবস্থা লামারা কাঞ্চন-মূল্যের বিনিময়ে করিয়া থাকেন।

ভুটানীদের গ্রামীণ সভ্যতা চাষের কাজ এদের খুব প্রিয়। নদীর উপত্যকা, পাহাড়ের গায়ে খাঁজ কাটিয়া (terracing) এরা জমি চাষ করে। সাধারণতঃ বড় জমি বলদ দিয়া চাষ করা হয়। তবে, ভুট্টার চাষ কোদাল দিয়া হয়। পাহাড়ের ঢালে খাঁজকাটা ছোট জমিতে বীজ ছিটাইয়া চাষ করা হয়, কিন্তু উপত্যকার বড় জমিতে রোপণ করা হয়। এই সব জমিতে নালা কাটিয়া জল সেচ করা হয়। আজকাল সরকারী প্রচেষ্টায় কৃষিকার্যে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। উচ্চ ফলনশীল বীজ, সার প্রভৃতি বিতরিত হইতেছে। ভুটানে আলু একটি প্রধান কৃষিদ্রব্য। বৎসরে দুইবার এবং কোন কোন জায়গায় তিনবারও আলু ফলে। ভারত সরকার ভুটানী নীরোগ আলুর বীজ প্রভূত পরিমাণে ক্রয় করেন। আলুর চালান খুব হয়। বর্তমানে বড় এলাচের চাষ আরম্ভ হইয়াছে।

ভুটানের মাটি ও আবহাওয়া ফলের চাষের উপযোগী। প্রায় দুই লক্ষ আপেলের চারা বিতরণ করাতে উহার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। ভুটানী আপেল কুলুর আপেলের চেয়ে কোনো অংশে নিকৃষ্ট নহে। ছয়টি গোপালন কেন্দ্র ও দুইটি মোষপালন কেন্দ্র ইতিমধ্যে স্থাপিত হইয়াছে। ট্রাউট মাছের চাষ উন্নতির পথে। পশুপালন উন্নত প্রথায় হইতেছে এবং পনীর তৈয়ারির কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে।

বন-সম্পদ হইতে ভুটানে প্রচুর আয় হয়। দেশের প্রায় সত্তর ভাগ বনভূমি। তবুও নূতন করিয়া মূল্যবান বৃক্ষ রোপণ কায চলিতেছে। ভুটানের দক্ষিণাঞ্চলে মানস নদীর অববাহিকায় প্রায় ৬২ বর্গমাইল জুড়িয়া একটি সংরক্ষিত বনভূমি আছে। এই বনে বহু দুষ্প্রাপ্য জন্তু জানোয়ার সংরক্ষিত হয়। ইহার মধ্যে আছে সোনালী লাঙুর যাহা পৃথিবীর কোথাও দেখা যায় না। সম্প্রতি ভুটান হইতে প্রায়শই হস্তিযূথ ভারতে প্রবেশ করিতেছে। এই অঞ্চল শিকারীদের স্বর্গ।

ভুটানে প্রায় সব নদী বরফ-গলা। ইহাতে বারোমাস জল থাকে। এই সব নদীকে শাসন করিয়া প্রচুর জলবিদ্যুৎ পাইবার সম্ভাবনা আছে। সম্প্রতি দুই লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তির চুখা প্রকল্প ভারত সরকারের সহযোগিতায় সম্পূর্ণ হইতে চলিতেছে। সুইডিস্ কোম্পানীর সহযোগিতায় একটি দিয়াশলাই কারখানা গঠিত হইতেছে। সুইস দেশের মত পাহাড়ী এলাকা ভুটান হাল্কা বিদ্যুৎ চালিত কারখানা স্থাপনের উপযোগী। সিমেণ্ট কারখানাও স্থাপিত হইতেছে।

শিক্ষাব্যবস্থায় ভুটান খুব আগ্রহী। উন্নয়ন-পরিকল্পনায় শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্তি করা হইয়াছে। ভুটানে প্রায় শতাধিক স্কুলে আনুমানিক দশ হাজার ছাত্রছাত্রী আছে। প্রায় ৪৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী সরকারী বৃত্তি লইয়া ভুটানের বাহিরে পড়াশুনা করে। একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। সরকারী জোংখা (Dzongkha) ভাষায় পাঠ্য পুস্তক রচিত হইতেছে।

স্বাস্থ্যবিভাগের অধীনে ত্রিশটি হাসপাতাল আছে। ম্যালেরিয়া-নিবারণী বিভাগ ভুটানে খুব কার্যকরী। যক্ষ্মা কুষ্ঠ ও গলগণ্ড রোগের প্রতিকারের খুব ভাল ব্যবস্থা করা হইতেছে। শহরে ও গ্রামে টিকা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে— রাস্তাঘাট তৈয়ারিও ইহার অন্তর্ভুক্ত। স্টেট বাস চালিত হইতেছে দিকে দিকে। এ পর্যন্ত (১৯৭২ অবধি) ১০৪০ কিলোমিটার পথ তৈয়ারী হইয়াছে এবং আরও হইতেছে প্রধান

প্রধান শহরের সহিত যোগাযোগ রক্ষাকল্পে। এ পর্যন্ত ৮টি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও প্রায় ৩২০ মাইল লাইন বসান হইয়াছে। রাজধানী থিম্ফুর সহিত পৃথিবীর সর্বত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা হইয়াছে। ৪০টি ডাকঘর আছে। ২টি টেলিগ্রাফ অফিসে টেলিপ্রিণ্টার যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে। মনি অর্ডার, রেজিস্ট্রী, পার্শেল, প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতের স্টেট ব্যাংকের সহযোগিতায় ভুটানের ব্যাংকের কায চলিতেছে। ভুটানের বর্ণাঢ্য ডাকটিকিট পৃথিবীর একটি আকর্ষণীয় বস্তু।

ভুটান এখন রাষ্ট্রসংঘের নবতম[১] সভ্য এবং পৃথিবীর যে-কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। ভারতের প্রতিবেশী রাজ্যসমূহের মধ্যে ভুটান অন্যতম সৌহার্দ্যপূর্ণ রাষ্ট্র।

ভুটানীদের জাতি, বেশভূষা, আহারাদি সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ভুটানীরা যদিও মোঙ্গল-জাতীয় তবুও চীনাদের সহিত ইহাদের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ইহারা দীর্ঘকায় ও গৌরবর্ণ—চীনাদের মত পীতবর্ণের নহে। ইহারা সর্বসময়ে ইহাদের জাতীয় পোষাক "বকু" পরিধান করিয়া থাকে। মেয়েদের বকু অবশ্য অপেক্ষাকৃত হাল্কা ও হাতাহীন। মেয়েরা সকলেই বয়ন-কুশলা। পূর্বে মেয়েরা পুরুষদের মত চুল কাটিত। এখন অবশ্য শহরের মেয়েরা বব বা বেণী রাখে। মেয়েরা সাধারণতঃ সুশ্রী ও কমনীয় গঠনের। পুরুষেরা প্রায় মাথা কামাইয়া ফেলে। তীরন্দাজী ইহাদের জাতীয় ক্রীড়া—ছয় ফুট দীর্ঘ ধনুকে শর যোজনা করিয়া ইহারা অনায়াসে একশত গজ দূরের লক্ষ্য ভেদ করিতে পারে। মুখোশ নৃত্য ইহাদের খুব প্রিয়।

ভুটানী স্ত্রীপুরুষ খুব পরিশ্রমী। ভিক্ষাবৃত্তি ইহাদের মধ্যে নাই। মাংস, স্থানীয় চাউলের অন্ন লঙ্কা ইহাদের দৈনন্দিন আহার্য। মদ্যপানও চলে। গো-মাংস অতিপ্রিয়, তবে ইয়াক বধ করিয়াও উত্তর ভুটানীরা মাংস ভক্ষণ করে। ইহারা মাখন বা লবণ মিশ্রিত করিয়া চা পান করে।

১ ভুটানের পরও বাংলাদেশ, গিনি-বিসাউ এবং গ্রেনাডা রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হইয়াছে।—সঃ

ডায়াবিটিস

ডক্টর সত্যপ্রকাশ দে

ভূমিকা

সালফা-জাতীয় রাসায়নিক ঔষধ ও পরে এন্টিবায়োটিক নামক বিভিন্ন ভেষজ আবিষ্কারের ফলে জীবাণু-ঘটিত (Bacterial infection) ব্যাধির চিকিৎসাক্ষেত্রে যে আশ্চর্য সুফল পাওয়া গিয়াছে, পূর্বের এক প্রবন্ধে সে বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।[১] নানাবিধ উন্নত মানের রাসায়নিক ঔষধাদি কীটাণুঘটিত রোগের চিকিৎসায় যুগান্তকারী পরিবর্তন সম্ভব করিয়াছে। প্রতিষেধক টিকা (Prophylactic vaccines) অণুজীবাণু-ঘটিত (Viral infection) বহু ব্যাধির প্রসার-রোধে সক্ষম হইয়াছে; বসন্ত, পোলিও প্রভৃতি ভয়াবহ সংক্রামক ব্যাধি পৃথিবীর বহু দেশ হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে। তথাপি এখনও চিকিৎসার দ্বারা বহু ব্যাধি নির্মূল অথবা দমন করা সম্ভব হয় নাই। ক্যানসার (কোষের),

১ উদ্বোধন, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১ সংখ্যায় 'অদৃশ্য জগতের রহস্য' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।—সঃ

লিউকিমিয়া (শ্বেতকণিকার) প্রভৃতি দুর্জয় ব্যাধির কোনও কার্যকরী চিকিৎসা-প্রথা আবিষ্কৃত হয় নাই। দেহের কয়েকটি গ্রন্থির (Organ) রোগ সম্বন্ধেও আমাদের এখন পর্যন্ত পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব রহিয়াছে। এইসব ব্যাধি কেন হয় বা কিভাবে তাহাদের নির্মূল করা যায়, তাহা সম্পূর্ণ জানা যায় নাই।

ডায়াবিটিস রোগ সম্বন্ধে বিগত পঞ্চাশ বৎসরে বহু নূতন তথ্য জানা সত্ত্বেও এই ব্যাধির সঠিক কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। দেহের এক বিশেষ গ্রন্থি— প্যানক্রিয়াসের (Pancreas) বিকৃত কার্যের ফলে এই রোগ দেখা দেয়। আমাদের পাকস্থলীর (Stomach) নীচে এই প্যানক্রিয়াস নামক গ্রন্থিটি রহিয়াছে। তাহা হইতে নিঃসৃত ক্ষরণ (Secretion আমাদের আহারের পরিপাকে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। ঐ গ্রন্থিতে একটি বহিরাগত ক্ষরণ স্নেহ-জাতীয় আহার্য ও ঐ গ্রন্থির নিজস্ব ক্ষরণ শর্করা-জাতীয় আহার্যের পরিপাকে সহায়তা করে। এই শেষোক্ত ক্ষরণের কার্যকারিতা বিঘ্নিত হইলে ডায়াবিটিস ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্যানক্রিয়াসের নিজস্ব ক্ষরণ শর্করা-জাতীয় পদার্থের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটাইয়া উহাকে চিনিতে (Glucose) পরিণত করে। এই চিনি পুনরায় নানা প্রক্রিয়ামাধ্যমে যকৃতে (Liver), কলা-বিশেষে (Tissues) গ্লাইকোজেন (Glycogen) রূপে জমা থাকে। দৈহিক কাজকর্মের সময়ে গ্লাইকোজেন পুনরায় গ্লুকোসে (Glucose) পরিণত হয় এবং আমাদের কাজের শক্তি (energy) যোগায়।

১৯২১-২ খ্রীষ্টাব্দে কানাডার টরোণ্টো বিশ্ববিদ্যা-লয়ের অধ্যাপক ম্যাকলিয়ডের গবেষণাগারে দুই জন গবেষক Banting ও Best সর্বপ্রথম প্যান-ক্রিয়াস-গ্রন্থির এই ক্ষরণটির সন্ধান পান। তাঁহারা এই ক্ষরণটির নাম দেন ইনসিউলিন। প্যানিক্রিয়াসের কোষের একটি বিশেষ অংশে (Islets of Langerhans) এই ক্ষরণ তৈয়ার হয় ও রক্তের সহিত মিশিয়া নানা প্রক্রিয়ার ফলে শর্করা-জাতীয় আহার্য গ্লুকোসে পরিণত করে। প্যানক্রিয়াসের এই বিশেষ অংশে কোন ব্যতিক্রম ঘটিলে তখন যথেষ্ট পরিমাণে ইনসিউলিন নিঃসৃত হয় না এবং শর্করা-জাতীয় উপাদানগুলির পরিপূর্ণ পরিপাক (metabolism) সম্ভব হয় না। ফলে যকৃত অথবা অন্যান্য স্থানে গ্লাইকোজেন সঞ্চিত হয় না, রক্তে গ্লুকোস অর্থাৎ চিনির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং পরিশেষে বিশেষ কোনও মাত্রার অধিক হইলে প্রস্রাবেও চিনি দেখা দেয়। রক্তে চিনির পরিমাণ সাধারণ নিয়মানুসারে মাত্রার অতিরিক্ত হইলে অথবা প্রস্রাবে চিনি দেখা দিলে, যে ব্যাধি হয় আমরা তাহাকেই ডায়াবিটিস (Diabetes mellitus) বলি।

ডায়াবিটিস অথবা বহুমূত্র অতি প্রাচীন ব্যাধি। বহু দেশের প্রাচীন চিকিৎসাগ্রন্থে এবং আমাদের দেশে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ইহাকে ‘মধুমেহ রোগ’ নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। রোগের প্রধান উপসর্গগুলির অর্থাৎ রোগীর লক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে আয়ুর্বেদে অতি নিপুণ বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায়।

বর্তমানে আমাদের সমাজে এই রোগ এত বিস্তার লাভ করিয়াছে যে, অন্ততঃ শহরবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রায় প্রতিটি পরিবারের কোন না কোন ব্যক্তিকে এই ব্যাধিতে আক্রান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্য দেশে বিশেষতঃ আমেরিকা যুক্ত-রাষ্ট্রে (U.S.A) এই রোগের বিস্তার আমাদের দেশ অপেক্ষা অধিক। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে ঐদেশে প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে একজন হয় প্রকাশ্য রোগী অথবা সুপ্ত অর্থাৎ প্রকাশ-অপেক্ষ (dormant) রোগী।

ডায়াবিটিসের কারণ

যদিও এই রোগের সঠিক কারণ এখনও পর্যন্ত জানা যায় নাই, তথাপি এই বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ যে, বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে এই রোগের প্রসারপ্রবণতা লক্ষিত হয়। কোনও বংশে পিতা, মাতা অথবা উভয়ের কিংবা পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে কাহারও এই রোগ থাকিলে, সেই বংশের কেহ কেহ এই ব্যাধির প্রকোপে পড়েন। বর্তমানে জিন (Gene) সম্পর্কে ডক্টর হরগোবিন্দ খোরানা প্রভৃতি গবেষকগণের আবিষ্কারের ফলে বংশে কেন অথবা কিভাবে এই রোগের বিস্তার হয়, সে সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য জানা গিয়াছে।

এই ব্যাধি সম্বন্ধে যাঁহারা ব্যাপক সমীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে পিতা অথবা মাতার এই রোগ থাকিলে সন্তানদের মধ্যে প্রায় ৪০-৫০ শতাংশের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদি পিতা ও মাতা উভয়েই এই রোগে আক্রান্ত হন, তবে প্রায় ৮০-১০০ শতাংশ সন্তানের এই ব্যাধি দেখা দিতে পারে। সুতরাং যদি কোন বংশ পরিচয়ে এই রোগের পূর্ব অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায়, তবে বংশধরেরা পূর্ব হইতেই সাবধান হইতে পারে। প্রকাশ-অপেক্ষ (dormant) হিসাবে কাহারও মধ্যে এ রোগের প্রবণতা আছে কি না জানিতে হইলে চিকিৎসকদের সহিত পরামর্শ করা কর্তব্য। সামাজিক দায়িত্ব হিসাবে বিবাহের সময় পাত্র অথবা পাত্রীর বংশে এই রোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা উচিত। পাত্র এবং পাত্রী উভয়ের ক্ষেত্রে পিতা অথবা মাতার মধ্যে যদি এই রোগ বর্তমান দেখা যায়, তাহা হইলে এইরূপ ক্ষেত্রে পরস্পরের বিবাহ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

স্থূলকায় ব্যক্তিদের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব অধিক দেখা যায়। বিশেষজ্ঞগণের মতে মেদবহুল ব্যক্তিদের প্রথমতঃ ইনসিউলিন অধিক মাত্রায় ক্ষরণ হওয়ায় ক্ষুধার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়। ফলে আহারের পরিমাণ সাধারণভাবে বৃদ্ধি পায় — বিশেষতঃ মিষ্টান্নজাতীয় খাদ্যের প্রতি আগ্রহ অধিক দেখা যায়। পরিমাণগত ও গুণগত এই দুই প্রকার আহারের ফলে দেহে মেদবৃদ্ধি হয়। ক্রমাগত এই অমিতাচারের ফলে ক্রমশঃ প্যান-ক্রিয়াস গ্রন্থির উপর চাপ পড়ায় ইনসিউলিন উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং এই ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায়। মায়েরা অনেক সময় সন্তান স্থূলকায় হইলে খুশী হন ও তাহাকে অধিক পরিমাণে ভোজনে উৎসাহ দেন। তাঁহাদের এই রোগ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিলে হয়তো বহু প্রাপ্তবয়স্ককে এই ব্যাধির কবল হইতে মুক্ত রাখা সম্ভব হইবে।

প্যানক্রিয়াসের ইনসিউলিন শর্করা-জাতীয় উপাদানগুলির পরিপাকের সহায়ক। আমাদের শরীরের আরো কয়েকটি নালী-বিহীন গ্রন্থির (Ductless gland) নিঃসৃত রসও এই পরি-পাকে অংশ গ্রহণ করে। মস্তিষ্কের তলদেশে অবস্থিত পিটিউটারি (Pituitary), বৃক্কের উপর এড্রিনাল (Adrenal) ও কণ্ঠনালীর উপর থাইরয়েড (Thyroid) গ্রন্থির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থিগুলির ব্যাধি বা বিকৃতির ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং ইনসিউলিনের কার্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। যদিও ইনসিউলিন প্রধানতঃ শর্করা-জাতীয় উপাদানগুলির পরিপাকে সহায়তা করে, কিন্তু প্রকারান্তরে এই রস আমিষ-জাতীয় (Protein) ও স্নেহ-জাতীয় (Fat) পদার্থগুলির পরিপাকেও পরোক্ষভাবে যথেষ্ট সাহায্য করে। ফলে ডায়াবিটিস রোগে এই উপাদানগুলির সম্যক্ ব্যবহার না হওয়ায় শরীর কৃশ হয় ও অনেক সময় অন্য উপসর্গও দেখা দিতে পারে; ইহার বিষয় পরে আলোচনা করা হইবে। অলসতা, অত্যধিক চিন্তা প্রভৃতি কারণে শরীরের অভ্যন্তরে কোন না কোন প্রকারে গ্রন্থিবিশেষের

ক্রিয়াকলাপের উপর বিশেষ চাপ পড়ায় এই রোগের উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক।

পূর্ব লক্ষণ

(১) অধিকবার প্রস্রাবের প্রবণতা

বিশেষতঃ রাত্রে দুই বা ততোধিকবার উঠিতে হইলে এই রোগ সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। বহু ক্ষেত্রে এই উপসর্গ দেখা নাও দিতে পারে। এমনকি অনেক সময় অন্য কোনও রোগের চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে যাইয়া সেখানে নিয়মানুসারে রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষার ফলে এই ব্যাধি প্রথমে ধরা পড়ে।

(২) ক্রমশঃ শরীরের ওজন হ্রাস

বিশেষ কোনও কারণ নাই অথচ শরীরের ওজন যদি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে দেখা যায়, তবে সতর্ক হওয়া উচিত। অনেকক্ষেত্রেই এই ওজন-হ্রাস ডায়াবিটিসের প্রথম উপসর্গ হিসাবে দেখা দেয়।

(৩) ক্লান্তি

ওজন-হ্রাসের সঙ্গে ক্লান্তিও দেখা দেয়। সাধারণ দৈনিক কাজে অবসাদ এবং অল্প পরিশ্রমে ক্লান্তি দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে রক্তে শর্করার পরিমাণ নির্ণয় করিয়া এই রোগ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া উচিত।

(৪) অধিক ক্ষুধা ও তৃষ্ণা

শর্করার মাত্রাবৃদ্ধির ফলে তথা সম্পূর্ণভাবে এই পদার্থ পরিপাক ও পরিণত না হওয়ায় এবং অধিকবার প্রস্রাবের ফলে শরীরে আহার ও পানীয়ের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, ফলে অধিক ক্ষুধা ও পিপাসার উদ্রেক হয়। এই উপসর্গ প্রায় কিছু পরে দেখা দেয়।

(৫) অপর উপসর্গ

পূর্বে যে সব উপসর্গের বিষয় বলা হইল, সেগুলি দেখা দিলেও রোগী অনেক সময় শৈথিল্য অথবা অবহেলাবশতঃ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করেন না। অনেকে ডায়াবিটিস হইয়াছে সন্দেহ করিয়া শুধু শর্করাজাতীয় কয়েকটি খাদ্য বর্জন করিয়া মনে করেন, ইহাতেই তাঁহাদের রোগ দমন করা যাইবে। ফলে নানা জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়। অন্য নানা প্রকার ব্যাধির কবলেও রোগীকে পড়িতে হয়। যদি অত্যন্ত চুলকানি বা ফোড়া হইতে থাকে অথবা কোন সাধারণ কাটা বা ঘা নিরাময় হইতে দেরি হইতেছে দেখা যায় কিংবা কারবান্‌কাল (Carbuncle) জাতীয় ঘা দেখা দেয় অথবা ক্রমশঃ চোখের দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায় কিংবা স্নায়বিক যন্ত্রণা (Neuritis) বা পেশীসমূহের যন্ত্রণা (Muscular cramps) দেখা যায়, তখন চিকিৎসকেরা নিয়মানুসারে রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা করাইয়া এই রোগের যথাযথ সন্ধান পান।

রোগ নির্ণয়

পূর্বে বলা হইয়াছে রোগের প্রারম্ভে সব উপসর্গ না থাকিতে পারে। বহুক্ষেত্রে একটি অথবা একাধিক উপসর্গ দেখা যায়। বহুবার প্রস্রাব-প্রবণতা, বিশেষতঃ রাত্রে একাধিকবার উঠিতে হইলে প্রথম অবস্থায় রোগের উৎপত্তি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় -- সাধারণ লোকেও ডায়াবিটিসের এই উপসর্গ সম্বন্ধে সচেতন। সুপ্ত অর্থাৎ প্রকাশ-অপেক্ষ (dormant) রোগীর ক্ষেত্রে অন্য কোনও ব্যাধির চিকিৎসাকালীন নিয়মমাফিক পরীক্ষার ফলে এই রোগও ধরা পড়ে। একমাত্র প্রস্রাব ও রক্তে শর্করার পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া ডায়াবিটিস সম্বন্ধে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা যায়।

সাধারণতঃ রাত্রে আহারান্তে নিদ্রার পর প্রভাতের দিকে প্রথম প্রস্রাব পরীক্ষার জন্য রাখা হয়। অনেক সময় এই প্রস্রাবে শর্করা পাওয়া না গেলে তখন সারাদিনের প্রস্রাব আলাদা আলাদা করিয়া ধরিয়া প্রত্যেকটি আলাদা পরীক্ষা করার ব্যবস্থারও নির্দেশ দেওয়া হয়। এইভাবে বহু নিদর্শন

(Sample) পরীক্ষার ফলে কয়েকটিতে চিনির সন্ধান ও রোগ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়। অধুনা চিকিৎসকেরা কেবলমাত্র প্রস্রাব পরীক্ষার উপর নির্ভর করেন না। বহুক্ষেত্রে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেশ অধিক না হওয়া পর্যন্ত প্রস্রাবে শর্করা দেখা দেয় না। সুতরাং শুধু প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া ডায়াবিটিস রোগ নির্ধারণ করা যায় না।

প্রস্রাব পরীক্ষার দ্বারা ডায়াবিটিস সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না বলিয়া রক্তে শর্করার পরিমাণ দেখা বিধেয়— চিকিৎসকেরা এই পরামর্শই দেন।

সাধারণতঃ রাত্রে আহারের পর, পরের দিন সকালে কিছুমাত্র আহার না করিয়া অর্থাৎ উপবাস করিয়া রক্ত পরীক্ষার নিদর্শন (sample) লইতে হয়। সুস্থ লোকের রক্তে শর্করার মাত্রা সাধরণতঃ ৮০-১২০ মিলিগ্রাম প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে পাওয়া যায়। ১২০ মিলিগ্রামের অধিক হইলে সন্দেহের কারণ হয়, বিশেষতঃ ১৩০ বা তদূর্ধ্ব হইলে খুবই সন্দেহজনক--অন্ততঃ এই সব ক্ষেত্রে আর কিছু দিন পরে অন্যভাবে রোগীর রক্ত পরীক্ষা করিতে হয়। তখন প্রায় ৫০ গ্রাম গ্লুকোস (Glucose) খাওয়ানর পূর্বে ও পরে ½-১-২-৩ ঘণ্টা অন্তর ভিন্ন ভিন্ন রক্তের নিদর্শন (sample) লইয়া সেগুলির রক্ত-শর্করার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। এই পদ্ধতিকে Glucose Tolerance Test বলে। ইহার দ্বারা সাধারণ লোকের রক্তে শর্করার মাত্রা যেভাবে ওঠা নামা করে এই সব রোগীর ক্ষেত্রে তাহার কোনও ব্যতিক্রম হয় কি না জানা যায় ও নিখুঁতভাবে রোগনির্ণয় করা সম্ভব হয়। প্রকাশ-অপেক্ষ (dormant) রোগীদের এইভাবে পরীক্ষার ফলে তাহাদের মধ্যে সুপ্ত ব্যাধির সন্ধান পাওয়া যায়।

অনেক সময় উপবাসের পর রক্ত পরীক্ষা না করিয়া সাধারণভাবে দ্বিপ্রহরের আহারের ২ ঘণ্টা পরে (Post Prandial) রক্ত-নিদর্শন পরীক্ষাও আজকাল সাধারণতঃ করা হয়। এইভাবে পরীক্ষার ফল নির্ভরযোগ্য ; সাধারণতঃ ২ ঘণ্টা পরে সুস্থ ব্যক্তির রক্ত-শর্করা প্রায় স্বাভাবিক মাত্রায় থাকে, ইহার ব্যতিক্রম হইলে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থাকে। এইভাবে পরীক্ষার পর সঠিকভাবে ডায়াবিটিস নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

চিকিৎসা

প্রাচীন কাল হইতে এই রোগের বিবরণ পাওয়া যায় এবং চিকিৎসা সম্পর্কে একমাত্র আহারে কয়েকটি উপদান পরিহার করার নির্দেশ দেখা যায়। কিঞ্চিদধিক ৪০ বৎসর পূর্বেও এইভাবে চিকিৎসার প্রথা চালু ছিল।

১৯২১-২ খ্রীষ্টাব্দে Banting ও Best এর ইনসিউলিন নামক প্যানক্রিয়াসের ক্ষরিত রসের সন্ধানের পর চিকিৎসা ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে। পূর্বে এই রোগে আক্রান্ত রোগীর আয়ুষ্কাল খুবই সীমিত ছিল— খুব সাবধানে থাকিয়াও ৫০ বৎসরের উর্ধ্বে রোগীর পক্ষে বাঁচা সম্ভব হইত না। বর্তমানে ঠিকভাবে চিকিৎসার ফলে সাধারণ হিসাবে প্রত্যেকের পূর্ণ আয়ু লাভ করা সম্ভব হইতেছে। বর্তমান সমাজে অধিক বৃদ্ধের সংখ্যা যে দেখা যায়, তাহার একটি কারণ এই যথোপযুক্ত চিকিৎসা। বিশেষতঃ পূর্বে শৈশবে এই রোগ নির্ণীত হইলে, সে শিশু প্রায়ই কৈশোর পর্যন্ত বাঁচিত না। এখন এইরূপ শিশুকে যত্ন করিয়া চিকিৎসা ও পরিচর্যা করিলে পূর্ণ ও সক্ষম জীবন দেওয়া সম্ভব।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে Banting ও Macleod পূর্বোক্ত গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার যুক্তভাবে লাভ করেন। Banting সম্বন্ধে একটি কাহিনী বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। গত বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে এই গবেষক এক বিমান-দুর্ঘটনায় পতিত

হন। মৃত্যুর পূর্বে হাসপাতালে জনৈক সাংবাদিককে তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার আবিষ্কারের জন্য নোবেল ও বহু পুরস্কার পাইয়াছেন, অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডিগ্রিও লাভ করিয়াছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার মনে এই আক্ষেপ রহিল যে, সাধারণ কোনও ডায়াবিটিস রোগী তাঁহার আবিষ্কারের ফলে নিজের উপকার হওয়ায় তাঁহাকে অভিনন্দন প্রকাশ করিয়া কোনও পত্র লেখেন নাই। বাস্তবিক উক্তিটি বড় মর্মস্পর্শী ও বেদনাদায়ক।

যদিও বর্তমানে ইনসিউলিনে এই ব্যাধির নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়, তথাপি ইনজেকসনের ব্যবস্থার আগে আরো কয়েকটি বিষয়ে চিকিৎসকগণ অবহিত হন। শৈশবে অথবা বাল্যে এই রোগ ধরা পড়িলে অবশ্য ইনসিউলিন ব্যবহার করাই বিধেয়, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কের ক্ষেত্রে প্রথমতঃ আহারের নিয়ন্ত্রণ ও সংযমের ফলে বহু ক্ষেত্রে রক্ত-শর্করা হ্রাস করা সম্ভব হয়। বিশেষতঃ রক্ত-শর্করার মাত্রা খুব বেশী না হইলে এই ব্যবস্থাতেই উপকার হয়। এইরূপ রোগীদের মধ্য শ্রেণীর অথবা Moderate diabetic বলা হয়, সাধারণতঃ ইঁহাদের রক্তে শর্করার মাত্রা ১৩০-১৫০ মিলিগ্রামের মধ্যে থাকে। যাঁহাদের রক্তে শর্করার মাত্রা ২০০ মিলিগ্রামের অধিক, তাঁহাদের ক্ষেত্রে আহারের ব্যবস্থায় অনেক সময় রক্ত-শর্করার পরিমাণ সাধারণ মাত্রায় নামান সম্ভব হয় না, তখন ঔষধের দ্বারা চিকিৎসার প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রাপ্তবয়স্কের অথবা প্রৌঢ় রোগীর জন্য খাওয়া যায় এরূপ কয়েকপ্রকার ঔষধও বর্তমানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। Rastinon, Diabenese, Dionil ইত্যাদি এই জাতীয় ঔষধ।

সাধারণভাবে ঔষধ ব্যবহার ব্যতীত সকল রোগীর পক্ষেই আহারের সুব্যবস্থা অপরিহার্য। আহার্য সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণাও রোগীদের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। শুধু ভাত, আলুজাতীয় সবজি, চিনি বা মিষ্টান্ন খাওয়া বন্ধ করিলেই রোগীর সুষম আহারের ব্যবস্থা হয় না। অপর পক্ষে ভাত ও রুটি সম্পর্কেও বিভিন্ন মতের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমানে চিকিৎসকেরা জাতি, রুচি নির্বিশেষে এই শর্করাজাতীয় আহার্যের কোন্‌টি কি পরিমাণে দেওয়া যায় সে-সম্পর্কে চিন্তা করেন। সকল জাতির পক্ষে ভাত বর্জনীয় নয়। ভারতবর্ষে অধিকাংশ উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীর সাধারণ আহার্যের মধ্যে গম স্থান পায় অথচ দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের লোকেদের অন্নই প্রধান খাদ্য। শেষোক্ত শ্রেণীর রোগীদের ভাত খাওয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিলে তাহাদের আহারে রুচি থাকে না। সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতে একটি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়াছে যে, সে-দেশের ডায়াবিটিক রোগীদের বিভিন্ন প্রকার আহারের ব্যবস্থা করিয়া অন্ন দেওয়ার ফলে সম্যক্‌ভাবে রোগের উপকার হইয়াছিল; পরন্তু পথ্যে রুটির ব্যবস্থা করিয়া আশানুরূপ সুফল পাওয়া যায়নাই। উপরন্তু, এই অন্নবিহীন আহারের ফলে রোগীদের ওজন দ্রুত হ্রাস পায়।

আহারের মূল উদ্দেশ্য কি ?

অপর এক প্রবন্ধে এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে।[১] মূলতঃ আহারের প্রধান উদ্দেশ্য —জীবনের প্রারম্ভে অর্থাৎ শৈশবে ও কৈশোরে শরীরের বৃদ্ধি ও পুষ্টি, পরে দৈনিক ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ, সর্বোপরি সকল বয়সে আমাদের আভ্যন্তরিক শারীর-ক্রিয়া ও কায়িক পরিশ্রমের শক্তির (Energy) যোগান দেওয়া। এই শক্তির যোগান ও পরিপূরণ খাদ্যের দ্বারাই সম্ভব। খাদ্যের এই শক্তি-উৎপাদন ক্ষমতাকে আমরা কেলোরির (Calories) সংখ্যায় নির্ধারণ করি। শরীরের ওজন হিসাবে প্রতি কিলোগ্রামের জন্য

১ উদ্বোধন, ৭৬।৪।১২-১৩ দ্রষ্টব্য।

২৫-৩০ কেলোরির প্রয়োজন— শৈশবে শরীরের বৃদ্ধির জন্য অথবা যে সকল ক্ষেত্রে অধিক শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয়, সেই সেই স্থলে এই পরিমাণের কিছু অধিক কেলোরির প্রয়োজন হয়। সাধারণ পূর্ণবয়স্ক পুরুষ বা নারীর জন্য দৈনিক ২০০০ কেলোরির প্রয়োজন। এই চাহিদা মিটাইবার জন্য আহারে যথাযথ শর্করাজাতীয় আমিষজাতীয় ও স্নেহজাতীয় পদার্থের ব্যবস্থা করা কর্তব্য, ইহাকেই সুষম খাদ্য বলা হয়। প্রতি গ্রাম শর্করা- আমিষ- ও স্নেহ-জাতীয় পদার্থের কেলোরি উৎপাদন ক্ষমতা (Calorific value) যথাক্রমে ৪, ৪ ও ৯ নির্ধারিত হইয়াছে। খাদ্য তালিকা প্রস্তুতকালে শরীরের ওজনের প্রতি কিলোগ্রাম হিসাবে ১ গ্রাম আমিষজাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন। একটি পূর্ণবয়স্ক ৬০ কিলোগ্রাম ওজনের ব্যক্তির জন্য ৬০ গ্রাম আমিষজাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন হয়। যদি একজন সাধারণ ব্যক্তির মোট ১৬০০ কেলোরির প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ৬০ কিলোগ্রাম দৈহিক ওজনের জন্যে ৬০ গ্রাম আমিষ খাদ্যে— ৬০ × ৪ হিসাবে মোট ২৪০ কেলোরি পাওয়া যায়। ১৬০০ কেলোরির বাকি ১৩৬০ (১৬০০ − ২৪০) কেলোরির জন্য শর্করা- ও স্নেহ-জাতীয় পদার্থ ২ : ১ অনুপাতে পাইতে হইবে। অতএব হিসাব হইবে নিম্নরূপ :

২ × ৪ + ১ × ৯ = ১৭ কেলোরি। ১৩৬০ ÷ ১৭ = ৮০ অর্থাৎ স্নেহ-জাতীয় পদার্থ ৮০ গ্রাম প্রয়োজন এবং শর্করা-জাতীয় পদার্থ ৮০ × ২ = ১৬০ গ্রাম প্রয়োজন।

এইভাবে একটি আহার-তালিকা প্রস্তুত করিলে দেখা যায়—

শর্করাজাতীয়	স্নেহজাতীয়	আমিষজাতীয়
১৬০ × ৪	৮০ × ৯	৬০ × ৪
= ৬৪০ কেলোরি	= ৭২০ কে.	= ২৪০ কে.

৬৪০ + ৭২০ + ২৪০ = মোট ১৬০০ কেলোরি পাওয়া যায়।

অপর একটি উপায়ে এই প্রকার খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। মোট ১৬০০ কেলোরির প্রয়োজন হিসাবে ৪০ শতাংশ শর্করা-জাতীয়, ১৫ শতাংশ আমিষজাতীয় ও ৪৫ শতাংশ স্নেহজাতীয় আহারের দ্রব্য দেওয়া হইলে—

শর্করা—৪০% × ১৬০০ = ৬৪০ কেলোরি

= ৬৪০/৪ গ্রাম = ১৬০ গ্রাম

আমিষ—১৫% × ১৬০০ = ২৪০ কেলোরি

= ২৪০/৪ গ্রাম = ৬০ গ্রাম

স্নেহ—৪৫% × ১৬০০ = ৭২০ কেলোরি

= ৭২০/৯ গ্রাম = ৮০ গ্রাম

এই দুই পদ্ধতির যে কোনও একটি গ্রহণ করিয়া শর্করা-আমিষ- ও স্নেহ-জাতীয় পদার্থের পরিমাণ পাইলে রোগীর জাতি ও রুচি অনুসারে খাদ্য-তালিকা তৈয়ার করা সহজসাধ্য হয়।

শর্করা-জাতীয় খাদ্য হিসাবে চাউল বা গম প্রধান, অবশ্য ভারতবর্ষের কয়েক স্থানে ভুট্টা যব রাগি ইত্যাদির ব্যবহার প্রচলিত আছে। তবে সাধারণ ডায়াবিটিস রোগীর জন্য জাতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে সর্বসাধারণভাবে প্রত্যেকবার আহারে শুধু ভাত বা রুটির স্থলে ভাত ও রুটি উভয় প্রকার আহারের ব্যবস্থাই সুসঙ্গত। বিশেষতঃ বাঙালীদের দুপুরের আহারে কিছু ভাত না পাইলে আহারে তৃপ্তি হয় না। পূর্বোক্ত দক্ষিণ ভারতের সমীক্ষায় দেখা গিয়াছে, সে দেশের ডায়াবিটিক রোগীদের শুধু গম অর্থাৎ রুটি খাইতে দেওয়ার ফলে রোগের বিশেষ উপশম হয় নাই। পক্ষান্তরে তাহাদের সীমিত অর্থাৎ পরিমাণমত ভাত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইলে সাধারণভাবে সর্বপ্রকারে তাহাদের উপকার দেখা গিয়াছে; বিশেষতঃ তাহাদের শরীরের ওজনে কিছু উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। অতএব শরীরের ওজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আহারের তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে—ওজনের হ্রাস ও

বৃদ্ধি উভয় দিকেই লক্ষ্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

দৈনিক আহারের তালিকায় মাঝে মাঝে পরিবর্তন করা প্রয়োজন—প্রত্যহ একই উপাদান খাইতে হইলে বৈচিত্র্যহীন আহারের দরুন রোগীর ভোজন-স্পৃহা কমিয়া যায়; আহারে রুচি বা তৃপ্তি না থাকিলে পরিপাকেও বিঘ্ন ঘটে। এই রোগে অনেকে দৈনিক কি খাওয়া উচিত, সে-বিষয়ে প্রশ্ন করেন। সারাদিনে সাধারণতঃ মোট চারিবার আহার করা হয়, সেই অনুসারে নীচে একটি তালিকা দেওয়া হইল:

প্রত্যুষে (৭—৮ ঘটিকা)—পাঁউরুটি (মাখন সহিত)—১ স্লাইস অথবা ৫″ ব্যাসের গমের রুটি—২ (সামান্য তরকারী সহ) অথবা ৩″ ব্যাসের লুচি ৩ (সামান্য তরকারী সহ), মুরগীর ডিম ১টি, চা বা কফি (স্যাকারিন সহ)।

দ্বিপ্রহর (১—২ ঘটিকা)—ভাত (২৫ গ্রাম চাউল) অথবা ৪″ ব্যাসের গমের রুটি ২টি-৩টি (মোট ২৫ গ্রাম); ভাত ও রুটি মিশাইয়া খাইলে সেই হিসাবে ব্যবস্থা করিতে হইবে। দাল, মাছ বা মাংস, তরকারী—তালিকাভুক্ত সব্জী—সুস্বাদু হইবে অথচ অধিক পরিমাণে তৈল বা মশলা দেওয়া হইবে না। দই (বিনা চিনির) ১০০—১৫০ গ্রাম।

বৈকালে (৪—৫ ঘটিকা)—Cream Cracker বিস্কুট ২-৪টি, ফল—বাতাবি লেবু, শশা, ডাঁশা পেয়ারা, জাম, আপেল ½, কলা (৩″)—১, ছানা—১০০-১৫০ গ্রাম, চা বা কফি (স্যাকারিন সহ)।

রাত্রি (৮—৯ ঘটিকা)— গমের রুটি (৪″) ২-৩টি। মাছ বা মাংস বা দাল, তরকারী—(সব্জী), দই (বিনা চিনির)—১০০-১৫০ গ্রাম, সাধারণ দালের পরিবর্তে সোয়াবীন (Soya-Bean) ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

ডায়াবিটিক রোগীর পক্ষে দুধের পরিবর্তে দই অথবা ছানার ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়।

যদি উপরি-উক্ত তালিকাভুক্ত আহার সত্ত্বেও ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তাহা হইলে একটি বা দুইটি Cream Cracker বিস্কুট অথবা ওই প্রকার কোনও বিস্কুট দেওয়া যাইতে পারে।

আহার সম্বন্ধে কোনও একটি বিশেষ তালিকা দেওয়া সম্ভব নহে, রোগী ও তাঁহার পরিবারবর্গের লোকেরা নিজেদের সুবিধামত উপরে লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী তালিকা প্রস্তুত করিতে পারেন। যদি তালিকা অনুযায়ী হিসাবমত আহারের পর শরীরের ওজন হ্রাস পায়, তবে সব্জী জাতীয় উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। খাদ্যে সব্জী খুবই প্রয়োজনীয়। খাদ্যপ্রাণ (vitamins) ও খনিজ লবণাদি (mineral salts) সব্জী হইতেই সংগ্রহ হয়।

যখন এইভাবে আহারের ব্যবস্থা করিয়া রক্তে শর্করার মাত্রা সাধারণ সীমার মধ্যে আনা সম্ভব হয় না, তখন অপর কয়েকটি ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়।

পূর্বে বলা হইয়াছে, শৈশবে অথবা বাল্যকালে ডায়াবিটিস রোগ দেখা দিলে, শুধু আহার সংযম না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ইনসিউলিনের প্রয়োগ অবশ্য করণীয়। প্রাপ্তবয়স্কের ক্ষেত্রে যদি আহার-ব্যবস্থায় উপকার পাওয়া যায়, তাহা হইলে এই প্রকার বিশেষ সহায়ক ঔষধের প্রয়োজন হয় না, নচেৎ তাহাদের জন্যও ইনসিউলিনের ব্যবহারের উপদেশ দেওয়া হয়।

ইনসিউলিন (Insulin)

Banting ও Best এর আবিষ্কারের পর এই ঔষধ ব্যাপকভাবে তৈয়ার করা আরম্ভ হয়। কসাইখানায় পশুর শবদেহ হইতে প্যানক্রিয়াস গ্রন্থি সংগ্রহ করিয়া বিশেষ পদ্ধতিতে এই ঔষধ তৈয়ার করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ইহার প্রস্তুত করণ সর্বাপেক্ষা অধিক। দুঃখের বিষয়, বর্তমানে আমাদের দেশে বিদেশী ঔষধ প্রস্তুতকারক ব্যতীত

কোনও প্রতিষ্ঠানে এই ইনসিউলিন তৈয়ার করা হয় না; কারণ, মৌলিক পদার্থগুলির অভাব। বিশেষতঃ আমাদের দেশে যে সকল জন্তু জবাই হয়, নানা কারণে অব্যবস্থার দরুন তাহাদের প্যানক্রিয়াস হইতে কাযকরী এই ক্ষরণটি প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়।

নানা প্রকার ইনসিউলিন পাওয়া যায়, তবে স্বচ্ছ অথবা জলের ন্যায় পরিষ্কার (Insulin Plain) ঔষধটির ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত। শৈশবে এই ব্যাধির চিকিৎসায় ইহাই একমাত্র ব্যবহার করা হয়। এই ঔষধটি প্রয়োগ করার অল্পক্ষণ পরে শরীরের মধ্যে উহার ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং কয়েক ঘণ্টা মাত্র পরে উহার কার্যকারিতা নিঃশেষ হওয়ার ফলে বহু ক্ষেত্রে সারাদিনে একাধিকবার এই ইনজেকসন লইতে হয়। বারংবার ইনজেকসন লইতে অসুবিধা হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং বর্তমানে Zinc solution এর সহিত Insulin তৈয়ারি করা হয়। এই জাতীয় ঔষধগুলি শরীরের মধ্যে ধীরে ধীরে বহুক্ষণ ধরিয়া কাজ করে, ফলে ২৪ ঘণ্টায় মাত্র একবার ইনজেকসনে সারাদিনের সকল আহারের পর শর্করাজাতীয় পদার্থের উপর ইহার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। Lente এবং N. P. H. Insulin এই জাতীয় ঔষধ, সাধারণতঃ ৪০ এবং ৮০ ইউনিট প্রতি মিলিলিটার হিসাবে ঔষধগুলি তৈয়ার হয় এবং রোগীর রক্ত-শর্করার মাত্রা অনুসারে প্রয়োজন মত ঔষধ ক্রয় করা হয়। অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্কেরা এই জাতীয় ইনসিউলিন ব্যবহার করেন।

খাইবার জন্য বড়ি ইত্যাদিও বর্তমানে বহু রোগী ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে ইনজেকসনের প্রয়োজন হয় না, ফলে নানা অসুবিধা ও অর্থব্যয় হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। Rastinon, Dionil, Diabenese সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। কয়েকটি ঔষধ ১০০ বা ২৫০ মিলিগ্রাম মাত্রা হিসাবে এবং অপর ক্ষেত্রে ½-১টি বড়ি হিসাবে সেবন করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। রোগীর রক্ত-শর্করার মাত্রানুযায়ী বড়ির ব্যবস্থা করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাতরাশের পূর্বে অথবা রাত্রের আহারের পূর্বে এই জাতীয় ঔষধ খাওয়া নিয়ম। চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত এইসব ঔষধ ব্যবহার করা উচিত নহে। শিশুদের ডায়াবিটিসে এই জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করা হয় না।

যে সকল রোগীর পক্ষে ইনসিউলিন ইনজেকসন ব্যতীত রক্ত-শর্করার পরিমাণ হ্রাস করা সম্ভব হয় না, বর্তমানে বহু দেশে সেই সকল রোগীরা নিজেরাই ইনজেকসন প্রয়োগ করেন— অপরের উপর নির্ভর করার অসুবিধা অনেক, বিশেষতঃ অনেক সময় ইহা ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় সাধারণ লোকের পক্ষে কষ্টকর হয়।

ইনসিউলিন প্রয়োগের জন্য বিশেষ ধরণের সিরিঞ্জ (Syringe) পাওয়া যায়। ইহাতে মাত্রার হিসাব (ইউনিট) অনায়াসে করা যায়। প্রথমে সিরিঞ্জ ও সূচ পরিষ্কার জলে ফুটাইয়া লইতে হইবে। পরে ঠাণ্ডা হইলে সূচটি লাগাইয়া অল্প Rectified Spirit টানিয়া পরে উহা আবার শিশিতে ঢালিয়া দুই তিনবার পিস্টনটি উপর নিচু করিলে ভিতরের স্পিরিট শুখাইয়া যাইবে। তখন প্রথমে ঔষধের শিশিটির মুখের ছিপিটি স্পিরিটযুক্ত তুলা দিয়া মুছিয়া কয়েকবার ধীরে ধীরে উল্‌টাইয়া ঔষধ ভাল করিয়া মিশাইয়া শিশিটি পুনরায় উল্‌টাইয়া সূচটি ছিপির ভিতর দিয়া চালাইয়া দিলে ঔষধ সিরিঞ্জে টানা সম্ভব হয়। মাত্রা দেখিয়া পরিমাণমত ঔষধ টানিয়া লইতে হয়।

ইনজেকসনের সর্বাপেক্ষা ভাল স্থান উরুর উপর বা পাশের চামড়া। প্রথমে চামড়ার

স্থানটি ভাল করিয়া স্পিরিট দিয়া মুছিয়া, বাম হাতের আঙ্গুল দিয়া অল্প করিয়া চামড়া উপরে টানিয়া ডান হাতে সূচের অগ্রভাগ সাবধানে ঢুকাইয়া দিতে হয়; ½" সূচ ভিতরে প্রবেশ করিলে, একবার পিস্টন টানিয়া দেখিতে হইবে ভিতরে রক্ত দেখা যায় কি না, রক্ত না দেখা গেলে পিস্টনটি ঠেলিলে সিরিঞ্জের ভিতরের ঔষধ (ইনসিউলিন) শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে ; দেখা যায় চামড়ার নীচের স্থানটি অল্প উঁচু হইয়াছে, স্চ বাহির করিয়া নিলে উঁচুভাব আর দেখা যায় না। পিস্টন টানিয়া রক্ত দেখা যাইলে, উরুর অপর কোনও স্থানে ইনজেকসন দিতে হইবে।

আহার-নিয়ন্ত্রণ ও ইনজেকসন ছাড়া প্রত্যেক রোগীকে প্রত্যহ ১-২টি মাল্টি ভিটামিন (Multi-vitamin) বড়ি সেবনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রত্যহ একই মাত্রায় ইনসিউলিন লইলে অনেক সময় রোগীর অজ্ঞাতসারে রক্তশর্করার মাত্রা বিশেষ হ্রাস (Hypoglycaemia) পাইতে পারে ও নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে। Plain ইনসিউলিন ব্যবহারের প্রায় ১।০-২ ঘণ্টার পরে এবং Zinc মিশ্রিত ঔষধের ক্ষেত্রে সকালের দিকে এই অবস্থার লক্ষণগুলি দেখা যায়। প্রধানতঃ ক্ষুধার উদ্রেক, অবসাদ, ঘাম হওয়া ও পরে চলায় দুর্বলতা দেখা দেয়। সেই সময় চিকিৎসা না করিলে শরীরে মৃদু কম্পন, মানসিক উত্তেজনা, প্রলাপ বকা এবং পরিশেষে দৃষ্টিশক্তির হ্রাস ও সংজ্ঞালোপ— এই সকল উপসর্গ দেখা দেয়। যাঁহারা Zinc মিশ্রিত ইনসিউলিন ব্যবহার করেন, তাঁহাদের ঘুম হইতে উঠিলে প্রায় মাথাধরা অথবা ক্লান্তি প্রথম লক্ষণ হিসাবে দেখা দেয়। প্রথম অবস্থায় সাবধান হইলে সামান্য প্রাথমিক চিকিৎসায় সুফল পাওয়া যায়। সতর্কতা অবলম্বনের উপায় হিসাবে প্রথম অবস্থায় রোগীকে কিছু মিষ্টান্ন অথবা মিষ্ট পানীয় দিলে সে সত্বর সুস্থ হয়। যাহাদের বাড়ীর বাহিরে যাইতে হয় তাহাদের সঙ্গে কিছু মিছরির খণ্ড অথবা লজেন্স থাকিলে তাহারা এই লক্ষণগুলি দমন করিতে পারে। পরে ইনসিউলিনের মাত্রার পরিবর্তন করা বাঞ্ছনীয়। প্রথম উপসর্গগুলি অবহেলা করিলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে।

ব্যায়াম

প্রত্যেক ডায়াবিটিক রোগীর পক্ষে কিছু ব্যায়াম অবশ্যকরণীয়। বাল্যকালে ও কৈশোরে কিছু খেলা ও পরে সকল বয়সে প্রত্যহ ½-১ ঘণ্টা বেড়ান অভ্যাস করা কর্তব্য। দেখা গিয়াছে, খেলা অথবা ব্যায়ামের ফলে ইনসিউলিনের মাত্রা কম প্রয়োজন হয়।

কয়েকটি বিশেষ জটিল উপসর্গ
(Complications)

রোগের প্রথম অবস্থা হইতে রোগী চিকিৎসকের উপদেশানুসারে চলিলে বহু জটিল উপসর্গের কবল হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। অনেক সময় বহুদিন নিয়মানুসারে থাকিয়া অবশেষে শৈথিল্য আসা স্বাভাবিক— বিশেষতঃ আহারে ও নিয়মিত রক্ত-পরীক্ষার ব্যাপারে ঔদাসীন্য প্রায়ই দেখা যায়। এইভাবে অবহেলার ফলে কয়েকটি জটিল উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এই উপসর্গগুলি প্রত্যেক রোগী ও তাহার পরিবারবর্গের জানা প্রয়োজন।

(ক) সংজ্ঞা-লোপ (Coma)

যখন ডায়াবিটিস রোগে সুচিকিৎসার অভাব হয় অথবা রোগী চিকিৎসকের নির্দেশ মানিয়া চলে না, বিশেষতঃ আহার বিষয়ে অসর্তক হইয়া অত্যধিক পরিমাণে আহার করে অথবা বেশী মসলা, তৈল, ঘি ইত্যাদির দ্বারা প্রস্তুত আহার্য গ্রহণ করে, তখন স্নেহ-জাতীয় উপাদানের সম্যক্ পরিপাকের বিঘ্ন ঘটে, ফলে শরীরে নানা-ভাবে ক্ষতিকর কয়েকটি পদার্থের সৃষ্টি হয়।

প্রস্রাবে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং এসিটোন (Acetone) ও ডাইএসিটিক এসিড (Diacetic acid) নামক দুইটি ক্ষতিকর পদার্থের আবির্ভাব হয়। এই শেষোক্ত দুইটির বিষক্রিয়ার ফলে নানা রকমের জটিল উপসর্গের সৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ ক্লান্তি বা অবসাদ, মাথাধরা, পিপাসা ও ক্ষুধামান্দ্য দেখা দিতে পারে, পরে বমির ভাব ও ধীরে ধীরে নিদ্রাভাবের লক্ষণ দেখা দেয়, কয়েকটি ক্ষেত্রে পায়ে ও পিঠে ব্যথাও হয় এবং ঠোট ও জিহ্বা শুখাইয়া যায় —পরিশেষে সংজ্ঞা লোপ পায়। তখন শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি দীর্ঘ ও ধীরে হইতে থাকে এবং মুখের কাছে নাক রাখিলে এসিটোনের মিষ্ট গন্ধও পাওয়া যায়। ডায়াবিটিসের ইহাই সর্বাপেক্ষা কঠিন ও জটিল উপসর্গ এবং অবিলম্বে চিকিৎসার ব্যবস্থা না হইলে বহুক্ষেত্রে পরিণাম ভয়াবহ হয়— মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক অথবা হাসপাতালের সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত এই অবস্থায় সুচিকিৎসা সম্ভব নহে।

(খ) ধমনীর নানারূপ অস্বাভাবিক পরিস্থিতি (Arteriosclerosis)

ডায়াবিটিস রোগে অবহেলার ফলে ধমনীর গাত্রে নানাভাবে কয়েকটি লবণ-জাতীয় পদার্থ জমাট বাঁধিয়া ধমনীর ব্যাসের সঙ্কোচ সাধন করে ও উহার স্থিতিস্থাপকতা গুণ হ্রাস পায়। ফলে রক্ত-চলাচলে বিঘ্ন ও শরীরের বিভিন্ন কলায় (Tissue) পুষ্টির অভাব ও কার্যকারিতায় ত্রুটি লক্ষিত হয়। ইহার পরিণামস্বরূপ কখনও কখনও অন্যান্য রোগেরও সৃষ্টি হয়। বৃক্ক (Kidney), হৃদ্‌যন্ত্র (Heart), অক্ষিপট (Retina) প্রভৃতিতে যখন এইভাবে ধমনীর মধ্যে পরিবর্তন ঘটে, তখন নানা রকমের নূতন উপসর্গের জন্য রোগীকে চিকিৎসকের পরামর্শের জন্য আসিতে হয়। দুঃখের বিষয় বহুক্ষেত্রে রোগ তখন প্রায় জটিল আকার ধারণ করে এবং চিকিৎসায় বিশেষ সুফল পাওয়া যায় না। ডায়াবিটিক রোগী যদি পূর্ব হইতেই সতর্ক থাকেন, তবে এই উপসর্গগুলির কবল হইতে মুক্ত থাকিতে পারেন।

বর্তমানকালে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হওয়ার ঘটনার কথা (Coronary Thrombosis) খুবই শোনা যায়। ডায়াবিটিক রোগী যদি তাহার ব্যাধি সম্বন্ধে সজাগ দৃষ্টি না রাখে, তবে হৃদ্‌যন্ত্রের কার্যে নানা বিঘ্ন ঘটিতে পারে ও ধমনীর ব্যাসের হ্রাসের ফলে উক্ত বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। ধমনীর এইরূপ বিকৃত পরিণামের ফলে অন্যান্যভাবে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়। পায়ের আঙুলে অনেক সময় প্রথমে কড়াজাতীয় উপসর্গ ও পরে ক্ষত হইতে পারে। রক্ত-চলাচলে বিঘ্নের ফলে এই সামান্য ক্ষত বহু ক্ষেত্রে পচনশীল ভয়াবহ ক্ষতে (Gangrene) পরিণত হইতে পারে। তখন অঙ্গচ্ছেদ ব্যতীত চিকিৎসা সম্ভব হয় না। সুতরাং প্রত্যেক ডায়াবিটিকের তাহার পা ও পায়ের আঙুলগুলির বিশেষভাবে যত্ন লওয়া কর্তব্য। স্নানের পরে অথবা কোনও কারণে পা ভিজিয়া গেলে পরিষ্কার তোয়ালের দ্বারা জল শুখাইয়া ও প্রত্যেক আঙুলের ফাঁকে যাহাতে একটুও জল না থাকে তাহা দেখিতে হইবে। যাঁহারা পারেন তাঁহারা আঙুলের মাঝে কোনও ঔষধযুক্ত পাউডার ব্যবহার করিবেন। ইহা ছাড়া মাঝে মাঝে পা মালিস (Massage) করিলেও রক্ত চলাচলে সুবিধা হয়।

(গ) চর্মরোগ, চুলকানি, গাত্রজ্বালা

এইসব লক্ষণ প্রায়ই দেখা দেয়। রোগীর পক্ষে তাই শরীর বিশেষভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা বাঞ্ছনীয়। অত্যধিক চুলকানি হইলে রক্ত-পরীক্ষা করিলে প্রায়ই শর্করার মাত্রার বৃদ্ধি

দেখা যায়। তখন তাহার হ্রাসের ব্যবস্থা করিলে উপকার পাওয়া যায়। নানা রকমের ফোড়াও রক্ত-শর্করা-বৃদ্ধির ফলে হইতে পারে।

(ঘ) স্নায়বিক যন্ত্রণা (Neuritis)

শরীরের স্থানবিশেষে অসহ্য যন্ত্রণা দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া উচিত। বিশেষতঃ হাতে, কাঁধের কাছে বা পায়ের পেশীতে এইরূপ যন্ত্রণা হইতে পারে। নিয়মিতভাবে 'বি'-জাতীয় খাদ্যপ্রাণ খাইলে এইসব যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। 'বি-১২' (Vitamin B-12) খাদ্য-প্রাণের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এইরূপ যন্ত্রণা দেখা দিলে রক্ত-পরীক্ষা করিয়া শর্করার মাত্রা সম্পর্কে অবগত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিশেষ বিধি-ব্যবস্থা

কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে ডায়াবিটিক রোগীর সম্বন্ধে বিশেষ বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ করা কর্তব্য :

(ক) গর্ভাবস্থায়

গর্ভবতী নারী নিজ ডায়াবিটিস রোগ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকিবেন। রোগ অবহেলা করিলে তাঁহার নিজের এবং গর্ভস্থ শিশুরও জটিল সমস্যা দেখা দিতে পারে। স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞের পরামর্শ লইয়া তাঁহার কথামত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে কোনও চিন্তার কারণ থাকে না, প্রসূতি ও শিশু উভয়ের স্বাস্থ্যের কোনও হানি হয় না।

(খ) অস্ত্রোপচারে

কোনও কারণে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হইলে, চিকিৎসককে রোগীর ডায়াবিটিস সম্বন্ধে অবহিত করা কর্তব্য। এই সময় রক্তে শর্করার মাত্রা বেশী থাকিলে নানা বিপদের সম্ভাবনা। পূর্ব হইতে জানা থাকিলে ও ইনসিউলিন ব্যবহার করিয়া রক্ত-শর্করার মাত্রা হ্রাস করা হইলে বহু জটিল অবস্থা হইতে রোগীকে রক্ষা করা সম্ভব হয়।

(গ) অন্য ব্যাধির চিকিৎসায়

যদি কোন ডায়াবিটিক রোগী যক্ষ্মা, নিউ-মোনিয়া, টাইফয়েড ইত্যাদি ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, তাহা হইলে চিকিৎসককে রোগীর ডায়াবিটিস সম্বন্ধে অবহিত করা প্রয়োজন। ডায়াবিটিসের চিকিৎসা না করিলে ঐ সকল রোগের চিকিৎসায় সুফল পাওয়া যায় না। বহুক্ষেত্রে ঐ সকল ব্যাধির সময় রক্ত-শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ফলে, অন্য চিকিৎসার সঙ্গে বহুক্ষেত্রে ইনসিউলিন ইনজেকশন দিতে হয় অথবা ইনসিউলিনের মাত্রা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়।

ডায়াবিটিস সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা সম্ভব নয়। আহারের নিয়ম, ইনসিউলিন, অথবা অপর সেব্য ঔষধের সাহায্যে রোগীকে কার্যক্ষম ও সুস্থ রাখা যায়, এমন কি সাধারণ হিসাবমত পূর্ণ আয়ু লাভও সম্ভব হয়। কিন্তু একান্তভাবে জানা দরকার যে, রোগীর চিকিৎসকের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ সহায়তা ভিন্ন কোন উপকার লাভ সম্ভব নয়। বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ও অন্যান্য গবেষণা কেন্দ্রে "জিন" সম্বন্ধে যে নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার ফলে, বিশেষতঃ নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্ত ডাঃ হরগোবিন্দ খোরানার আবিষ্কৃত তথ্যের ফলে আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে এই ব্যাধির নূতন উপায়ে চিকিৎসা সম্ভব হইবে। মানবজাতি সহস্র সহস্র বৎসরের অভিশাপ হইতে মুক্তি পাইবে।

পৃথিবীর বহু অমূল্য প্রাণ এই ব্যাধির কবলিত হইয়াছেন। আমাদের বহু দেশবরেণ্য সন্তানের এই ব্যাধিতে দেহাবসান হইয়াছে, স্বামীজী মহা-রাজকে আমরা অকালে হারাইয়াছি। আমাদের ক্ষোভ, এই ইনসিউলিন উনবিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হয় নাই—হইলে, হয়তো আমরা তাঁহাকে আরো কিছু কাল পাইতাম—সারা পৃথিবী আরো নূতন সম্পদ লাভ করিত।

পরলোকে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্

গভীর দুঃখের বিষয়, গত ২রা বৈশাখ, বুধবার রাত্রিতে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, ভারতীয় দর্শনের বিশ্ববিশ্রুত প্রবক্তা ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ মাদ্রাজের একটি নার্সিং হোমে পরলোক গমন করিয়াছেন। বিগত জুন (১৯৭৪) মাসে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের দরুন তিনি নার্সিং হোমে ভরতি হন ও সারিয়া উঠিয়া বাড়ী ফিরিয়া যান। কিন্তু স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় পুনরায় তাঁহাকে নার্সিং হোমে ভরতি করা হয়। অন্তিম দিন প্রাতে তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রে যন্ত্রণা ও শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। মাঝে মাঝেই তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিতেছিল এবং যান্ত্রিক উপায়ে নাড়ির গতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৬ বৎসর হইয়াছিল।

ডঃ রাধাকৃষ্ণন্ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর মাদ্রাজের (বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের) চিত্তুর জেলার তিরুত্তানি গ্রামে এক তেলেগু ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন পিতা বীর সমযোর দ্বিতীয় সন্তান। ১৯০৯ সালে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. পাশ করেন। (১৯০৬ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও এম. এ. উপাধি লাভ করেন)। ১৯০৯-১৯১৬ তিনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে লেকচারার, সহকারী অধ্যাপক ও অধ্যাপক হিসাবে অধ্যাপনা করেন। ১৯১৭ সালে তিনি রাজমহেন্দ্রী আর্টস্ কলেজে বদলী হন। পরবর্তী কর্মজীবন: (১৯১৮-২১) মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক; (১৯২১-৩৯) দর্শনের অধ্যাপক— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পুনরায় (১৯৩৭-৪৪); (১৯৩১) অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, (১৯৩২-৫২) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ধর্ম ও নীতির প্রথম ভারতীয় অধ্যাপক, (১৯৪২) কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, (১৯৪৬-৫০) বহুবার ইউনেস্কোর ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের অধিনায়ক; (১৯৪৮) ভারত সরকার কর্তৃক নিয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের সভাপতি; (১৯৪৮) ইউনেস্কোর কার্যকরী সমিতির সভাপতি; (১৯৫২) ইউনেস্কোর সভাপতি; (১৯৬২) বৃটিশ আকাদমির অনারারি ফেলো; (১৯৬২) হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কংগ্রেস অব ফিলসফিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি।

উপরোক্ত শিক্ষা-সংস্কৃতিগত পদ ভিন্ন রাজনীতি ক্ষেত্রেও তিনি উচ্চ উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৪৯-৫২ সালে রাশিয়ায় ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদূত হিসাবে তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। বস্তুতঃ বর্তমানে ক্রমবর্ধমান সোভিয়েট-ভারতীয় মৈত্রীর বীজ তিনিই বপন করিয়াছিলেন। ১৯৫২-৫৬ ও ১৯৫৭-৬২ সালে দুইবার ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ও ১৯৬২-৬৭ সালে তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন।

লণ্ডন অক্সফোর্ড শিকাগো প্রভৃতি বহু স্থানে প্রদত্ত বক্তৃতামালা তাঁহার প্রজ্ঞার খ্যাতিকে বিশ্বব্যাপ্ত ও ব্যক্তিত্বকে সর্বজনশ্রদ্ধেয় করিয়া তুলিয়াছিল। ১৯৩১ সালে প্রাপ্ত নাইট উপাধি হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দু ধর্ম-দর্শনের উপর গবেষণামূলক কাজের জন্য ১৯৭৪ সালের টেম্পলটন পুরস্কার লাভ পর্যন্ত—অক্সফোর্ড, মস্কো প্রমুখ শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক উপাধিতে তিনি ভূষিত

হইয়াছেন। তাঁহার প্রতি নিবেদিত এই শ্রদ্ধাতে পরোক্ষভাবে ভারতীয় চিন্তাজগতের চির-উজ্জ্বল ধারাকেই সম্মানিত করা হইয়াছে।

বক্তা হিসাবে তিনি ছিলেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বক্তা— তাঁহার কণ্ঠোৎসারিত স্বতঃস্ফূর্ত অজস্র শোভন বাক্যাবলী প্রজ্ঞা-দৃঢ়তার ও বিশ্বাসের জীবন্ত স্পর্শে সুমধুর মাঙ্গলিক ধ্বনির ন্যায় সভাকক্ষে দিব্য পরিবেশের সৃষ্টি করিয়া শ্রোতাদের হৃদয় মন সঞ্জীবিত করিয়া তুলিত।

অবশ্য লেখক ও দার্শনিক হিসাবেই তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের বলিষ্ঠতা তিনি তাঁহার রচিত ২৫টির অধিক অমূল্য গ্রন্থের মাধ্যমে সমুজ্জ্বল মনস্বিতা সহায়ে তুলিয়া ধরিয়াছেন। প্রধান উপনিষদসমূহ, ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপর ভাষ্য রচনা ভারতীয় আচার্যগণের মহান কৃতিত্ব ও গৌরবময় ঐতিহ্য। রাধাকৃষ্ণন্ উক্ত প্রস্থানত্রয় ইংরেজী ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া বিশ্ববাসীকে সেই ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত করিয়াছেন। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ও রাষ্ট্রপতি থাকাকালে শুভেচ্ছা সফরে তিনি যে-সকল দেশে গিয়াছেন, সে-সকল দেশবাসীর নিকটেই আর্যসংস্কৃতির শাশ্বত বাণী প্রচার করিয়াছেন।

তাঁহার মহাপ্রয়াণে ভারত তথা বিশ্বের চিন্তা-জগতে অপূরণীয় ক্ষতি হইল। তাঁহার স্মৃতির প্রতি আমরা আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি এবং ভগবচ্চরণে তাঁহার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

যে তীর্থ আজও আছে পঞ্চনদের দেশে

শ্রীনির্মলচন্দ্র ঘোষ

[পূর্বানুবৃত্তি]

মণ্ডি

যে নার্চয়ন্তি গিরিশং সময়ে প্রদোষে
যে নার্চিতং শিবমপি প্রণমন্তি চান্যে।
যে তৎকথাং শ্রুতিপুটৈর্ন পিবন্তি মূঢ়া-
স্তে জন্মজন্মসু ভবন্তি নরা দরিদ্রাঃ ॥[1]

[যাহারা সন্ধ্যাকালে শিবের অর্চনা করে না, যাহারা শিবকে পূজিত হইতে দেখিয়াও তাঁহাকে প্রণাম করে না, যাহারা তাঁহার কথা কর্ণবিবরের দ্বারা পান করে না, তাহারা মূঢ় এবং জন্মে জন্মে দরিদ্র হয়।]

মণ্ডি হিমাচল প্রদেশের একটি প্রধান শহর। পূর্বে উহা মণ্ডি নামক পার্বত্য রাজ্যের রাজধানী ছিল। সিমলা হতে মণ্ডি প্রায় এক শত কুড়ি কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে; মোটরে কিংবা বাসে যেতে হয়। পাঠানকোট হতে রেলপথে যোগীন্দ্রনগর যেয়ে তারপর মোটরে কিংবা বাসে মণ্ডি যাওয়া যায়।

মণ্ডিতে শিব, মহাকালী ও ভূতনাথের মন্দির প্রসিদ্ধ। শিবের মন্দির অতি প্রাচীন।

মণ্ডির পাশ দিয়ে পুণ্যতোয়া ব্যাস নদী প্রবাহিত। নদীর তীরে ত্রিলোকনাথ শিবের প্রাচীন মন্দির।

মণ্ডি শহরের প্রায় চব্বিশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে রেবালসর হ্রদ। হ্রদের তীরে সাতটি

১ স্তবকুসুমাঞ্জলি, শিবপ্রদোষস্তোত্রাষ্টকম্, শ্লোক ২

পাহাড় আছে। তাদের একটির নাম গৌরীদেবী। তার খুব মাহাত্ম্য— গৌরীর প্রতীক বলে কথিত। হ্রদের তীরে পদ্মসম্ভবের (ব্রহ্মা) প্রাচীন মন্দির আর শিব, লক্ষ্মীনারায়ণ ও লোমশ মুনির মন্দির আছে। রেবলসর বৌদ্ধ ও শিখদেরও তীর্থ। হ্রদের তীরে বৌদ্ধ বিহার ও শিখ গুরুদ্বারা আছে।

মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা
দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা।
শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা
গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা ॥[২]

[হে দেবি! লোকে যাঁহার কৃপায় সর্বশাস্ত্রের মর্ম জানিতে পারে, আপনি সেই মেধা (দেবী সরস্বতী)। আপনি দুস্তর ভবসাগরের তরণী, অদ্বিতীয়া দুর্গা। আপনি লক্ষ্মীরূপে নারায়ণের হৃদয়বিলাসিনী। আপনিই চন্দ্রমৌলি মহাদেবের অর্ধাঙ্গে স্থিতা গৌরী।]

রেণুকা তীর্থ

হিমাচল প্রদেশে সিরমুর জেলার নাহান্ শহরের প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার উত্তরে রেণুকা তীর্থ। নাহান্ সড়ক পথে অম্বালা শহর হতে আশী কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে।

রেণুকা তীর্থে রেণুকা দেবীর নামে একটি পুণ্যোদক জলাশয় আছে। রেণুকা ঋষি জমদগ্নির পত্নী ও বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরামের মাতা ছিলেন।

কুলু

প্রাতঃ স্মরামি রঘুনাথমুখারবিন্দং
মন্দস্মিতং মধুরভাষি বিশালভালম্।
কর্ণাবলম্বিচলকুণ্ডলশোভিগণ্ডং
কর্ণান্তদীর্ঘনয়নং নয়নাভিরামম্ ॥[৩]

[প্রাতঃকালে আমি রঘুনাথের নয়নানন্দদায়ী সেই মুখকমল স্মরণ করি, যাহা ঈষৎ হাস্যযুক্ত, মধুরভাষি, বিশাল ললাটযুক্ত, আকর্ণবিস্তৃত-নয়ন এবং যাহাতে কর্ণ হইতে গণ্ড পর্যন্ত দোদুল্যমান কুণ্ডল শোভমান।]

হিমাচল প্রদেশের মণ্ডি শহর হতে কুলু প্রায় সত্তর কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে। পুণ্যতোয়া ব্যাস নদীর তীরে, প্রায় চার হাজার ফুট উচ্চ পার্বত্য উপত্যকায় এই শহর অবস্থিত। তার চতুর্দিকে অতি মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য। বসন্তকালে নানা রঙের ফুলে কুলু উপত্যকা সুশোভিত হয়।

কুলু শহরে শ্রীরঘুনাথের মন্দির অতি প্রাচীন ও বিখ্যাত। কুলুর আশেপাশে অনেক দেবদেবীর মন্দির আছে। তাই কুলু উপত্যকাকে বলে Valley of gods (দেবগণের উপত্যকা)।

দশহরার সময় প্রতি বৎসর কুলুতে একটি বিশেষ উৎসব হয়। তখন আশেপাশের গ্রাম থেকে দেবতাদের নানা রঙ-বেরঙের সাজ পোশাক পরিয়ে মিছিল করে কুলুতে নিয়ে এসে তাঁদের পূজা করা হয়। রঙীন বেশভূষায় সজ্জিত অধিবাসীদের নৃত্যগীতে ও আনন্দ কলরবে কুলু উপত্যকা মুখর হয়ে উঠে।

কুলুর প্রায় এগার কিলোমিটার দূরে, প্রায় ৮০০০ ফুট উচ্চে বিজলী মহাদেবের মন্দির, আর পাঁচ কিলোমিটার দূরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির আছে। কুলুর মাত্র চার কিলোমিটার দূরে পরাশর গ্রাম। কিংবদন্তি, এই গ্রামে ব্যাসদেবের পিতা পরাশর মুনি কঠোর তপস্যা করেছিলেন।

কুলুর প্রায় কুড়ি কিলোমিটার দক্ষিণে, ৩৬০০ ফুট উচ্চে, বজোরা গ্রামে অনেক শিব ও পার্বতীর মন্দির আছে। তাদের মধ্যে ব্যাসেশ্বর শিবের মন্দির সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

---

২ শ্রীশ্রীচণ্ডী ৪।১১

৩ শ্রীরামপ্রাতঃস্মরণম্, শ্লোক ১

কস্তুরিকাচন্দনলেপনায়ৈ
শ্মশানভস্মাঙ্গবিলেপনায়।
সৎকুণ্ডলায়ৈ ফণিকুণ্ডলায়
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥[৪]

[সুন্দর কুণ্ডল পরিহিতা, কস্তুরী ও চন্দন-চর্চিতা পার্বতীকে, এবং ফণিকুণ্ডল-শোভিত ও শ্মশানের ভস্মে ভূষিত-গাত্র শিবকে প্রণাম করি।]

মানালি

আপদামপহর্তারং দাতারং সর্বসম্পদাম্।
লোকাভিরামং শ্রীরামং ভূয়োভূয়ো নমাম্যহম্ ॥

[যিনি সকল আপদ বিনাশ করেন এবং সর্ব সম্পদ্ দান করেন সকল লোকের আনন্দদায়ী সেই শ্রীরামকে আমি বারংবার প্রণাম করি।]

কুলু শহরের প্রায় সত্তর কিলোমিটার উত্তরে, দেবদারু বনের মধ্যে ৮০০০ ফুট উচ্চে, মানালি একটি সুন্দর গ্রাম। মানালি হতে হিমালয়ের তুষার-ধবল শৃঙ্গগুলি অতি চমৎকার দেখায়।

মানালিতে প্রাচীন রঘুনাথের মন্দির প্রসিদ্ধ। এখানে হিড়িম্বার মন্দির বলে একটি দেবীর মন্দিরও আছে। কিংবদন্তি, পাণ্ডবগণ মানালিতে এসে ছিলেন এবং দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম মায়ের আদেশে এখানে হিড়িম্বা রাক্ষসীকে বিয়ে করেছিলেন। দেবীর মন্দিরটি কাষ্ঠ-নির্মিত।

মানালির প্রায় বাইশ কিলোমিটার উত্তরে, সমুদ্রের উপরিতল (sea level) হতে প্রায় ১৩০০০ ফুট উচ্চে, ব্যাসকুণ্ড নামে একটি পুণ্য তীর্থ আছে। রাস্তার শেষের দিকে প্রায় আট কিলোমিটার পথ বরফের উপর দিয়ে যেতে হয়। ব্যাসকুণ্ড পুণ্যতোয়া ব্যাসনদীর উৎপত্তি-স্থল। এক সময়ে মহামুনি ব্যাসের আশ্রম এখানে ছিল, সেজন্য নদীর নামও ব্যাসনদী। স্থানটির নাম রোহতাঙ্গ জোৎ। বৈশাখ হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত তীর্থযাত্রার রাস্তাটি খোলা থাকে; তার পরে বরফে ঢেকে যায়। চারদিকে তুষারাবৃত পর্বত।

নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে
ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ
প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥

[হে মহামতি ব্যাসদেব! আপনার নয়ন-যুগল প্রস্ফুটিত পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃত। মহা-ভারতরূপ তৈলপূর্ণ জ্ঞানময় প্রদীপ আপনার দ্বারা প্রজ্বালিত। আপনাকে প্রণাম।]

জগৎসুখ

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রিচ্ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে ॥

পুণ্যতোয়া ব্যাসনদীর তীরে, নাগর হতে প্রায় বার কিলোমিটার উত্তরে এবং কুলু হতে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার উত্তরে জগৎসুখ গ্রাম।

জগৎসুখে একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ শিবের মন্দির আছে। শিবলিঙ্গের নাম বিশ্বকেশ্বর। কিংবদন্তি, পুরাকালে পাণ্ডবগণ বনবাসের সময় গুরু ধৌম্যের আদেশে এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন।

জগৎসুখে গায়ত্রী দেবীরও একটি প্রাচীন মন্দির আছে। নাগরেও একটি প্রাচীন শিব-মন্দির আছে।

জগৎসুখের প্রায় ছাব্বিশ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে, হামৃতা পাহাড়ে, অর্জুন-গুফা নামে একটি গুহা আছে। তার মধ্যে অর্জুনের মূর্তি আছে আর আছে একটি ছোট স্রোতস্বিনী। কিংবদন্তি, অর্জুন তাঁর মাতা কুন্তী দেবীর তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে পাহাড়ে বাণ বিদ্ধ করে এই স্রোতস্বিনী

---

৪ শঙ্করাচার্য-রচিত হরগৌর্যষ্টকম্, শ্লোক ১

সৃষ্টি করেন। হাম্তার কাছে শাকম্ভরী দেবীর একটি মন্দির আছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে শাকম্ভরী দেবীর কথা আছে। নিম্নে তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত হল :

কার্মুকঞ্চ স্ফুরৎকান্তিঃ বিভ্রতী পরমেশ্বরী।
শাকম্ভরী শতাক্ষী সা সৈব দুর্গা প্রকীর্তিতা॥
বিশোকা দুষ্টদমনী শমনী দুরিতাপদাম্।
উমা গৌরী সতী চণ্ডী কালিকা সাপি পার্বতী॥
শাকম্ভরীং স্তবন্ ধ্যায়ন্ জপন্ সম্পূজয়ন্নমন্।
অক্ষয্যমশ্নুতে শীঘ্রমন্নপানামৃতং ফলম্। [৫]

জগৎসুখ হতে মাত্র দুই কিলোমিটার দূরে ত্রিবেণী-সঙ্গম তীর্থ। সেখানে তিনটি পুণ্যতোয়া স্রোতস্বিনী—ধৌম্যগঙ্গা, ব্যাসগঙ্গা ও সৌম্যগঙ্গা মিলিত হয়েছে। স্নান ও পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ ও তর্পণের জন্য তীর্থটি খুব মাহাত্ম্যপূর্ণ। ত্রিবেণী-সঙ্গমের এক কিলোমিটার দূরে মহর্ষি কপিলের আশ্রম। নিকটেই কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে।

মণিকরণ

মন্দারমালাপরিশোভিতায়ৈ
কপালমালা-পরিশোভিতায়।
দিব্যাম্বরায়ৈ চ দিগম্বরায়
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥[৬]

[দিব্যবস্ত্রপরিহিতা ও মন্দার ফুলের মালায় পরিশোভিতা পার্বতীকে এবং নরকপালের মালায় পরিশোভিত দিগম্বর শিবকে আমি প্রণাম করি।]

কুলু শহরের প্রায় তেতাল্লিশ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে, পুণ্যতোয়া পার্বতী নদীর তীরে প্রসিদ্ধ মণিকরণ তীর্থ। পাঠানকোট-যোগীন্দ্রনগর রেলপথে যোগীন্দ্রনগর পর্যন্ত রেলপথে এসে যোগীন্দ্রনগর হতেও মণিকরণ যাওয়া যায়। তবে এপথে ভুমন্তর পরাওর নিকটে ব্যাসনদী পার হয়ে তারপর জরি পরাও হয়ে প্রায় বত্রিশ কিলোমিটার হেঁটে বা মোটর গাড়ীতে যেতে হয়। তীর্থস্থান প্রায় ৫৭০০ ফুট উচ্চে। মণিকরণ তীর্থ সম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উল্লেখ আছে।

মণিকরণে একটি গরম জলের কুণ্ড আছে। এই কুণ্ডে মহাদেবের কানের কুণ্ডল পড়েছিল, তাই নাম হয় মণিকরণ। কুণ্ডের ধারে শিব ও পার্বতীর মন্দির আছে। কাশীর মণিকর্ণিকা তীর্থে পার্বতীর কানের কুণ্ডল পড়েছিল।

নৃমুণ্ড

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্যা।
তামম্বিকামখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ॥[৭]

[দেবতাগণের শক্তিসমূহের ঘনীভূত মূর্তিস্বরূপ যে দেবী নিজ মায়াশক্তির প্রভাবে এই বিশ্বে পরিব্যাপ্ত এবং সকল দেবতা ও মহর্ষিগণের আরাধ্যা, সেই অম্বিকাকে আমরা ভক্তিপূর্ণ প্রণাম করি। তিনি আমাদের সর্বপ্রকার মঙ্গল করুন।]

পুণ্যতোয়া শতদ্রু নদীর তীরে, রামপুর শহরের প্রায় এগার কিলোমিটার দূরে, শতদ্রুর অপর তীরে, নৃমুণ্ড তীর্থ। রামপুর হিন্দুস্থান-তিব্বত সড়কের উপরে, সিমলা হতে একশত চুয়াল্লিশ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত।

নৃমুণ্ডে শ্রীঅম্বিকা দেবীর মন্দির অতি প্রাচীন ও বিখ্যাত। কিংবদন্তি, পুরাকালে জমদগ্নি ঋষির পুত্র, বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার শ্রীপরশুরাম নৃমুণ্ডে কঠোর তপস্যা করেছিলেন এবং তিনিই দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

অম্বিকা দেবীর মন্দির ভিন্ন নৃমুণ্ডে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মন্দির আছে, যথা—লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির, ঈশেশ্বর মহাদেবের মন্দির, চণ্ডী মন্দির ও বিশ্বকেশ্বর শিবের মন্দির।

---

৫ শ্রীশ্রীচণ্ডী, মূর্তিরহস্য, শ্লোক ১৫-১৭
৬ শঙ্করাচার্য-রচিত হরগৌর্যষ্টকম্, শ্লোক ২
৭ শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৪।৩

নৃমুণ্ডে একটি গুহায় শ্রীপরশুরামের রৌপ্য মূর্তি আছে।

ক্ষত্রিয়-রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্।
কেশবধৃতভৃগুপতিরূপ
জয় জগদীশ হরে ॥৮

[তুমি ক্ষত্রিয়ের রুধিররূপ জলে জগৎকে স্নান করাইয়া তাহার পাপ ক্ষালন কর এবং সংসারের তাপ শান্ত কর ; হে কেশব, হে পরশুরামরূপী, হে জগদীশ্বর, হে হরি, তোমার জয় হউক।]

নৃমুণ্ড হতে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে একটি গুহায় টনকেশ্বর শিবের মন্দির আছে। গুহার মধ্যে শিবলিঙ্গের উপরে আপনা হতে বিন্দু বিন্দু জল পড়ে। শ্রীমন্দিরে পার্বতী দেবী ও হনুমানজীর মূর্তিও আছে।

নৃমুণ্ড হতে প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রম আছে। কিংবদন্তি, পুরাকালে এখানে বিখ্যাত মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রম ছিল। মার্কণ্ডেয় ঋষি শিবের বরে অমর হয়েছিলেন। প্রলয়কালে নারায়ণ মুখব্যাদান করে তাঁকে তাঁর মুখের মধ্যে প্রবেশ করতে বলেছিলেন। তা করেই ঋষির জীবন-রক্ষা হয়েছিল।

নৃমুণ্ড হতে প্রায় চৌদ্দ কিলোমিটার দূরে নিথর গ্রামের বুড়া মহাদেবের মন্দির অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। নিথরের আশেপাশে চারটি শিবমন্দির, সাতটি দেবীমন্দির ও নয়টি নাগমন্দির আছে। মন্দিরগুলি সবই প্রাচীন।

শ্রীখণ্ড মহাদেব

অতঃ প্রদোষে শিব এক এব
পূজ্যোঽথ নান্যে হরিপদ্মজাদ্যাঃ।
তস্মিন্ মহেশে বিধিনেজ্যমানে
সর্বে প্রসীদন্তি সুরাধিনাথাঃ ॥৯

[অতএব সন্ধ্যাবেলায় শিবই একমাত্র পূজ্য ; হরি ব্রহ্মাদি অন্য কেহ নন। সেই মহেশ যথাবিধি পূজিত হলে সকল দেবাধিপতিগণই তুষ্ট হন।]

নৃমুণ্ডের প্রায় তিপ্পান্ন কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে, হিমালয়ের এক তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গের উপরে, শ্রীখণ্ড মহাদেব তীর্থ। কেবল মাত্র শ্রাবণ-ভাদ্র মাসেই এই তীর্থে যাওয়া যায়, অন্য সময়ে বরফের জন্য তীর্থটি অগম্য। রামপুর হতে শ্রীখণ্ড মহাদেব পঁয়ষট্টি কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে।

শ্রীখণ্ড মহাদেবে এক অতি প্রাচীন শিবের মন্দির আছে। কিংবদন্তি, সেকালে ভস্মাসুর নামে এক অসুর এখানে মহাদেবের আরাধনা করত। শিব তুষ্ট হয়ে তাকে বর দিতে এলে সে বর চাইল যে, যার মাথায় সে হাত দেবে সে-ই ভস্ম হয়ে যাবে। শিব তাকে সেই বরই দিয়েছিলেন ; কিন্তু বর দিয়ে তিনি মহাবিপদে পড়েছিলেন। কারণ ভস্মাসুর তাঁরই মাথায় হাত দিয়ে বর সত্য কিনা তাই পরীক্ষা করতে চেয়েছিল।

শ্রীখণ্ড মহাদেবের পথে যাত্রিগণ নয়নসর নামে পুণ্য পুষ্করিণীতে অবগাহন করে।

শ্রীখণ্ড মহাদেব হতে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে কার্তিকের মন্দির আছে। [ক্রমশঃ]

---

৮ শ্রীজয়দেব-রচিত দশাবতারস্তোত্রম্, শ্লোক ৬
৯ শিবপ্রদোষস্তোত্রাষ্টকম্, শ্লোক ৭

সমালোচনা

বিবেকানন্দ পুঁথি : শ্রীবিভূতিভূষণ রায় প্রণীত : আশা-কানন, ৭১।১ চণ্ডী ঘোষ রোড, শীলপাড়া, বড়িশা, কলিকাতা-৮ হইতে প্রকাশিত ; *প্রাপ্তিস্থান : নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা-৯ ;* পৃষ্ঠা ৩২৭ ; মূল্য ৭ টাকা।

গ্রন্থখানি পদ্যে রচিত স্বামীজীর জীবনালেখ্য। ছন্দ পয়ার ও ত্রিপদী। সুতরাং ধরন মধ্যযুগীয়। গ্রন্থখানি পাঠ করলে কৃত্তিবাস ওঝা ও কাশীরাম দাসের উত্তরসূরীদের বংশ যে শেষ হয়নি, তা অনুধাবন করা যায়। প্রশ্ন উঠতে পারে, এ ধরনের জীবনালেখ্য রচনা বর্তমান যুগের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা? আমার মতে, পাঠকশ্রেণীর এক বৃহত্তর অংশের জন্যে এই পদ্ধতির বিশেষ প্রয়োজন আছে। কারণ, চরিতকাব্যের প্রতি পাঠকশ্রেণীর এক বিশেষ অংশের তীব্র আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়—গদ্যে রচিত জীবনকে তাঁরা ঠিক পছন্দ করেন না। এই দিক দিয়ে স্বামীজীর জীবনসাহিত্যের একটা বড় ফাঁক পূরিত হ'ল।

শ্রীযুক্ত রায় স্বভাব-কবি, ভক্ত এবং পণ্ডিত ব্যক্তি। বিবেকানন্দ পুঁথিতে রচয়িতার তিনটি বৈশিষ্ট্যই সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে পুঁথিখানি অসাধারণ না হলেও সাধারণোত্তর যে হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পণ্ডিত হয়েও পুঁথিকার কোথাও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেবার প্রচেষ্টা করেননি। জীবনালেখ্য-খানির এই হ'ল আর একটি বৈশিষ্ট্য। বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে পড়ে দেখলাম যে, চরিতকাব্য-খানির অনেক অংশই আবৃত্তির যোগ্য। এ ব্যাপারে বিভিন্ন বিদ্যালয় ও সংঘ কর্তৃপক্ষ আমার সঙ্গে একমত হলে ছাত্রছাত্রীদের 'নতুন কিছু'র সন্ধান দিতে পারবেন।

জীবনালেখ্য রচনায় শ্রীযুক্ত রায় অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত স্বামীজীর জীবনীর ওপরই প্রধানত নির্ভর করেছেন, হয়ত বা স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রণীত জীবনী এবং সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের বিবেকানন্দ চরিত থেকে কোন কোন উপাদান সংগ্রহ করেছেন। মোট কথা, বিতর্কমূলক সব কিছুকে বাদ দিয়ে সোজা ভাষায় সুললিত ছন্দে পুণ্যজীবনালেখ্য অঙ্কন করেছেন। ফলে যাদের জন্য রচনা তাদের প্রয়োজন সম্পূর্ণ মিটেছে, আর পুঁথিখানি হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রামাণ্য ও পূর্ণাঙ্গ। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীর সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরাও জীবনালেখ্যের এই প্রকারভেদ থেকে বেশ কিছুটা আনন্দ লাভ করবেন, আর যাঁরা অর্ধ পরিচিত তাঁরা পাবেন মোটামুটি এক পূর্ণ পরিচয়। তথ্য-বিন্যাসে কবির ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিচয় পাওয়া যায়। কাগজের এই দুষ্প্রাপ্যতার যুগে কাগজ আশাতীতভাবে ভাল, মুদ্রণও সুন্দর। চরিতকার প্রথমেই শুদ্ধিপত্র সংযোগ করতে ইতস্তত করেননি। এটা কি তাঁর সাধুতার পরিচয় বহন করে না? চরিতকাব্যখানির বহু প্রচার কামনা করি এবং রচয়িতার ঐকান্তিকতাকে সাধুবাদ জানাই।

ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

Tales from Ramakrishna: Published by Swami Budhananda, Advaita Ashrama, Mayavati, Himalayas: (19L5) pp. 54 : Price Rs. 4·25

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত কিছু ভাবান্তরিত ছ'টি নীতিগর্ভ রূপক-কাহিনী বা parable জাতীয় গল্পের সংকলন। ভাষান্তর করেছেন শ্রীমতী

আইরীন রে এবং মল্লিকা ক্লেয়ার গুপ্তা। অবশ্য ঠিক ভাষান্তরকরণ নয়, গল্পগুলো ইংরেজীতে এক রকম নতুন করেই বলেছেন। গল্প ছ'টি হ'ল: সর্বমঙ্গলা, সাত ঘড়া, জটিল, কৃষ্ণসর্প, গো-হত্যা কে করেছে? এবং পণ্ডিত ও গোয়ালিনী।

প্রকাশক মহাশয়ের মতে, গল্পগুলো বলবার সময় লেখিকাদ্বয় প্রাপ্তবয়স্কদের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলেন। বোধ হয় গিয়েছিলেন তবুও কিন্তু ৫৪ পৃষ্ঠার এই কাহিনী-পুস্তিকাখানি প্রাপ্তবয়স্ক-দেরও আকর্ষণ করবে। এই রকম হ'ল গল্প বলবার ধরন। অবশ্য প্রাপ্তবয়স্কের অহমিকায় বড়রা যদি বিশেষ করে চিত্রাবলী দেখে পুস্তিকাখানি সম্পূর্ণ শিশুপাঠ্য বলে উপেক্ষা না করেন।

তিনটি গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল অচঞ্চলা ভক্তি। ব্যাকুল হ'য়ে ডাকলে, সম্পূর্ণ আস্থাস্থাপন করলে, ভগবান ভক্তের সহায়ক রূপেই অবতীর্ণ হন। এর মধ্যে কিন্তু বিষয়ভোগের চিন্তা থাকলে চলবে না। তাই গোয়ালার মেয়ে 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করে জলের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে গেল, কিন্তু কাপড় বাঁচাতে গিয়ে পণ্ডিত ঐ প্রক্রিয়ায় ব্যর্থ হলেন। আবার ভক্তিতে কোন রকম খাদ থাকলে চলবে না। এর দরুনই জটিলের শিক্ষা-গুরুর সামনে মধুসূদন এসে দাঁড়ালেন না। সর্ব-মঙ্গলাদের পিতৃগৃহে সর্বমঙ্গলারূপে মা-দুর্গার আগমন সাধক রামপ্রসাদের জীবনের ঘটনাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

কৃষ্ণসর্পের গল্পটি বহু-পরিচিত। গল্পটি রোমাঁ রোলাঁকেও মুগ্ধ করেছিল। সাত ঘড়া এবং ব্রাহ্মণের গো-হত্যার গল্প— এই দু'টিও বিশেষভাবে মর্মস্পর্শী। শুধু মর্মস্পর্শী নয়, সব কটিই জীবনবেদ-রচনার নীতি পরিস্ফুটিত করে। গোড়াতেই বলেছি, ঠিক parable নয়— parable জাতীয় গল্প। অর্থাৎ, প্রতিপাদ্য বিষয় অনুধাবনে মোটেই বিলম্ব হয় না—আর ব্যাখ্যাও প্রকারভেদ-সম্ভাবনা-রহিত। মূলত শিশুদের উদ্দেশ্যে রচিত বলে এবং হৃদয়গ্রাহী করে তোলবার জন্যেও রঙীন চিত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে চিত্রকর শ্রীবিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তী বিশেষ অভিনন্দনের দাবি রাখেন। দু'টি চিত্র সম্বন্ধে কিন্তু কিছু বলবার আছে। ৪১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, একদিন তিনটি ক্ষুদ্র বালক ব্রাহ্মণের বাগানে ঢুকেছিল, কিন্তু চিত্রে চারটি বালককে দেখান হয়েছে। আবার ৩৩ ও ৩৫ পৃষ্ঠায় যে সন্ন্যাসীকে দেখান হয়েছে, তিনি পরিচ্ছদের ধরন থেকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরই ধারণা বহন করেন। বোধহয় হিন্দু সন্ন্যাসীর মত পরিচ্ছদ ধারণ করলেই ভাল হত। এসব অবশ্য অতি সামান্য ত্রুটি। সব মিলিয়ে এই রকম দৃষ্টি-আকর্ষক ও মনোগ্রাহী পুস্তকের দেখা বড় একটা পাওয়া যায় না। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে দ্রুত পঠনের জন্যে গ্রন্থখানি পাঠ্যতালিকাভুক্ত করলে শিশুদের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভি-ভাবকগণ অন্তত নতুন কিছু একটা আস্বাদনের সুযোগ পাবেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ যে আনন্দ লাভ করবেন তা সত্যিই অনির্বচনীয়।

ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

'অমৃতস্য পুত্রাঃ'—সূর্যসারথি বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক: কল্যাণী ভট্টাচার্য; যতীশ্বরানন্দ পাঠচক্র (ডাঃ এ. ভট্টাচার্য্য'স ক্লিনিক): ১১, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কলিকাতা ৩৩। পৃষ্ঠা ৪১৯: প্রকাশনের সাহায্যার্থে চাঁদা টাকা ১২.৫০।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার সঙ্গে যাঁরা সুপরিচিত তাঁরা জানেন যে, এই মহামানবদের কেন্দ্র ক'রে একদল সাধক-পুরুষ এই দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন— যাঁরা যে কোন দেশে, যে কোন যুগে স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পারতেন— স্বামী যতীশ্বরানন্দ এই সাধক-পুরুষদের অন্যতম। তাঁর অমূল্য জীবন ও বাণী

অধ্যাত্মপিপাসুদের চির আদরের সম্পদ। স্বামী যতীশ্বরানন্দের সাধনা-কর্ম-মনন আমাদেরও স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমরাও অমৃতের পুত্র। লেখক তাই তাঁর গ্রন্থের নাম দিয়েছেন—'অমৃতস্য পুত্রাঃ।' স্বামী যতীশ্বরানন্দজীর জীবনী ও বাণী প্রচারের শুভ সঙ্কল্প নিয়ে গ্রন্থটি রচিত।

গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় মনোজ রায় চৌধুরী লিখেছেন— "এ শুধু জীবনী নয়, ভক্তের কৃতজ্ঞ শ্রদ্ধাঞ্জলি। এখানে যেমন জীবনীসুলভ নীরস তত্ত্ব ও তথ্যের ব্যাখ্যা নেই— তেমনি, আমাদের সৌভাগ্য লেখক ভক্তির উচ্ছ্বাসে আচ্ছন্ন করেননি স্বামীজীকে।"— এর সঙ্গে আমরাও একমত।

পাঁচটি পর্বে গ্রন্থটি বিভক্ত। স্বামী যতীশ্বরানন্দজীর জীবনের প্রথম থেকে অন্তিমকাল পর্যন্ত ঘটনাবলী কালানুযায়ী সুন্দরভাবে পরিবেশিত। আর তাতে পেয়েছি এই পরম সত্যের প্রকাশ— "আধ্যাত্মিক পথে একটু অগ্রসর হলে সাধক ক্রমে নিজেকে জীবাত্মা এবং উপাস্য দেবতাকে পরমাত্মারূপেই অনুভব করেন। জীবাত্মা বাস্তবিকই পরমাত্মা বা অনন্ত চৈতন্যের অংশ এবং গুরুও প্রকৃতপক্ষে তাঁরই এক দিব্য প্রকাশ, যাঁর মাধ্যমে ভক্তের কাছে ভগবৎ-করুণা—জ্ঞান, প্রেম ও শান্তি প্রবাহিত হয়ে থাকে। সাধক, ইষ্টদেবতা এবং গুরু যে একই পরমচৈতন্যের প্রকাশ—এই সত্যটিকে উপলব্ধি করাই হচ্ছে আমাদের সাধনা।" (পৃঃ ৩৬২)

এই সকল বিভিন্ন পর্বে মহাজীবনের অনেক কাহিনী পরিবেশিত, যেগুলি অনেকেরই অজানা। জ্ঞাননিষ্ঠ সাধক ও অধ্যাত্ম উপদেষ্টারূপে তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশ আপন স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত এবং বেদান্তের নিরন্তর চর্চা ও চর্যাই তাঁর অন্তর্মুখী জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সেই সঙ্গে কর্ম ও ভক্তির সম্মেলনে যতীশ্বরানন্দ-জীবনকথা পূর্ণতা লাভ করেছে। তাঁর জীবন ছিল সম্পূর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণময়। ঠাকুর বলতেন— "গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউ-এর কিছু গঙ্গা নয়।" লক্ষ্য আমাদের সকলেরই শ্রীশ্রীঠাকুর – একথা যেন কখনও ভুলে না যাই।

শ্রীসূর্যসারথি বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তলেখক, যাঁর রচনাভঙ্গীতে অধ্যাত্মপ্রেরণার সরল তন্ময়তাটুকু পাঠকচিত্তকে নিবিষ্ট করে। লেখক গ্রন্থমধ্যে প্রসঙ্গোপযোগী রবীন্দ্রনাথের কবিতার অংশবিশেষ সংযোজন করেছেন। এই পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থটির রচনা দ্বারা বাংলা সাহিত্যের জীবনী শাখাটি (Hagiography) আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। তবু কয়েকটি জায়গায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার ধারাবাহিকতার অভাব ও বানান ভুল চোখে লাগে। স্বেচ্ছাপূর্বক এই জাতীয় পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয়।

যতীশ্বরানন্দজীর বাণী সংগ্রহে ও বিশ্লেষণে লেখকের নৈপুণ্য অপূর্ব সার্থকতালাভ করেছে। শুধু লেখায় নয়, গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে পবিত্র ওঁকার চিত্র এবং মধ্যে মধ্যে ঠাকুর, মা, স্বামী বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ, বাঙ্গালোর আশ্রম মন্দির এবং যতীশ্বরানন্দজীর বিভিন্ন ছবি ও গ্রন্থ-সজ্জার নানা অলঙ্করণে গ্রন্থটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

স্বামী যতীশ্বরানন্দজীর বাণী ও জীবনীর কথা ছাড়াও ঠাকুর-মায়ের সাক্ষাৎ সন্তানদের এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূর্ববর্তী কর্ণধাররূপী গুরুজনদেরও বহু মূল্যবান পুণ্যস্মৃতি এ গ্রন্থে সংযোজিত, যা অন্যত্র দুর্লভ। এক কথায় সমগ্র গ্রন্থটি শ্রীরামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলের স্নিগ্ধ সুবাসে পরিপূর্ণ। লেখকের শ্রম সার্থক। ভাষায় স্বচ্ছতা আছে, বর্ণনার ভঙ্গীটিও ভাল। 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' স্মৃতিকথার সঙ্কলনটিতে লেখক তাঁর স্মৃতিসম্পদ সাজিয়ে দিয়েছেন। সহজ সরল ভাষায় যে ঈশ্বরতন্ময়তা এই স্মৃতিকথায় ফুটে উঠেছে, তা পাঠকমাত্রেরই হৃদয়ে শান্তি সঞ্চার করবে। আমরা গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীবিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

বাংলাদেশে সেবাকার্য: বাংলাদেশের সেবাকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে এপ্রিল ১৯৭৫-এর শেষ পর্যন্ত মোট ৩৪,৭৪,৭৩৯ টাকা খরচ করা হইয়াছে। এই হিসাবের মধ্যে বিতরিত দ্রব্যাদির মূল্য ধরা হয় নাই। জানুআরি, ফেব্রুআরি ও মার্চ ১৯৭৫-এ কৃত সেবাকার্য নিম্নরূপ:

ঢাকা কেন্দ্র: চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ১৩,৭০৭। বিতরিত হয়: গুঁড়ো দুধ ৩,৫০১ পা:, বিস্কুট ২৬০ কেজি, সোয়েটার ২,৩৮৩, কম্বল ৬৪৭, মশারি ৪৭, নূতন বস্ত্রাদি ৭১২, পুরাতন বস্ত্রাদি ৫০৭, সাবান ৩৬ ও জুতা ১,২০০ জোড়া।

বাগেরহাট কেন্দ্র: চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ১০,৩৬০। বিতরিত হয়: গুঁড়ো দুধ ৩,৮৫৪ পা: এবং কোদাল ২৬।

দিনাজপুর কেন্দ্র (জানুআরি ও মার্চ): চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ৩,১৩১। বিতরিত হয়: গুঁড়ো দুধ ১,৫৩৩ পা:, বস্ত্রাদি ১১৯ ও ভিটামিন ট্যাবলেট ১,২২৮।

নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্র: চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ১৩,০২৪। বিতরিত হয়: ১,২৪৮ পা: গুঁড়ো দুধ।

বরিশাল কেন্দ্র (জানুআরি ও ফেব্রুআরি): চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ৪৬৯।

শ্রীহট্ট কেন্দ্র (মার্চ): চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ৯৮।

ভারতে সেবাকার্য:

রাজকোট কেন্দ্র: লঙ্গরখানায় প্রতিদিন ৫০ জনকে খাওয়ানো হইয়াছে। (ত্রৈমাসিক উপলক্ষে)

মনসাদ্বীপ কেন্দ্র: গত ফেব্রুআরি মাসে বিতরিত হয়: মাছ ধরার জাল ১১টি, সুতো ৬ বাণ্ডিল এবং গুণচট ১৯টি।

রায়পুর কেন্দ্র (ফেব্রুআরি ও মার্চ): বিতরিত হয়: খাদ্যদ্রব্য ১০,১৫৫ কেজি এবং পোশাকাদি ১,৯৯২।

উৎসব

শিলং রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক গত ১৫ই হইতে ২৩শে মার্চ পর্যন্ত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪০তম পুণ্য আবির্ভাব-তিথি বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়।

১৫ই মঙ্গলারতি বেদগান ভজনাদির পর মন্দির পরিক্রমা করা হয়। পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজা শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ এবং হোমাদি হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় দেড় হাজার ভক্ত নরনারী প্রসাদ ধারণ করেন। বৈকালে স্বামী প্রেমরূপানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী আলোচনা করেন।

১৬ই হইতে ১৮ই পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যায় শ্রীসুধীর চৌধুরী রামায়ণ গান পরিবেশন করেন। ১৯শে অপরাহ্নে স্বামী দেবানন্দ গীতা ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যায় শ্রীসত্যেশ্বর মুখার্জী চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী অবলম্বনে সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

পরদিন অপরাহ্নে স্বামী দেবানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় শ্রীসত্যেশ্বর মুখার্জী প্রথমে বিবেকানন্দ গীতি-আলেখ্য এবং পরে মুকুন্দ দাশের গান পরিবেশন করেন।

২১শে অপরাহ্নে শ্রীমা সারদাদেবী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন স্বামী চিদাত্মানন্দ (সভাপতি), শ্রীমতী উষা ভট্টাচার্য, শ্রীমতী জ্যোৎস্না দাশগুপ্তা এবং শ্রীমতী সরযূ দাস।

২২শে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ভাষণ দেন **Dr. K. Subrahmanian** (সভাপতি), স্বামী

চিদাত্মানন্দ, J. P. Singha এবং P. G. Marbaniang।

২৩শে পূর্বাহ্ণে পুষ্পমাল্যাদি শোভিত শ্রীশ্রীঠাকুর-মা-স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ এক বিশাল মিছিল ভজন গাহিতে গাহিতে শহর পরিক্রমা করে। পরে মিছিলের সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বৈকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে ভাষণ দেন স্বামী চিদাত্মানন্দ (সভাপতি), অধ্যক্ষ রাজনাথ উপাধ্যায় এবং অধ্যাপক রামপদ পাণিগ্রাহী।

সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে গত ৪, ৫ ও ৬ই এপ্রিল ১৯৭৫, বহরমপুর শহরে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় স্বামী ধ্যানাত্মানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মসভা হয়। ৪ঠা শ্রীশ্রীঠাকুর, ৫ই শ্রীশ্রীমা ও ৬ই স্বামীজী সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী বিবিক্তানন্দ, স্বামী প্রভানন্দ ও স্বামী শিবময়ানন্দ। প্রতিদিন সভার পরে শ্রীবিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রামায়ণ গান করেন। ৬ই মঙ্গলারতি বেদপাঠ ভজন বিশেষ পূজা হোম শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ ও কথামৃতপাঠ হয়। মধ্যাহ্নে ভক্তদের হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্ণে আশ্রমের শিক্ষার্থিগণ শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি পরিবেশন করে।

তমলুক রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে গত ১১ই এপ্রিল হইতে দিবসত্রয় শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালিত হয়। প্রথম দিন স্বামী অমৃতত্বানন্দের সভাপতিত্বে ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য ও শ্রীসুনীলকুমার সেনগুপ্ত শ্রীশ্রীমায়ের কথা অলোচনা করেন। 'ত্রৈলঙ্গ স্বামী' ছায়াচিত্রও প্রদর্শিত হয়।

দ্বিতীয় দিন হাসপাতালের রোগী এবং শিশুরক্ষা ভবনের বালকদের ফলপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় ধর্মসভার অধিবেশনে স্বামী অমলানন্দের সভাপতিত্বে স্বামী অন্নদানন্দ ও স্বামী মুমুক্ষানন্দ স্বামীজী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। 'মায়ের খেলা সংস্থা' শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গীত-সমৃদ্ধ জীবনালেখ্য পরিবেশন করেন। সমাপ্তিদিবস প্রাতে লীলাপ্রসঙ্গ ও কথামৃত পাঠ হয়। স্বামী তারানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের কথা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রায় ৪০০০ লোক প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে বাউল সঙ্গীতের পর সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহসম্পাদক স্বামী চিদাত্মানন্দ (সভাপতি) শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণীর আলোচনা করেন এবং আশ্রমাধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের দিব্য জীবন-লীলা বর্ণনা করেন। সর্বশেষে সরকারের সৌজন্যে শ্রীকানাই বন্দ্যোপাধ্যায়ের কীর্তন বিশেষ উপভোগ্য হয়।

আলং (অরুণাচল প্রদেশ) রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ে গত ১৫ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪০তম জন্মতিথি পালিত হয়। অপরাহ্ণে ছাত্রাবাসের বালকবৃন্দ বৈদিক শান্তিমন্ত্র ও পুরুষসূক্ত আবৃত্তি করে। পরে হিন্দীতে ও ইংরাজীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জীবনী- ও বাণী-পাঠ এবং গীতা-পাঠ ও ভজন হয়। সন্ধ্যায় সুসজ্জিত নাটমন্দিরে ৩০০ ছাত্র ও ১০০ অতিথির উপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের বৈদিক মন্ত্রাবৃত্তি স্তোত্র-পাঠ এবং সংগীতের পরে আশ্রমাধ্যক্ষ ইংরাজীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী আলোচনা করেন। তাহার পর ৬টি ছাত্র স্বামীজীর My Master হইতে অংশ বিশেষ আবৃত্তি করে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ অবলম্বনে হিন্দীতে রচিত তিনটি একাংক নাটিকা বালকগণ কর্তৃক অভিনীত হয়। স্কুলের একটি বালিকা কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-ভজন ও কয়েকটি ছাত্র কর্তৃক সংস্কৃত স্তোত্রপাঠের পর উৎসবের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানটি হয়: শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিতের ১৩টি আলেখ্য-কথিকা পুতুল-নাচের মাধ্যমে পরিবেশন করে ১৪ বৎসর বয়স্ক শ্রীতারা বিনি। সভায় সিয়াং-এর ডেপুটি কমিশনার শ্রী এম. ঝা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের অবদানের বিষয় আলোচনা করেন ও আলং-এ রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে ডঃ উইলিয়াম নরম্যান ব্রাউন

প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ মার্কিন মনীষী ডক্টর উইলিয়াম নরম্যান ব্রাউন গত এপ্রিল মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পেন্সিলভানিয়ায় স্বগৃহে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার বয়স ৮২ বৎসর হইয়াছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যাণ্ড প্রদেশের প্রধান শহর বালটিমোরে তিনি ২৪শে জুন, ১৮৯২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্যকাল ভারতে, অধিকাংশ সময়ে জব্বলপুরে, মিশনারি পিতামাতার সান্নিধ্যে অতিবাহিত হয়। এই সময়ে তিনি হিন্দী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। ১৩ বৎসর বয়সে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

বালটিমোরের জন্স হপকিন্স নামক বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হইয়া ব্রাউন ১৯১৬ সালে পেন্সিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে হ্যারিসন রিসার্চ ফেলো হন এবং বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহী হন। গ্রীক ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করার ফলে সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহার অনুরাগ জন্মে।

ভারতবর্ষে তিনি বহুবার আসেন: ১৯২২-২৩—বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত অধ্যয়ন; ১৯২৮-২৯—জৈন সাহিত্য অধ্যয়ন; ১৯৩৪-৩৫—ভারতীয় চিত্রকলা শিক্ষা; ১৯৪০-৪৮—পেন্সিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষার কার্যসূচী প্রণয়ন সম্পর্কে; ১৯৬১—'জ্ঞানরত্নাকর' উপাধি গ্রহণ করিতে।

ডঃ ব্রাউন পেন্সিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর (১৯২৬-৬৬) সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি বলিতেন যে, সুনিপুণ স্থপতি কর্তৃক পরিকল্পিত সুরম্য প্রাসাদের ন্যায় সংস্কৃত ভাষা সুগঠিত এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসম্মত বিশ্লেষণের ঘাতসহ সংস্কৃতের ন্যায় আর কোনও ভাষা আছে কিনা তাহা তাঁহার জানা নাই।

ভারততত্ত্ববিদ্ ও বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হিসাবে ডঃ ব্রাউন ভারতের বিদ্বৎসমাজে সমাদৃত। বৈদিক সাহিত্য, ভারতীয় চিত্রকলা, পঞ্চতন্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে কয়েকখানি গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। তাঁহার উল্লেখযোগ্য গবেষণার অনেকগুলি হার্ভার্ড ওরিয়েন্টাল সিরিজে, আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটির পুস্তকাবলীতে এবং কলম্বিয়া ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯৫৭ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় ও ১৯৭০ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডক্টরেট উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন। ১৯৬১ সালে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সমাবর্তন সভায় তাঁহাকে 'জ্ঞানরত্নাকর' উপাধি প্রদান করা হয়। ১৯৬৮ সালে তিনি কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইন্স্টিটিউট ও ভারতের অন্যান্য সংস্কৃত গবেষণা প্রতিষ্ঠানেরও তিনি সদস্য ছিলেন। পুনায় আমেরিকান ইন্স্টিটিউট অফ্ ইণ্ডিয়ান স্টাডিজ্-এর তিনি দশ বৎসর (১৯৬১-৭১) সভাপতি ছিলেন। আমরা এখানে শুধু ভারতবর্ষেই তাঁহাকে যে সম্মান দেওয়া হইয়াছে, তাহারই উল্লেখ করিলাম। বিস্তার-ভয়ে পাশ্চাত্য দেশে প্রদত্ত সম্মানের কথা উল্লিখিত হইল না।

সংস্কৃতের প্রচার ও প্রসারের জন্য তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার কথা স্মরণ করিয়া আমরা তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি। (ইউ.এস.আই.এস. প্রেরিত তথ্যাবলম্বনে)

উৎসব

চাকদহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সংঘের উদ্যোগে বিগত ১৫, ১৬ ও ১৭ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিনই যোড়শোপচারে পূজা হোম গীতা-ও চণ্ডী-পাঠ হয়। ১৫ই চার প্রহর 'রামকৃষ্ণ'-নামকীর্তন ও রাত্রিতে ধর্মীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। ১৬ই মধ্যাহ্নে কয়েক সহস্র নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও স্বামী নিবৃত্ত্যানন্দ। সন্ধ্যায় শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গ্রন্থনায় শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সম্প্রদায় কর্তৃক "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ" গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। ১৭ই অপরাহ্নে যুব-সভায় শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীবীরেন্দ্র কুমার চক্রবর্তী স্বামীজীর আদর্শ ও সেবাধর্মকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে যুবসমাজকে আহ্বান জানান। সন্ধ্যায় ডাঃ বীরেন্দ্রকুমার কুণ্ডু রামায়ণ গান করেন।

তেজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ১৫ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-তিথি পূজা কথামৃতপাঠ ভজন-কীর্তন প্রসাদ-বিতরণ ও জীবনী আলোচনার মাধ্যমে পালিত হয়। এই উপলক্ষে ২৬শে হইতে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত সাধারণ উৎসব পালিত হয়।

২৬শে বিভিন্ন ধর্মের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণসহ প্রায় ৩ হাজার ভক্তের এক শোভাযাত্রা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এক প্রতিকৃতি জীপে সাজাইয়া নানাবিধ বাদ্য ও কীর্তন-সহযোগে শহর পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রার শেষে প্রায় পাঁচ হাজার নরনারী খিচুড়ি প্রসাদ ধারণ করেন। ২৬শে হইতে ২৮শে পর্যন্ত প্রতি সন্ধ্যায় শ্রীসুধীর চৌধুরীর রামায়ণ-গান হয়। ২৯শে ও ৩০শে ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য জীবনীর বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন সর্বশ্রী কমলেশ্বর বরা, হেমেন্দ্রনাথ বরঠাকুর, শ্রীকান্ত শর্মা, অজয় বসু, স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ও স্বামী প্রেমরূপানন্দ। ৩১শে সন্ধ্যায় স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ম্যাজিক ল্যান্টার্ন সহায়ে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর জীবনী আলোচনা করেন। উৎসবের প্রতিটি অনুষ্ঠানে বিপুল লোকসমাগম হয়।

দুর্গাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রমের উদ্যোগে গত ২৩শে মার্চ হইতে ৩ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামীজীর জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

২৩শে প্রত্যূষে স্তোত্রপাঠ ও ভজনের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতিসহ একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন অঞ্চল পরিক্রমা করে। পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজা ও হোমাদির পর প্রায় এক হাজার ভক্ত প্রসাদ পান। অপরাহ্নে ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী মিত্রানন্দ এবং শ্রীহৃষীকেশ চক্রবর্তী "শ্যামপুকুরে শ্যামাপূজা" গীতি-কথিকা পরিবেশন করেন। ২৪শে অপরাহ্নে প্রব্রাজিকা স্বরূপপ্রাণা শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী পর্যালোচনা করেন। পরে স্থানীয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘের সভ্যাবৃন্দ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গীতি-আলেখ্য' পরিবেশন করেন ও "মহাতীর্থ কালীঘাট" চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। ২৫শে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-গীতি পরিবেশন করেন স্বামী চন্দ্রশেখরানন্দ। শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলীর একটি চিত্র-প্রদর্শনী উৎসবের অঙ্গ ছিল।

নবগ্রাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে গত ৩০শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবতিথি উপলক্ষে মঙ্গলারতি উষাকীর্তন প্রভাতফেরী পূজা হোম কথামৃতপাঠ ও আলোচনাদি হয়। বিকালে আয়োজিত ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ (সভাপতি) ও স্বামী নিবৃত্ত্যানন্দ। সভাশেষে কাশীপুর নাট্য সমিতি কর্তৃক 'স্বামী বিবেকানন্দ' যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

নববারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদে গত ৯ ও ১০ই মার্চ স্বামী বিবেকানন্দের ১১৩তম শুভ আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ৯ই প্রত্যূষে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি লইয়া এক শোভাযাত্রা বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। পূজার্চনার পর প্রায় ৫০০ জন ভক্ত প্রসাদ পান। অপরাহ্ণে ছাত্র সম্মেলনে প্রায় ৩৫ জন ছাত্র আবৃত্তি, সঙ্গীত ও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগীদের পরে পুরস্কৃত করা হয়। সন্ধ্যায় ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ (সভাপতি), অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এবং অধ্যাপক ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী। ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীভূপেন চক্রবর্তী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পরিষদ সভাপতি ডঃ মহেন্দ্র চন্দ্র মালাকার। ১০ই জনসভায় ভাষণ দেন শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় এবং স্বর ও শ্রুতিগোষ্ঠীর পরিচালনায় শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

ঘাটশিলা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমে গত ৬, ৭ ও ৮ই এপ্রিল যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে। স্বামী প্রজ্ঞানন্দের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর আশ্রম-প্রাঙ্গণে রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দিরের সৌজন্যে 'রাণী রাসমণি' ও 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' এবং পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের সৌজন্যে 'মাথুর' ছায়াচিত্র দেখানো হয়। উৎসবের তিন দিনই প্রচুর জনসমাগম হয়।

দিনহাটা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের উদ্যোগে গত ৪, ৫ ও ৬ই এপ্রিল স্থানীয় চওড়াহাট কালীবাড়ীতে বিশেষ পূজা পাঠ ভজন ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মধ্যাহ্নে প্রায় দুই হাজার ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতিসহ এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্বন্ধে ভাষণ দেন প্রধান অতিথি স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ ও সর্বশ্রী শচীন্দ্র নাথ চক্রবর্তী কানাইলাল সাহা ও অলোক গঙ্গোপাধ্যায়। ছায়াচিত্রে স্বামীজীর চিত্র প্রদর্শন ও বক্তৃতা করেন শ্রীযোগেশ চন্দ্র দাস। দিনহাটা শিল্পিসংসদ "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ লীলা-গীতি" পরিবেশন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর চিত্র সম্বলিত একটি প্রদর্শনী উৎসবের অঙ্গ ছিল।

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সংসদে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-উৎসব গত ৫ই হইতে ৮ই এপ্রিল পর্যন্ত মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ৫ই সকালে পূজা চণ্ডী-ও গীতা-পাঠ এবং ভজনাদি হয়। কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গ আলোচনা করেন স্বামী চিৎসুখানন্দ। দুপুরে প্রায় ১২০০ ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক 'মহা উদ্বোধন' নাটক মঞ্চস্থ হয় ও সাধক বামাক্ষ্যাপার জীবনী অবলম্বনে লীলাকীর্তন হয়। ৬ই হইতে ৮ই রামনাম সংকীর্তন ও রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম কর্তৃক 'নদের পাগল' যাত্রাভিনয় হয়। প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা শ্রীমা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ধর্মসভাতে 'অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ' আলোচনা করেন স্বামী চিৎসুখানন্দ এবং স্বামী শিবানন্দ গিরি 'উদ্ধব-সন্দেশ' কীর্তন করেন।

বাগদা (পুরুলিয়া) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৫ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণজন্মোৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। পূজা পাঠ ভজন-কীর্তন এবং প্রসাদ বিতরণ উক্ত উৎসবের অঙ্গ ছিল। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সৌজন্যে দুই দিবস "ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ" চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

রাউরকেলা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ গত ১৫ই এবং ১৬ই মার্চ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪০তম শুভ জন্মোৎসব পালন করে। ১৫ই মার্চ মঙ্গলারতি পূজা হোম ভক্তিমূলক সঙ্গীত প্রসাদ বিতরণ সন্ধ্যারতি এবং বক্তৃতা হয়। ১৬ই অপরাহ্ণে ইস্পাত বিদ্যালয়ের হলঘরে আহূত জনসভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীএইচ. কে. মহান্তি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীএস. রথ। স্বামী অকামানন্দ, স্বামী মহানন্দ ও ডাঃ কে. পি. মিশ্র শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন।

ভাগলপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র কর্তৃক গত ১লা চৈত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ ১৪০তম জন্মতিথি উৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রায় সহস্রাধিক দরিদ্রনারায়ণ উক্ত দিবসে পরম পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়াছে।

শ্রীসুনীল কুমার সোম, শ্রীসন্তোষ গাঙ্গুলি ও অন্যান্য শিল্পিবৃন্দের ভজন কীর্তন বিশেষ পূজা ভোগ আরতি ও স্তবস্তোত্র-গীতা-কথামৃত- ও শ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি-পাঠ এবং সর্বশ্রী হিমাংশু মৈত্র শ্যামাচরণ রাহা ও ক্ষীরোদেন্দু চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক বক্তৃতা ও নামকীর্তন হয়।

বঙ্গাইগাঁও শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম কর্তৃক ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪০তম জন্মোৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম দিন প্রায় তিন হাজার ভক্তকে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। দুই দিনই অপরাহ্ণে ধর্মসভা হয়। ভাষণ দেন স্বামী প্রেমরূপানন্দ। সভান্তে শ্রীযোগেশ দাস শ্রীরঞ্জিত ঘোষ ও সহশিল্পিবৃন্দ লীলাগীতি পরিবেশন করেন এবং ছায়াছবি সহযোগে স্বামীজী সম্পর্কে আলোচনা হয়।

পশ্চিম রাজাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে গত ৮ই এপ্রিল শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর, ১৯শে শ্রীশ্রীস্বামীজীর ও ২০শে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। ৮ই মহিলাদের ও ১৯শে যুবকদের সারাদিনব্যাপী শিক্ষণ শিবির ও সন্ধ্যায় মহিলাসভা ও যুবসম্মেলন হয়। মহিলা শিক্ষণ শিবির পরিচালনা করেন অখিল ভারত নিবেদিতা ব্রতী সংঘ এবং যুবকদের শিক্ষণ শিবির পরিচালনা করেন অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল। ৮ই বক্তৃতা দেন প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা ও অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত; সভানেত্রীত্ব করেন প্রব্রাজিকা তপস্যাপ্রাণা। ১৯শে বক্তৃতা দেন শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়। ২০শে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবে মঙ্গলারতি শ্রীরামনাম-সংকীর্তন নগরকীর্তন বিশেষ পূজা প্রসাদ বিতরণ গীতাপাঠ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও বৈকালে ধর্মসভা হয়। ভাষণ দেন স্বামী শিবেশ্বরানন্দ (সভাপতি) ও স্বামী জিতাত্মানন্দ। পরে রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দিরের সৌজন্যে 'ভক্ত হরিদাস' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

পরলোকে অনিলাবালা বসু

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী ভক্ত ৺চুনীলাল বসুর পুত্র, স্বামীজীর মন্ত্রশিষ্য ৺অসীমকুমার বসুর সহধর্মিণী শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্যা অনিলাবালা বসু গত ১৬ই বৈশাখ, ব্রাহ্মমুহূর্তে (৪টা-৭মিঃ) তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে ৯৪ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে পরম বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন।

ভ্রম-সংশোধন

বৈশাখ ১৩৮২ সংখ্যার ১৬৫ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের শেষ পঙ্‌ক্তিতে 'সেখানেই' শব্দটির স্থলে 'বড় মামারই বৈঠকখানায়' এবং ১৬৬ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ১৬শ পঙ্‌ক্তিতে 'সুরেশবাবুর' স্থলে 'সুরেন-বা—র' হইবে।

[পুনর্মুদ্রণ]

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ]　　১৫ই শ্রাবণ। (১৩০৬)　　[১৪শ সংখ্যা।]

জন্মান্তর।

(বাবু সিদ্ধেশ্বর রায় লিখিত।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

যত দিন না লোকে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, তত দিন তাহার ভোগ শেষ হয় নাই। জোর করিয়া ভোগ শেষ করা যায় না; কিন্তু সময়ে যখন ভোগ শেষ হয়, তখন আর কর্ম্ম থাকে না, শুষ্ক নারিকেল পত্রের ন্যায় বৃক্ষ হইতে স্বয়ং স্খলিত হইয়া পড়ে। অতএব যখন সংসার কর্ম্মময় ও ভোগের স্থান, তখন কর্ম্ম না করিয়া এখানে অবস্থিতি করা সম্ভব নহে—যিনি আর সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিও আহার নিদ্রার অধীন। সুতরাং কর্ম্ম যখন অত্যাজ্য, তখন যাহা করিতে হইবে, তাহা অনাসক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণে তাহার ফল অর্পণ করিয়া করাই বিধি। তাহা হইলে আবার জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয় না।

সুখ।*

অভ্রভেদী তুঙ্গশৃঙ্গ ভূধর যথায়,
উদ্‌গ্রীব হইয়া সদা উর্দ্ধপানে চায়,
ঝর ঝর ঝর যথা ঝরে নির্ঝরিণী,
উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে যায় সাগরবাহিনী,
উত্তাল তরঙ্গ তুলি সুনীল বারিধি,
অনন্তের পানে ছুটি চলে নিরবধি,
সংসারের কোলাহল না পশে যথায়,
আনন্দে বিহগকুল উড়িয়া বেড়ায়;
বসি তথা নিরজনে,　　সুস্থির প্রশান্ত মনে,
আপন অন্তরে সুধী! বারেক শুধাও,
'কিবা কাযে ভবমাঝে ঘুরিয়া বেড়াও।'
'আসি ভব কারাবাসে,　　ছুটাছুটি যে উদ্দেশে,
পেলে কি হে সে রতন,　　যা লাগি বিকল মন,
সতত কাতর হিয়া পরাণ উধাও?'
আসিবে উত্তর "হেথা বৃথা আকিঞ্চন,
ভগবৎ পাদপদ্মে মিলে সে রতন।"

---

* স্বামী প্রকাশানন্দ রচিত।—বর্ত্তমান সম্পাদক

ভগবদ্গীতা

শাঙ্করভাষ্যানুবাদ।

(পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত।)

[২য় অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকের ভাষ্য হইতে ২১ শ্লোকের ভাষ্য ও অনুবাদ পর্যন্ত।—বর্তমান সম্পাদক]

মুর্শিদাবাদ অনাথ আশ্রম।

১২শ সংখ্যার উদ্বোধনে মুর্শিদাবাদ অনাথাশ্রমের আয়-ব্যয়ের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে ছাপাই ভুল অনেক রহিয়া গিয়াছে এবং কতকস্থলে অস্পষ্টও থাকিয়া গিয়াছে; সেই কারণ, পুনরায় সেগুলি সংশোধন ও সুস্পষ্ট করিয়া নিম্নে দেওয়া হইল।—

১৮৯৮ খৃঃ অব্দের মে হইতে ১৮৯৯ খৃঃ অব্দের এপ্রিল পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদ অনাথাশ্রমের আয় ব্যয়ের বিবরণ—

আয়।

এককালীন সাহায্যকারীগণ	৪৮৯॥৶৫
মাসিক সাহায্যকারীগণ (১৮৯৮ অক্টোবর হইতে) ...	১৪১॥৶০
বিবিধ	৯॥১৫
মোট জমা—	৬৪০৸/০

ব্যয়।

সম্বৎসরের গড়ে ১২ জন লোকের খাইখরচ	৩৫১/১২॥
গায়ের কাপড়, লেপ কম্বলাদি; রন্ধনপাত্র, বিছানা ও অন্যান্য আবশ্যকীয় তৈজসাদি ...	১০৫৶০
দার্জ্জিলিং হইতে ৪টী বালক আনিবার ও দ্রব্যাদি আনয়নের খরচা ...	৭৯৸৵০
পোষ্টেজ ও টেলিগ্রাম	২১ ৵৫
দুইখানি ঘর প্রস্তুত করিবার জন্য মজুরি, মুটে ভাড়া প্রভৃতি ..	৪৩৲১৭॥
বালকদিগের পুস্তক, কাগজ, ষ্টেশনারি প্রভৃতি ...	১৩ ॥৶০
ঔষধ, বার্লি প্রভৃতি	১০ ।১০
মোট খরচ—	৬২৪ ।/৫
উদ্বৃত্ত—	১৬৷৵১৫
	৬৪০৸/০

সমালোচনা।

"দার্জ্জিলিংয়ের নক্সা"।—পুস্তকখানি বাহিরে দেখিতেও যেমন অতি সুন্দর; ভিতরে, লেখাও তেমনি অতি পরিপাটী হইয়াছে। ইহা একখানি হাস্যরস ও ব্যঙ্গোক্তি-প্রধান অভিনয়-গ্রন্থ—মাত্র পাঁচটী দৃশ্যে সম্পূর্ণ; সম্প্রতি দার্জ্জিলিংয়ে অভিনীত হইতেছে। নূতন দার্জ্জিলিং-দর্শক বাঙ্গালী জমিদার ও মধ্যবিৎ বাবুদিগের এবং তত্রস্থ ভুটিয়া, ফিরিঙ্গী, বাঙ্গালী হিন্দু ও ব্রাহ্মগণের পরস্পর ব্যবহার কতক পরিমাণে চিত্রিত হইয়াছে। যতটুকু চিত্রিত হইয়াছে—তাহা বড় স্বাভাবিক ও উজ্জ্বলভাবে হইয়াছে। গ্রন্থকার গুটীকতক বেশ ভুটিয়া গান এবং ইংরাজী গান ইহাতে রচনা করিয়া দিয়াছেন। ইহার প্রধান নায়ক—একটী নূতন উপাধিপ্রাপ্ত রাজা,—নূতন দার্জ্জিলিং দর্শনে গিয়াছেন। সঙ্গে—ম্যানেজার "জন" সাহেব এবং "মাণিক" নামক রাজার "মোসাহেব"; ইহারাই প্রধান নট। কলিকাতা, ২৩৩ স্কটস্ লেন নিবাসী বাবু ধীরেন্দ্রনাথ পাল প্রণীত ও বাবু নরেন্দ্রনাথ পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত; মূল্য চারি আনা।

উপরে এই পুস্তিকাকে "অভিনয়-গ্রন্থ" বলিয়াছি—"নাটক" বলিলাম না কেন?—আমাদের সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রমতে হাস্যোদ্দীপক অভিনেয় পুস্তককে "নাটক" বলা যাইতে পারে না। আজ কাল, বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল অভিনেয় পুস্তক প্রণয়ন করা হয় সে সকল কেবল ইংরাজী ধরণে।—এক রকম মন্দ নয়; ইহাতে বাঙ্গালা দৃশ্য-কাব্যের উন্নতি কতকটা হইতেছে বলা যাইতে পারে। সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে "নাটক" কাহাকে কহে সময়ান্তরে উদ্বোধনে স্থান পাইলে প্রবন্ধাকারে বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিব।

[১ম বর্ষ।] ১লা ভাদ্র। (১৩০৬ সাল) [১৫শ সংখ্যা।]

পরমহংসদেবের উপদেশ।

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত।)

১। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংসারে থেকে ঈশ্বর উপাসনা কি সম্ভব?" পরমহংসদেব একটু হাসিয়া বলিলেন, "ওদেশে দেখিছি, সব চিঁড়ে কোটে; একজন স্ত্রীলোক এক হাতে ঢেঁকির গড়ের ভেতর হাত দিয়ে নাড়ছে. আর এক হাতে ছেলে কোলে নিয়ে মাই খাওয়াচ্ছে, ওর ভেতর আবার খদ্দের আসছে, তার সঙ্গে হিসাব করছে, "তোমার কাছে উদিনের এত পাওনা আছে, আজকের এত দাম হ'লো"; এই রকম সে সব কায কচ্ছে বটে, কিন্তু তার মন সর্ব্বক্ষণ ঢেঁকির মুষলের দিকে আছে; সে জানে যে ঢেঁকিটী হাতে পড়ে গেলে হাতটী জনমের মত যাবে। সেইরূপ সংসারে থেকে সকল কায কর, কিন্তু মন রেখো তাঁর প্রতি। তাঁকে ছাড়লে সব অনর্থ ঘটবে।

২। সংসারের মধ্যে বাস ক'রে যিনি সাধনা করতে পারেন, তিনিই ঠিক বীর সাধক। বীর পুরুষ যেমন মাথায় বোঝা নিয়ে আবার অন্যদিকে তাকাতে পারে, বীর সাধক তেমনি এ সংসারের বোঝা ঘাড়ে ক'রে ভগবানের পানে চেয়ে থাকে।

৩। বাউল যেমন দুই হাতে দুরকম বাজনা বাজায় ও মুখে গান করে, হে সংসারী জীব! তোমরাও হাতে সমস্ত কায কর্ম্ম কর, কিন্তু মুখে সর্ব্বদা ঈশ্বরের নাম জপ করতে ভুল না।

৪। নষ্ট স্ত্রীলোক যেমন আত্মীয় স্বজনের মধ্যে থেকে সংসারের সব কায করে, কিন্তু তার মন প'ড়ে থাকে উপপতির উপর। সে কায করতে করতে সর্ব্বদা ভাবে যে, কখন্ তার সঙ্গে দেখা হবে। তোমারও, সংসারের কায করতে করতে, মন সর্ব্বদা যেন ভগবানের দিকে প'ড়ে থাকে।

বিলাতযাত্রীর পত্র

(স্বামী বিবেকানন্দ প্রেরিত।)

স্বামীজি ওঁ নমো নারায়ণায়—"মো" কারটা হৃষীকেশী ঢঙের উদাত্ত ক'রে নিও ভায়া। আজ সাত দিন হল আমাদের জাহাজ চলেছে, রোজই তোমায় কি হচ্চে না হচ্চে খবরটা লিখ্‌বো মনে করি, খাতা পত্র কাগজ কলমও যথেষ্ট দিয়েছ, কিন্তু ঐ বাঙ্গালী "কিন্তু" বড়ই গোল বাধায়। একের নম্বর কুঁড়েমি—ডায়েরি, নাকি তোমরা বল, রোজ লিখবো মনে করি, তার পর নানাকাজে সেটা অনন্ত "কাল" নামক সময়েতেই থাকে; এক পাও এগুতে পারে না। দুয়ের নম্বর—তারিখ প্রভৃতি মনেই থাকে না। সে গুলো সব তোমরা নিজগুণে পূর্ণ করে নিও। আর যদি বিশেষ দয়া কর তো, মনে ক'র যে, মহাবীরের মত বার তিথি মাস মনে থাক্‌তেই পারে না—রাম হৃদয়ে ব'লে। কিন্তু বাস্তবিক কথাটা হচ্চে এই যে, সেটা বুদ্ধির দোষ এবং ঐ কুড়েমি। কি উৎপাৎ! "ক সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ"— থুড়ি হলোনা,— "ক সূর্য্যপ্রভববংশচূড়ামণিরামৈকশরণো বানরেন্দ্রঃ" আর—কোথা আমি দীন অতি দীন। তবে তিনিও শত যোজন সমুদ্র পার এক লাফে দিয়েছিলেন, আর আমরা কাঠের বাড়ীর মধ্যে বন্ধ হয়ে, ওছল পাছল ক'রে, খোঁটা খুঁটি ধ'রে চলৎশক্তি বজায় রেখে, সমুদ্র পার হচ্চি। একটা বাহাদুরি আছে—তিনি লঙ্কায় পৌঁছে রাক্ষস রাক্ষসীর চাঁদমুখ দেখেছিলেন, আর আমরা রাক্ষস রাক্ষসীর দলের সঙ্গে যাচ্চি। খাবার সময় সে শত ছোরার চক্‌চকানি আর শত কাঁটার ঠক্‌ঠকানি দেখে শুনে তু—ভায়ার ত আক্কেল গুড়ুম। ভায়া থেকে থেকে সিঁটকে উঠেন, পাছে পার্শ্ববর্ত্তী রাঙ্গাচুলো বিড়ালাক্ষ ভুলক্রমে ঘ্যাচ ক'রে ছুরিখানা তাঁরই গায়ে বা বসায়—ভায়া একটু নধরও আছেন কিনা। বলি হ্যাগা, সমুদ্র পার হতে হনুমানের সি সিক্‌নেস হয়েছিল কিনা, সে বিষয়ে পুঁথিতে কিছু পেয়েছ? তোমরা প'ড়ো পণ্ডিত মানুষ, বাল্মীকি আল্মীকি কত জান; আমাদের "গোঁসাইজি" ত কিছুই বল্‌ছেন না। বোধ হয়—হয় নি; তবে ঐ যে, কার মুখে প্রবেশ করেছিলেন সেই খানটায় একটু সন্দেহ হয়। তু—ভায়া বল্‌চেন জাহাজের গোড়াটা যখন হুস্‌ ক'রে স্বর্গের দিকে উঠে ইন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করে,

আবার তৎক্ষণাৎ ভুস্ করে পাতালমুখো হ'য়ে বলি রাজাকে বেঁধবার চেষ্টা করে, সেই সময়টা তাঁরও বোধ হয়, যেন কার মহা বিকট বিস্তৃত মুখের মধ্যে প্রবেশ করছেন। মাফ ফরমাইয়ো ভাই—ভালা লোককে কাযের ভার দিয়েছ! রাম কহো! কোথায় তোমায় সাতদিন সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা দেবো, তাতে কত রঙ ঢঙ মসলা বার্ণিস থাক্‌বে, কত কাব্যরস ইত্যাদি, আর কিনা আবল তাবল বক্‌চি! ফল কথা মায়ার ছালটী ছাড়িয়ে ব্রহ্মফলটী খাবার চেষ্টা চিরকাল করা গেছে, এখন খপ করে স্বভাবের সৌন্দর্য্যবোধ কোথা পাই বল। "কাঁহা কাশী, কাঁহা কাশ্মীর, কাঁহা খোরাশান গুজরাত", আজন্ম ঘুরচি। কত পাহাড়, নদ, নদী, গিরি, নির্ঝর, উপত্যকা, অধিত্যকা, চিরনিহার-মণ্ডিত মেঘমেখলিত পর্ব্বতশিখর, উত্তুঙ্গতরঙ্গভঙ্গকল্লোলশালী কত বারিনিধি দেখ্‌লুম শুনলুম ডিঙ্‌লুম পার হলুম। কিন্তু কেরাঞ্চি ও ট্রাম ঘড়ঘড়ায়িত ধূলিধূসরিত কলকাতার বড় রাস্তার ধারে—কিবা পানের পিক বিচিত্রিত দেয়ালে টিক্‌টিকি ইঁদুর ছুঁচো মুখরিত একতলা ঘরের মধ্যে দিনের বেলায় প্রদীপ জ্বেলে—আঁব কাঠের তক্তায় ব'সে, থেলো হুঁকো টান্‌তে টান্‌তে,—কবি শ্যামাচরণ, হিমাচল, সমুদ্র, প্রান্তর, মরুভূমি প্রভৃতির যে হুবহু ছবিগুলি চিত্রিত ক'রে, বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন,—সে দিকে লক্ষ্য করাই আমাদের দুরাশা। শ্যামাচরণ ছেলে বেলায় পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছিলেন, যেথায় আকণ্ঠ আহার ক'রে এক ঘটি জল খেলেই বস্—সব হজম, আবার ক্ষিধে,—সেখানে শ্যামাচরণের প্রাতিভদৃষ্টি এই সকল প্রাকৃতিক বিরাট ও সুন্দর ভাব উপলব্ধ করেছে। তবে একটু গোল যে, ঐ পশ্চিম—বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত নাকি শুনতে পাই।

তবে একান্তই তোমাদের উপরোধ, আর আমিও যে একেবারে "ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস" নহি, সেটা প্রমাণ করবার জন্ম শ্রীদুর্গা স্মরণ ক'রে আরম্ভ করি; তোমরাও খোঁটা খুঁটি ছেড়ে দিয়ে শোনো—

নদীমুখ বা বন্দর হ'তে জাহাজ রাত্রে প্রায় ছাড়ে না,—বিশেষ কলিকাতার ন্যায় বাণিজ্য-বহুল বন্দর, আর গঙ্গার ন্যায় নদী। যতক্ষণ না জাহাজ সমুদ্রে পৌঁছায়, ততক্ষণই আড়কাটির অধিকার; তিনিই কাপ্তেন; তাঁরই হুকুম; সমুদ্রে বা আসবার সময় নদীমুখ হতে বন্দরে পৌঁছে দিয়ে তিনি খালাস। আমাদের গঙ্গার মুখে দুটী প্রধান ভয়; একটী বজ্‌বজের কাছে জেমস্ ও মেরি নামক চোরা বালি, দ্বিতীয়টী ডায়মণ্ড হারবারের মুখে চড়া। পুরো জোয়ারে, দিনের বেলায়, পাইলট অতি সন্তর্পণে জাহাজ চালান্; নতুবা নয়। কাযেই গঙ্গা থেকে বেরুতে আমাদের দুদিন লাগলো।

হৃষীকেশের গঙ্গা মনে আছে? সেই নির্ম্মল নীলাভ জল—যার মধ্যে দশ হাত গভীরের মাছের পাখ্‌না গোনা যায়, সেই অপূর্ব্ব সুস্বাদ হিমশীতল "গাঙ্গ্যং বারি মনোহারি", আর সেই অদ্ভুত হর্ হর্ হর্ তরঙ্গোত্থ ধ্বনি, সাম্‌নে গিরি নির্ঝরের হর্ হর্ প্রতিধ্বনি, সেই বিপিনে বাস, মাধুকরী ভিক্ষা, গঙ্গাগর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপাকার-শিলাখণ্ডে ভোজন করপুটে অঞ্জলি অঞ্জলি সেই জল পান, চারিদিকে কণপ্রত্যাশী মৎস্যকুলের নির্ভয় বিচরণ? সে গঙ্গাজলপ্রীতি, গঙ্গার মহিমা, সে গাঙ্গ্যবারির বৈরাগ্যপ্রদস্পর্শ, সে হিমালয়বাহিনী গঙ্গা, শ্রীনগর, টিহিরি, উত্তরকাশী, গঙ্গোত্রী, তোমাদের কেউ কেউ গোমুখী পর্য্যন্ত দেখেছ; কিন্তু আমাদের কর্দ্দমাবিলা, হরগাত্রবিঘর্ষণশুভ্রা, সহস্রপোতবক্ষা এ কলিকাতার গঙ্গায় কি এক টান আছে, তা ভোলবার নয়। সে কি স্বদেশপ্রিয়তা বা বাল্য-

সংস্কার—কে জানে ? হিন্দুর সঙ্গে মায়ের সঙ্গে এ কি সম্বন্ধ !—কুসংস্কার কি ? হবে। গঙ্গা গঙ্গা করে জন্ম কাটায়, গঙ্গা জলে মরে, দূর দূরান্তরের লোক গঙ্গাজল নিয়ে যায়, তাম্রপাত্রে যত্ন ক'রে রাখে, পালপার্ব্বণে বিন্দু বিন্দু পান করে। রাজারাজড়ারা ঘড়া পুরে রাখে, কত অর্থব্যয় ক'রে গঙ্গোত্রীর জল রামেশ্বরের উপর নিয়ে গিয়ে চড়ায় ; হিন্দু বিদেশে যায়—রেঙ্গুন, জাভা, হংকং, জাঞ্জীবর, মাডাগাস্কর, সুয়েজ, এড্‌ন্, মাল্‌টা—সঙ্গে গঙ্গাজল, সঙ্গে গীতা। গীতা গঙ্গা—হিঁদুর হিঁদুয়ানি। গেলবারে আমিও একটু নিয়ে গিয়েছিলুম—কি জানি কি ! বাগে পেলেই এক আধ বিন্দু পান কর্‌তাম, পান কল্লেই কিন্তু সে পাশ্চাত্যজনস্রোতের মধ্যে, সে কোটি কোটি মানবের উন্মত্তপ্রায় দ্রুতপদসঞ্চারের মধ্যে, মন যেন স্থির হয়ে যেত। সে জনস্রোত, সে রজোগুণের আস্ফালন, সে পদে পদে প্রতিদ্বন্দ্বিসংঘর্ষ, সে বিলাসক্ষেত্র, অমরাবতীসম পারিস, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, বার্লিন, রোম, সব লোপ হয়ে যেত, আর শুন্‌তাম সেই হর্ হর্ হর্, দেখতাম সেই হিমালয়ক্রোড়স্থ বিজন বিপিন, আর কল্লোলিনী সুরতরঙ্গিণী যেন হৃদয়ে মস্তকে শিরায় শিরায় সঞ্চার করছেন, আর গর্জ্জে গর্জ্জে ডাকছেন হর্ হর্ হর্ !!

এবার তোমরাও পাঠিয়েছ দেখ্‌চি মাকে মান্দ্রাজের জন্য। কিন্তু একটা অদ্ভুত পাত্রের মধ্যে মায়ের প্রবেশ করিয়েছ্ ভায়া ! তু—ভায়া বাল-ব্রহ্মচারী "জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েণ তেজসা" ; ছিলেন "নমো ব্রহ্মণে", হয়েছেন "নমো নারায়ণায়" (বাপ্ রক্ষা আছে), তাই বুঝি ভায়ার হস্তে ব্রহ্মার কমণ্ডলু ছেড়ে মায়ের বদ্‌নায় প্রবেশ। যাহক্ খানিক রাত্রে উঠে দেখি, মায়ের সেই বৃহৎ বদ্‌নাকার কমণ্ডলুর মধ্যে অবস্থানটা অসহ্য হয়ে উঠেছে। সেটা ভেদ ক'রে মা বেরুবার চেষ্টা করচেন। ভাব্‌লুম সর্ব্বনাশ, এই খানেই যদি হিমাচল ভেদ, ঐরাবত ভাসান, জহ্নুর কুটীর ভাঙ্গা প্রভৃতি পর্ব্বাভিনয় হয় ত—গেছি। স্তব স্তুতি অনেক করলুম, মাকে অনেক বুঝিয়ে বল্লুম—মা ! একটু থাক, কাল্ মান্দ্রাজে নেমে যা হয়, যা করবার করো, সেদেশে হস্তী অপেক্ষাও সূক্ষ্মবুদ্ধি অনেক আছেন, সকলেরই প্রায় জহ্নুর কুটীর, আর ঐ যে চক্‌চকে কামান টিকিওয়ালা মাথাগুলি ওগুলি সব প্রায় শিলাখণ্ডে তৈয়ারি, হিমাচল ত ওর কাছে মাখম, যতপার ভেঙ্গ, এখন একটু অপেক্ষা কর। উঁহুঁ ; মা কি শোনে তখন। এক বুদ্ধি ঠাওরালুম, বল্লুম মা দেখ ঐ যে পাগড়ী মাথায় জামাগায়ে চাকরগুলি জাহাজে এদিক ওদিক করুছে ওরা হচ্চে নেড়ে, আসল গরুখেকো নেড়ে, আর ঐ যারা ঘরদোর সাফ করে ফির্‌ছে, ওরা হচ্চে আসল মেথর, লাল বেগের চেলা। যদি কথা না শোনো ত ওদের ডেকে তোমায় ছুঁইয়ে দিইছি আর কি। তাতেও যদি না শান্ত হও, তোমায় এক্ষুণি বাপের বাড়ী পাঠাব ; ঐ যে ঘরটী দেখ্‌ছ, ওর মধ্যে বন্ধ করে দিলেই তুমি বাপের বাড়ীর দশা পাবে, আর তোমার ডাক হাঁক সব যাবে, জ'মে একখানি পাথর হয়ে থাকতে হবে। তখন বেটি শান্ত হয়। বলি সুধু দেবতা কেন, মানুষেরও ঐ দশা—ভক্ত পেলেই ঘাড়ে চ'ড়ে বসেন।

কি বর্ণনা কর্‌তে কি বক্‌ছি আবার দেখ ! আগেই ত বলে রেখেছি, আমার পক্ষে ওসব এক রকম অসম্ভব, তবে যদি সহ্য কর ত আবার চেষ্টা করুতে পারি।

আপনার লোকের একটি রূপ থাকে, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। নিজের খাঁদা বোঁচা ভাই বোন ছেলে মেয়ের চেয়ে গন্ধর্ব্ব লোকেও সুন্দর পাওয়া যাবে না সত্য। কিন্তু গন্ধর্ব্ব লোক বেড়িয়েও যদি আপনার লোককে যথার্থ সুন্দর পাওয়া যায়, সে আহ্লাদ রাখ্‌বার কি আর

জায়গা থাকে ? এই অনন্তশস্যশ্যামলা সহস্রস্রোতস্বতিমাল্যধারিণী বাঙ্গালা দেশের একটী রূপ আছে। সে রূপ—কিছু আছে মলয়ালমে (মালাবার), আর কিছু কাশ্মীরে। জলে কি আর রূপ নাই ? জলে জলময়, মুষলধারে বৃষ্টি কচুর পাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্চে, রাশি রাশি তাল নারিকেল খেজুরের মাথা একটু অবনত হয়ে সে ধারাসম্পাত বইছে, চারিদিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ,—এতে কি রূপ নাই ? আর আমাদের গঙ্গার কিনার, বিদেশ থেকে না এলে, ডায়মণ্ড হারবারের মুখ দিয়ে না গঙ্গায় প্রবেশ করলে, সে বোঝা যায় না। সে নীল নীল আকাশ, তার কোলে কাল মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালি কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ ঝোপ তাল নারকেল খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেলচে, তার নীচে ফিকে, ঘন, ঈষৎ পীতাভ, একটু কাল মেশান, ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ী ঢালা আম নীচু জাম কাঁটাল,—পাতাই পাতা—গাছ ডাল পালা আর দেখা যাচ্চে না, আসে পাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেলচে দুলচে, আর সকলের নীচে যার কাছে ইয়ার্কান্দী ইরানি তুর্কিস্তানি গালচে দুলচে কোথায় হার মেনে যায়—সেই ঘাস, যতদূর চাও সেই শ্যাম শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে ছুঁটে ঠিক করে রেখেচে ; জলের কিনারা পর্য্যন্ত সেই ঘাস ; গঙ্গার মৃদুমন্দ হিল্লোল যে অবধি জমিকে ঢেকেছে, যে অবধি অল্প অল্প লীলাময় ধাক্কা দিচ্চে, সে অবধি ঘাসে আঁটা। আবার তার নীচে আমাদের গঙ্গাজল। আবার পায়ের নীচে থেকে দেখ, ক্রমে উপরে যাও, উপর উপর মাথার উপর পর্য্যন্ত, একটী রেখার মধ্যে এত রঙের খেলা, একটী রঙে এত রকমারি, আর কোথাও দেখেছ ? বলি, রঙের নেশা ধরেছে কখন কি—যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে ? হুঁ, বলি—এই বেলা এ গঙ্গা-মা'র শোভা যা দেখবার দেখে নাও, আর বড় একটা কিছু থাকচে না। দৈত্য দানবের হাতে পড়ে এ সব যাবে। ঐ ঘাসের জায়গায় উঠবেন—ইটের পাঁজা, আর নাববেন ইটখোলার গর্ত্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি ঘাসের সঙ্গে খেলা করছে, সেখানে দাঁড়াবেন পাট বোঝাই ফ্ল্যাট, আর সেই গাধা বোট ; আর ঐ তাল তমাল আঁব নীচুর রঙ, ঐ নীল আকাশ, মেঘের বাহার, ওসব কি আর দেখতে পাবে ? দেখবে পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের মত অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন কলের চিমনি ! ! !

এইবার জাহাজ সমুদ্রে পড়ল। ঐ যে দূরাদয়শ্চক্র ফক্র তমালতালী বনরাজী ইত্যাদি ও সব কিছু কাযের কথা নয়। মহাকবিকে নমস্কার করি, কিন্তু তিনি কোন জন্মে হিমালয়ও দেখেন নি, সমুদ্রও দেখেন নি এই আমার ধারণা।

এই খানে ধলায় কালোয় মেশামেশি, প্রয়াগের কিছু ভাব যেন। সর্ব্বত্র দুর্লভ হলেও "গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।" তবে এ জায়গা বলে ঠিক গঙ্গার মুখ নয়। যা হ'ক আমি নমস্কার করি, "সর্ব্বতোক্ষিশিরোমুখং" বলে।

কি সুন্দর ! সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়, ঘন নীলজল তরঙ্গায়িত, ফেনিল, বায়ুর সঙ্গে তালে তালে নাচ্চে। পেছনে আমাদের গঙ্গাজল, সেই বিভূতিভূষণা, সেই "গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেঃ।" সে জল অপেক্ষাকৃত স্থির। সামনে মধ্যবর্ত্তী রেখা। জাহাজ একবার সাদা জলের একবার কাল জলের উপর উঠছে। ঐ সাদা জল শেষ হয়ে গেল। এবার খালি নীলাম্বু, সামনে পেছনে আসে পাশে খালি নীল নীল নীলজল, খালি তরঙ্গ ভঙ্গ। নীলকেশ, নীলকান্ত অঙ্গ আভা, নীল পট্টবাস

পরিধান। কোটি কোটি অসুর দেবভয়ে সমুদ্রের তলায় লুকিয়ে ছিলো ; আজ তাদের সুযোগ, আজ তাদের বরুণ সহায়, পবনদেব সাথী ; মহা গর্জ্জন, বিকট হুঙ্কার, ফেনময় অট্টহাস, দৈত্যকুল আজ মহোদধির উপর রণতাণ্ডবে মত্ত হয়েছে। তার মাঝে আমাদের অর্ণবপোত ; পোতমধ্যে যে জাতি সসাগরা ধরাপতি সেই জাতির নরনারী, বিচিত্র বেশ ভূষা, স্নিগ্ধ চন্দ্রের ন্যায় বর্ণ, মূর্ত্তিমান আত্মনির্ভর, আত্মপ্রত্যয়, কৃষ্ণবর্ণের নিকট দর্প ও দম্ভের ছবির ন্যায় প্রতীয়মান, সগর্ব্ব পাদচারণ করিতেছে। উপরে বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের জীমূতমন্দ্র, চারিদিকে শুভ্রশির তরঙ্গকুলের লম্ফ ঝম্ফ গুরুগর্জ্জন, পোত শ্রেষ্ঠের—সমুদ্রবল উপেক্ষাকারী—মহাযন্ত্রের হুহুঙ্কার,—সে এক বিরাট সম্মিলন, তন্দ্রাচ্ছন্নের ন্যায় বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া ইহাই শুনিতেছি ; সহসা এ সমস্ত যেন ভেদ করিয়া বহু স্ত্রীপুরুষকণ্ঠের মিশ্রণোৎপন্ন গভীর নাদ ও তার-সম্মিলিত "রুল ব্রিটানিয়া রুল দি ওয়েভ্‌স্" মহাগীতধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, চমকিয়া চাহিয়া দেখি—

জাহাজ বেজায় দুল্‌চে, আর তু—ভায়া দুহাত দিয়ে মাথাটী ধ'রে অন্নপ্রাশনের অন্নের পুনরাবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন।

সেকেণ্ড ক্লাসে দুটী বাঙ্গালীর ছেলে পড়্‌তে যাচ্চে। তাদের অবস্থা ভায়ার চেয়েও খারাপ। একটী ত এমনিই ভয় পেয়েচে যে, বোধ হয়, তীরে নাম্‌তে পার্‌লে একছুটে চোঁচা দেশের দিকে দৌড়োয়। যাত্রীদের মধ্যে তারা দুটী আর আমরা দুজন—ভারতবাসী, আধুনিক ভারতের প্রতিনিধি। যে দুদিন জাহাজ গঙ্গার মধ্যে ছিল, তু - ভায়া উদ্বোধন সম্পাদকের গুপ্ত উপদেশের ফলে "বর্ত্তমান ভারত" প্রবন্ধ শীঘ্র শীঘ্র শেষ করবার জন্য দিক্ ক'রে তুল্‌তেন। আজ আমিও সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম "ভায়া বর্ত্তমান ভারতের অবস্থা কিরূপ" ? ভায়া একবার সেকেণ্ড ক্লাসের দিকে চেয়ে, একবার নিজের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে জবাব দিলেন "বড়ই শোচনীয়—বেজায় গুলিয়ে যাচ্চে।"

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান

সংক্রামক রোগ।

(ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ।)

জনপদোদ্ধংসন বা মহামারী।

আজকাল অনেক নূতন সংক্রামক রোগের নাম শুনা যায়। অনেকের বিশ্বাস এ সকল রোগ পূর্ব্বে ছিল না, কালধর্ম্মে অভিনব রোগসকলের আবির্ভাব হইতেছে। ফলতঃ চরকাদি প্রসিদ্ধ চিকিৎসাগ্রন্থে অধিকাংশ সংক্রামক রোগের কোনরূপ বর্ণনা আদৌ নাই ; অথচ এই সকল রোগ যে এদেশে পূর্ব্বে ছিল না, তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায় না ; বরং সংক্রামক রোগের সাধারণ ধর্ম্ম—বহু জানপদের সমকালীন আক্রমণ ও তন্নিবন্ধন মৃত্যুর আধিক্য হইয়া জনপদোদ্ধংসের কথা চিরপ্রসিদ্ধ আছে। এই জনপদোদ্ধংসকর সাধারণ ধর্ম্ম দেখিয়া প্রাচীন বৈদ্যকগ্রন্থে সংক্রামক রোগসকল বিভিন্নলক্ষণ হইলেও "জনপদোদ্ধংসন" বা "মহামারী" এই সাধারণ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং আধুনিক সংক্রামক রোগসকল যে তৎকালে ছিল না, এরূপ নহে ; অস্মদ্দেশীয় চিকিৎসাগ্রন্থে ইহাদের বিভিন্নতা ও বিশেষত্ব নিরূপিত হয় নাই। [ক্রমশঃ]

দিব্য বাণী

য একোঽবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাদ্-
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥

— শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৪।১

পরিদৃশ্যমান বিশ্বচরাচর
স্থিতিকালে যাতে রয়,
প্রলয়ের কালে অমোঘ বিধানে
যাঁহাতে বিলীন হয় ;
সৃষ্টির আদিতে বিচিত্র শক্তিতে
অজানা সে প্রয়োজনে
প্রকাশ করেন যিনি স্বপ্রকাশ
জড় ও চেতনগণে,
তিনি নির্বিশেষ সত্তা অদ্বিতীয়
বিরাজিত মহিমায় ;
শুভবুদ্ধি সাথে সংযোগ মোদের
হোক্ তাঁর করুণায়।

কথাপ্রসঙ্গে

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী কাহাকে বলে, তাহা বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই অল্প-বিস্তর অবগত আছেন। তথাপি এই বিজ্ঞানের যুগেও ঐ দৃষ্টিভঙ্গীর এতই অভাব পরিলক্ষিত হয় যে, বিষয়টির আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। সংজ্ঞা-নির্দেশ অপেক্ষা উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে সহজবোধ্য করা যাইবে বলিয়া আমরা প্রথমতঃ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের দু-একটি ঘটনার অবতারণা করিতেছি। তাঁহার জীবনীর সহিত পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেরই ঘটনাগুলি সুবিদিত, তথাপি মহাজীবনের আলোচনা যে-প্রসঙ্গেই উত্থাপিত হউক না কেন, নিঃসন্দেহে তাহা কল্যাণকর এবং 'অধিকং তু ন দোষায়'— উক্তিটি এই ক্ষেত্রে সর্বথা সার্থক বলিয়া মনে হয়।

বালক নরেন্দ্রনাথের সহপাঠীর পিতামহ যখন নরেন্দ্রনাথের চাঁপাগাছে চড়িয়া দোল খাওয়া বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন, 'ও গাছে একটা বেহ্মদত্যি আছে, যারা ও গাছে চড়ে, তাদের ঘাড় মটকে দেয়', তখন সহপাঠী শঙ্কিত হইয়া গাছে চড়িতে নিষেধ করিলেও নরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, 'তুই ছোঁড়াও যেমন গাধা! একজন একটা কথা বলে গেল, আর অমনি তা বিশ্বাস করতে হবে? যদি তোর ঠাকুরদা বুড়োর ঐ বেহ্মদত্যির কথা সত্যি হত, তাহলে অনেকক্ষণ আগেই আমার ঘাড় মটকে যাওয়া উচিত ছিল।'

'একজন বলেছে বলেই কি বিশ্বাস করতে হবে?'—এই মনোভাব স্বামীজীর চিরকাল ছিল। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে 'শ্রীম'-র সহিত যুবক নরেন্দ্রনাথের কথোপকথন স্মরণীয়: "আমি Truth চাই। সেদিন পরমহংস মশায়ের সঙ্গেই খুব তর্ক করলাম। উনি আমায় বলেছিলেন, 'আমায় কেউ কেউ ঈশ্বর বলে।' আমি বললাম, 'হাজার লোকে ঈশ্বর বলুক, আমার যতক্ষণ সত্য বলে না বোধ হয়, ততক্ষণ বলবো না।...নিজে ঠিক না বুঝলে অন্য লোকের কথা শুনবো না।'"

লীলাসংবরণের এক বৎসর পূর্বের ঘটনা। স্বামীজী অসুস্থ। গুরুভাইদের বিশেষ ইচ্ছায় কবিরাজী চিকিৎসা চলিতেছে। 'দেশী কবিরাজী ঔষধ বোধ হয় আমাদের শরীরের পক্ষে সমধিক উপযোগী'— শিষ্য শরচ্চন্দ্রের এই মন্তব্যের উত্তরে লক্ষণীয় স্বামীজীর উক্তি: 'আমার মত কিন্তু একজন scientific (বর্তমান চিকিৎসাবিজ্ঞান-বিশারদ) চিকিৎসকের হাতে মরাও ভাল; layman (হাতুড়ে)— যারা বর্তমান science (বিজ্ঞান)-এর কিছুই জানে না, কেবল সেকেলে পাঁজিপুঁথির দোহাই দিয়ে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছে, তারা যদি দু-চারটে রোগী আরাম করেও থাকে, তবু তাদের হাতে আরোগ্যলাভ আশা করা কিছু নয়।'

স্বামীজীর জীবনী অথবা 'বাণী ও রচনা'-গ্রন্থাবলী হইতে এই-জাতীয় বহু ঘটনার উল্লেখ করিয়া তাঁহার বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির সবিশেষ পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এইজন্য মাত্র তিনটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর আংশিক পরিচিতি দেওয়া হইল।

অন্বয়মুখে (positively) এই সামান্য পরিচয়ের পর ব্যতিরেকমুখে (negatively) কিছু বলা প্রয়োজন— অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী না থাকিলে, কি বৌদ্ধিক অনৈতিকতা (intellectual

immoralities) ঘটে, তাহাও প্রণিধানযোগ্য।

'যা-কিছু হারায়' গৃহিণীই শুধু নন সমভাবে বহু গৃহকর্তাও বলেন, 'কেষ্টা বেটাই চোর।' আশি বৎসর পূর্বে রচিত রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি বর্তমানের বহু বৃদ্ধও বাল্যকালে আবৃত্তি করিয়াছেন। কিন্তু কালের এই সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় 'কেষ্টা'র চরিত্র বিশ্লেষণ করা হইয়াছে কিনা, জানা নাই। 'কেষ্টা'র চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া এক পক্ষ বলিবেন— 'অমন সেবাপরায়ণ প্রভুভক্ত পুরাতন ভৃত্য কস্মিন্‌কালেও কিছু চুরি করে নাই —করিতে পারেই না।' ল্যাটিন ভাষায় একটি উক্তি আছে : de mortuis nil nisi bonum — মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে ভাল ছাড়া অন্য কিছুই বলিবে না। জীবিতকালে যত দোষই নজরে পড়ুক, মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে মানুষ কটূক্তি করিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়, বিশেষতঃ সে-মানুষ যদি 'কেষ্টা'র মত সেবার মাধ্যমে আত্মোৎসর্গ করে। অপর পক্ষ বলিবেন—মানব-চরিত্র জটিল, পরস্পরবিরোধী ভাবের সমাবেশ তাহাতে অহরহ দেখা যায়। 'কেষ্টা'র প্রভুভক্তির সঙ্গে সঙ্গে চৌর্যবৃত্তিও থাকা অসম্ভব নয় - তবে যাহা কিছু হারায় তাহার জন্যই তাহাকে দায়ী করা যায় কিনা সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহে সন্দেহের অবকাশ আছে। বলা বাহুল্য, এই শেষোক্ত পক্ষেরই দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিক। পূর্বকল্পিত (preconceived) ধারণার বশবর্তী হইয়া সকল দিক বিচার না করিয়া কাহাকেও দোষী সাব্যস্ত করা বৌদ্ধিক অনৈতিকতার একটি দৃষ্টান্ত।

যাঁহারা আক্ষেপ করিবেন— কবিতার একটি চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া কাব্যমাধুর্য এইভাবে নষ্ট করা কেন ?, তাঁহাদের বলি, 'কেষ্টা'র চরিত্র বিশ্লেষণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, উহাকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়াই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবের ফলে ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র সম্বন্ধে যুক্তিহীন মন্তব্য করিয়া আমরা যে-অবিমৃশ্যকারিতার পরিচয় দিয়া থাকি, তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ধীর স্থির অনলসভাবে উন্মুক্ত মনসহকারে সত্যান্বেষণ করেন। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়া তবেই তিনি একটি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তিনি ইহাও জানেন যে, সমস্ত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তই আপাতসিদ্ধান্ত- মানুষের জ্ঞানের বিস্তারের ফলে পরিবর্তিত হইবার সম্ভাবনার অধীন। এই কারণে তিনি নিরভিমান, 'মতুয়ার বুদ্ধি' (dogmatism)-বর্জিত এবং উপযুক্ত নূতন প্রমাণ পাইলে স্বকীয় পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত করিতে দ্বিধাশূন্য। তিনি স্বাধীনচেতা— অন্যের দ্বারা নিজ মনকে প্রভাবিত হইতে দেন না। নাম কিনিবার জন্য অথবা অন্য কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য তিনি সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হন না। তিনি চিন্তাশীল, সর্বদা বিচারপরায়ণ— ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হইবার প্রবণতা হইতে মুক্ত। নিজ জ্ঞানের পরিধি সম্বন্ধে তিনি সদা-সচেতন। যাহা তিনি জানেন না, তাহা অসংকোচে ও মুক্তকণ্ঠে 'জানি না' বলিতে সর্বদা প্রস্তুত। তাঁহার আত্ম-প্রত্যয় আছে - নিজেকে অপদার্থ মনে করেন না। নচিকেতার মনোভাব : 'বহূনামেমি প্রথমো বহূনামেমি মধ্যমঃ' - অনেকের মধ্যে আমি প্রথম, অনেকের মধ্যে আমি মধ্যম, কিন্তু কখনই অধম নই। গীতার কথা : 'নাতিমানিতা'— মাত্রাধিকাবর্জিত আত্মসম্মান, তবে আত্মাবমাননা নয়। এই মনোভাব ব্যতীত কেহই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক হইতে পারেন না। 'আমি খুব জানি, আমি খুব বুঝি' বা 'আমি সবজান্তা'— এই অহংকার যাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হওয়া তাহার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। পক্ষান্তরে, 'আমি কিছুই জানি

না, কিছুই বুঝি না'- এইরূপ মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ত করা কঠিন হইলেও, একান্ত অসম্ভব নয়।

পূর্বোক্ত গুণাবলীর যে পরিমাণে অভাব থাকে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশও সেই পরিমাণে ব্যাহত হয়। ফলে জীবনের যে-কোন ক্ষেত্রেই ঐরূপ অপরিণত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রযুক্ত হউক না কেন বৌদ্ধিক অনৈতিকতার শিকার হইতে আমরা বাধ্য। এই বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

যদি আমি কোনও প্রাচীন ধর্ম-গ্রন্থের রচনা-কাল বা কোনও পূর্বাচার্যের জীবনকাল নির্ণয়ের জন্য গবেষণায় উদ্যোগী হই, তাহা হইলে সর্বাগ্রেই দেখিতে হইবে, কোন বিশেষ ধর্মমত বা ধর্ম-সম্প্রদায়ের আনুগত্য আমার মনকে পূর্ব হইতেই যেন প্রভাবিত করিয়া না রাখে। কারণ, এইভাবে পূর্ব-প্রভাবিত হইলে প্রকৃত সত্য নির্ণয় করা অসম্ভব। ভাষার ভিত্তিতে কিভাবে ভাষাতত্ত্ব-বিজ্ঞানীরা পরম্পরাক্রমে একের পর আর প্রত্যেকে সারা জীবন তপস্যা করিয়া গ্রন্থগুলির সময়-নির্দেশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন ও পাইতেছেন, তাহার বিন্দু-বিসর্গ না জানিয়া, তাহাকে নস্যাৎ করিয়া দিয়া নিজের বা কোনও গোষ্ঠীর স্বার্থে যে-গবেষণা করা হয়, তাহা অনৈতিক সন্দেহ নাই।

চিরাচরিত বিধিবদ্ধ প্রথানুযায়ী শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন না করিয়া শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিও স্ব-কপোল-কল্পিত শাস্ত্রব্যাখ্যা শুধু বিত্তবত্তার জোরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিতে পশ্চাৎপদ হন না। নিজের মনগড়া অর্থকেই তিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য গ্রন্থরচনা করেন। বলা বাহুল্য, ইহা বৌদ্ধিক অনৈতিকতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

কোন কোন অতি সজ্জনও শাস্ত্রের তথাকথিত যৌগিক ব্যাখ্যা করেন। ব্যক্তিবিশেষের বা গোষ্ঠীবিশেষের পক্ষে তাহা উপযোগী হইতে পারে। কিন্তু যদি বলা হয়, শাস্ত্রের ঐ প্রকার যৌগিক ব্যাখ্যাই একমাত্র ব্যাখ্যা বা সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা, তাহা হইলে নিষ্কর্ষ এই দাঁড়ায় যে, যুগ যুগ ধরিয়া মহান আচার্যগণ যে অ-যৌগিক শাস্ত্রার্থ করিয়াছেন, তাহা ভ্রান্ত, তাঁহারা কেহই শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ঐরূপ উক্তি বৌদ্ধিক অনৈতিকতার আর একটি দৃষ্টান্ত। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের উক্তি: 'মতুয়ার বুদ্ধি (dogmatism) করো না।' যদিও তিনি ঈশ্বর-প্রসঙ্গেই কথাটি বলিয়াছিলেন, তথাপি ইহা জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর একটি অমূল্য নির্দেশ।

একটি লুপ্ত ইতিহাসের কিছু দলিল হয়তো আমার হাতে আসিল, আর আমি তৎক্ষণাৎ ইতিহাস রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, কিন্তু প্রকৃত বিজ্ঞানীর পূর্বোক্ত গুণগুলি আমাতে আছে কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখিলাম না— এই পরিস্থিতিতে বৌদ্ধিক অনৈতিকতা ঘটা অবশ্যম্ভাবী। এইভাবে ইতিহাস রচিত হয় না— ইতিহাসের বিকৃতিই হইয়া থাকে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ত করিবার জন্য যে বিজ্ঞানেরই চর্চা করিতে হইবে— পদার্থবিদ্যা জ্যোতির্বিদ্যা রসায়ন ইত্যাদির অধ্যয়ন ও গবেষণা যে করিতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই। বিজ্ঞানীরা যে দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতিসহায়ে গবেষণাদি করেন, তাহা জানিলেই যথেষ্ট। উহা জানার পর জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উহার প্রয়োগই মুখ্য ব্যাপার। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী কাহারও কাহারও সহজাত থাকে, অধিকাংশ ব্যক্তিকেই উহা সাধনার দ্বারা আয়ত্ত করিতে হয়।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী একজন বিজ্ঞানীর পক্ষে

অপরিহার্য তো বটেই, জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ইহার প্রয়োজনীয়তা আজ সর্বতোভাবে স্বীকৃত। সমাজবিজ্ঞান অর্থনীতি রাজনীতি দর্শন ইতিহাস —এমন কি ধর্মের ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য। ধর্ম শুধু বিশ্বাসের বস্তু নয়—ইহা একটি বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীসহায়েই ইহার চর্চা হওয়া উচিত। এই বিষয়ে স্বামীজীর উক্তি স্মরণীয়: 'অন্ধভাবে বিশ্বাস করা অন্যায়; নিজের যুক্তি ও বিচারশক্তি খাটাইতে হইবে; সাধন করিয়া দেখিতে হইবে, শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে, তাহা সত্য কিনা। অন্যান্য বিজ্ঞান শিখিতে হইলে যেভাবে শিক্ষা কর, ঠিক সেই প্রণালীতে এই বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে।'

প্রায়ই দেখা যায়, এক ব্যক্তির সামান্য একটি কথা বা একটি আচরণের মর্মমূলে কি অভিসন্ধি নিহিত থাকিতে পারে—কি উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া সে ঐ কথাটি বলিয়াছে বা আচরণটি করিয়াছে, তাহা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীসহায়ে বহু বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াও আমরা নির্ণয় করিতে সমর্থ হই না এবং আমাদের বুদ্ধির দৌড় দেখিয়া আমরা নিজেরাই বিস্মিত হই। বাস্তবিক, যে-বুদ্ধির আমরা গর্ব করিয়া থাকি, তাহা খুবই সীমাবদ্ধ। প্রশ্ন হইতে পারে, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর মূল্য কী? মূল্য এই যে, উহা আমাদের মনকে উন্মুক্ত রাখে। পূর্বকল্পিত কোনও ধারণার বশবর্তী হইয়া সহসা কোন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বৌদ্ধিক অনৈতিকতা। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সেই অনৈতিকতা হইতে আমাদের রক্ষা করে। এই প্রসঙ্গে আরও প্রশ্ন হইতে পারে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীসহায়েও যদি আমরা এই সকল ক্ষেত্রে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত না হইতে পারি, তাহা হইলে উপায়ান্তর কী আছে? উপায়ান্তর—স্বজ্ঞা, ইংরেজীতে যাহাকে intuition বলা হয়। মনের এইরূপ অদ্ভুত শক্তি আছে যে, বিচার-পদ্ধতির (reasoning process) মাধ্যম ব্যতিরেকেই যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। ঐ শক্তি অধিকাংশ মানুষেই সুপ্ত থাকে। যোগীরা সাধনার দ্বারা উহা লাভ করেন। অবতার-পুরুষগণের উহা স্বভাবসিদ্ধ। ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, মনের ঐ স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানের তুলনায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী—তাহার যত মূল্যই থাকুক না কেন—অতি অকিঞ্চিৎকর।

বিরলতম ব্যক্তিরাই যখন স্বজ্ঞার অধিকারী, তখন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী যে প্রায় সকল মানুষের পক্ষেই বিশেষ প্রয়োজনীয়, ইহা বলাই বাহুল্য। তথাপি ইহা মনে রাখা দরকার যে, সকল বিষয়েরই একটি মাত্রা আছে। অভ্যাসের দ্বারা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে চরিত্রের একটি সহজ সরল সুন্দর ও স্বাভাবিক গুণে পরিণত করিতে হইবে। অস্বাভাবিক হইলেই উহা অসুন্দরও হইবে। যাঁহারা জীবনের প্রতি পদে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া মাতামাতি করেন, তাঁহাদের ঐরূপ আচরণকে ইংরেজী ভাষায় প্রায়শঃ অবজ্ঞার্থে scientism বলা হয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী (scientific outlook) প্রশংসনীয় ও অর্জনীয়, কিন্তু উহার মাত্রাধিক্য (scientism) নিন্দনীয় ও বর্জনীয়। জীবনের ছন্দেও গুরু-লঘুর বিচারের অভাবে ছন্দঃপতন অবশ্যম্ভাবী।

'কোন কিছুকেই পরীক্ষা না ক'রে আমরা বিশ্বাস করি না; ঠাকুর আমাদের ঐরকম করতে শিখিয়ে গেছেন।'

—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

অনুবাদক : স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

পরমতে ঘটেশ্বরসংযোগাদৌ জীবাত্মগতজ্ঞানাদৌ চাভিন্ননিমিত্তোপাদানত্ব-দর্শনাৎ। ততশ্চানুমানসিদ্ধম্ অভিন্ননিমিত্তোপাদানত্বম্ অনূদ্য তস্য ব্রহ্মত্ববোধনং শ্রুত্যা সম্ভবতি। এবং চ শ্রুতে র্লক্ষণপরত্বাভাবেনানুমানসিদ্ধম্ অভিন্ননিমিত্তোপাদানত্বম্ অনূদ্য তস্য ব্রহ্মত্ববোধনমাত্রেণ ন বাক্যভেদপ্রসঙ্গঃ।

তস্য চ ব্রহ্মণঃ স্বরূপম্ আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানীতি বাক্যেন নির্ণীয়তে। প্রমাণং চ বিষ্ণৌ 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' 'তৎ তু সমন্বয়াৎ' ইত্যুক্তন্যায়েন সর্বে বেদান্তাঃ। ততশ্চ লক্ষণপ্রমাণয়োঃ সত্ত্বেন বিষ্ণোঃ স্তোত্রকরণপ্রতিজ্ঞা সংঘটতে, ন কিঞ্চিদ্ অবদ্য-মিতি ভাবঃ।

নন্বু যদ্ যৎ কারণং তৎ তদ্ অন্যতো জন্যমিতি ব্যাপ্তেরাকাশাদৌ দর্শনাদাকা-শাদিকারণস্যাপি বিষ্ণোর্জন্যত্বানুমানেন জন্যসর্বোপাদাননিমিত্তত্বলক্ষণং তস্মিন্ননুপপন্নং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য 'অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ' ইতি ন্যায়েন তস্যাজন্যত্বম্ আহ **অনাদিম্** ইতি। আদিঃ কারণং ন বিদ্যতে যস্য সোঽনাদিরজন্য ইত্যর্থঃ।

অয়ং ভাবঃ কিং ব্রহ্মণো জড়ং কারণম্ উত চেতনম্। নাদ্যঃ, জড়স্য আকাশাদে ব্র্হ্মকার্যত্বাৎ। নাপি দ্বিতীয়ঃ। স্বস্য স্বকারণত্বানুপপত্তেশ্চেতনান্তরাভাবাচ্চ। (চেতনান্তরস্য) সত্ত্বে বা তস্যাপি কারণত্বেনান্যজন্যত্বানুমানেন চেতনানবস্থাপ্রসঙ্গাৎ। কস্যচিদ্ অজন্যত্বে বা তত্রৈব কারণত্বহেতোর্ব্যভিচারাৎ। তস্যৈব (অজন্যচেতনস্য) ব্রহ্মত্বাঙ্গীকারাৎ। 'স বা এষ মহানজ আত্মা' ইত্যজন্যত্বপ্রতিপাদক-শ্রুতিবিরোধাচ্চ ন তস্য জন্যত্বম্ ইতি জন্যসর্বোপাদান-নিমিত্তত্বলক্ষণম্ উপপন্নম্ ইতি।

অনুবাদ : অন্য মতেও * ঘট ও ঈশ্বরের সংযোগাদিতে এবং জীবাত্মগত জ্ঞানাদিতে অভিন্ন-নিমিত্তোপাদানত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। অতএব অনুমানসিদ্ধ অভিন্ন-নিমিত্তোপাদানত্ব অনুবাদপূর্বক শ্রুতিদ্বারা তাহার (অভিন্ননিমিত্তোপাদানত্বের অর্থাৎ জগৎকারণত্বের) ব্রহ্মত্ব প্রতি-পাদন (অর্থাৎ জগৎকারণত্বই ব্রহ্মত্ব—ইহা প্রতিপাদন) সম্ভব হয়। এইরূপে 'যতো বা ইমানি ...' এই শ্রুতি (স্বরূপ-) লক্ষণপর না হইয়াও অনুমানসিদ্ধ অভিন্ননিমিত্তোপাদানত্ব অনুবাদ করিয়া ব্রহ্মত্ববোধন করাইয়া থাকে। সেজন্য বাক্যভেদ-প্রসঙ্গ এখানে হয় না। (এক বাক্যের দুই অর্থ হইলে তাহা বাক্যভেদরূপ দোষদুষ্ট হয়)।

---

* রামানুজ, নিম্বার্ক, বলদেব প্রভৃতি আচার্যগণের মতে।

(জগৎকারণ) সেই ব্রহ্মের স্বরূপ (-লক্ষণ) 'আনন্দ হইতেই এই সমস্ত ভূতবর্গ জাত হয়' (তৈঃ উঃ ৩।৬) এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা নির্ণীত হয়।

(ব্রহ্মের লক্ষণ বলিয়া এখন তদ্বিষয়ে প্রমাণ বলিতেছেন) - 'একমাত্র বেদরূপ প্রমাণের দ্বারাই জগতের কারণাদি রূপে ব্রহ্মকে জানা যায় বলিয়া ব্রহ্ম বেদমাত্রগম্য' (ব্রঃ সূঃ ১।১।৩) 'ব্রহ্ম বেদান্তবাক্যের প্রতিপাদ্য, কারণ (ষড়্‌বিধ তাৎপর্য-লিঙ্গযুক্ত) সমস্ত বেদান্তবাক্য ব্রহ্মেই অন্বিত হয়' (ঐ ১।১।৪)—এই সকল শারীরক ন্যায় অনুসারে সমস্ত বেদান্তবাক্যই বিষ্ণু অর্থাৎ ব্রহ্ম বিষয়ে প্রমাণ। অতএব লক্ষণ ও প্রমাণ—এই উভয় থাকায় বিষ্ণুর স্তোত্র রচনার প্রতিজ্ঞা যুক্তিযুক্ত এবং এই বিষয়ে আক্ষেপের কিছুই নাই, ইহাই ভাবার্থ।

(শঙ্কা): যাহা যাহা কারণরূপে প্রসিদ্ধ, তাহা তাহাই অন্য কিছু হইতে উৎপন্ন—এইরূপ ব্যাপ্তি অর্থাৎ নিয়ম আকাশাদিতে দেখা যায়। সুতরাং অনুমানের দ্বারা আকাশাদির কারণ বিষ্ণুরও জন্যত্ব সিদ্ধ হয় বলিয়া সমস্ত জন্য পদার্থের অভিন্ন-নিমিত্তোপাদানত্ব-রূপ লক্ষণ তাঁহাতে (অর্থাৎ ব্যাপক পরমাত্মা বিষ্ণুতে) যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না।

(সমাধান): পূর্বোক্ত শঙ্কার উত্তরে 'পরমাত্মার উৎপত্তি অসম্ভব, যেহেতু সদ্‌বস্তুর উৎপত্তি যুক্তিসিদ্ধ হয় না' (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৯)—এই শারীরক যুক্তিসহায়ে তাঁহার (বিষ্ণুর) অজন্যত্ব (অনুৎপন্নত্ব) বলিতেছেন—] **'অনাদিম্'**—এই শব্দ দ্বারা। আদি অর্থাৎ কারণ যাহার নাই, তাহাই অনাদি অর্থাৎ অজন্য, ইহাই অর্থ।

[এখানে এইরূপ মর্মার্থ বোদ্ধব্য: ব্রহ্মের কারণ কি জড়বস্তু অথবা চেতনবস্তু? প্রথম পক্ষ হইতে পারে না, কারণ জড় আকাশাদি ব্রহ্মেরই কার্য। দ্বিতীয় পক্ষও অসিদ্ধ। কারণ চেতন ব্রহ্ম নিজেই নিজের কারণ হইতে পারেন না, আর ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন চেতনও নাই। যদি অন্য চেতন আছে স্বীকার করা যায়, তবে তাহাও কারণ বলিয়া অন্য চেতন হইতে উৎপন্ন, এই অনুমানের দ্বারা চেতনের অনবস্থা-প্রসঙ্গ ঘটিবে। আর (অনবস্থাদোষ পরিহারার্থ) ঐরূপ চেতন-পরম্পরার মধ্যে কোন একটি চেতনকে অজন্য বলিলে, সেখানেই কারণত্ব-হেতুটি সাধ্যের ব্যভিচারী হইয়া পড়িবে।* আর ঐ অজন্য চেতনকেই ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করা হয়। (সুতরাং অন্য চেতন ব্রহ্মের কারণ—এই দ্বিতীয় পক্ষও গৃহীত হইতে পারে না।) আর 'সেই এই আত্মা মহান্ ও জন্মরহিত'—আত্মার অজন্যত্ব প্রতিপাদক এই শ্রুতিসহ বিরোধ হইয়া পড়ে বলিয়াও ব্রহ্মের জন্যত্ব হইতে পারে না। অতএব সর্ব জন্য পদার্থের অভিন্ন-নিমিত্তোপাদান-কারণই ব্রহ্ম, এই লক্ষণ যুক্তিদ্বারা প্রমাণিত হইল। [ক্রমশঃ]

---

* ব্রহ্ম জন্য, যেহেতু উহা কারণ (ব্রহ্ম জন্যং, কারণত্বাৎ); প্রতিবাদী এইরূপ অনুমান করিয়া ব্রহ্ম উৎপন্ন পদার্থ, ইহাই প্রতিপাদন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কোন একটি চেতনকে অজন্য অর্থাৎ নিত্য বলিলে, সেখানে পূর্ব-প্রদর্শিত অনুমানের সাধ্যরূপে নির্দিষ্ট জন্যত্বের অভাব থাকে, অথচ কারণত্ব-হেতুটি সেখানে থাকিয়া যায়। সুতরাং সাধ্যের অভাবের অধিকরণে হেতু বিদ্যমান থাকায় ব্যভিচার-দোষ ঘটে।

শ্রীশ্রীমায়ের অপ্রকাশিত পত্র

[তরলাবালা সেনগুপ্তকে লিখিত]

(১)

শ্রীশ্রীহরিশরণং। জয়রামবাটী।

৪ আশ্বিন। *

পরম কল্যাণীয়া

মা তোমার পত্রখানা পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম।

আমি শারীরিক এক প্রকার ভাল আছি ; বাকি সকলে ভাল আছে। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ওরূপ অবস্থায় মালা জপ করা চলে না, মনে মনে জপ করিবে। আশা করি তোমরা সকলে ভাল আছ ; বাকি মঙ্গল। ইতি।

আঃ

মাতাঠাকুরাণী।

(২)

শ্রীশ্রীহরিশরণম্ জয়রামবাটী।

১ কার্ত্তিক। †

পরম কল্যাণীয়া

মা তোমার পত্রে সমস্ত অবগত হইয়া বিশেষ চিন্তিত ও দুঃখিত হইলাম। রাধু এখন বসিতে ও দাঁড়াইতে না পারায় বড়ই ভাবিত আছি। আমার নিজের শরীরও বেশ ভাল নাই, পেটের গোলমাল হইতেছে। খোকা প্রভৃতি বাকি সকলে একপ্রকার ভাল আছে। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। বাকি মঙ্গল। ইতি।

আঃ

মাতাঠাকুরাণী।

(৩)

৩রা কার্ত্তিক

কলিকাতা

‡

কল্যাণীয়াসু

মা তোমার চিঠি পাইয়াছি। তুমি আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমার প্রেরিত মিষ্টি পাইয়াছি। নলিনী কাশী হতে অযোধ্যা গিয়াছে শুনছি। বোধ হয় এখানে ফিরিতে বিলম্ব আছে। বেলুড় মঠে প্রতিমা আনা হয় নাই, পটে পূজা হয়েছে। কাশীতে প্রতিমা হয়েছিল এবং বেশ মত পূজাদি হয়েছে। সংসারে থাকিতে গেলেই অল্পবিস্তর ঝঞ্ঝাট জুটে পড়ে। ঠাকুরকে স্মরণ রাখিবে। ইতি

আশীর্ব্বাদিকা

তোমার মাতাঠাকুরাণী।

---

* পোষ্টকার্ডটিতে কলমা (ঢাকা) ডাকখানার ছাপ আছে : 26 SEP 19 (26th September 1919) ।—সঃ

† পোষ্টকার্ডটিতে কলমা (ঢাকা) ডাকখানার ছাপ আছে : 21 OCT 19 (21st October 1919) ।—সঃ

‡ পোষ্টকার্ডটিতে ডাকখানার যে ছাপ আছে, তাহা পড়া যায় নাই ।—সঃ

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা

স্বামী সারদেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

মা এইরূপে তাঁহার সন্তানগণের প্রয়োজনানুযায়ী স্বতন্ত্র খাওয়ার ব্যবস্থা করিতেন সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে উহা অপরের চক্ষুশূল না হয় সেজন্য সাবধানতারও সীমা ছিল না। মায়ের বাড়ীর খাওয়া সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মতো—সকালে মুড়ি, দুপুরে সিদ্ধ মাঝারি চালের ভাত, কলায়ের ডাল, পোস্ত, একটা ঝাল তরকারী, একটু টক; কখনও শাক, ডালনা, ভাতে, ভাজা প্রভৃতি; অন্য কিছুও থাকে সুবিধানুযায়ী, মাছ একটু প্রায়ই থাকে। মা পূর্বে স্বহস্তেই রান্না ও পরিবেশন করিতেন, এখন আর সম্ভব হয় না, কিন্তু সামনেই বসিয়া থাকিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত দেখেন—আসন, পাতা, জল সব ঠিকমত যেন হয়—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; গ্লাসে জল যেন কম বেশী না হয়; পাতা ঠিক আসনের মাঝখানে যেন থাকে। আসনগুলি আবার ঘনও হইবে না, দূরেও থাকিবে না—সমান ফাঁক ফাঁক। পরিবেশন হইতেছে, সুমধুর আহ্বান ছেলেদের কানে গেল—'বাবা, বেলা হয়েছে, দেরি হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি এসো, পাতে ভাত পড়েছে, খাবে এসো।' ছেলেদের একটু দেরি হইতেছে, হাতের কাজ শেষ না করিয়া আসিতে পারিতেছে না; মা পাতা আগলাইয়া বসিয়া আঁচলে মাছি তাড়াইতেছেন। খাওয়া আরম্ভ হইল—মায়ের চোখে-মুখে আনন্দের প্রকাশ। সুমধুর বাক্যে পরম স্নেহাদরে ছেলেদের খাওয়া দেখিতেছেন, জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'কেমন হয়েছে?' কাহার পাতে ভাত নাই, কাহার ডাল কম, কাহার কোন্‌টিতে রুচি, দেখিয়া-শুনিয়া বলিয়া-কহিয়া পেট ভরিয়া খাওয়াইতেছেন; 'আর দুটি ভাত নাও', 'একটু ডাল নাও', (রাঁধুনীকে) 'মাসীমা, এ ছেলেটির পাতে দুটি ভাত রয়েছে, একে একটু কিছু দাও', 'এ পোস্ত ভালবাসে, বেশী থাকে ত একটু দিও।' কাহাকেও বলিলেন, 'বাবা! তুমি আজ কম খেলে কেন? যা ভাল লাগে চেয়ে নাও, কি দেবে বলো।' মাছ থাকিলে ছেলেদের বলিয়া-কহিয়া বেশী করিয়া খাওয়াইলেন। সকলে সমান খায় না—কেহ বেশী, কেহ কম খাইল। মা সকলকে সমান আদর করিতেছেন।

কোন নবাগত ভক্ত ছেলের প্রাণের আঁকাঙ্ক্ষা, মায়ের প্রসাদ পাইবে। মা তাহাকে বুঝাইয়া শুঝাইয়া প্রথমেই খাওয়াইয়া দিলেন—বলিলেন, 'এখন বসে পেট ভরে খাও, আমার খেতে দেরি হয়, আমি প্রসাদ রাখব তোমার জন্যে, পরে পাবে ঠিক।' দ্বিপ্রহরে মা একটু দুধ-ভাতও খান; তরকারী একটু একটু সব মুখে দিয়া বাটিতে দুধে চারিটি ভাত মাখিলেন, একটু মুখে দিলেন, তারপর প্রসাদপ্রার্থী ভক্তকে ডাকিলেন। সে উপস্থিত হইলে প্রসন্নমুখে বলিলেন, 'বাবা! এই ধর গো! প্রসাদ চেয়েছিলে, বসে বসে তৃপ্তি করে খাও।' সন্তানের প্রাণ জুড়াইল, মায়েরও পরমানন্দ!

রাত্রে মায়ের বাড়ীতে খাওয়া—রুটি-তরকারী, গুড়, একটু দুধ। রুটি অতি চমৎকার হয়। মা আটা মাখেন স্বহস্তে, অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া টিপিয়া টিপিয়া—অতি মোলায়েম করিয়া। সন্ধ্যার পর ঠাকুরকে ভোগ দিয়া সেই খাবার ভালভাবে ঢাকা দিয়া কাছে লইয়া বসিয়া থাকেন, যাহাতে না ঠাণ্ডা হইয়া যায়। ছেলেরা একটু রাত হইলে

খাইবে,— সন্ধ্যাবেলা ঠাকুরকে ডাকিবে, তাঁহার স্মরণ করিবে ; আবার একটু রাত্রি না হইলে ক্ষুধা পায় না, পেট ভরিয়া খাইতে পারিবে না ; তাই মা প্রতীক্ষা করিতেছেন। রাধুর বেড়াল আছে—খাবার চুরি করিয়া খায়, তাই মা একটি ছোট লাঠি রাখিয়াছেন হাতের কাছে। মিট্ মিট্ প্রদীপটি জ্বলিতেছে। ঠাকুরকে ধূপ দিয়া প্রণাম করিয়া, আলো কমাইয়া দিয়া মা পা মেলিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। কোথায় কোন্ রাজ্যে তাঁহার মন বিচরণ করিতেছে, তিনিই জানেন। সব নিস্তব্ধ।

কোনদিন সন্ধ্যার একটু পরেই বাহিরে বারান্দায় গিয়া বসিলেন। ভানু পিসী আসিয়া তাঁহার ছোট মাটির প্রদীপটি নিবাইয়া দিয়া মায়ের পদপ্রান্তে বসিয়া ধীরে ধীরে পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছেন। কোন দিন বেশী ক্লান্ত থাকিলে মা বারান্দায় মাদুরে শুইয়া পড়িলেন, কোন সন্তানকে একটু হাত বুলাইয়া দিতে বলিলেন। কখনও হাঁটুতে বাতের বেদনা বাড়িয়াছে, একটু রসুন-তেল গরম করিয়া মালিশ করিয়া দিবার জন্য স্নেহার্দ্রস্বরে বলিলেন, 'বাবা, আজ পাটা কামড়াচ্ছে বড, একটু রসুনতেল গরম করে মালিশ করে দাও তো।' দুধ রাত্রে সকলেই একটু একটু পায় ; কম হইলে মা একটু জল মিশাইয়া বাড়াইয়া সকলকে বাটিয়া দেন। কদাচিৎ কখনও এত কম হয় যে, সকলকে কোন মতেই দেওয়া চলে না। সেদিন রোগী, বৃদ্ধ ও শিশুদের তাহা দেন। একটু বেশী হইলে, যে-সন্তান দুধ খুব ভালবাসে তাহাকে খাওয়ার পরে ঘরের ভিতর ডাকিয়া আড়ালে চুপি চুপি খাওয়াইয়া দেন। তাঁহার নিজের আহার—পূজনীয় শরৎ মহারাজ যোগেন মা গোলাপ মা ও অন্যান্য ঐকান্তিক ভক্ত সেবক-সেবিকাগণের আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী রাত্রে দুই-একখানা লুচি ও দুধ। কিন্তু জয়রামবাটীতে তাহাও নিয়মিত জোটে না। ভক্তগণের চেষ্টায় গাই কেনা হইয়াছে— দুধ দেয় যথেষ্ট, আবার প্রয়োজন মত কেনাও হয়। তথাপি সময় সময় মায়ের জন্য নির্দিষ্ট দুধ কম পড়িয়া যায়, কারণ মা সর্বাগ্রে অন্যের প্রয়োজন মিটাইতে সর্বদাই ব্যগ্র থাকেন।

মায়ের বাড়ীতে কোন ছেলে উপস্থিত না থাকিলে মায়ের মনে অভাব বোধ হইত, প্রতীক্ষা করিতেন, পথের দিকে চাহিতেন। আজ উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি। একটি সন্তান কিছু জিনিসপত্র লইয়া সকালেই মায়ের বাড়ী আসিয়াছেন। মা বিমর্ষ-ভাবে ছিলেন, তাঁহাকে পাইয়া মুখ প্রফুল্ল হইল, পরম স্নেহাদরে গ্রহণ করিয়া জানাইলেন, 'এমন দিন, পিঠে সংক্রান্তি, পিঠে হয়েছে। একটি ছেলেও কাছে নাই, মনটা কেমন কেমন লাগছিল, পথের দিকে চেয়ে ঘর-বার কচ্ছিলুম। এসেছ, বেশ করেছো।' দেখিতে দেখিতে আর একটি ছেলেও হাজির, মার আনন্দ ধরে না! ঠাকুরের পূজা করিলেন, আজ এমন দিন,- ছেলেরা ফুল লইয়া আসিয়াছে, প্রাণ ভরিয়া ঠাকুরকে দিলেন খুব খুশী হইয়া। মা ছেলেদের অন্তর ভাল করিয়াই জানেন। কিছু ফুল রহিয়াছে তাহাদের জন্য, তাহারাও আজ এই পুণ্যবাসরে মনের সাধে তাহাদের গুরুপদে অঞ্জলি দিবে। মা ছেলেদের সর্ববিধ কল্যাণের জন্য, ভগবানে ভক্তি-নিষ্ঠার জন্য সদা উৎকণ্ঠিত আগ্রহান্বিত। পূজা করিয়াই মা খাটের উপর পশ্চিমাস্য হইয়া বসিয়াছেন, প্রসন্ন বদনমণ্ডল -স্নেহরসে পূর্ণ, করুণায় স্নিগ্ধ, জ্ঞানে সমুজ্জ্বল, প্রভাত-সূর্যের কিরণোদ্ভাসিত সদ্য প্রস্ফুটিত কমলের শোভাকেও যেন ম্লান করিয়াছে। কমলের শোভা অন্তরে আনন্দ দেয় বটে, কিন্তু এই করুণামাখা মুখপদ্ম দেখিবামাত্র কঠিন তপ্ত হৃদয় তৎক্ষণাৎ দ্রবীভূত ও সুশীতল হয়, পরমানন্দে অন্তর পূর্ণ হয়। মন-প্রাণ বুঝিতে পারে, যাহা

এতদিন খুঁজিতেছিলাম, খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রান হইয়াছি, কাঁদিয়াছি, আজ সেই বাঞ্ছিত নিধি পাইলাম। সুন্দর সুবর্ণ-বলয়-শোভিত বরাভয় হস্তযুগল কোলের উপর রাখিয়া, পা ঝুলাইয়া মা বসিয়াছেন, পরনে শুভ্র বস্ত্র, সরু রাঙা পাড়, লম্বিত আলুলায়িত কৃষ্ণ কেশরাশি দুগ্ধধবল বস্ত্রের সহিত মিলিত হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। মা ঈষৎ অবগুণ্ঠনাবৃতা। সুধাবর্ষী স্বরে ছেলেদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'বাবা, ঐ তোমাদের জন্য ফুল রহিয়াছে, তাড়াতাড়ি সেরে নাও, বেলা হয়ে গেছে, তোমাদের জলখাবার দিতে হবে।' ছেলেরাও এই শুভ মুহূর্তের জন্যই অধীর হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল, এই আশাতেই তো ভোরে ভোরে বাহির হইয়া এতদূর হাঁটিয়া আসিয়াছে। মায়ের দরজার গোড়ায় বসিয়া তাঁহার অপূর্ব পূজা— যাহাতে কোন প্রকার বাহ্যাড়ম্বর নাই, শুধু প্রাণের টান আর অন্তরের ভক্তি—নয়ন ভরিয়া দেখিতেছে! দেখিতেছে আর মোহিত হইয়া যাইতেছে। ছোট আসনটিতে মা শ্রীশ্রীঠাকুরের পট আর বালগোপালমূর্তি রাখিয়াছেন। শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে মা গুরু-ইষ্টরূপে সাক্ষাৎ ঠাকুরকে পূজা করিলেন, আর বাৎসল্যরসে পূর্ণ হইয়া গোপালকে স্নান করাইয়া সাজাইয়া খাওয়াইলেন। মায়ের চিত্তের অদ্ভুত ভাববিকাশ এই পূজায় পরিলক্ষিত হইল। আবার পূজাশেষে স্থিরভাবে কোলের উপর হস্তদ্বয় রাখিয়া যখন ধ্যানস্থা হইলেন, তখন সে 'সৌম্যাৎ সৌম্যতরা' মূর্তি দেখিয়া কে বলিবে তিনি মানবী? সন্তানের হৃদয় আজ বিশেষ উৎফুল্ল, মায়ের পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তাঁহার স্নেহাশীর্বাদ লাভ করিয়া আনন্দে ভরপুর। আবার, সন্তানের মনোমত ফুলটিও মা রাখিয়াছেন।

পূজান্তে তাঁহার নিজের ঘরের বারান্দায়, দরজার সম্মুখে ছেলেদের বসাইয়া মা জলখাবার খাওয়াইতেছেন, সামান্য প্রসাদী ফল মিষ্টি আর চিতুই পিঠে। আজ মুড়ি দিলেন না। মা পাশে বসিয়া কথা বলিতে বলিতে আনন্দে ছেলেদের খাওয়াইতেছেন। ছেলেদের একজন পূর্ববঙ্গবাসী ; অপর জনের জন্মস্থান ঐ অঞ্চলে, এখান হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে, এখন অন্যত্র থাকেন, কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান। তাঁহারা দুইজনেই বন্ধু, পূর্ব-পরিচিত। অনেক কাল পরে হঠাৎ আজ মায়ের বাড়ীতে পরস্পরের দেখা, দুজনেই খুশী। মা মোলায়েম সুরে পূর্ববঙ্গবাসী ছেলেটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, 'বাবা! এখানকার পাড়া-গেঁয়ে লোক এইসব পিঠেই খায়। ওরা ভাল জিনিস কোথায় পাবে? গরীব, নিজেদের চাষের জিনিস দিয়ে ঘরেই তৈরি করে সব খায়। মোটা খাবার, তবে খুব সহজে হজম হয়ে যায়, সুপাচ্য। পেট ভরে খাও, কোন অসুখ করবে না।' মা জানেন পূর্ববঙ্গবাসীদের খাওয়া খুব ভাল, সৌখিন সব জিনিস, তাই এই কৈফিয়ত। চাল-কলাই-ডাল বাটা, নারকেল কুচা পুর দিয়া ভাপে সিদ্ধ মোটা মোটা পিঠা রসগুড় দিয়া খাইতে দিয়াছেন। সুসিদ্ধ পিঠা খাইতে ভালই লাগিতেছে। সন্তানটি খাইতে খাইতে আনন্দের সহিত বলিতেছেন, 'মা, আমাদের দেশে এই পিঠা আছে, আমরা খুব খেয়েছি। ওখানে নারকেল আর গুড় আগেই কড়ায় পাক করে সন্দেশের মত করে পুর দেয়। এ পিঠা আমার খুব ভাল লাগছে পেট ভরে খাব।' মা খুব খুশী হইলেন, আরও পিঠা দিলেন, তাঁহারা দুই বন্ধুতে খাইয়া সিংহবাহিনী দর্শন করিতে আর গ্রামে বেড়াইতে বাহির হইলেন।

রান্না হইতে একটু দেরি হইল। মা ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করিয়া ছেলেদের ডাকিয়া আনিয়া রান্নাঘরের সামনে বড় মামার ঘরের বারান্দার কোণে খাওয়াইতে বসাইলেন। তাঁহার ঘরের বারান্দায় এখন একপাশে ছোট মামী, অন্যদিকে

নলিনীদিদি বসিয়া রাধু ও মাকুর শ্বশুরঘরে তত্ত্ব পাঠাইবার আয়োজন করিতেছেন, জিনিসপত্র ছড়াইয়া আছে। তাঁহারা ভারি ব্যস্ত, ঘর-বাহির করিতেছেন আর এটা আনিতেছেন, ওটা আনিতেছেন, দেখিতেছেন, দেখাইতেছেন। ভাল-মন্দ মতামত জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আবার স্বগত উক্তি অনেক! কে কাহার কথা শুনে! রাধুর মা ছোটমামী এবং তাঁহার বড় ভাসুরকন্যা নলিনী দুইজনের বয়সে খুব বেশী পার্থক্য নাই। একজন কন্যাকে, অপরে ছোট ভগিনীকে লইয়া ব্যস্ত। ছোটমামীর ইচ্ছা মা রাধুকে মানুষ করিয়াছেন, সব কিছু রাধুর প্রাপ্য। নলিনী ও মাকু কেন বোঝা হইয়া আছে? আর মা-ই বা কেন এদের এত স্নেহ-যত্ন করেন? নলিনীদিদি মনে করেন, তিনি বড় ভাইঝি, পরিবারের প্রথম সন্তান। মা তাঁহাকেও কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছেন। তাঁহার সহোদরা মা-মরা মাকুও তো রাধুরই মত ভাইঝি। তাঁহারা সবাই সমান স্নেহের অধিকারিণী; রাধু কেন বেশী পাইবে? মায়ের কিন্তু সকল ভাইঝি, ভাইপোর উপর সমান স্নেহ, সকলকে সমান আদর যত্ন করেন। তবে রাধুর প্রতি বিশেষ কারণে দায়িত্ব ও মমতা একটু বাড়িয়াছে। রাধুর বাবা, ছোটভাই অভয়কে তিনি মানুষ করিয়াছিলেন, লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। মেডিকেল স্কুলে পড়িয়া ডাক্তারী পরীক্ষা দিবার পর অভয় হঠাৎ কলেরারোগে মারা গেলেন। মৃত্যুসময়ে গর্ভবতী স্ত্রীর কথা স্মরণ করিয়া দিদির উপর তাঁহার ভার দিয়া গিয়াছেন। রাধুর জন্ম হইল। পতিশোকে উন্মাদিনী মাতা শিশু কন্যাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে অক্ষম। ওদিকে ঠাকুর আবার রাধুকে অবলম্বন করিয়া থাকিবার কথা মাকে বলিয়াছেন। মা তাই রাধুকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই হেতু তাঁহার ঊর্ধ্বগামী মনও নীচে নামিয়া জীবকল্যাণে রত রহিয়াছে।

ছোটমামী ও নলিনীদিদিতে কথাবার্তা বড় একটা দেখা যায় না, বরং একে অন্য হইতে সরিয়াই থাকেন। আজ কিন্তু দুইজনেই পাশাপাশি সব জিনিসপত্র গোছগাছ করিতেছেন আর পরোক্ষে আলাপও হইতেছে। মার এই সকলের দিকে নজর নাই, তিনি বড় মামার বারান্দার উঁচু ভিটায় গা ঠেসিয়া দাঁড়াইয়া ছেলেদের খাওয়াইতেছেন, কথাবার্তা বলিতেছেন, প্রয়োজন মত ভাত তরকারী দেওয়াইতেছেন, দিতেছেন। ছোটমামী ও নলিনীদিদির আন্তরিক ইচ্ছা, মা তত্ত্ব সম্বন্ধে খোঁজখবর লন, যাহাতে মনোমত ভাল জিনিসপত্র হয় সে বিষয়ে সাহায্য করেন। মামী ও দিদি মাকে শুনাইয়া, ফিস্‌ফিস্ করিয়া, কখন বা জোর গলায় দুঃখ করিতেছেন, 'ভাল জিনিস হলো না, কুটুম্বেরা কি বলবে, লোকে নিন্দে করবে', ইত্যাদি। কিছুক্ষণ শুনিয়া মা ছেলেদের দিকে তাকাইয়া খেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমার এত ছেলে আছে, যেমনটি দাও, হাতে করে পাতে করে আনন্দে খেয়ে যাবে; আর এদের একটি এলে বাটিই বের কত্তে হবে কত গণ্ডা! না দিলে আবার কথা হবে! বাবা, কত গণ্ডা বাটিই বের কত্তে হবে!' মা তত্ত্বের দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। আহারের পর ছেলেরা পান লইয়া কালীমামার বৈঠকখানায় বিশ্রাম করিতে গেল। মাও নিজের ঘরে ঢুকিলেন। আজ নলিনীদিদির মন ভারি—শেষ পর্যন্ত হয়ত মাকে সাধ্য সাধন করিতে হইবে তাঁহাকে খাওয়াইবার জন্য। মা, তোমার 'ক্ষ্যাপার হাটবাজার'! [ক্রমশঃ]

পতিতোদ্ধারিণী সুরশৈবলিনী

শ্রীশেফালিকা দেবী

হরিদ্বার। ১৩৮০ সালের বিদায়-লগ্ন। আর দুদিন পরে পূর্ণকুম্ভ-স্নানের যোগ। ত্রিতলের ছাদ থেকে রাজপথের দিকে তাকিয়ে আছি। অদূরে 'মদনমথনমৌলের্মালতীপুষ্পমালা' স্বচ্ছ-সলিলা কলনাদিনী গঙ্গা খরবেগে প্রবাহিতা। আর রাজপথ কলরোলে মুখরিত করে জাহ্নবী-ধারার সমান্তরালভাবে প্রবাহিত জনস্রোতের ধারা। সে-ধারার দিকে তাকালে কত বৈচিত্র্যই না চোখে পড়ে! মাথায় বিপুল ভার নিয়ে স্বচ্ছন্দ গতিতে ভুজদ্বয় আন্দোলিত করে চলেছে গৌরবর্ণা, সবল-কায়া পাঞ্জাবী কিশোরী; তার পাশেই মৃদুপদে সঞ্চরমাণা ক্ষীণাঙ্গী, শ্যামবর্ণা বাঙ্গালী বধূ; তার পিছনে অঞ্চলে অঞ্চলে গ্রন্থি বন্ধনে আবদ্ধা ঘাগরাপরিহিতা একদল মধ্যপ্রদেশীয়া রমণী; তার পিছনে অবগুণ্ঠনাবৃতা, রূপার মোটা মল ও কাঁকন-শোভিতা স্থূলাঙ্গিনী রাজস্থানী গৃহিণী। এক পাশ দিয়ে দ্রুতপদে ধাবমান টেরিলিন শার্ট ও প্যাণ্ট পরিহিত নব্যযুবক; তার পাশেই জটাজুট-মণ্ডিত, ভস্মাচ্ছাদিত-কায় গৈরিক-শোভিত সন্ন্যাসী; পিছনে বিশাল পাগড়ী-মণ্ডিত আজানুলম্বিত-ধুতি-পরিহিত উত্তরপ্রদেশীয় কৃষক। মাঝে মাঝে দু' একটি শ্বেতাঙ্গ বা শ্বেতাঙ্গিনীও চোখে পড়ে। আর কোন্ বয়সের লোক নেই! তিন মাসের শিশু অঙ্কে ষোড়শী জননী; যুবক পৌত্রের পিঠে আরূঢ় অশীতিপর পিতামহ; সংসার-দাবানলের রেখাঙ্কিত আননে অকাল-বৃদ্ধ; রোগে শীর্ণকায় পঙ্গুপ্রায় বালক; সচ্ছলতার মধ্যে প্রতিপালিতা পুষ্টকায়া প্রৌঢ়া।

এরা কোন্ আকর্ষণে দূরদূরান্তর থেকে নিরাপদ গৃহকোণ ত্যাগ করে শত অসুবিধা মেনে নিয়ে এই গঙ্গাতীরে অনাবৃত স্থানে দ্বিপ্রহরে প্রচণ্ড মার্তণ্ডতাপ আর রাত্রে তীব্র শীতল বায়ুপ্রবাহ সহ্য করে পড়ে আছে? ভাষা, আচার, পোশাক, আহার কত বিভিন্ন। তবু একটি কেন্দ্রে সকলের মন গিয়ে মিলিত হয়েছে—সে-কেন্দ্র হল গঙ্গা-মায়ী। তাই ব্রহ্মকুণ্ডের দুই কূলে সূর্যাস্তের বহুপূর্ব হতেই সহস্র সহস্র নরনারী স্থির হয়ে বসে শান্ত-ভাবে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে গঙ্গামায়ীর আরতি দর্শনের জন্য। ক্রমে পশ্চিমাকাশ রক্তিমাভ হতে থাকে। স্বর্ণোজ্জ্বল সূর্যের রঙ ম্লান হয়ে আসে। পলাশ-কনকচাঁপার অর্ঘ্য ছড়ানো পথে দিবাকর অস্তাচলে যান। সন্ধ্যার কালো ছায়া ধীরে ধীরে গাঢ়তর হতে থাকে। নক্ষত্রখচিত আকাশের কোলে পর্বতশ্রেণী যেন চিত্রপটে আঁকা। ক্রমে আরতির বিশাল দীপগুলি জ্বলে ওঠে পূজারীর হাতে। ঘণ্টা-নিনাদ, জয়ধ্বনি, সমবেত কণ্ঠে স্তবগাথা, গঙ্গার কলরোল আকাশ বাতাস পূর্ণ করে। দর্শকবৃন্দের হাতেও জ্বলে ওঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপ। জনসমুদ্রের মাঝে সেই আন্দোলিত ক্ষুদ্র দীপগুলি—গঙ্গাবক্ষে ভাসমান পাতার নৌকায় ক্ষুদ্র দীপমালা, আকাশে অসংখ্য নক্ষত্ররাজি সকলের মনকে মুহূর্তে জগতের সীমারেখা ছাড়িয়ে কোন্ উচ্চলোকে নিয়ে যায়! সমস্ত ভেদাভেদ এককালে লুপ্ত হয়। একটি সুরই তখন আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হতে থাকে —'গঙ্গামায়ীকী জয়!'

সমস্ত দেবদেবীই স্বর্গবাসী। ধ্যানযোগে তাঁদের দর্শন লাভ করতে হয় অথবা অনেক তপস্যা ও কৃচ্ছ্র সাধনের ফলে তাঁরা দর্শন দেন। কিন্তু দেবী সুরেশ্বরী, ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিত-চরণা

ভগবতী গঙ্গামায়ীর দর্শন লাভের জন্য কোন সাধনা করতে হয় না। সহস্রধারায় যেমন সগর-সন্তানদের অনায়াসে মুক্তিদান করেছেন—তেমনি দিবারাত্র অসংখ্য নরনারীকে লীলাভরে মুক্তিদান করে চলেছেন। একমাত্র গঙ্গাদেবীই বিনা সাধনায় সকলের স্থূল ইন্দ্রিয়ের গোচর হন। অন্য দেবদেবীকে দর্শন করতে হলে পবিত্র হয়ে মন্দিরে ছুটতে হয়, শাস্ত্রের নির্দেশানুযায়ী তাঁদের অর্চনা করতে হয়—অনুষ্ঠানে ত্রুটি হলে অমঙ্গলের আশঙ্কাও থাকে। তাঁদের মূর্তি স্পর্শ করার অধিকারও সকলের থাকে না। আর অপবিত্র বা পবিত্র, উচ্চ বা নীচ, ধনী বা দরিদ্র, পণ্ডিত বা মূর্খ—যে কেউ নির্ভয়ে মাতৃ-অঙ্কে শিশুর মত সুরধুনীর শীতল বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়লে মা তাঁর তরঙ্গরূপ অসংখ্য স্নেহমণ্ডিত বাহু দিয়ে তার দেহের ও অন্তরের সকল গ্লানি দূর করেন। তাপিত সন্তানের কণ্ঠে ধ্বনিত [illegible] :

রোগং শোকং পাপং তাপং,
হর মে ভগবতি কুমতি-কলাপম্।
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে,
ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে॥

যে কোনও তীর্থস্থানে সেই তীর্থাধিপতি দেবদেবীর মন্দিরে ভক্তগণ সমবেত হন, পূজা দেন, প্রার্থনা করেন। হরিদ্বারে গঙ্গাদেবীর মন্দির থাকলেও সেখানে ভীড় বড় নেই। কারণ প্রত্যক্ষ দেবীকে ত্যাগ করে কে তাঁর মূর্তিকে প্রাধান্য দেয়? তাই আরাত্রিকও হয় মন্দিরে প্রতিমার নয়—ভক্তসমক্ষে প্রত্যক্ষ আবির্ভূতা গঙ্গামায়ীর। তাই গঙ্গার দুই কূলেই জনস্রোত ধাবিত হয়—তাঁর শীতল স্নেহস্পর্শ লাভের আকাঙ্ক্ষায়।

সুদূর অতীত থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত পুরাণে কাব্যে সাহিত্যে গঙ্গার বহু খণ্ড চিত্র দেখা যায়। তার সবগুলিই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও মহিমায় উজ্জ্বল—কোনটি স্নিগ্ধ, কোনটি মধুর, কোনটি বা করুণ। কতকগুলি আমাদের মনে রেখাপাত করে। প্রথমেই গঙ্গাবতরণের কথা বলি :

রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে বিশ্বামিত্র যখন মিথিলার দিকে অগ্রসর হলেন, তখন একদিন মধ্যাহ্নে তাঁরা জাহ্নবীকূলে এসে উপস্থিত। অবগাহন তর্পণ ও হোমের পর ভোজন সমাপনান্তে বিশ্বামিত্র ভগীরথের গঙ্গা আনয়নবৃত্তান্ত শোনালেন। গঙ্গা স্বর্গ থেকে মর্ত্যে অবতরণ করছেন—সে-দৃশ্য দেখার জন্য আগত দেব ঋষি গন্ধর্ব সিদ্ধ প্রভৃতির অঙ্গপ্রভায় আকাশ সমুজ্জ্বল হল।

শিশুমারোরগগণৈর্মীনৈরপি [illegible] চঞ্চলৈঃ।
বিদ্যুদ্ভিরিব বিক্ষিপ্তৈরাকাশমভবৎ তদা॥
পাণ্ডুরৈঃ সলিলোৎপীড়ৈঃ কীর্যমাণৈঃ সহস্রধা।
শারদাভ্রৈরিবাকীর্ণং গগনং হংসসংপ্লবৈঃ॥
ক্বচিদ্ দ্রুততরং যাতি কুটিলং ক্বচিদায়তম্।
বিনতং ক্বচিদুদ্ভূতং ক্বচিদ্ যাতি শনৈঃ শনৈঃ॥
সলিলেনৈব সলিলং ক্বচিদভ্যাহতং পুনঃ।
মুহূরূর্ধ্বপথং গত্বা পপাত বসুধাং পুনঃ॥
তচ্ছঙ্করশিরোভ্রষ্টং ভ্রষ্টং ভূমিতলে পুনঃ।
ব্যরোচত তদা তোয়ং নির্মলং গতকল্মষম্॥

—চঞ্চল শিশুমার (শুশুক), সর্প ও মৎস্য সকল বিক্ষিপ্ত হওয়ায় আকাশ বিদ্যুৎ-শোভিতের ন্যায় হল। শুভ্রবর্ণ ফেনপুঞ্জ সহস্রধা বিকীর্ণ হওয়ায় মনে হল যেন হংস-সমাকীর্ণ শরতের শুভ্র মেঘে আকাশ সমাচ্ছন্ন। গঙ্গার ধারা কোথাও দ্রুত কোথাও বক্রগতিতে কোথাও বিস্তৃতভাবে কোথাও সঙ্কীর্ণভাবে কোথাও বা ধীরগতিতে প্রবাহিত হতে লাগল। কোথাও জলের সঙ্গে জলের সংঘর্ষ হল। কোথাও জল ঊর্ধ্ব দিকে গিয়ে পুনরায় ভূমিতে পড়তে লাগল। শঙ্করের শিরোভ্রষ্ট বারি বারংবার ভূপতিত হওয়ায় সে নির্মল নিষ্কলুষ বারি অতিশয় শোভান্বিত হল।

আবার মেঘদূতে গঙ্গাবতরণের এক অপূর্ব বর্ণনা—বিরহী যক্ষ মেঘকে সম্বোধন করে বলছেন

স্মাদ্ গঙ্গেরমুকনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং
হ্নোঃ কন্যাং সগর-তনয়-স্বর্গ-সোপান-পংক্তিম্।
গৌরী-বক্ত্র-ভ্রুকুটি-রচনাং যা বিহস্যেব ফেনৈঃ
ম্ভোঃ কেশগ্রহণমকরোদিন্দু-লগ্নোর্মি-হস্তা ॥

তারপর সেখান (কুরুক্ষেত্র) থেকে তুমি নখল যাবে। সেখানে হিমালয় হতে অবতীর্ণা, র-তনয়গণের স্বর্গগমনের সোপান-পংক্তি-স্বরূপা হ্নবী বিরাজমানা। তিনি যেন শুভ্র-ফেনপুঞ্জ হাস্যের দ্বারা গৌরীর ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে হাদেবের ললাটস্থ চন্দ্রে উর্মিরূপ হস্ত লগ্ন করে র জটাজাল ধারণ করেছেন।

বর্তমান যুগের কবির লেখনী দ্বারা অঙ্কিত ঙ্গাবতরণের মধুর চিত্র :

নারদ-কীর্তন-পুলকিত-মাধব-
বিগলিত-করুণা ক্ষরিয়া,
ব্রহ্ম-কমণ্ডলু উচ্ছলি' ধূর্জটি
জটিল জটা'পর ঝরিয়া।
অম্বর হইতে সম শতধারা
জ্যোতিঃ প্রপাত তিমিরে
নামি ধরাতলে হিমাচলমূলে
মিশিলে সাগর সঙ্গে।

গঙ্গাবতরণের উল্লেখ ক'রে এখন আমরা অন্যান্য দৃশ্যের অবতারণা করছি :

বনগমনকালে সীতা ও লক্ষ্মণসহ রাম শৃঙ্গবের-পুরে এসে উপস্থিত হলেন। নিষাদরাজ গুহ প্রদত্ত সুসজ্জিত নৌকায় আরোহণ করে তাঁরা গঙ্গা পার হলেন। নৌকা নদীর মধ্যদেশে এলে সীতা করজোড়ে বল্লেন :

পুত্রো দশরথস্যায়ং মহারাজস্য ধীমতঃ।
নিদেশং পালয়ত্বেনং গঙ্গে ত্বদভিরক্ষিতঃ ॥
চতুর্দশ হি বর্ষাণি সমগ্রাণ্যুষ্য কাননে।
ভ্রাত্রা সহ ময়া চৈব পুনঃ প্রত্যাগমিষ্যতি ॥
ততস্ত্বাং দেবি শুভগে ক্ষেমেণ পুনরাগতা।
যক্ষ্যে প্রমুদিতা গঙ্গে সর্বকামসমৃদ্ধিনী ॥
ত্বং হি ত্রিপথগে দেবি ব্রহ্মলোকং সমক্ষসে।
ভার্যা চোদধিরাজস্য লোকেঽস্মিন্ সংপ্রদৃশ্যসে ॥
সা ত্বাং দেবি নমস্যামি প্রশংসামি চ শোভনে।
প্রাপ্তরাজ্যে নরব্যাঘ্রে শিবেন পুনরাগতে ॥
গবাং শতসহস্রঞ্চ বস্ত্রাণ্যন্নঞ্চ পেশলম্।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদাস্যামি তব প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥
সুরাঘটসহস্রেণ মাংসভূতৌদনেন চ।
যক্ষ্যে ত্বাং প্রীয়তাং দেবি পুরীং পুনরুপাগতা ॥
যানি ত্বত্তীরবাসীনি দৈবতানি চ সন্তি হি।
তানি সর্বাণি যক্ষ্যামি তীর্থান্যায়তনানি চ ॥
পুনরেব মহাবাহুর্ময়া ভ্রাত্রা চ সঙ্গতঃ।
অযোধ্যাং বনবাসাত্তু প্রবিশত্বনঘোঽনঘে ॥

গঙ্গে! ধীমান্ রাজা দশরথের এই পুত্র তোমার দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে পিতৃসত্য পালন করুন। চতুর্দশ বৎসর বনে বাস করে আমার ও ভ্রাতার সহিত প্রত্যাবর্তন করবেন। হে সৌভাগ্যদায়িনি! দেবি! গঙ্গে! কুশলে ফিরে এসে আমি সকল কাম্য বস্তু দ্বারা সানন্দে তোমার পূজা করব। হে দেবি! ত্রিপথগামিনি! তুমি ব্রহ্মলোক ব্যাপ্ত করে আছ এবং এই লোকে তুমি সমুদ্র-ভার্যা বলে পরিচিতা। দেবি! শোভনে! তোমায় প্রণাম ও তোমার স্তব করি। নরশ্রেষ্ঠ রাম কুশলে ফিরে এসে রাজ্য লাভ করলে তোমার প্রীত্যর্থে ব্রাহ্মণগণকে শত সহস্র গো, বস্ত্র ও প্রচুর অন্নদান করব। আমি নগরীতে পুনরায় ফিরে সহস্র ঘট সুরা ও পলান্নের দ্বারা তোমার পূজা করব। দেবি! তুমি প্রসন্না হও। তোমার তীরবর্তী সকল দেবতাকে এবং সকল তীর্থ ও পুণ্যক্ষেত্রে পূজা দেব। হে অনঘে! মহাবাহু নিষ্পাপ রাম বনবাসশেষে আমার ও লক্ষ্মণের সহিত যেন অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন।

কৃষ্ণা-চতুর্দশীর ঘোর নিশা। বারণাবত নগরে জতুগৃহে অগ্নি সংযোগ করে কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডব পলায়ন করছেন। ভীমের স্কন্ধদেশে কুন্তী, দুই

কক্ষে নকুল-সহদেব এবং দুই করে ধৃত যুধিষ্ঠির ও অর্জুন। মাথার উপর নক্ষত্র দেখে দিক্ নির্ণয় করে বনপথে তাঁরা দ্রুত পদবিক্ষেপে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হলেন। বিদুরের জনৈক অনুচর তাঁদের গঙ্গাপারের ব্যবস্থা করে দিলেন। যাঁরা একদিন আসমুদ্রহিমাচলের একচ্ছত্র অধিপতি হবেন—আজ তাঁরা শঙ্কিত ও উদ্বিগ্নচিত্তে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল। তাঁদের ভীতি শঙ্কা ও উদ্বেগের একমাত্র সাক্ষী থাকলেন গঙ্গা দেবী। তিনি কি সেদিন তাঁর বক্ষোত্থিত শীতল বায়ু স্পর্শে তাঁদের ভীতি ও ক্লান্তি দূর করেননি? সান্ত্বনা দেননি?

'পরিব্রাজক'-এ সন্ন্যাসীর দৃষ্টিতে গঙ্গার এক বৈরাগ্যোদ্দীপক চিত্র: 'হৃষীকেশের গঙ্গা মনে আছে? সেই নির্মল নীলাভ জল—যার মধ্যে দশ হাত গভীরের মাছের পাখনা গোনা যায়, সেই অপূর্ব সুস্বাদু হিমশীতল "গাঙ্গ্যং বারি মনোহারি" সেই অদ্ভুত "হর্ হর্ হর্" তরঙ্গোত্থ ধ্বনি, সামনে গিরিনির্ঝরের "হর্ হর্" প্রতিধ্বনি, সেই বিপিনে বাস, মাধুকরী ভিক্ষা, গঙ্গাগর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপাকার শিলাখণ্ডে ভোজন, করপুটে অঞ্জলি অঞ্জলি সেই জল পান, চারিদিকে কণপ্রত্যাশী মৎস্যকুলের নির্ভয় বিচরণ? সে গঙ্গাজল-প্রীতি, গঙ্গার মহিমা, সে গাঙ্গ্যবারির বৈরাগ্যপ্রদ স্পর্শ, সে হিমালয়বাহিনী গঙ্গা, শ্রীনগর, টিহিরি, উত্তরকাশী, গঙ্গোত্রী, তোমাদের কেউ কেউ গোমুখী পর্যন্ত দেখেছ; কিন্তু আমাদের কর্দমাবিলা হরগাত্রবিঘর্ষণশুভ্রা, সহস্র-পোতবক্ষা এ কলকাতার গঙ্গায় কি এক টান আছে, তা ভোলবার নয়। সে কি স্বদেশ-প্রিয়তা বা বাল্যসংস্কার—কে জানে? হিন্দুর সঙ্গে মায়ের সঙ্গে একি সম্বন্ধ!—কুসংস্কার কি?—হবে! গঙ্গা গঙ্গা করে জন্ম কাটায়, গঙ্গা জলে মরে, দূর দূরান্তরের লোক গঙ্গাজল নিয়ে যায়, তাম্র পাত্রে যত্ন কোরে রাখে, পালপার্বণে বিন্দু বিন্দু পান করে। রাজারাজড়ারা ঘড়া পুরে রাখে, কত অর্থব্যয় কোরে গঙ্গোত্রীর জল রামেশ্বরের উপর নিয়ে গিয়ে চড়ায়; হিন্দু বিদেশে যায়—রেঙ্গুন, জাভা, হংকং, জাঞ্জীবর, মাডাগাস্কর, সুয়েজ, এডেন, মাল্টা—সঙ্গে গঙ্গাজল, সঙ্গে গীতা। গীতা গঙ্গা—হিঁদুর হিঁদুয়ানি। গেল বারে আমিও একটু নিয়ে গিয়েছিলুম—কি জানি! বাগে পেলেই এক আধ বিন্দু পান করতাম। পান কল্লেই কিন্তু সে পাশ্চাত্য জনস্রোতের মধ্যে, সভ্যতার কল্লোলের মধ্যে, সে কোটী কোটী মানবের উন্মত্তপ্রায় দ্রুত পদসঞ্চারের মধ্যে, মন যেন স্থির হয়ে যেত! সে জনস্রোত, সে রজোগুণের আস্ফালন, সে পদে পদে প্রতিদ্বন্দ্বিসংঘর্ষ, সে বিলাসক্ষেত্র, অমরাবতীসম পারিস, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, বার্লিন, রোম—সব লোপ হয়ে যেত, আর শুনতাম—সেই "হর্ হর্ হর্", দেখতাম—সেই হিমালয়ক্রোড়স্থ বিজন বিপিন, আর কল্লোলিনী সুরতরঙ্গিণী যেন হৃদয়ে মস্তকে শিরায় শিরায় সঞ্চার করছেন আর গর্জে গর্জে ডাকছেন—"হর্ হর্ হর্!"'

গঙ্গার শোভা সন্দর্শনে মুগ্ধ সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এক চন্দ্রালোকিত রজনীতে বাঙ্গালী মনের আশা অনুভব করলেন:

"একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়াছিলাম। প্রদোষ কাল—প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষবীচি বিক্ষেপশালিনী—মৃদু পবন হিল্লোলে তরঙ্গভঙ্গ চঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বারাণ্ডায় বসিয়াছিলাম তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি মৃদু রব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি! কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনে তৃপ্তি সাধন করি। ইংরেজি কবিত

তাহা হইল না— ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস, ভবভূতিও অনেক দূরে।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র কাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গাহিতেছে—

'সাধ-ও আছে মা মনে।
দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব
জাহ্নবী-জীবনে।'

তখন প্রাণ জুড়াইল— মনের সুর মিলিল— বাংলা ভাষায় -- বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম— এ জাহ্নবী-জীবন 'দুর্গা' বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্যময় জগৎ আপনার বলিয়া বোধ হইল— এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।"

নাড়ীতে রক্তধারার মত সকল হিন্দু নরনারীর অন্তরেই গঙ্গাপ্রীতি প্রবহমান। কোথাও তা ব্যক্ত কোথাও বা সুপ্ত— কিন্তু লুপ্ত কোথাও নয়। তাই ধর্ম নিয়ে বিশেষ মাথা না ঘামালেও, পাশ্চাত্য ভাবধারায় জীবন যাপন করলেও বিশেষ পর্ব উপলক্ষ্যে বিশেষ তীর্থস্থানে গঙ্গামায়ীর দর্শন স্পর্শনের জন্য বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ বুদ্ধিজীবী, ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ্ প্রভৃতির সমাগম ঘটে। কেউ এটাকে বলেন নিছক কৌতূহল-চরিতার্থতা এবং কেউ বা সৌন্দর্যপ্রীতি বলেন। আবার কেউ বা অবসর বিনোদনের দোহাই দেন— কিন্তু মূলটা যে কোথায় সেটা তলিয়ে দেখেন না বা দেখতে চান না।

সুখে বা দুঃখে যে ভাবেই জীবন যাপিত হোক্ না কেন, গঙ্গাতীরে মৃত্যু হিন্দু নরনারীর কাম্য। গঙ্গাতীরে মৃত্যু সম্ভবপর না হলে— অন্ততঃ অস্থিভস্মও যাতে গঙ্গাবারিতে যায়— তা অনেকেই আকাঙ্ক্ষা করেন। এই আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা স্বামীজী 'পরিব্রাজক'-পুস্তকে একটি কৌতুকজনক কাহিনীতে বর্ণনা করেছেন— কেমন করে এক গৃহিণী তাঁর স্বামীর অস্থিচূর্ণ-মিশ্রিত দুগ্ধ গঙ্গাতীরবাসী জামাতাকে পান করিয়ে স্বামী গঙ্গাজল স্পর্শে উদ্ধার হল বলে সন্তোষ প্রকাশ ও আনন্দাশ্রু বিসর্জন করেছিলেন।

বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারীর অন্তিম সময়ে গঙ্গালাভ করার প্রার্থনা যুগে যুগে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। ভাষা যাই হোক্— ভাব সর্বত্র এক।

তাই দেখি, আদিকবি বাল্মীকি দেবভাষায় প্রার্থনা করছেন :

মাতঃ শৈলসুতাসপত্নি বসুধাশৃঙ্গারহারাবলি
স্বর্গারোহণবৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে।
ত্বত্তীরে বসতস্ত্বদম্বু পিবতস্ত্বদ্বীচিমুৎপ্রেক্ষত-
স্ত্বন্নাম স্মরতস্ত্বদর্পিতদৃশঃ স্যান্মে শরীরব্যয়ঃ॥

হে জননি, পার্বতী-সপত্নি, ধরিত্রীর বিলাস-মাল্য-রূপিণি, স্বর্গারোহণের বিজয়-কেতন-স্বরূপিণি, ভাগীরথি— তোমার নিকট এই প্রার্থনা যেন তোমার তীরবাসী ও তোমার জলপানকারী হয়ে তোমার তরঙ্গ নিরীক্ষণ ও নাম স্মরণ করতে করতে তোমাতে অর্পিতদৃষ্টি আমার শরীর ত্যাগ হয়।

নিরক্ষরা সরলা গ্রাম্য বালিকা ব্রতশেষে কর-জোড়ে বলছে :

'পুত্র দিয়ে স্বামী কোলে,
প্রাণ যেন যায় গঙ্গাজলে।'

অথবা

"বাস করব নগরে,
মরব গিয়ে (গঙ্গা) সাগরে।"

সাধক অন্তিম সময়ে বলেন, "আনরে ভোলা, জপের মালা, ভাসি গঙ্গাজলে।" চন্দ্রালোকিত গঙ্গাবক্ষে অমার্জিত কণ্ঠে ধীবর প্রাণের বাসনা ব্যক্ত করছে —"সাধ-ও আছে মা মনে, দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব

জাহ্নবী-জীবনে"— আর সে সুরে স্পন্দিত হতে থাকে শিক্ষিত সুমার্জিত বিদগ্ধ সাহিত্যিকের হৃদয়ের গোপন আকাঙ্ক্ষা। পাশ্চাত্যের ঐশ্বর্য-বহুল ভোগভূমিতে দীর্ঘকাল বাস করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনান্তে কবি মধুর ছন্দে গঙ্গাদেবীর নিকট কাতরভাবে নিবেদন করেন :

'পরিহরি ভব সুখ দুখ যখন মা
শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জল-কলরব
বরিষ সুপ্তি মম নয়নে।
বরিষ শান্তি মম শান্কত প্রাণে
বরিষ অমৃত মম অঙ্গে ;
মা ভাগীরথি ! জাহ্নবি ! সুরধুনি
কল-কল্লোলিনি গঙ্গে।'

'কবিং পুরাণম্'

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

তব কাব্যগ্রন্থখানি
রাত্রিদিন মাস ঋতু বরষ শতকে
সাদা কালো পাতা-বাঁধা দিবা আর রাত্রির মোড়কে
বাঁধো আর খুলে ফেল ?
মানুষেরই মতো তুমি কত কথা মোছ আর লেখ ?
নূতন পুরানো কথা !—কখনো বা একেবারে এক !
ভুলচুক পুনরুক্তি ফিরে ফিরে দেখ !
ছিঁড়ে ফেল ? কোথায় সে ছেঁড়া পাতা—
কে নেয় কুড়ায়ে—
সেই সব সাদা কালো পাতার জঞ্জাল ?—
সে কি পথচারী সেই বৃদ্ধ, 'চিরকাল' !
কেহ কি বুঝিতে পারে কি লিখেছ তাতে ?
সে কি সুখ ? সে কি দুঃখ, আর্ত মূঢ় শোক—
শতকের নানা-অঙ্ক-আঁকা-তনু আমাদের ক্ষুদ্র জীবলোক !
খণ্ড খণ্ড ক্ষণিকায় গাঁথা তুচ্ছ মানবজীবন—
দু-চোখে বিস্ময় ভয়—কভু অশ্রু দুই চোখে—
চিরদিন হেরে তব কাব্য সে অপার !
আর—আহা ! অর্থ তার চিরকাল করে অন্বেষণ !

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও শক্তি-আরাধনা

শ্রীচারুচন্দ্র পাকড়াশী

কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর শুদ্ধাভক্তিপথাবিষ্ট হইয়া নিরবচ্ছিন্ন শ্রীকৃষ্ণ-ভজন স্বয়ং আচার ও প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীকৃষ্ণপারম্যবাদই তাঁহার অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের সুদৃঢ় ভিত্তি। কিন্তু ভজন-মহাবৃক্ষের পরমাশ্রয় সর্বমূলাবলম্বনের শিক্ষা দিলেও তিনি উহার শাখা কাণ্ড পত্র পুষ্প পল্লবাদি উপেক্ষা করেন নাই। তাহা তাঁহার আচরণে সর্বথা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। তাঁহার জীবনই তাঁহার বাণী। 'আপনি আচরি প্রভু সবারে শিখায়। আপনি না কৈলে কর্ম শিখান না যায়॥' (চৈ.চ.)

তাঁহার উক্ত আচার-প্রচারে শক্তি-আরাধনা বিষয়ক যে-শিক্ষা তিনি দিয়াছেন, তাহাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচিত হইতেছে। সংসারাশ্রমে অবস্থিতিকালে প্রেমাবতার নদীয়ার নিমাই শ্রীগৌরসুন্দর, করুণাবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দের সহিত মিলিত হইয়া সারা নবদ্বীপে নাম-প্রেমের প্লাবন সৃষ্টি করিয়াছেন।

শ্রীঅদ্বৈত শ্রীবাস গদাধর মুকুন্দ হরিদাস প্রভৃতি অগণিত ভক্ত সাঙ্গোপাঙ্গ তাঁহার নাম-প্রেমধর্ম আচার-প্রচারে সঙ্গী হইয়াছেন। পাষণ্ডী-প্রধান জগাই মাধাই উদ্ধার হইয়াছে। নাম-প্রেমমহিমার বিজয়-কেতন সর্বত্র উড্ডীন হইয়াছে। এমন সময় একদিন বিশ্বম্ভর গৌর-সুন্দর লীলাভিনয়ের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তাঁহার মেসোমহাশয় চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে স্থান নির্ণীত হইল। সাজসজ্জা দৃশ্যপটাদির যথা-রীতি আয়োজন ও ব্যবস্থা হইল। মাতা শচী-দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সহ সমগ্র বৈষ্ণব গৃহিণীবর্গ দর্শনে আহূতা হইলেন। আর অভিনেতা ও দ্রষ্টা স্বরূপে অন্যান্য ভক্তবৃন্দ ও সাঙ্গোপাঙ্গগণ সহকারী হইলেন। মুখ্য অভিনয় শ্রীরুক্মিণীদেবীর পূর্বরাগ।

শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং রুক্মিণী, নিত্যানন্দ তাঁহার বর্ষীয়সী সহকারিণী, শ্রীঅদ্বৈত—সূত্রধার, শ্রীবাস—নারদ, হরিদাস—কোটাল ইত্যাদি সাজিয়াছেন। অভিনয় আরম্ভের পূর্বে মহাপ্রভু কৃপা করিয়া তাঁহার পুরুষভক্তগণকে বর দিলেন, 'মহাযোগেশ্বর আজি তোমরা হইবা। দেখিয়া আমারে কেহ মোহ না পাইবা॥' (চৈ. ভা.)। সমুদ্র-মন্থনান্তে যাঁহার মোহিনী মূর্তি দর্শন করিয়া স্বয়ং দেবাদিদেব শঙ্করও বিমুগ্ধ, তিনিই আজ রমণীবেশ গ্রহণ করিতেছেন, কাজেই তদ্দর্শনে যোগ্যতা দানের প্রয়োজন অবশ্যই রহিয়াছে।

যথাসময় অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীগৌর-সুন্দর রুক্মিণী সাজে অভিনয় করিতেছেন। 'পত্রী সহ ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়া তাঁহার প্রতীক্ষার' অনুষঙ্গে দৃশ্যান্তরে প্রিয় গদাধর গোকুলসুন্দরী শ্রীরাধাভাবে অভিনয় করিলেন। যুগপৎ পুরলীলা ও ব্রজলীলার রসাস্বাদনে সঙ্গী অভিনেতৃবৃন্দ ও নারীপুরুষ নির্বিশেষে সমবেত দর্শকমণ্ডলী সকলেই ভরপুর।

অভিনয়-সমাপ্তির প্রাক্‌কালে রুক্মিণী বেশে সজ্জিত বিশ্বম্ভর শচীদুলাল এক অতি-অভিনব ভাবের প্রকাশ করিলেন। দর্শকবৃন্দ বিমুগ্ধ।

জগতজননীভাবে নাচে বিশ্বম্ভর।
সময় উচিত গান গায় অনুচর॥
কোন্ প্রকৃতির ভাবে নাচে নারায়ণ।
হেন দড়াইতে কেহ নারে কোন জন॥

কখনো বোলয়ে বিপ্র কৃষ্ণ কি আইলা।
তখন বুঝিয়ে যেন বিদর্ভের বালা[১] ॥
নয়নে আনন্দধারা দেখিয়ে যখন।
মূর্তিমতী গঙ্গা[২] যেন বুঝিয়ে তখন ॥
ভাবাবেশে যখন বা অট্ট অট্ট হাসে।
মহাচণ্ডী[৩] হেন সবে বুঝেন প্রকাশে ॥
ঢুলিয়া ঢুলিয়া প্রভু নাচয়ে যখনে।
সাক্ষাৎ রেবতী[৪] যেন কাদম্বরী পানে ॥
ক্ষণে বলে চল বড়াই যাই বৃন্দাবনে।
গোকুল-সুন্দরী[৫] ভাব বুঝিয়ে তখনে ॥
বীরাসনে ক্ষণে প্রভু বসে ধ্যান করি।
সভে দেখে যেন মহা-কোটি-যোগেশ্বরী[৬] ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত নিজ শক্তি আছে।
সকল প্রকাশে প্রভু রুক্মিণীর কাচে ॥
(চৈ. ভা.)

এইভাবে শক্তি ও শক্তিমানের পূর্ণাভিন্নতা মহাপ্রভু লীলায় প্রকটিত করিলেন। চৈতন্য-লীলার ব্যাসঠাকুর—বৃন্দাবন দাস এই লীলা বর্ণনান্তে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন :

'ব্যপদেশে মহাপ্রভু শিখায় সবারে।
পাছে মোর শক্তি কোন জন নিন্দা করে ॥
লৌকিক বৈদিক যত কিছু বিষ্ণুশক্তি।
সভার সম্মানে হয় কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি ॥
দেবদ্রোহ করিলে কৃষ্ণের বড় দুঃখ।
গণ সহ কৃষ্ণ পূজা করিলেই সুখ ॥
যে শিখায় কৃষ্ণচন্দ্র সেই সত্য হয়।
অভাগ্যে পাপিষ্ঠমতি তাহা নাহি লয় ॥'

অতঃপর রুক্মিণীবেশী বিশ্বম্ভর অভিনয় সমাধা-করতঃ বিগ্রহ-মন্দিরে প্রবেশান্তর—

"ক্ষণেকে ঠাকুর গোপীনাথে[৭] কোলে করি।
মহালক্ষ্মী ভাবে উঠে খট্টার উপরি ॥
সম্মুখে রহিলা সবে জোড়হস্ত করি।
'মোর স্তুতি পড়' বলে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
জননী আবেশ বুঝিলেন সর্বজনে।
সেই রূপে সবে স্তুতি পড়ে প্রভু শোনে ॥
কেহ পড়ে লক্ষ্মীস্তব কেহ চণ্ডীস্তুতি
সভে স্তুতি পড়েন যাহার যে মতি ॥"
(চৈ. ভা.)

ঠাকুর বৃন্দাবন এই স্থানে যে অনবদ্য মহামায়া-স্তুতি খ্যাপন করিয়াছেন তাহা অপূর্ব ভাব ও তত্ত্বব্যঞ্জক। তাহার প্রারম্ভ মধ্য ও শেষাংশ মাত্র উল্লেখ করিতেছি নতুবা প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইয়া পড়িবে।

'জয় জয় জগত-জননী মহামায়া।
দুঃখিত জীবেরে দাও চরণের ছায়া ॥
জয় জয় অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডকোটীশ্বরী।
তুমি যুগে যুগে ধর্ম রাখ কৃপা করি ॥

*　　*　　*

জগত-স্বরূপা তুমি, তুমি সর্বশক্তি।
তুমি শ্রদ্ধা দয়া লজ্জা, তুমি বিষ্ণুভক্তি ॥
যত বিদ্যা সকল তোমার মূর্তিভেদ।
সর্বপ্রকৃতির শক্তি তুমি কহে বেদ ॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে পরিপূর্ণ তুমি মাতা।
কে তোমার স্বরূপ কহিতে পারে কথা ॥

*　　*　　*

ব্রহ্মাদির বন্দ্য তুমি সর্বভূতবুদ্ধি।
তোমায় স্মঙরিলে সর্বমন্ত্রাদির শুদ্ধি ॥

*　　*　　*

সভে লইলাঙ মাতা তোমার শরণ।
শুভদৃষ্টিকর তোর পদে রহু মন ॥
এই মত স্তুতি করে সকল মহান্ত।
বরমুখে মহাপ্রভু শুনয়ে একান্ত ॥ (চৈ.ভা.)

উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী আজ জগজ্জননী মহা

---

১ রুক্মিণী ২ গঙ্গাদেবী ৩ কৌষিকী ৪ বলদেবপত্নী রেবতী ৫ শ্রীরাধা ৬ যোগমায়া
৭ চন্দ্রশেখরের গৃহদেবতা

মায়ারূপী বিশ্বম্ভরের নিকট হইতে কৃষ্ণভক্তি বর লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে এই শিক্ষাধারাই শ্রীকৃষ্ণলীলায় সুস্পষ্ট বর্ণিত রহিয়াছে।

ব্রজবালিকাগণ মাসব্যাপী কাত্যায়নী মায়ের অর্চনা করিয়া কৃষ্ণ-সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিলেন। এবং বিদর্ভ-রাজনন্দিনী রুক্মিণীদেবী মা অম্বিকার আরাধনার ফলে কৃষ্ণপতি লাভে কৃতার্থা হইলেন। তাঁহাদের সাধনমন্ত্র যথাক্রমে শ্রীমদ্ভাগবতে—

কাত্যায়নি! মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি! পতিং মে কুরু তে নমঃ॥

নমামি ত্বাম্বিকেঽভীক্ষ্ণং স্বসন্তানযুতাং শিবাম্।
ভূয়াৎ পতির্মে ভগবান্ কৃষ্ণস্তদনুমোদতাম্॥

মা যোগমায়াই কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায়িনী আর তাঁহার আবরিকাস্বরূপা গুণমায়া বিশ্ববিমোহিনী, যাঁহার মোহার্গল মুক্ত হইলেই প্রেম-প্রদায়িনীর নির্বিচার উন্মুক্ত প্রেমভাণ্ডারের সান্নিধ্য লাভ হয়। কলিযুগপাবনাবতার প্রেমপুরুষোত্তম এই সহজ সরল সুশিক্ষাই জীব-জগতে প্রদান করিয়াছেন। অজ্ঞতাপ্রযুক্ত আমরা ইতস্ততঃ ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি করিয়া অধঃপতিত হইতেছি। শক্তিমানকে উপেক্ষা করিয়া শক্তি-সাধনাও যেমন নিরর্থক, তেমনি শক্তিকে উপেক্ষা করতঃ শক্তিমানের ভজনও ব্যর্থতাপূর্ণ। শ্রুতি নির্গুণ নিরাকার একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মস্বরূপকেই পরতত্ত্বের প্রাথমিক* পরিচয়রূপে খ্যাপন করিয়াছেন এবং কেবলমাত্র তাঁহার অস্তিত্ব-সত্তাকে জ্যোতিঃস্বরূপে স্বীকার করিয়াছেন। বেদান্ত পরতত্ত্বের অস্তিত্বসহ চৈতন্য-সত্তার উপলব্ধি প্রদানে তাঁহাকে সর্বত্রব্যাপী 'পরমাত্মা'রূপে নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত আরও নিকটবর্তী হইয়া বলিলেন, তিনি সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহধারী লীলাময় ভগবান্।—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ (ভাঃ)

এই পৃথক্‌দর্শন একই স্বরূপের ক্রমাভিজ্ঞান মাত্র। ব্রহ্মে সৎ শক্তি মাত্রই বিকশিত; চিৎ, আনন্দ গুপ্ত। পরমাত্মায় সৎ ও চিৎ ব্যক্ত, কিন্তু আনন্দ অপ্রকাশ। আর ভগবৎ-স্বরূপে তিন শক্তিরই পূর্ণ বিকাশ। তাই ভগবান পূর্ণ সচ্চিদানন্দময় এবং তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ (ভাঃ)। উক্ত সৎ চিৎ আনন্দ তিন শক্তিই অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তি। এতদ্‌ব্যতীত বহিরঙ্গা আবরিকা-শক্তি ত্রিগুণময়ী মায়া। এবং এই উভয়ের অন্তবর্তী তটস্থ-শক্তিই জীব।* এই ত্রিশক্তির খেলাই ঈশ্বর জীব জগৎ। শক্তিও শক্তিমানের অভেদত্বহেতু ভেদজ্ঞান সম্পূর্ণ অজ্ঞতা-প্রসূত ও অপ্রতিষ্ঠ। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্‌ভাগবত-সিদ্ধান্তের কিছু দিগ্‌দর্শন দীনভাবে উপস্থিত করিতেছি।

আধ্যাত্মিক জ্ঞানপ্রলুব্ধ ভারতীয় আর্য ঋষিবৃন্দ বিশ্বকারণ পরতত্ত্বের সন্ধানে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া সুগভীর সাধনায় যে মন্ত্রাবলীর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই শাশ্বত অধ্যাত্ম-জ্ঞানভাণ্ডার অপৌরুষেয় বেদ। যদিও বেদে প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ দেবতা অগ্নি সূর্য বায়ু ইন্দ্র পূষা উষা প্রভৃতির উদ্দেশে বহু ঋগ্‌মন্ত্রের বিদ্যমানতা রহিয়াছে, তথাপি উহা বেদের সারবার্তা নহে। ঐগুলি সার্থক করিয়া পরতত্ত্বের নির্ণয়ে বৈদিক ঋষির চূড়ান্ত অবদান 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' নির্গুণ নির্বিশেষ অব্যক্তশক্তিক

* প্রবন্ধের এই শেষাংশে যে দার্শনিক তত্ত্ব পরিবেশিত হইয়াছে, বলা বাহুল্য, তাহা সর্ববাদিসম্মত নহে। এ বিষয়ে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। কারণ একই আর্যশাস্ত্রকে ভিত্তি করিয়া যে বহু মতবাদ প্রচলিত আছে, তাহা সকলেরই সুবিদিত।—সঃ

ব্রহ্ম। তাঁহার সর্বাদিবাঙ্ময় মূর্তি হইলেন ত্রিবর্ণ-গঠিত মহাবাক্য প্রণব।

ওঁ ইত্যেতদ্ ব্রহ্মণো নেদিষ্টং নাম। (শ্রুতি)

স্বরূপ ও নাদব্রহ্মের উপলব্ধির পর আর্য ঋষি উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন পরতত্ত্বের বিজ্ঞান। অর্থাৎ তাহার উপলব্ধিলাভের মহান সূত্র। ঔপনিষদ বাণীতে তাহার পরিচয়—'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি...তদ্ ব্রহ্মেতি।' অবাঙ্মনসোগোচর পরতত্ত্বকে সুপরিজ্ঞাত বিশ্ব সম্বন্ধসূত্রে ধরিবার যে ইঙ্গিত প্রদত্ত হইল তাহাতে লক্ষ্যীভূত হইতেছে তিনটি কারক :—

'যাহা হইতে', 'যাহা দ্বারা' ও 'যাহাতে' এই অপাদান, করণ ও অধিকরণ এই তিনটি কারক পরতত্ত্বে বিদ্যমান। এস্থলে বিচার্য 'কারক' কর্তা-কৃত ক্রিয়ারই বৈশিষ্ট্য মাত্র। পরন্তু কর্তা ব্যতীত কোন ক্রিয়া সম্পাদিত হইতে পারে না। ফলে তত্ত্বসন্ধানরত ঋষি উপলব্ধি করিলেন পরতত্ত্ব ব্রহ্মে ক্রিয়া-সামর্থ্য বা শক্তির নিত্যবিদ্যমানতা এবং তাহা কেবল তিনটিই নহে বহু—

'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।'

তন্মধ্যে প্রধানা (১) জ্ঞানশক্তি (২) ইচ্ছা-শক্তি ও (৩) ক্রিয়াশক্তি—যাহার কার্য সৃষ্টি স্থিতি বিলয়, যাহা পরিদৃশ্যমান জগতে চক্রবৎ নিত্য আবর্তিত হইতেছে।

অব্যক্তশক্তিক ব্রহ্মের ব্যক্তশক্তির পরিচয় লাভের পরেই ঋষিবর্গ রুচিবৈচিত্র্যবশতঃ মুখ্য তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

প্রথম শক্তিমান (ব্রহ্ম) পারম্যবাদী, দ্বিতীয় —শক্তি পারম্যবাদী আর তৃতীয়— সমন্বয়ী, যুগ্ম-পারম্যবাদী। ইহার ফলেই ব্রহ্মপারম্য-নিগম (বেদ) কে অবলম্বন করিয়া শক্তিপারম্য-আগমের (তন্ত্র) প্রকাশ পাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে নিগম ও আগমের সংযোগে সমন্বয়ী বিবিধ সংহিতার উদ্ভব হইয়াছে। ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রক্রম প্রায়শঃ ও ক্রমশঃ এই ত্রিবিধ শাখায় বিভক্ত হইয়া নানাবিধ বৈচিত্র্যময় ফুল ও ফলের বিকাশ করতঃ জগতে মানবমনীষার এক অভূতপূর্ব অনন্ত অবদানের স্বাক্ষর রাখিয়াছে। বেদে যাহা বীজরূপে, উপনিষদ ও ইতিহাস (রামায়ণ, মহাভারত) পুরাণাদিতে তাহা উক্ত ত্রিবিধ ধারায় প্রচুরতর বৈশিষ্ট্যে বিশ্লেষিত হইয়াছে। যিনি যে ধারাশ্রয়ে অগ্রসর হইবেন, তিনি তাহাতেই সফলকাম হইবেন এবং সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ লাভে ধন্য ও কৃতার্থ হইবেন। ইহাতে কোনও সংশয় বা সন্দেহ নাই। আমার মনে হয়, পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের 'যত মত তত পথ' মহাবাক্যের ইহাই সুদৃঢ় ভিত্তি।

সূর্যস্মরণ

'অবধূত চট্টোপাধ্যায়'

হে সবিতা! ভর্গদেব! ওহে বিবস্বান্!
মর্তের অমরশিশু আমি করি ধ্যান
তোমার দ্যুতির।

হে তেজগম্ভীর
উদিত আদিত্য!
তোমার যে দিব্যজ্যোতি প্রতি নিত্য
অনুস্যূত হয়ে সারা মহাকাশময়
সৃষ্টিরূপে প্রকাশিত হয়,
বরেণ্য তোমার সেই অপূর্ব আলোক
আমার বুদ্ধির সদা প্রবর্তক হোক্!!

ভাগবত-ধর্ম *

ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

ভাগবত-ধর্মের ভিত্তি প্রধানতঃ ভাগবত-গ্রন্থ।[1] ভাগবতগ্রন্থের আরম্ভ 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই বাক্য লইয়া। বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় সূত্র 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'। ইহাতে বুঝা যায় ভাগবতগ্রন্থ বেদান্তভিত্তিক। ভাগবতগ্রন্থকে বেদবৃক্ষের গলিত ফল বলা হইয়াছে। বেদের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র গায়ত্রী। ভাগবত সেই গায়ত্রী মন্ত্রের ভাষ্যস্বরূপ, এই কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং ভাগবত-ধর্ম বুঝিতে হইলে বেদান্তের সঙ্গে পরিচয় আবশ্যক।

বেদান্ত বেদের নির্যাস। সনাতন বেদ হিন্দু-জাতির মূল ধর্মশাস্ত্র। হিন্দুধর্মের যত কিছু ধর্ম-তত্ত্ব, জীবনাদর্শ, তাহার মূল বেদ। বেদান্তের বার্তা বিশ্বমানবের জন্য। নিখিল বিশ্বের নর-নারীকে বেদান্ত ডাকিয়াছেন মধুময় আহ্বানে—শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।— হে অমৃতের পুত্রগণ শোন। বেদান্ত আমাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন—'অমৃতের পুত্রগণ', এই সম্বোধন করিয়া।

তথাপি আমাদের সকলেরই জীবনে দুঃখ আছে। এই দুঃখ কেহই চাহে না। সংসারের সকল নরনারীরই একটি জপমন্ত্র 'দুঃখং মে মা ভূৎ সুখং মে ভূয়াৎ' —যেন দুঃখ না পাই, যেন সুখে থাকি। দুঃখের গ্রাহক নাই। প্রত্যেকটি মানুষই সুখার্থী, অথচ দিনরাত সুখ সুখ করিয়া সুখের

---

* ১৯৭৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'জ্ঞানেন্দ্র নাথ পাল'-স্মারক বক্তৃতামালা। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।—সঃ

১ ভাগবত-ধর্ম বহু প্রাচীন। ইহার ভিত্তি কবে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা বলা কঠিন। লেখক নিজেই লিখিয়াছেন: 'ভাগবত-ধর্মের প্রাচীন নাম পাঞ্চরাত্র-মত বা সাত্বত মত। ভাগবত-ধর্মের প্রথম প্রবর্তক নারায়ণ ঋষি। মহাভারতের নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ে ইঁহার কথা আছে।'

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে হেলিওদোরস্ (Heliodorus) নামে একজন গ্রীক ভাগবত-ধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি তক্ষশিলারাজ গ্রীক অন্তিঅলিকিত (Antialkidas)-এর রাজদূত হিসাবে বিদিশার রাজা ভাগভদ্রের রাজসভায় প্রেরিত হন এবং ভাগভদ্রের রাজ্যের চতুর্দশ বর্ষে মধ্যপ্রদেশের বেশ-নগরে একটি গরুড়-ধ্বজ-স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া তাহাতে ভাগবত-ধর্মে তাঁহার দীক্ষা-গ্রহণের কথা ও ভাগবত-ধর্ম বলিতে যে (১) দম (২) ত্যাগ ও (৩) অপ্রমাদ বুঝায়, ইহা উৎকীর্ণ করেন। লক্ষণীয় যে, দম ত্যাগ ও অপ্রমাদ এই শব্দত্রয় মহাভারতেরই কথা। পরবর্তী কালে ভাগবত-ধর্ম বিশাল আকার ধারণ করে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার পূর্ণ বিকাশ ঘটে, বিশেষতঃ একাদশ স্কন্ধের নবযোগীন্দ্র-সংবাদে। গীতায় (রচনাকাল: রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের মতে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের প্রারম্ভের পরে নহে।) ভাগবত-ধর্ম যাহা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, ভাগবতে তাহাই বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইল: শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থটি কোন্ সময়ে রচিত? এ-বিষয়ে মতভেদ আছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে বোপদেব কর্তৃক উহা রচিত হইয়াছিল, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের এই মত বর্তমানে অনেকেই স্বীকার করেন না। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে উহার রচনাকাল সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় নবম শতক বা তাহারও পরে। পুরাণ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ডঃ রাজেন্দ্র হাজরার মতে মূল পুরাণটি সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল এবং পরে উহাতে অনেক অংশ সংযোজিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ভাগবতের রচনাকাল নির্ধারিত না হইলে, 'ভাগবত-ধর্মের ভিত্তি প্রধানতঃ ভাগবত-গ্রন্থ', এই উক্তির সহিত অনেকেই একমত হইবেন না। যাঁহাদের এইরূপ ধারণা যে, একই ব্যক্তি মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত-সমেত যাবতীয় পুরাণগ্রন্থের রচয়িতা, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।—সঃ

পিছনে ছুটিয়াও কেহ সাক্ষ্য দিতেছে না যে, সে খুব সুখে আছে।

বেদ বলেন, মানবীয় চেষ্টায় দুঃখ কিছু কমিবার নয়। কিছু কমে সাময়িকভাবে, আংশিকভাবে। শ্রুতি বলেন, আমার কথা যদি শোন, তাহা হইলে আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি হইবে। সকল দুঃখ যাইবে একেবারেই। বেদ দুঃখের কারণ বাহির করিয়াছেন ও দূরীকরণের উপায় বলিয়াছেন। দুঃখের কারণ অল্পে সুখানুসন্ধান। কিন্তু বেদ বলেন: 'যদ্বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি'— অল্পে সুখ নাই। ভূমাই সুখ। ভূমার সন্ধানই করিতে হইবে। ভূমার সঙ্গে যুক্ততায় সুখের উদয়, দুঃখের নিবৃত্তি। দুঃখের মূল কারণ অল্পতা, ক্ষুদ্রতা। মানব যে দুঃখী তাহার কারণ এই যে, সে নিজেকে বড় ছোট করিয়াছে, অত্যন্ত গণ্ডীবদ্ধ করিয়াছে। সংকীর্ণতা, সীমাবদ্ধতা সকল দুঃখের জনক।

মানব, তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তুমি হয়ত একটি পাড়ার নাম কর। তুমি যখন পাড়ায় জন্মিয়াছ তখনই একটি জেলায় একটি প্রদেশে বা একটি দেশে বা পৃথিবীতে জন্মিয়াছ। তুমি একটা পল্লী-সচেতন না হইয়া একটা দেশ-সচেতন হইতে পার। দেশ-সচেতন না হইয়া বিশ্ব-সচেতন হইতে পার। নিজেকে বড় করিয়া দেখ— নিজেকে বিশ্ববাসী বলিয়া ভাবো।

নিজেকে যত ছোট করিয়া দেখিবে, ততই দুঃখে ডুবিবে। যত বড় করিয়া জানিবে, ততই দুঃখের মাত্রা কমিয়া গিয়া সুখের উদয় হইবে। আমরা স্বরূপতঃ বড়ই আছি, কিন্তু বড় চেতনায় সজাগ নাই। নিজেকে বড় করিয়া জানিবার উপায় বড়র সঙ্গে যুক্ত হওয়া। তুমি যত বড়র সঙ্গে যুক্ত হইবে তত বড় হইবে।

যিনি সর্বাধিক বড়,— বৃহত্তম, তিনি ভূমা। ভূমার সঙ্গে যুক্ত হইলেই ভূমা হইবে। ভূমাই সুখের নিলয়, ভূমাতেই দুঃখের নিবৃত্তি। সুতরাং দুঃখী জীবের জানিবার বস্তু - জিজ্ঞাসা করিবার বিষয় শুধু ভূমা।

ভূমার অপর নাম ব্রহ্ম। বৃহত্বাদ্ ব্রহ্ম। যিনি সবচেয়ে বড়, যাঁহার বৃহত্তা সর্বাতিশায়ী, তিনি ব্রহ্ম। শুধু তাহাই নহে। ব্রহ্ম শুধু বড়ই নহেন। তিনি অপরকেও বড় করেন। বৃংহণত্বাদ্ ব্রহ্ম। যিনি আসেন ব্রহ্মের সংস্পর্শে, তিনিও বড় হইয়া যান। ব্রহ্মের কথা বলিলে, ভাবিলে, ধ্যান করিলে, অনুধাবন করিলে, বড় হওয়া যায়। বড় হইলেই দুঃখ যায়।

এই ব্রহ্মের সংবাদ লইয়াই ব্রহ্মসূত্র। ব্রহ্মসূত্রের অপর নাম বেদান্তসূত্র। ইহা ভারতীয়-দর্শন সমূহের শিরোমণি। বেদান্ত-দর্শন একত্বের দর্শন। একত্ব-দর্শনই বেদান্ত-দর্শনের মুখ্য তাৎপর্য। যিনি একত্ব অনুভব করেন, তাঁহার আর শোক তাপ দুঃখ থাকে না। 'তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।'

ব্রহ্মসূত্রে ৫৫৫টি সূত্র আছে। প্রথম সূত্র: 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'— আসুন ব্রহ্মের কথা বলি। কাজকর্মের শেষে যদি কিছু অবকাশ পাইয়া থাকেন— আসুন সবচেয়ে যিনি বড়, তাঁহার কথা আলোচনা করি।

ব্রহ্ম বস্তুটি কি, ইহা লইয়া দ্বিতীয় সূত্র। এই নিখিল বিশ্ব-সংসারের সৃষ্টিস্থিতিলয় যাঁহা হইতে হয়, তিনিই ব্রহ্ম। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ।' 'জন্মাদি' — জন্ম স্থিতি পরিণতি। 'যতঃ' যাঁহা হইতে— তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্মতত্ত্ব লইয়া প্রধানতঃ দুইটি ধারার উদ্ভব হইয়াছে। একটি জ্ঞানীদের, অপরটি ভক্তদের। ভক্তদের ভাবনার ধারাই ভাগবত-ধর্ম

ব্রহ্মবস্তুর মধ্যে কোন ক্রিয়া আছে কিনা মুখ্যতঃ ইহা লইয়া জ্ঞানী ও ভক্তদের মধ্যে মতভিন্নতা দৃষ্ট হয়। জ্ঞানবাদীরা মনে করেন যে,

অপূর্ণ বস্তুরই ক্রিয়া থাকে। যদি ব্রহ্মবস্তুতে ক্রিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্ম অপূর্ণত্ব-দোষযুক্ত হন। ক্রিয়ার প্রকাশ গতিতে। যার গতি আছে সে পূর্ণ নয়। সুতরাং পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্মে কোন গতি নাই— সুতরাং কোন ক্রিয়ার কর্তৃত্ব নাই। যাঁহাতে ক্রিয়ার কর্তৃত্ব নাই, তিনি সৃষ্টি-কর্তা হইতে পারেন না ; অথচ বেদান্ত বলিতেছেন — সৃষ্টি স্থিতি লয় যাঁহা হইতে হইতেছে তিনি ব্রহ্ম। সুতরাং জ্ঞানবাদীদের মতে নিখিল সৃষ্টি ব্রহ্মের বিবর্ত বা ব্রহ্মের অধিষ্ঠানে 'ভান' মাত্র।

বিবর্ত কথাটির অর্থ কি? অন্ধকার পথে একগাছি রজ্জু দেখিয়া আপনি তাহা সর্প মনে করিয়া ভীত হইয়াছেন। সর্পকে রজ্জু সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু এই সৃষ্টিতে রজ্জুর কোন ক্রিয়াকারিত্ব নাই। এইরূপ সৃজনকেই বেদান্ত বলেন বিবর্ত। সর্পটি সত্য না হইয়াও সত্যের ভান (appearance) হয়। ভানের ভিত্তিটিকে বলে অধিষ্ঠান। সত্য রজ্জুর অধিষ্ঠানে মিথ্যা সর্পের ভান। ঠিক সেইরূপ ব্রহ্মের উপর জগতের ভান হইতেছে। জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত। মিথ্যার বাধ হয়। সত্যের কখনও বাধ হয় না। সত্যজ্ঞান আসিলে মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হয়। আলো আসিলে রজ্জুটি দৃষ্ট হইলে, সর্প আর থাকে না। রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্তে রজ্জুর যে স্থান, ব্রহ্মের সেই স্থান এবং সর্পের যে স্থান, তাহা জগতের স্থান। এই কথাকেই সংক্ষেপে বলা হয় 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'।

জ্ঞানবাদীর এই মত। ভক্তিবাদীরা অর্থাৎ ভাগবত-ধর্ম ইহা স্বীকার করে না। জ্ঞানবাদীর মতে ব্রহ্ম স্থির স্থাণু অচল বস্তু। ইহা গতিহীন, ক্রিয়াহীন। ভাগবত-ধর্ম এই মত অগ্রাহ্য করেন। ভক্তিবাদিগণের মতে ব্রহ্মবস্তু গতিশীল ক্রিয়াশীল একটি Dynamic জীবন্ত সত্তা। ভক্তিবাদী বলেন : যাহার ক্রিয়া নাই, কাজ নাই, গতি নাই — সে অচেতন বা মৃত। ব্রহ্মবস্তু চৈতন্যময়। সুতরাং ব্রহ্ম স্বভাবতই ক্রিয়াযুক্ত। 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ'। ক্রিয়াটি শক্তির পরিচায়ক। ভক্তিবাদীর মতে ব্রহ্ম শক্তিমান। জ্ঞানবাদীর মতে ব্রহ্ম নিঃশক্তিক।

ভাগবতধর্ম-মতে বিশ্ব-সৃষ্টি ব্রহ্মেরই কার্য বিশ্বের মূল উপাদান প্রকৃতি - ব্রহ্মেরই শক্তি। সৃষ্টি প্রকৃতির পরিণতি – বিবর্ত নহে। পরিণতি হইলেও, ব্রহ্ম পরিণামী বা বিকারী হন না। দেহস্থিত কেশলোমাদির মত। কেশলোমের পরিবর্ধনে পরিবর্জনে দেহী যেমন বিকারগ্রস্ত হন না স্পর্শমাত্র লৌহকে সুবর্ণ করিয়াও স্পর্শমণি যেমন বিকারী হয় না, তদ্রূপ।

ভাগবতধর্ম-মতে সৃষ্টির উপাদান ব্রহ্মেরই অপরা শক্তি। ইহা ভিন্ন জীবশক্তি নামে ব্রহ্মের আর এক শক্তি আছে – গীতার পরিভাষায় 'পরা প্রকৃতি'। অপরা প্রকৃতির পরিণাম পরা প্রকৃতির ভোগের জন্য। জীবশক্তির অনাদি-সঞ্চিত কর্ম-ফলগুলির ভোগের জন্য প্রকৃতির পরিণতি ঘটিয়া বিশাল প্রপঞ্চ প্রকটিত হয়।

ভাগবতধর্ম-মতে ব্রহ্ম নিয়ন্তা, জীব ও জগৎ নিয়ম্য। জীব চিৎস্বরূপ ভোক্তা, অচিৎ জগৎ ভোগ্য— ব্রহ্ম উভয়েরই নিয়ন্তা। সুতরাং ব্রহ্ম সত্য, জগৎ ও জীবও সত্য— ব্রহ্মের অধীনে সত্য। জ্ঞানী জগৎকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন, ভক্ত জগৎকে ব্রহ্ম হইতে পৃথগ্‌রূপে ব্রহ্মের নিয়ম্যরূপে দর্শন করেন। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গিই স্বতন্ত্র। ইহা বুঝিলেই ভাগবত-ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য জানা হইল।

ভাগবতীয়দের চিন্তাধারা তিন ভাগ করিয়া অনুশীলন করিতেছি। প্রথম বৈদিক যুগ হইতে আচার্য রামানুজ পর্যন্ত— ইহা প্রাচীন যুগ। আচার্য রামানুজ হইতে বল্লভাচার্য পর্যন্ত মধ্য যুগ। মহাপ্রভু হইতে বর্তমান যুগ চলিতেছে।

ভাগবত-ধর্মের প্রাচীন নাম পাঞ্চরাত্র মত বা সাত্বত মত। বর্তমানে ইহার চলতি নাম বৈষ্ণব ধর্ম। ভাগবত-ধর্মের প্রথম প্রবর্তক নারায়ণ ঋষি। ইনি নারায়ণের অবতার। মহাভারতে নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ে ইহার কথা আছে। ইনি প্রথমে দেবর্ষি নারদকে এই পাঞ্চরাত্র-ধর্ম উপদেশ দেন। পাঞ্চ-রাত্র নামের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত আছে। কেহ কেহ বলেন, সত্যযুগে কেশব ব্রহ্মাকে পাঁচ রাত্রি ধরিয়া উপদেশ দান করেন। অপরে বলেন, ঐ উপদেশ তিনি পাঁচ জনকে দিয়াছিলেন। এইজন্য পাঞ্চরাত্রে পাঁচ ভাগ ও পাঁচ লক্ষ শ্লোক। ভাগগুলির নাম ব্রহ্মরাত্র শিবরাত্র ইন্দ্ররাত্র ঋষি-রাত্র ও রুদ্ররাত্র। ইহার অন্য নাম সাত্বত মত। শ্রীকৃষ্ণ যে যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশে সাত্বত নামক একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার নামানুসারেই উক্ত নামকরণ। পাঞ্চরাত্র মত এই বংশে বেশী প্রচলিত ছিল।

এই ধর্ম নারায়ণ ঋষির নিকট লাভ করেন নারদ। নারদ দেন ব্যাসদেবকে। ব্যাসদেব দান করেন শুকদেবকে ও মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে। আবার অন্যত্র আছে, নারায়ণ ঋষি দেন বিবস্বান্‌কে, বিবস্বান্ দেন মনুকে, মনু দেন ইক্ষ্বাকুকে। সেই ধারার কথাই শ্রীকৃষ্ণ বলেন অর্জুনকে গীতায় ও অনুগীতায়। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকেও এই ধর্ম উপদেশ দেন। এই ধর্ম আবার বেদব্যাস দেন বৈশম্পায়নকে এবং তিনি দেন জনমেজয়কে। এই ধারা মহাভারতে কীর্তিত। এই ধর্মের পরবর্তী নাম বৈষ্ণব ধর্ম। বৈষ্ণব শব্দ বেদে পাওয়া যায় না। বেদে 'বিষ্ণু'-শব্দের অর্থ যজ্ঞ। এই অর্থে যজুর্বেদে 'বৈষ্ণব'-শব্দ আছে। পদ্মপুরাণে বৈষ্ণবের সংজ্ঞা আছে—একমাত্র বিষ্ণুই যাঁহার শ্রোতব্য কীর্তনীয় পূজ্য আরাধ্য, তিনিই বৈষ্ণব। মহাভারতে বৈষ্ণবদের 'একান্তী' বলা হইয়াছে। যাঁহার চিত্তবৃত্তি একটি বিষয়ে অর্থাৎ ঈশ্বরে অন্ত বা সমাপ্তি প্রাপ্ত—অভিনিবিষ্ট, তিনি একান্তী, তিনি বৈষ্ণব।

বিশ্বের সৃষ্টি-রহস্য ও ধর্মের সাধনাদি সম্বন্ধে বৈষ্ণবগণের সকলেরই প্রায় একই মত। এই মত গীতায় সুব্যক্ত। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—একই পরতত্ত্বের তিন নাম— ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে যিনি ব্রহ্ম, যোগীর দৃষ্টিতে তিনি আত্মার অন্তর্যামী পরমাত্মা এবং ভক্তের দৃষ্টিতে তিনি ভগবান। ভাগবতের এই দৃষ্টিভঙ্গি সাম্প্রদায়িক ভাবের অনেক উর্ধ্বে।

ভক্তের ভগবানের স্বরূপ শ্রীগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন। 'আমি সমগ্র জগতের প্রভব এবং প্রলয়।' 'আমি জগতের পিতা মাতা ধাতা পিতামহ গতি ভর্তা প্রভু সাক্ষী শরণ ও সুহৃদ।' 'আমি প্রভব প্রলয় স্থান নিধান ও অব্যয় বীজ।' 'আমি ভূতবর্গের আদি অন্ত ও মধ্য।' ইহাতে বুঝা গেল ভগবান বিশ্ববীজ বিশ্বরূপ ও বিশ্বমূর্তি। তাঁহা হইতে ব্যতিরিক্ত [illegible] অচর কেহ বা কিছুই নাই। তাঁহার ব্যক্ত-রূপ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ-রূপ মায়িক। তাঁহার ইন্দ্রিয়াগোচর অপ্রাকৃত স্বরূপ অক্ষয় অব্যয়। 'আমার পরম ভাবকে না জানিয়াই বুদ্ধিহীন নরনারী অব্যক্ত আমাকে ব্যক্তভাবাপন্ন মনে করে।' 'আমি যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত বলিয়া সকলের নিকট প্রকট নহি। মূঢ় লোক জানে না যে, আমি অজ ও অব্যয়।' 'অব্যক্তস্বরূপ আমা দ্বারা সর্ব জগৎ ব্যাপ্ত।' 'সর্ব ভূতবর্গ আমাতে স্থিত। আমি উহাদিগেতে স্থিত নহি।' 'আমার আত্মা ভূতভাবন, কিন্তু ভূতস্থ নহেন।' 'আমি ক্ষর ও অক্ষরের অতীত। আমি পুরুষো-ত্তম।' 'আমি ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা। শাশ্বত ধর্ম ও ঐকান্তিক সুখ আমাতেই স্থিত।'

ঈশ্বরের এই অপ্রাকৃত স্বরূপতত্ত্বসমূহ সম্বন্ধে বৈষ্ণবগণের মোটামুটি একই মত। এতদ্ব্যতীত

তাঁহাদের জীবন-দর্শনও মোটামুটি একই রূপ। 'বাসুদেবই সকল'—ইহাই সর্বোচ্চ জ্ঞান। তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যিনি সর্বদা এই পরম জ্ঞানে সুস্থিত। ভাগবত-ধর্মের জীবন-দর্শনের সার কথা হইল ঈশ্বরার্থে সকল কর্ম করা। ভক্ত সাধক শরীর বাক্য মন ইন্দ্রিয়সমূহ ও বুদ্ধিসহায়ে যাহা কিছু কায করিবেন সমস্তই ঈশ্বরার্থে করিতেছি, মনে করিয়া ঈশ্বরে সমর্পণ করিবেন। 'তদর্থেঽখিল-চেষ্টিতম্।' ভাগবত-ধর্মের সাধক এইরূপ ভাবনা করিবেন যে, শ্রীভগবান বাসুদেব তাঁহার এই এই কর্ম করিবার ভার আমার উপর অর্পণ করিয়াছেন। আমি তাঁহারই ভৃত্য, তাঁহার নির্দেশানুসারে তাঁহার কর্ম করিতেছি মাত্র—নিজ প্রয়োজনে কিছুই করিতেছি না; আমি আমার নিজের জন্য যাহা করিতেছি, তাহাও প্রকৃত পক্ষে তাঁহারই কর্ম। কারণ, আমি তাঁহারই। ইহাই ঈশ্বরার্থে কর্ম করা।

গীতা প্রথমে বলিয়াছেন, ফল কামনা না করিয়া কর্তব্যবুদ্ধিতে কর্ম কর। তাহার পর বলিয়াছেন, কর্ম কর, করিয়া তাঁহাকে অর্পণ কর। তাহার পর বলিয়াছেন, আগে নিজেকে তাঁহাকে অর্পণ করিয়া তুমিই তাঁহার হইয়া যাও—তাহার পর তিনি যাহা করান তাহাই কর। প্রথমে বলিয়াছেন স্বধর্মবুদ্ধিতে কর্ম কর। তাহার পর 'তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্'—কর্ম করিয়া উহা আমাকে অর্পণ কর। সর্বশেষ 'মামেকং শরণং ব্রজ'—আমার হইয়া যাও। আমিই সব করি, তুমি নিমিত্ত মাত্র হও।

স্বধর্মবুদ্ধিতে কর্ম করার অর্থ বর্ণাশ্রম-নীতি অনুসারে যাহার যাহা নির্দিষ্ট কর্তব্য তাহা করা। সেই কর্মও ভগবানের অর্চনা-বুদ্ধিতে করিতে হইবে। কর্মের ছোট বড় নাই, কি উদ্দেশ্যে—অন্তরে কি ভাব লইয়া—কর্ম করা হইতেছে, তাহাই আসল কথা।

ব্রাহ্মণ যদি তাঁহার পূজাদি কর্ম উদর-পূর্তির জন্য করেন, তবে তাহা হীন কর্ম। ঝাড়ুদারও যদি তাহার কর্ম ভগবদর্চনা-বুদ্ধিতে করে, তবে তাহাতেই তাহার সিদ্ধিলাভ হইবে। 'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।' ভাগবত-ধর্ম বর্ণাশ্রম স্বীকার করেন, কিন্তু সকল কর্ম সেবা-বুদ্ধিতে করিবার উপদেশ দেন। ভাগবত-শাস্ত্র বলেন যে, যাহারা বিদ্যাহীন তাহারাও যাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে, সেইজন্য ভগবান সুনিশ্চিতভাবে যে-সকল সাধন-ভজনের কথা বলিয়াছেন, তাহাই ভাগবত-ধর্ম। এই ধর্ম অবলম্বন করিলে কখনও প্রমাদগ্রস্ত হইতে হয় না। চক্ষু বুজিয়া দৌড়াইলেও এই ধর্ম-পালনকারী ভক্ত-সাধকের পদস্খলন হইবে না। আমি তাঁহারই পদাশ্রিত—আমি তাঁহারই করস্থিত যন্ত্রতুল্য। তিনি প্রতিমুহূর্তে যাহা করাইতেছেন, তাহাই করিতেছি, এই বুদ্ধি যাঁহার চিত্তে সর্বদা জাগরূক - সত্য সত্যই সংসার-পথে চক্ষু বুজিয়া ছুটিলেও তাঁহার কখনও আছাড় খাইয়া পতিত হইবার ভয় নাই।

ভাগবত-ধর্মের আর একটি অভিনবত্ব—অবতারবাদ। ভগবান আসেন মানব-সমাজের মধ্যে। এই মত ইসলাম-ধর্মাবলম্বিগণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, তিনি নিজে আসেন না আসিতে পারেন না—তাঁহার প্রেরিত লোক পাঠান। তাহাও পাঠানো শেষ হইয়াছে। শেষ নবী আসিয়া গিয়াছেন।

খৃষ্টান ধর্মে বলা হয়—ঈশ্বর তাঁহার পুত্রকে একবার মাত্র পাঠাইয়াছিলেন—আর পাঠাইবেন না। মানুষ ভগবানের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া স্বর্গ-ভ্রষ্ট হইয়াছিল। সেই স্বর্গকে আবার পাইবার পথ করিয়া দিতে—মানুষ ও ভগবানের মধ্যে, আজ্ঞালঙ্ঘন-জনিত যে বিরাট ব্যবধান হইয়াছিল, তাহা দূর করিয়া দিতে—ঈশ্বরের পুত্র আসিয়া

ক্রুশে আত্মদান করিয়াছেন। তাঁহার সেই আত্মদান দ্বারাই পুনঃ স্বর্গপ্রাপ্তির পথ সুগম হইয়াছে। তাঁহার আত্মদান একটি সেতুস্বরূপ হইয়া ঈশ্বরভ্রষ্ট মানুষকে আবার তাঁহার নিকট সহজে যাইবার নিশ্চিত উপায় করিয়া দিয়াছে। এই ঘটনা একবারই হইয়াছে, আর হইবে না।

হিন্দুধর্মের মধ্যে শৈব শাক্ত সৌর ও গাণপত্য মতাবলম্বিগণ, বৌদ্ধ ও শিখগণ, ব্রাহ্ম-সমাজ ও আর্য-সমাজ—ইঁহারা অবতারবাদের বিরোধিতা না করিলেও নিষ্ঠার সহিত কোন অবতারকে নিজ নিজ সাধন-পথের সহায়ক বলিয়া গ্রহণ করেন না। *একমাত্র ভাগবত-ধর্মই অবতারবাদকে* বিশেষ নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করিয়াছে। অবতারবাদই এই ধর্মকে সুদৃঢ় করিয়াছে। পরবর্তী গৌড়ীয় মতে দেখা যায় যে, একমাত্র অবতারবাদের ভিত্তিতেই ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত। অবতার না মানিলে ইহার ভিত্তিই যেন ধসিয়া যায়।

অবতারবাদের মূল তাৎপর্য এই যে, আমার জীবনের ও সমাজের দুর্দশার জন্য আমিই চিন্তিত নই, তিনিও ব্যথিত হইয়া কল্যাণের জন্য নামিয়া আসেন। কেবল একবার আসেন নাই, সাত সহস্রবার আসিয়াছেন ও আরো আসিবেন। ভাগবত বলিয়াছেন 'অবতারাহ্যসংখ্যেয়াঃ।'

মানুষকে বলা হইয়াছে সাধন ভজন উপাসনা করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে। ভাগবত বলেন, তোমার তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবার সামর্থ্যাভাব দেখিয়া তিনি তোমার মঙ্গলের জন্য নামিয়া আসিয়াছেন। তুমি তাঁহার কাছে যাইতে পার না দেখিয়া তিনি তোমার কাছে আসিয়াছেন। যাহাতে তুমি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে পার, ভালবাসিতে পার, সেইজন্য তিনি তোমার নিকটতর হইয়াছেন।

ভগবান অবতাররূপে আসিয়া নিজ জীবনের আচরণ দ্বারা এমন সব উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করেন, যাহার আলোকে লোক শত শত বৎসর ধরিয়া পথের সন্ধান পায়। শ্রীরামচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা পিতৃভক্তি, লক্ষ্মণ ও ভরতের ভ্রাতৃভক্তি, সীতাদেবীর পতিভক্তি, হনুমানের প্রভুভক্তি—সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া মানবের যাত্রাপথে উজ্জ্বল বর্তিকা হইয়া রহিয়াছে।

গৌড়ীয় মতের দৃষ্টিতে ভগবান শুধু মানবের কল্যাণের জন্য অবতরণ করিয়া নিস্পৃহভাবে কর্ম করেন না—প্রেমের সহিত মানুষকে ভালবাসিয়া কর্ম করেন। জীবের দুর্গতি দেখিয়া তিনি অশ্রুবর্ষণ করেন। 'উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে প্রভু জীবের লাগিয়া।' যাঁহারা ইহা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের অন্তরে এক অভাবনীয় ঈশ্বরপ্রেমের উদয় হয়। তাঁহার করুণায় তাঁহাদের জীবন ভরপুর হইয়া যায়।

শ্রীভগবানকে অবতাররূপে নিজ জন করিয়া পাইবার ফলে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম যে কত উজ্জ্বল হইয়াছে, তাহা পরবর্তী ভাষণে বলিব।

ভাগবত-ধর্মের প্রাচীন স্বরূপ বলা হইল। মধ্য যুগের কথা ও বর্তমান যুগের কথা পরবর্তী প্রবন্ধে বলিব। তৃতীয় নিবন্ধে ইসলামের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করিব। [ক্রমশঃ]

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥ —শ্রীমদ্ভাগবত

যাঁহার নাম অবশেও উচ্চারণ করিলে পাপরাশি বিনষ্ট হয়, সেই হরি স্বয়ং প্রণয়পাশে বদ্ধপদ হইয়া যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না, তিনিই ভাগবত-শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত।

একমেবাদ্বিতীয়ম্

শ্রীমতী মানসী বরাট

সুন্দর তুমি শান্ত স্নিগ্ধ, রুদ্র ভীষণ তুমি ভয়াল,
নিষ্ঠুর তুমি, নিরদয় তুমি, করুণাময় গো তুমি দয়াল।
নির্গুণ তুমি, সগুণশ্রেষ্ঠ, তুমি হে আধেয়, তুমি আধার,
তুমিই জ্ঞান, তুমি অজ্ঞান, তুমি বিজ্ঞান, জ্ঞানের পার।
নিখিল বিশ্ব ধারণা করিতে পারে না তোমারে সীমার মাঝ ;
সেই তুমি যে গো সীমায়িত হ'য়ে ধূলিকণাতেও কর বিরাজ
যে তুমি রাজিছ ভক্ত-হৃদয়ে স্তিমিত যেমন উদয়-ভানু,
সেই তুমি তেজে দীপ্ত সূর্য দগ্ধিতে পার জীব-জীবাণু।
বিপদ তুমিই বিপদ-বারণ, বিপথ তুমিই, তুমিই পথ,
হৃদয়-গুহাতে আত্মরূপেতে রথী সে তুমিই, তুমিই রথ।
দুঃখদাহের দাবাগ্নি তুমি, রোগ ও শোকের তপ্ত মরু,
নিভাতে বহ্নি তুমিই বারিধি, তুমি যে গো মোর কল্পতরু।
পূজিবে বল কে, কি দিয়া কাহারে ? বুঝিতে পারি না কোনমতেই
পূজা পূজক পূজোপকরণ, লভে যে জনম তোমা হতেই।

তমসার শেষে

শ্রীমোহিনী মোহন গাঙ্গুলী

তুমি যে তোমার আলোক-কিরণে চিত্ত ভরালে মম
হৃদয়-তীর্থে নিত্য তোমারে হেরি ওগো প্রিয়তম।
অঙ্গে আমার রোমাঞ্চ তুলি
মুছে দাও প্রিয় যত কালি ধূলি
যত অপরাধ সবই করুণায় তুমি যে নিত্য ক্ষম॥
মূলাধারে তুমি তোল কলতান সে সুর সহস্রারে—
অনাহতে নিতি মুক্ত ছন্দে অবিরত ঝঙ্কারে।
তোমার আলোকে নিত্য ছন্দে
অন্তর মোর ভরে আনন্দে
প্রেম-নিকুঞ্জে এ হৃদয় ধায় উল্লাসে অভিসারে॥
তোমাকে চেয়েছি তোমাকে পেয়েছি তৃপ্ত হৃদয় মোর—
তুমিই এনেছ তমসার শেষে সোনালী উষার ভোর॥

'মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না'

স্বামী বলরামানন্দ

উত্তরার্ধ

(১)

পূর্বার্ধে শ্রীরামকৃষ্ণকথিত ব্যাখ্যার আলোকে আমরা এই পদ্যাংশের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। এখন সেই ব্রহ্ম-সিংহের শাবক পঞ্চভূতরূপী মেষের পালে পড়িয়া কি ভাবে ভ্যা ভ্যা করিয়া কাঁদে, তাহা শ্রীশ্রীঠাকুরেরই অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীকৃত ব্যাখ্যা অনুসারে একটু আলোচনা করিব। তিনি তাঁহার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ নামক গ্রন্থে[১] তোতাপুরীর শুদ্ধ ও সরল মনের সহিত সাধারণ সাধকের বাসনাকলুষিত অবাধ্য মনের তুলনা করিতে যাইয়া উপরোক্ত পদ্যাংশই কিন্তু অন্যভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন; যাহার ফলে উহার ব্যাখ্যা শ্রীরামকৃষ্ণকথিত ব্যাখ্যা হইতে একটু অন্যরকম হইয়া যায়।* ব্যাখ্যা যে রকমই হউক না কেন, আলোচনার পরে আমরা বুঝিব যে সাধকজীবনের পক্ষে উভয় ব্যাখ্যাই প্রয়োজনীয়।

(২)

পূর্বার্ধের আলোচনা পড়িয়া কোন সাধক হয়ত বলিবেন যে, যাঁহাদের মন তোতাপুরীর[২] বা স্বামী বিবেকানন্দের মনের ন্যায় শুদ্ধ ও সরল, তাঁহাদের জন্য পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা ঠিক হইতে পারে; কিন্তু আমাদের মত পাজী মনের জুয়াচুরিতে যাঁহারা রাত-দিন ত্রস্ত, সেই সব সাধকদের পক্ষে উহা কেবল কথার কথা। কেন না, সত্য ও বাস্তবিকতার মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য আছে। আমাদের ভাবের ঘরে শুধু চুরিই নয়, বরং ডাকাতি নিত্যই হইতেছে মন মুখ এক করা ত দূরের কথা! আমাদের মন তো বেশ বুঝিতেছে এবং অপরকেও যুক্তি-তর্ক-দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে পারিতেছে যে, ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য বস্তু—সংসার অনিত্য, মায়া, স্বপ্নবৎ; আমরা স্বরূপতঃ ব্রহ্মস্বরূপ; আমাদের ভিতরের সেই আত্মশক্তি সহস্র সহস্র দেবদূতের ন্যায় আমাদের ভগবান লাভে সাহায্য করিতে প্রস্তুত, আমরা সত্য-সত্যই ব্রহ্ম-সিংহ, ইত্যাদি; কিন্তু যখনই কোন সাংসারিক প্রলোভনের বা জীবনদ্বন্দ্বের সংঘর্ষে পড়ি, তখন সব ব্রহ্মজ্ঞান যেন কোথায় উড়িয়া যায়! আজ হয়তো অহংকারের দোলায় দুলিতেছি, কাল আবার কাম-ক্রোধাদির জ্বালায় পুড়িতেছি, পরশু হয়ত লোভ-মোহের জালে আবদ্ধ হইতেছি, এইরূপ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলিতেছে। তখন মনে হয়, কোথায় জ্ঞান, কোথায় ভক্তি, আর কোথায় আমি! মনে মনে ত বেশ বুঝি যে, ভগবান লাভই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য; ত্রিবিধতাপ ও জন্ম-মৃত্যুর গ্রাস হইতে বাঁচিতে হইলে স্ব-স্বরূপের সাক্ষাৎকারই একমাত্র উপায়। উহাই শাশ্বত সুখ, শাশ্বত শান্তি, শাশ্বত

---

১ গুরুভাব, পূর্বার্ধ, পৃঃ ২৭৭—৭৮ দ্রষ্টব্য।

* ব্যাখ্যার বিভিন্নতার কারণ—প্রসঙ্গের (Context) বিভিন্নতা। 'মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না' বাক্যটির মৌল অর্থের তাহাতে হেরফের হয় নাই। সাধারণতঃ বাক্যটি মস্তিষ্ক (Intellect) ও হৃদয় (Heart)—যুক্তিবিচার (Reason) ও আবেগ (Emotion or Impulse)-এর দ্বন্দ্বের দ্যোতক। প্রাবন্ধিক অবশ্য প্রাণকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—পূর্বার্ধে প্রাণকে কুণ্ডলিনী শক্তি, প্রত্যগাত্মা, পরমাত্মা ইত্যাদির সহিত সমীকরণ করা হইয়াছে। উত্তরার্ধে প্রাণকে বাসনা অর্থাৎ সংস্কার বলা হইয়াছে এবং মনোবিজ্ঞানের আলোকে প্রতিবর্ত-ক্রিয়া মোদনা ইত্যাদির দ্বারা প্রাণের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রাণের এইরূপ ব্যাখ্যা পূর্বার্ধেও প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়।— সঃ

২ ঐ দ্রষ্টব্য।

মুক্তি এবং অমৃতত্বের একমাত্র পথ, 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে' ইত্যাদি। অভিজ্ঞতার ফলেও বুঝিয়াছি যে, জগতের যাবতীয় ভোগসুখই 'অগ্রে অমৃতোপমং পরিণামে বিষমিব', 'যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে' ইত্যাদি; এবং যাহাতে বিবেক-বৈরাগ্য ও ভক্তি লাভ হয় সেরূপ চেষ্টাও করিতেছি; কিন্তু 'সংসারের পাপ-প্রলোভনাদির দিকে অতৃপ্ত লালসার কটাক্ষপাত' হইলেই এবং 'মন বাঁকিয়া দাঁড়াইলে ঐ পুরুষকার যে প্রবল প্রবাহের মুখে তৃণগুচ্ছের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যায়, আত্মনির্ভরতা ও আত্মপ্রত্যয়ের স্থলে যে আপনার ক্ষমতার উপর ঘোর অবিশ্বাস আসিয়া জীবকে সামান্য কীটাপেক্ষা দুর্বল করিয়া তুলে।'[৩] এইরূপ "'মন বুঝেছে, প্রাণ বোঝে না' এমন একটা অবস্থা যে মানবের হইতে পারে —'মন মুখ এক' করিতে না পারিয়া সে যে শত বৃশ্চিকের দংশনজ্বালা ভিতরে নিরন্তর অনুভব করিতে পারে—মনের ভিতর সহস্রটা কর্তা এবং শরীরের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়টা স্ব স্ব প্রধান হইয়া কেহ কাহারও কথা না মানিয়া চলিয়া তাহাকে যে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়া হতাশার অন্ধতামিস্রে ফেলিয়া ঘোর যন্ত্রণা দিতে পারে—"[৪] ইহা ত অধিকাংশ মানুষেরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। স্বামী সারদানন্দজীর ব্যাখ্যার আলোকে ইহাকেই বলে 'মন বুঝেছে কিন্তু প্রাণ বোঝে না।' আমাদের মন অর্থাৎ বুদ্ধির সাহায্যে ত আমরা সংসার এবং পরমার্থের সব কথাই পরিষ্কার বুঝি, কিন্তু আমাদের প্রাণ অর্থাৎ অশুভ-বাসনা-শক্তি তা বোঝে না।

(৩)

সুতরাং, প্রাণ কথাটির অর্থ, যে-শক্তির সহিত সাধককে ইষ্টলাভ হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম করিতে হয় সেই 'অশুভ বাসনাশক্তি'। ইহাও সেই প্রকৃতি বা মায়ারই শক্তি। ইহাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় 'আসুরী' নামে বর্ণিত। আমাদের চিত্তে নানা রকমের ভাল ও মন্দ সংস্কার আছে। দৈনন্দিন জীবনে অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয় প্রাপ্ত হইলে, কোন রকমের সার-অসার বিচার করিবার অবসর না দিয়াই নিমেষমাত্রে ভাল বা মন্দ বৃত্তি আমাদের চিত্তে উৎপন্ন হয়। এগুলি আমাদেরই জন্ম-জন্মান্তরে স্বেচ্ছাকৃত কর্মজনিত 'বাসনা'র অর্থাৎ সংস্কারের ফল।

আধুনিক মনোবিজ্ঞান অনুসারে ইহাকেই মস্তিষ্কের স্নায়ু-কোষ-শৃঙ্খলাগুলির উদ্দীপন (stimulus) ও তাহাদের প্রতিক্রিয়া (response) বলে। ইহা মানবের সু বা কু শিক্ষার (learning) ফলে হইয়া থাকে। এই উদ্দীপনা ইন্দ্রিয়-বিষয় সম্বন্ধ ছাড়াও অনেক প্রকারে হইতে পারে বলিয়া তাঁহারা বলেন।

(৪)

এই বাসনাগুলির বিষয়ে স্বামী সারদানন্দজী বলিয়াছেন, 'স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম অনন্ত বাসনাস্তরসমূহ উহার [মানব-মনের] ভিতরে বিদ্যমান রহিয়াছে, একটিকে যদি কোনরূপে অতিক্রম করিতে তুমি সমর্থ হইয়াছ, তবে আর একটি আসিয়া তোমার পথরোধ করিল…'[৫]। তিনি আরও বলিয়াছেন, 'সেখানে আছে কেবল সাধকের নিজ অন্তর ও তন্মধ্যস্থ জন্মজন্মান্তরাগত অনন্ত সংস্কার প্রবাহ। আছে কেবল… তল্লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য নিজ প্রতিকূল সংস্কার [বাসনা] সমূহের সহিত দৃঢ় সংকল্পপূর্বক অনন্তসংগ্রাম।'[৬] এই সব সংগ্রাম

---

৩ তদেব, পৃঃ ২৭৮-৭৯

৪ তদেব, পৃঃ ২৭৮-৭৯

৫ তদেব, সাধকভাব, পৃঃ ৩৩

৬ তদেব, পৃঃ ২৫২

হইতেছে নিজ প্রতিকূল বাসনাসমূহকে ক্ষয় করিবার জন্য, বা অবুঝ প্রাণকে বুঝাইবার জন্য।

(৫)

এইরূপ সংগ্রামে সাধক যাহাতে হতোৎসাহ না হন, এইজন্য এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া নবোদ্যমে সাধনায় প্রোৎসাহিত করিবার জন্যই যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝাইতেছেন, 'হে মহাবাহো মন যে দুর্নিবার ও চঞ্চল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু হে কৌন্তেয়, ধ্যানাভ্যাস এবং ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ভোগে বিতৃষ্ণার দ্বারা উহাকে সংযত করা যায়।'[৭] 'হে কুন্তীপুত্র, বিক্ষেপকারী ইন্দ্রিয়গুলি অতি যত্নশীল, মেধাবী (শাস্ত্রজ্ঞ) পুরুষের মনকেও বলপূর্বক বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করে।'[৮] 'বলবান ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান পুরুষকেও জোর করিয়া [বিষয়ের দিকে] টানিয়া থাকে।'[৯] তাহার কারণ, আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, 'ইন্দ্রিয়গুলি স্বভাবতই বিষয়াভিমুখী, ব্রহ্মাভিমুখী নহে।'[১০] শাস্ত্রোক্ত এইরূপ বাণী বিশেষতঃ যাঁহাদের প্রাণ বোঝে না তাঁহাদেরই উদ্দেশ্যে। অতএব সাধকের পক্ষে হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। কেননা, সকলেই জানেন যে, বিষয়গুলির সান্নিধ্যে (বা চিন্তার দ্বারা), যাঁহাদের মন বেশ বুঝিয়াছিল এমন বিদ্বান পুরুষদেরও, প্রাণের না বোঝার জন্য, স্মৃতিভ্রংশ হইয়া থাকে।

(৬)

এক্ষণে আমরা প্রাণের না বোঝার কারণ রাজযোগের[১১] আলোকে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

এই প্রাণ বা বাসনাশক্তির সহিত সংগ্রাম চালাইতে হইলে তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে, ইহাদের বাসস্থান যে অন্তঃকরণ তাহার সম্বন্ধেও বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক; যাহার ফলে সাধক শত্রুকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে। অতএব ভারতীয় মনোবিজ্ঞানের আলোকে ঐ বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন আছে।

নিখিল বিশ্বের পরিচালিকা শক্তিকে প্রাণ বলে। চিৎস্বরূপ আত্মাই এই প্রাণশক্তির পরিচালক বলিয়াই তাঁহাকে 'প্রাণভৃৎ' বলা হয়। জীবনের প্রত্যেকটি শক্তি এই প্রাণশক্তিরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। এই মহাশক্তি জীবের গর্ভাবস্থায় তাহার শিরোদেশ হইতে প্রবেশ করিয়া মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড এবং বিভিন্ন স্নায়ু-প্রণালী বা নাড়ীগুলির ভিতরে প্রবেশ করিয়া থাকে।* যোগ এবং তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে জীবাবস্থায় সেই প্রাণশক্তি-প্রবাহ ইড়া, পিঙ্গলা এবং অন্যান্য নাড়ীর ভিতরে বিশেষভাবে প্রবাহিত হয়। যোগিগণ প্রাণায়ামাদির দ্বারা এই স্নায়ুপ্রবাহের অন্যান্য পথ রুদ্ধ করিয়া, সুষুম্না-নাড়ীর মূলদেশে (মূলাধারে) স্থিত কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে উহাকে সেথায় কেন্দ্রিত করিয়া থাকেন। তাহার ফলে জাগ্রত কুণ্ডলিনী-শক্তি ক্রমে ক্রমে ঊর্ধ্বে উঠিয়া যখন সহস্রারে স্থিত পরমশিবের সঙ্গে মিলিত হয় তখন সেই ভাগ্যবান সাধকের সংসারের জ্বালা শেষ হইয়া যায়।

মনই প্রাণশক্তির বিশেষ অভিব্যক্তি। এই মন মানবের চেতন অবচেতন ও অতিচেতন—এই তিনটি স্তরে কার্য করিয়া জীবন পরিচালনা করে। চিন্তাশক্তি ইচ্ছাশক্তি আদি হইতে মানবমনের নিম্নতম শক্তি পর্যন্ত যাহা কিছু সব এই প্রাণ-

---

৭ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬।৩৫

৮ তদেব, ২।৬০

৯ মনুস্মৃতি, ২।২।১৪

১০ বেদান্তদর্শন, শাঙ্করভাষ্য, ১।১।২

১১ এবিষয়ের আলোচনা স্বামী বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' ও অন্যান্য যোগশাস্ত্রের গ্রন্থের সাহায্যে লিখিত।

* Bhavan's Journal, Aug. 19, 1973, p. 36 দ্রষ্টব্য।

শক্তির বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। সুতরাং, যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যানাদির দ্বারা 'ব্যুত্থানসংস্কার-প্রতিবন্ধী নিরোধ-সংস্কারের' উৎপত্তি না হওয়া পর্যন্ত যে-প্রাণ বোঝে না, সে এই প্রাণ। তবে দীর্ঘকাল ধৈর্যের সহিত সুদক্ষ গুরুর নির্দেশানুসারে সাধনা করিলে এই প্রাণ সার্কাসের ঘোড়ার ন্যায় কথা বুঝে ও শুনে, এবং গঙ্গার প্রবাহের ন্যায় দ্রুতবেগে সাধককে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম-সাগরে লীন করাইয়া দেয়।

(৭)

এই অশুভ বাসনাবেগরূপে অভিব্যক্ত প্রাণকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য নানা রকমের সাধন-প্রণালী বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। সাধক নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে যে কোন প্রণালী অবলম্বন করিতে পারেন। তবে, সাধক যে ভাবই আশ্রয় করুন না কেন, প্রাণকে বুঝাইবার পক্ষে সৎসঙ্গ হইতেছে একটি বিশেষ প্রভাবশালী সাধন। যাঁহারা নিজের প্রাণকে বশীভূত করিয়া পূর্ণকাম হইয়াছেন, তাঁহারা অপরের প্রাণকেও বুঝাইয়া আদর্শের দিকে পরিচালিত করিতে সক্ষম। এইজন্য প্রাণ বা সংস্কারকে জয় করিতে হইলে সাধু-মহাত্মাদের সঙ্গ ও সিদ্ধগুরুর শরণ গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

আধুনিক সমাজ-মনোবৈজ্ঞানিকদের মতেও একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ববান ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর ভাবধারা পরিবর্তিত করিতে পারে, অর্থাৎ নিজ ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত করিতে পারে। অনুরূপভাবে একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী কোনও ব্যক্তিবিশেষকে তো বটেই, এমন কি অপর একটি গোষ্ঠীকেও প্রভাবিত করিতে পারে। এই তত্ত্ব অনুসারেও উচ্চ কিন্তু সমভাবে ভাবিত ব্যক্তির বা সমাজের সঙ্গ সাধকের প্রাণকে বুঝাইবার পক্ষে অত্যন্ত উপকারী সাধন; কিন্তু দুঃসঙ্গ যে সর্বথৈব ত্যাজ্য এ কথা কি আর বলিতে হইবে! শুধু দুঃসঙ্গই নয়, এক ভাবে ভাবিত সাধক যদি কোন অন্য ভাবে ভাবিত সাধকের বা সাধুসমাজের সম্পর্কে আসেন, তাহা হইলে তাঁহার ক্ষতিই (ভাবভঙ্গ) হইতে পারে। ইহাও একটি মনোবৈজ্ঞানিক সত্য। সেইজন্য, অবতারগণ বলিয়াছেন, কাহারও ভাব ভঙ্গ করিও না, 'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ' ইত্যাদি।

(৮)

এক্ষণে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের আলোকে 'প্রাণ বোঝে না কেন' তাহার আলোচনা করা হইতেছে।[১২]

মনোনিগ্রহ যদিও পাশ্চাত্ত্য মনোবিদ্যার বিষয় নহে, তথাপি আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যে-সমস্ত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহা সাধকের পক্ষেও উপযোগী হইতে পারে।

প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex action)

ভারতীয় যোগিগণ যাহাকে সংস্কার বা বাসনা-

---

১২ গ্রন্থপঞ্জী—১ শ্রীপরেশনাথ ভট্টাচার্য, মনোবিদ্যা, ১ম সংস্করণ

২ Nichel Colder : The Mind of Man, 1st Edn. 1970

৩ The Reader's Digest, Feb. 1972 'Breakthrough in Brain Research'.

৪ Floyd L. Ruch : Psychology and Life, 7th Edn. 1970

৫ Wegner M. A., Jones F. N., Jones M. H. : Physiological Psychology. 1956

৬ Pears Cyclopaedia, 1957-58

৭ V. E. Rele : The Mysterious Kundalini, Eighth Edn.

শক্তি বলেন, পাশ্চাত্ত্য মনোবৈজ্ঞানিকগণ তাহাকে 'প্রতিবর্ত ক্রিয়া' (reflex action) বলিয়া থাকেন। এই ক্রিয়াগুলি মেরুদণ্ড, সুষুম্না-শীর্ষক (Medulla) বা মস্তিষ্কের বহিঃস্তরকে কেন্দ্র করিয়া হইয়া থাকে। যে কোন বিষয় সম্পর্কে একই রকম ক্রিয়া স্বেচ্ছায় বার বার করিবার ফলে বা সহজপ্রবৃত্তির (instinct) দ্বারা মানবের স্নায়ু-প্রণালী (nerve-links) যে-ভাবে গঠিত হইয়া গিয়াছে, সেই বিষয়গুলির সান্নিধ্যে, মস্তিষ্কের চিন্তা-বিভাগের অজ্ঞাতসারেই স্নায়ুগুলির যে-স্বতন্ত্র ক্রিয়া হইয়া থাকে তাহাকে প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলে। সেজন্য দেখা যায়, ক্ষুধিত ব্যক্তি সামনে খাদ্য-পদার্থ দেখিলেই অজ্ঞাতসারে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার লালাস্রাব হয়। এইরূপ অনেক ক্রিয়াই জাগ্রত এবং স্বপ্নাবস্থায় অজ্ঞাতসারে হইয়া থাকে। সেই সকল অনভিপ্রেত ক্রিয়ার জন্য অনেকে বিষণ্ণচিত্ত অনুতপ্ত ও লজ্জিত হন। ইহার কারণ, যদিও তাঁহাদের মন বেশ বুঝিয়াছে যে, ঐরূপ করা উচিত নয়, তথাপি প্রাণের (nervous impulse) প্রভাবে তাঁহারা অসহায় হইয়া যান। ইহাকেই আমরা বলিতে পারি প্রাণের না বোঝা।

উচ্চ শ্রেণীর প্রতিবর্ত ক্রিয়া

মস্তিষ্কের বহিঃস্তরে (Cerebral Cortex) নানা রকমের সূক্ষ্ম এবং অসংখ্য স্নায়ু-কোষ (nerve-cells) আছে। যেমন যেমন শিক্ষা (learning) বা সাংসারিক জ্ঞান লাভ হয় তেমন তেমন মস্তিষ্কের অনুষঙ্গ অঞ্চলে (association areas) স্নায়ুকোষ-শৃঙ্খলাগুলি (nervous links) গঠিত হইতে থাকে। চিরকাল অভ্যাসের ফলে এগুলি স্থায়ী হইয়া যায় এবং উদ্দীপিত হইলে, চিন্তাশক্তির সাহায্য ব্যতীতই কার্য করিয়া থাকে। যেমন যেমন উদ্দীপনা বহির্জগৎ বা অন্তর্জগৎ হইতে আসে, তেমন তেমন এই স্নায়ুকোষ-শৃঙ্খলাগুলির মধ্য দিয়া স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহ, কিছুটা বিদ্যুৎপ্রবাহের ন্যায়ই, নিমেষের মধ্যে সঞ্চালিত হয়, এবং অন্যান্য কর্মসম্পাদক স্নায়ু-প্রণালীকে (motor nerves) কার্যান্বিত করে। তাহার ফলেই দেখা যায়, মিত্র-দর্শনে আনন্দ বা শত্রু-দর্শনে ক্রোধাদি। ক্রোধাদি প্রকাশ না করিতে অনেকেই চায়, কিন্তু শুধু চাহিলে কি হইবে, স্নায়বিক-শক্তি সঞ্চলন এত দ্রুত হয় যে, ক্রোধ করা উচিত নয়, এই কথা ভাবিতে ভাবিতেই হয়তো শত্রুর উপরে দণ্ড-প্রহারও হইয়া যাইতে পারে (অন্ততঃ মনে মনে)। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, প্রাণের না বোঝার জন্যই এইরূপ হইয়া থাকে।

প্রতিকারের উপায়

প্রতিবর্ত ক্রিয়াগুলির দ্বারা প্রাণের এইরূপ তাণ্ডবনৃত্য দেখিয়া বিষণ্ণ-চিত্ত বা হতোৎসাহ হইবার কোন কারণ নাই, কারণ ঐগুলি আমাদেরই কৃত কু-অভ্যাসের ফলে হইয়াছে। যখন সু-অভ্যাসের দ্বারা স্নায়ুপ্রবাহকে ইষ্ট স্নায়ু-পথগুলির ভিতরে চালিত করিবার ফলে ঐ সকল অনিষ্টকারী স্নায়ুপথগুলির ব্যবহার বন্ধ হইয়া যাইবে, তখন অবাঞ্ছিত স্নায়ুপথগুলি নিষ্ক্রিয় হইয়া যাইবে। সুশিক্ষার দ্বারা উচ্চভাবের স্নায়ুপ্রণালী স্থায়ীভাবে গঠিত করিতে পারিলেই এই কার্য সাধিত হয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা দীর্ঘকাল অভ্যাসের ফলেই হইয়া থাকে। যেমন বশিষ্ঠ মহামুনি বলিয়াছেন, "হে রাম, এই সংসারে দৃঢ়ভাবে স্থিতি (আমাদেরই) শত শত জন্মের অভ্যাসের ফলে হইয়াছে। তাহা দীর্ঘকালব্যাপী অভ্যাস-যোগ না করিলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে না।"[১৩]

---

১৩ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, উপশম প্রঃ ৯২।২৩

কর্মযোগ, শম, দম, উপরতি, বৈরাগ্য, শ্রবণ, মননাদি সাধনার দ্বারা অজ্ঞাতসারে ইহাই হইয়া থাকে। স্বামী বিবেকানন্দও বলিয়াছেন, '... গোটা শরীরটাকে যেন নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিতে হইবে। ... চিন্তার প্রবাহের জন্য মস্তিষ্কে নূতন নূতন প্রণালী নির্মিত হইবে, যে-সব স্নায়ু সারা জীবনে কখনো কাজে লাগে নাই, সেগুলিও সক্রিয় হইয়া উঠিবে, এবং শরীরেও সম্পূর্ণ নূতন ধরনের পরিবর্তন-পরম্পরা উপস্থিত হইবে।'[১৪]

প্রেষণা (Motivation) বা নোদনা (Drive); ও স্বতন্ত্র-স্নায়ু-তন্ত্র-বিভাগ (Autonomous Nervous System)

আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিকদের মতে প্রাণের না বুঝিবার আরও একটি কারণ হইতেছে 'প্রেষণা' (Motivation)। শারীরিক অথবা মানসিক কোন অভাব মিটাইবার জন্য ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা কামবেগ জিজীবিষা আদি প্রেষণা বা নোদনা (drive) মানব অনুভব করিয়া থাকে। এই নোদনাগুলি মানব-মনের এক একটি বেগবতী প্রেরকশক্তি। ইহাদের মধ্যে তৃষ্ণা ক্ষুধা ও কামবেগ মস্তিষ্কের হাইপো-থ্যালামাস বিভাগের দ্বারা পরিচালিত। এই হাইপো-থ্যালামাসেরই অন্যতম অংশটি সুখ-উৎপাদক অংশ বলিয়া মনোবৈজ্ঞানিকগণ অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারিয়াছেন। হৃদ্‌যন্ত্র নাসিকা জিহ্বা পাকস্থলী জননেন্দ্রিয় ইত্যাদি এই স্বতন্ত্র-স্নায়ুতন্ত্র-বিভাগের দ্বারা পরিচালিত থাকায় ইহাদের উপরে মস্তিষ্কের চিন্তা-বিভাগের (Cerebral Cortex) পূর্ণ আধিপত্য থাকে না, কিন্তু আংশিকভাবে থাকিতে পারে। মস্তিষ্কের প্রক্ষোভ (Emotion)-কারী ক্ষেত্রও (limbic system) এই স্বতন্ত্র-স্নায়ুতন্ত্র-বিভাগকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়া থাকে বলিয়াই ভয় ক্রোধ ভালবাসা ঘৃণা সহানুভূতি আদির প্রতিক্রিয়া হৃদ্‌যন্ত্র নেত্র ইত্যাদির উপরে বিশেষভাবে দেখা যায়। এই সকল স্নায়ু-ব্যবস্থার কথা চিন্তা করিলে বুঝিতে বাকি থাকে না যে, মন বুঝিলেও, নোদনা প্রক্ষোভ ও স্বতন্ত্র-স্নায়ুতন্ত্র-বিভাগাদিতে অভিব্যক্ত প্রাণ বোঝে না কেন। মস্তিষ্কের বিবেকের এলাকার সহিত উপরোক্ত স্নায়ু-ব্যবস্থা— বিশেষতঃ সাধকের অপক্ক অবস্থায় — কিছুটা দুর্বলভাবে জড়িত থাকায় এবং কোন শক্তিশালী ও অবাধ্য প্রদেশের ন্যায় বহুকাল স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিবার ফলে ইহার একটু Special Status থাকায়, সাধনার প্রথমাবস্থায় যদি কখনও প্রাণ বোঝে না বলিয়া মনে হয়, তথাপি হতোৎসাহ হইবার কোন কারণ নাই।

হরমোনের প্রভাব (Hormonic Influence)

উপরোক্ত স্নায়ুব্যবস্থাকে উদ্দীপিত করিবার আরও একটি শক্তিশালী কারণ আছে। উহার নাম হরমোন। হরমোন এই গ্রীক কথার অর্থ, 'আমি উত্তেজিত করিতেছি'। আমাদের শরীরে কয়েকটি কার্যসম্পাদক গ্রন্থি আছে। এইগুলি এক একটি বিশিষ্ট শক্তিশালী রস উৎপাদন করিয়া থাকে— যেমন পুরুষের যৌনগ্রন্থি হইতে অ্যানড্রোজেন এবং নারীর যৌনগ্রন্থি হইতে এস্ট্রোজেন নামক হরমোন যৌবনাবস্থা হইতে নিঃসৃত হয়। এই হরমোনগুলির ফলে শরীর ও মনের উপরে নানা রকমের প্রতিক্রিয়া হয়। যৌনগ্রন্থি হইতে নিঃসৃত হরমোন এবং পিটুইটারি গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত হরমোনগুলি যৌনযন্ত্র ও মনের অদস্ (Id) এবং প্রক্ষোভ বিভাগকে উত্তেজিত করিয়া কাম-নোদনাকে বাড়াইয়া থাকে। তবে পশুদের মধ্যে যে পরিমাণে, সেই পরিমাণে নয়। মনের অদস্‌বিভাগে মানবের

---

১৪ বাণী ও রচনা, ৭৮-

সমস্ত নিষিদ্ধ ও অতৃপ্ত বাসনাগুলি, সাপুড়িয়ার চুব্‌ড়িতে সর্পগুলির ন্যায়, মাথা তুলিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া বাস করিতে থাকে। মনের প্রহরী (Super ego or Censor) একটু অসাবধান থাকিলেই ইহারা ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। কাম-নোদনা, স্বতন্ত্র-স্নায়ুতন্ত্র-ব্যবস্থা প্রক্ষোভ এবং এই হরমোনগুলির সাহায্য পাইলে এই অদম্য মনের তাণ্ডব হইতে আর কত দেরি! অতএব মন বুঝিলেও প্রাণ যে সহজে বোঝে না- ইহাতে আর আশ্চর্য কি!

এই সব শক্তিশালী এবং অবাধ্য প্রাণের প্রবাহকে এবং স্বতন্ত্র-স্নায়ুতন্ত্রব্যবস্থাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যেই যোগিগণ প্রাণায়াম মুদ্রা বন্ধাদি করিয়া থাকেন।

ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়া

মনোবৈজ্ঞানিকদের মতে ইচ্ছা প্রেষণা কামনাদির দ্বারা ঐচ্ছিক এবং সহজপ্রবৃত্তি (instinct) অভ্যাস (habit) ইত্যাদির দ্বারা অনৈচ্ছিক ক্রিয়াগুলি হইয়া থাকে। ঐচ্ছিক ক্রিয়াগুলির জন্য সাধককে পশ্চাত্তাপদগ্ধ না হইতে হইলেও, অনৈচ্ছিক ক্রিয়াগুলির জন্য তাহার প্রাণ বোঝে না বলিয়া মনস্তাপ হয়। সেইজন্য এই সহজপ্রবৃত্তি ও কু-অভ্যাসকে নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে মনোবৈজ্ঞানিকগণ কয়েকটি সু-অভ্যাস গঠনের নিয়ম দিয়াছেন, যাহার ফলে পুরাতন স্নায়ু-পথগুলিকে নিষ্ক্রিয় করিয়া নূতন স্নায়ু-শৃঙ্খলা গঠিত করা যাইতে পারে।

ঐ বিষয়ে স্বামীজীও বলিয়াছেন, 'মনই এই স্নায়ুজাল নির্মাণ করিয়াছে, মনকেই ঐ জাল ছিন্ন করিতে হইবে।'[১৫] 'স্নায়বীয় শক্তি-প্রবাহগুলির গতি ফিরাইয়া দিয়া তাহাদিগকে নূতন পথে প্রবাহিত করিতে হইবে; তখন শরীরের মধ্যে নূতন প্রকারের স্পন্দন বা ক্রিয়া আরম্ভ হইবে, ...।'[১৬]

(৯)

মন বুঝিলেও প্রাণের না বোঝার কারণ বিভিন্ন দিক হইতে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইল। কিন্তু, সব কারণেরও মূল কারণ হইতেছে কু-শিক্ষা বা কু-অভ্যাস। অতএব প্রাণকে বুঝাইবার প্রধান উপায় হইতেছে বৈরাগ্য এবং সু-অভ্যাস। এই সাধনার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বার্ধে আলোচিত ব্রহ্ম-সিংহের কথা মনে থাকিলে সাধক ভগবানের শরণাগত হইয়া ধৈর্য এবং উৎসাহের সহিত বাসনা-শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে পারিবেন। স্বামীজীও বলিয়াছেন, 'একটি ভাব আশ্রয় কর, উহার জন্য জীবন উৎসর্গ কর এবং ধৈর্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া যাও; তোমার জীবনে সূর্যোদয় হইবেই।'[১৭]

---

১৫ বাণী ও রচনা, ১।২৫৪

১৬ তদেব, পৃঃ ২২৫

১৭ তদেব, ৩।৪৭৯

যে তীর্থ আজও আছে পঞ্চনদের দেশে

শ্রীনির্মলচন্দ্র ঘোষ

[পূর্বানুবৃত্তি]

সারাহান

সারাহান হিন্দুস্থান হতে তিব্বত যাওয়ার রাজপথের উপরে অবস্থিত। রামপুর শহর হতে সারাহানের দূরত্ব প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে।

সারাহানে প্রাচীন ভীমা কালী দেবীর মন্দির প্রসিদ্ধ। শ্রীশ্রীচণ্ডী হতে দেবীর মুখনিঃসৃত নিজের ভীমারূপী প্রকাশ সম্বন্ধে উক্তি নিয়ে উদ্ধৃত করা হল:

পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে।
রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ॥
তদা মাং মুনয়ঃ সর্বে স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্তয়ঃ।
ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥[১]

[পুনরায় মুনিদিগকে রক্ষা করার জন্য আমি যখন হিমালয়ে ভীমরূপ ধারণ করিয়া রাক্ষসগণকে বিনাশ করিব, তখন মুনিগণ নতশির হইয়া আমার স্তব করিবেন। সেই কারণে আমার নাম ভীমাদেবী বলিয়া খ্যাত হইবে।]

চম্বা

চম্বা হিমাচল প্রদেশের একটি প্রসিদ্ধ শহর। পুণ্যতোয়া রাবি নদীর তীরে, ডালহৌসীর প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার পূর্বদিকে চম্বা অবস্থিত। পাঠানকোট রেল স্টেশন হতে ডালহৌসীর দূরত্ব তিরাশি কিলোমিটার। চম্বা সমুদ্রের উপরিতল (sea-level) হতে প্রায় ৪০০০ ফুট উচ্চে। ইংরাজ আমলে চম্বা একটি পার্বত্য করদ রাজ্য ছিল।

চম্বায় অনেক মন্দির; তাদের মধ্যে লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ, গৌরীশঙ্কর, পঞ্চমুখী শিব, চন্দ্রগুপ্ত শিব ও লক্ষ্মী-দামোদরের মন্দির প্রসিদ্ধ।

রাজা সহিল বর্মা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে এই রাজ্যে রাজত্ব করতেন। তখন রাজধানী ছিল ভরমৌরে। রাজা প্রথমে নিঃসন্তান ছিলেন। সন্ন্যাসীদের আশীর্বাদে তাঁর দশ পুত্র ও এক কন্যা হয়। কন্যার নাম চম্পাবতী। তাঁর নামেই চম্বা শহর স্থাপিত হয় এবং সেখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। রাজা লক্ষ্মী-নারায়ণের বিগ্রহ নির্মাণের জন্য পাথর আনতে তাঁর দশ পুত্রকে বিন্ধ্যপর্বতে পাঠান। সেখানে নয় পুত্র ডাকাতের হাতে প্রাণ হারায়। একজন শেষে পাথর লয়ে আসেন। সেই পাথরে বিগ্রহ তৈরী হয়।

চম্বায় রাজকুমারী চম্পাবতীর নামে একটি মন্দির আছে। রাজকুমারী চম্পাবতী খুব সুন্দরী, ধর্মশীলা ও বিদুষী ছিলেন। তিনি চম্বার একজন সাধুর কাছে পুরাণ পাঠ অভ্যাস করতেন। একদিন রাজা মেয়েকে সন্দেহ করে সাধুর কুটীরে গিয়ে দেখেন যে, রাজকুমারী সেখানে নেই। তাকে না দেখে যখন রাজা খুব চঞ্চল হয়ে পড়লেন, তখন এক দৈববাণী শুনতে পেলেন যে, তিনি তাঁর মেয়েকে সন্দেহ করেছেন বলে আর তাকে দেখতে পাবেন না। দৈববাণী শুনে রাজা খুব দুঃখিত হলেন; তারপর মেয়ের নামে একটি সুন্দর মন্দির তৈরি করালেন। এই মন্দিরে

---

১ শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১।৫০—৫২

মহিষাসুরমর্দিনী পূজিতা হন।

যা চণ্ডী মধুকৈটভাদিদলনী যা মাহিষোন্মূলিনী
যা ধূম্রেক্ষণচণ্ডমুণ্ডমথনী যা রক্তবীজাশনী।
শক্তিঃ শুম্ভনিশুম্ভদৈত্যদলনী যা সিদ্ধিদাত্রী পরা
সা দেবী নবকোটিমূর্তিসহিতা
মাং পাতু বিশ্বেশ্বরী ॥[২]

[যে চণ্ডী মধুকৈটভাদি-দৈত্যনাশিনী, যিনি মহিষাসুরমর্দিনী, যিনি ধূম্রলোচন ও চণ্ডমুণ্ডকে নিহত করিয়াছেন, যিনি রক্তবীজকে ভক্ষণ করিয়াছেন, যিনি শক্তিরূপা, যিনি শুম্ভ ও নিশুম্ভকে নিধন করিয়াছেন, যিনি শ্রেষ্ঠা সিদ্ধিদাত্রী এবং যিনি নয় কোটি সহচরী পরিবৃতা, সেই জগদীশ্বরী আমাদিগকে রক্ষা করুন।]

ডালহৌসীর প্রায় পনর কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে এবং চম্বার ৭ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে খজুয়ার গ্রামে একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। সেখানে একটি ছোট হ্রদও আছে।

ভরমৌর

চম্বার প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার পূর্ব দিকে এবং ধর্মশালার প্রায় আটত্রিশ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে ভরমৌর অবস্থিত। সড়ক পথে গেলে দূরত্ব অনেক বেশী, প্রায় দ্বিগুণ। ভরমৌরের প্রাচীন নাম ছিল ব্রহ্মপুর। স্থানটি বুধিল নামক নদীর তীরে, সমুদ্রের উপরিতল হতে প্রায় ৭০০০ ফুট উচ্চে।

ভরমৌরে অনেক মন্দির; কয়েকটি খুব প্রাচীন। মন্দিরগুলির মধ্যে হরিহরের মন্দির, নৃসিংহদেবের মন্দির, পার্বতীর মন্দির, মহালক্ষ্মীর মন্দির ও গণেশের মন্দির প্রসিদ্ধ। ভরমৌরে অনেক শিব-মন্দির আছে।

ভরমৌরের তেইশ কিলোমিটার পশ্চিমে, চম্বা যাওয়ার রাস্তায়, ছত্রারি নামক গ্রামে একটি সুন্দর দেবী-মন্দির আছে।

মণি মহেশ

ভরমৌরের প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে প্রসিদ্ধ মণি মহেশ তীর্থ।

কথিত আছে, পাঠানগণ যখন প্রথমে পুণ্যভূমি কাশ্মীর অধিকার করে, তখন দেবাদিদেব মহাদেব অমরনাথ গুহা হতে মণি মহেশ পাহাড়ে এসে অধিষ্ঠান করেন। স্থানীয় অধিবাসিগণ মণি মহেশকে কৈলাসও বলে। শিবের নাম মণি মহেশ, তাই তীর্থের নামও মণি মহেশ। মণি মহেশ তীর্থে একটি পবিত্র হ্রদ আছে। তার জলে স্নান করলে খুব পুণ্য হয়। হ্রদের তীরে একটি শিবলিঙ্গ আছে। হ্রদের সম্মুখে মণি মহেশ পর্বত। তার চূড়া সমুদ্রের উপরিতল হতে প্রায় ১৮০০০ ফুট উচ্চে। কেউ সেখানে যায় না। এক গদ্দি[৩] বালক মণি মহেশ ঠাকুরকে পাহাড়ের উপরে দেখতে পেয়েছিল। তিনি তাকে তাঁর কথা কাউকে বলতে এবং তিনি কোথায় থাকেন তার রাস্তা দেখাতে বারণ করেছিলেন। দর্শনের পর বালক খুব আনন্দে ছিল। কিন্তু অনেক তীর্থ-যাত্রীর ঐকান্তিক অনুরোধে সে একদিন ঠাকুরের নির্দেশ অমান্য করে তাকে নিয়ে পাহাড়ের উপরে ঠাকুর যেদিকে থাকেন সেদিকে যাচ্ছিল, সেজন্য সে, তার সঙ্গী ও ভেড়ার পাল পাথর হয়ে গিয়েছিল।

মণি মহেশ যাত্রা জন্মাষ্টমী হতে রাধাষ্টমী পর্যন্ত এক পক্ষ কাল খোলা থাকে। অন্য সময়ে বরফে রাস্তা ঢেকে যায়। যাত্রিগণ হ্রদের ধারে তাঁবু খাটিয়ে রাত্রিবাস করে। তারা ধ্যান জপ

---

২ শ্রীশ্রীচণ্ডিকার ধ্যান

৩ এক জাতীয় মেষ পালক। তারা ভেড়ার চামড়া দিয়ে খুব লম্বা চাবুক তৈরি ক'রে তা কোমরে জড়িয়ে রাখে।

পূজা প্রার্থনা করে। গদ্দিরা শিবের উদ্দেশ্যে মেষ বলি দেয়।

হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপাণে
স্থাণো গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো।
ভূতেশ ভীতভয়সূদন মামনাথং
সাংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥[৪]

[হে চন্দ্রশেখর মদনভস্মকারী শূলপাণি অচল স্থাণু গিরীশ পার্বতী-পতি মহেশ শম্ভু ভূতপতি ভয়হারী জগদীশ্বর! আমি অনাথ, আমাকে সংসারের গভীর দুঃখ হইতে রক্ষা করুন।]

ত্রিলোকনাথ

ত্রিলোকনাথ তীর্থ চম্বা শহরের প্রায় এক শত কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে, যদিও কাকের মত সোজা উড়ে গেলে দূরত্ব মাত্র আটাত্তর কিলোমিটার। চম্বা হতে দুর্গথি ও কলিচো গিরিবর্ত্ম হয়ে ত্রিলোকনাথে যেতে হয়। রোহ্‌তাঙ জোৎ হতেও ত্রিলোকনাথে যাওয়া যায়। তবে এই দ্বিতীয় পথে যেতে হলে প্রথমে রোহ্‌তাঙ জোৎ হতে চন্দ্রা নদীর তীরে খোক্‌সার গ্রামে যেতে হয়, তারপর খোক্‌সার হতে পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিমে চন্দ্রা ও ভাগা নদীর সঙ্গমস্থল কেবলঙে যেয়ে সেখান হতে সংযুক্ত চন্দ্রভাগা (চেনাব) নদীর তীর দিয়ে পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে গিয়ে ত্রিলোকনাথ তীর্থে পৌঁছানো যায়। ত্রিলোকনাথ শিবের নামে তীর্থের নাম ত্রিলোকনাথ হয়েছে।

পুণ্যতোয়া চন্দ্রভাগার তীরে প্রসিদ্ধ ত্রিলোকনাথের মন্দির। মন্দির যদিও ছোট, কিন্তু খুব সুন্দর। ঠাকুরের বিগ্রহ শ্বেত পাথরের। কত কাল ধরে যে দুটি প্রদীপ মন্দিরে অবিরত জ্বলছে তা জানা নেই। যাত্রিগণ প্রদীপে ঘৃত প্রদান করে।

হে বিশ্বনাথ শিব শঙ্কর দেবদেব
গঙ্গাধর প্রমথনায়ক নন্দিকেশ।
বাণেশ্বরান্ধকরিপো হর লোকনাথ
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥[৫]

[হে বিশ্বনাথ শিব শঙ্কর দেবদেব গঙ্গাধর ভূতপতি নন্দিকেশ্বর বাণেশ্বর অন্ধকাসুরের শত্রু হর লোকনাথ জগদীশ্বর! আপনি সংসারের নিদারুণ কষ্ট হইতে আমাকে রক্ষা করুন।]

চিনি

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥

হিমাচল প্রদেশের কিন্নৌর জেলায় চিনি শহর। সিমলা হতে হিন্দুস্থান-তিব্বত রোড ধরে গেলে চিনির দূরত্ব প্রায় দুইশত ষোল কিলোমিটার (পূর্ব-উত্তর-পূর্ব দিকে)।

চিনি শহরের প্রায় দশ কিলোমিটার দক্ষিণে কমরু গ্রামে বদরীনারায়ণ ও ভীমা কালীর প্রাচীন মন্দির আছে।

চিনি সদর তহ্‌শীলের অন্তর্গত সুবা পরগণার কোঠি গ্রামে চণ্ডিকা দেবীর একটি প্রাচীন মন্দির আছে। দেবীর বিগ্রহ সোনার।

মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপরত্নবেদী-
সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্।
পীতাম্বরাং কনকভূষণমাল্যশোভাং
দেবীং ভজামি ধৃতমুদ্গরবৈরীজিহ্বাম্ ॥[৬]

[সুধাসাগরে মণিমণ্ডপে রত্নময় বেদীর উপরে সিংহাসনে আসীনা, অতি সুন্দর পীতবর্ণা, পীতবস্ত্র-পরিহিতা, স্বর্ণালঙ্কার ও মাল্য-শোভিতা এবং হস্তে গদা ও শত্রুর জিহ্বাধারিণী দেবীর ভজন করি।]

---

৪ শঙ্করাচার্য-রচিত শিবনামাবল্যষ্টকম্, শ্লোক ১

৫ তদেব, শ্লোক ৪

৬ শ্রীশ্রীচণ্ডিকার ধ্যান

সমালোচনা

বঙ্গ-সংস্কৃতি কথা : শ্রীপ্রসিত রায় চৌধুরী। শৈব্যা পুস্তকালয়, কলিকাতা ১২। পৃঃ ১৫৬ ; মূল্য ৪.০০

পশ্চিমবাংলার ছাত্র-ছাত্রীরা যদি তাদের দেশকে ভালো ক'রে না জেনে থাকে, তবে তার জন্য দায়ী আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা। দেশকে না জানলে, দেশের সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ না করলে তরুণদের মন যে কখনই দেশের মাটিতে বদ্ধমূল হয় না এবং তা না হলে তারা যে ক্রমশই উৎকেন্দ্রিকতার পথে পা বাড়াবে, এ সহজ সত্য আজও আমাদের মর্মে পৌছাল না। পশ্চিম-বাংলার বিভিন্ন স্থানের সাংস্কৃতিক সম্পদ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে, বিশেষত অল্পবয়সীদের, সচেতন ক'রে তোলার বিরাট দায়িত্ব আমাদের রয়েছে। লেখক ও শিল্পীদের সেই আবশ্যিক কর্তব্য পালনে এগিয়ে আসা উচিত। এই কারণেই শ্রীপ্রসিত রায়চৌধুরীকে ধন্যবাদ. তিনি সংক্ষিপ্ত পরিসরে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক তথ্যচিত্র তুলে ধরেছেন। তথ্যচিত্র হলেও বইটি তথ্য-ভারাক্রান্ত নয়, রচনারীতির স্বাচ্ছন্দ্যে সুখপাঠ্য।

'বঙ্গ-সংস্কৃতি কথা' মূলত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লেখা, সে কারণে তথ্য নির্বাচনে লেখককে হিসেবী হতে হয়েছে। অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলির সাহায্যে শ্রীরায়চৌধুরী কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের পনেরোটি জেলার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক রূপ পরিস্ফুট করার প্রয়াস পেয়েছেন। মোট ১৫৬ পৃষ্ঠার বইটিতে সবচাইতে বেশী জায়গা পেয়েছে কলকাতা (আঠারো পৃষ্ঠা) ও চব্বিশ পরগণা (সতের পৃষ্ঠা) এবং সবচাইতে কম কোচবিহার (সাড়ে পাঁচ)। অন্যান্য জেলার বৃত্তান্তগুলি গড়ে আট থেকে দশ পাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। রচনার উপাদান সংগৃহীত হয়েছে বিভিন্ন গেজেটিয়ার এবং নানাবিধ নতুন ও পুরোনো বইপত্র থেকে। পূজা-পার্বণ মেলা উৎসব জনশ্রুতি কিংবদন্তী লোকাচার জীবনচর্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ক তথ্যের সন্নিবেশে বইটি একই সঙ্গে শিক্ষাপ্রদ ও আকর্ষণীয়। কিছু প্রাসঙ্গিক আলোক-চিত্র এবং রেখাচিত্র বইটির মূল্য ও আকর্ষণ আরো বাড়িয়েছে।

সংস্কৃতি বিষয়ে কিছু লেখা সহজসাধ্য নয়, বিশেষত ছোটদের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থরচনা রীতিমতো দুরূহ। 'বঙ্গ-সংস্কৃতি কথা'র সাফল্য এ কারণে অভিনন্দনযোগ্য, শ্রীপ্রসিত রায়চৌধুরী পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়েদের কাছে তাদের দেশের সাংস্কৃতিক তথ্য চিত্রটি চিত্তস্পর্শীভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন বলেই আমার বিশ্বাস। এবং সাধারণ বয়স্ক বাঙালীরাও এ বই পড়ে উপকৃত হবেন।

১৯৭১ সালে প্রথম প্রকাশিত এ বইটির ইতিমধ্যে চারটি সংস্করণ হয়েছে। নিঃসন্দেহেই এ ঘটনা জনপ্রিয়তার নিদর্শন। বইটির দামও সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে, অবশ্য আগামী সংস্করণের দাম প্রকাশকের সদিচ্ছার পূরক হতে পারবে কি না সন্দেহ। যাই হোক, যেহেতু এ ধরনের দেশপরিচায়ক গ্রন্থে তথ্যগত ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা অবাঞ্ছনীয়, সে কারণে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের জন্য আমি আপাতত কয়েকটি ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

১। পৃষ্ঠা ২ : 'শক হূণ দল মোগল

পাঠান এক দেহে হ'ল লীন' এবং 'আমার শোণিতে হতেছে ধ্বনিত তার বিচিত্র সুর' ; শুদ্ধ পাঠ : 'শক হুণ দল পাঠান মোগল এক দেহে হ'ল লীন' এবং 'আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তারি বিচিত্র সুর'।

২। পৃষ্ঠা ১০ ও ৭৩ : রামরাম বসু রচিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' 'প্রতাপাদিত্য চরিত' রূপে উল্লিখিত হয়েছে।

৩। পৃষ্ঠা ১৯ : জ্যোতির্বিদ টলেমীকে প্রথম শতাব্দীর লেখক বলা হয়েছে ; হবে দ্বিতীয় শতাব্দীর।

৪। পৃষ্ঠা ৫৪ : 'হুয়েন সাং-এর বিবরণীতে Kirana Safalana এই নগরীর উল্লেখ আছে।' এই ধরনের কোন নগরীর উল্লেখ ঐ বিবরণীতে নেই, ফলে ঐ নগরীর সুবর্ণরেখার তীরবর্তী সাফাবণের সঙ্গে অভিন্ন হওয়ারও প্রশ্ন ওঠে না।

৫। পৃষ্ঠা ৭১ : 'নীলমণি (ঠাকুর) এক লক্ষ টাকায় প্রাসাদ নির্মাণ করেন ১৭৮৪ সালে।' রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা, নীলমণি ১৭৮৪ সালের জুন মাসে জোড়াসাঁকোতে (তখন নাম ছিল মেছুয়া-বাজার) বসবাস শুরু করেন ; তিনি বাড়ি তৈরি করেন পরে এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামলোচন আরও জায়গা-জমি কিনে বংশের মর্যাদা-বৈভব বাড়িয়েছিলেন।

৬। পৃষ্ঠা ৮১ : 'ডাক্তার ওয়ালিচ নামে এক দিনেমার উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ্ ও প্রখ্যাত বাগ্মী কেশব সেনের ঠাকুরদা রামকমল সেনের সহায়তায় কলকাতা যাদুঘরের সূচনা হয়।' প্রকৃত তথ্য এই : কলকাতা যাদুঘর বা ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের জন্ম এশিয়াটিক সোসাইটিতে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটির নিজস্ব ভবনে ; ওয়ালিচ ১৮১৪ সালে ঐ সংগ্রহশালাটির অবৈতনিক অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং তাঁর অন্যতম সাহায্যকারী ছিলেন রামকমল সেন (মৃত্যু ১৮৪৪)। এশিয়াটিক সোসাইটির কর্তৃপক্ষ ১৮৫৮ সালে সরকারের কাছে একটি সর্বভারতীয় সংগ্রহশালা স্থাপনের প্রস্তাব করেন এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম এ্যাক্ট প্রবর্তিত হয় ; ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে চৌরঙ্গী রোডে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের নিজস্ব ভবন নির্মিত হলে সোসাইটির সংগ্রহশালা ওখানে উঠে যায়। সুতরাং কলকাতা যাদুঘরের সূচনা ওয়ালিচের এবং রামকমলের হাতে, এ উক্তি অযথার্থ। 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা' এবং বিখ্যাত ব্রাহ্ম নেতা হিসাবেও কেশবচন্দ্রের উল্লেখ বাঞ্ছনীয়।

৭। বইয়ের ঐ পৃষ্ঠাতেই আছে : 'সারনাথের অশোক স্তম্ভের চূড়াটি এখানে সংরক্ষিত।' এটিও ভুল। মিউজিয়ামের অগ্রভাগে সিংহচতুষ্টয়-সংবলিত যে স্তম্ভশীর্ষ সংরক্ষিত, সেটি প্লাস্টার অফ প্যারিসে তৈরী মূল স্তম্ভশীর্ষ সারনাথ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত।

৮। পৃষ্ঠা ৮৩ : What Bengal thinks to-day, India thinks tomorrow ; ছাপা হয়েছে India will think to-morrow.

৯। পৃষ্ঠা ১১৫ : 'মুর্শিদাবাদে রেশমের কারবার খুলেছিলেন দ্বারকানাথ।' দ্বারকানাথ রেশমের সূত্র-নিষ্কাশন-কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন কুমারখালিতে ; কুমারখালি তখন নদীয়ার অন্তর্গত ছিল।

১০। পৃষ্ঠা ১১৭ : 'মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে নগদ রূপোর টাকার ঘাটতি দেখা দিলে কেনা-বেচার কাজে কড়ির ব্যবহার শুরু হয়, তাই টাকা-কড়ি।' কেনা-বেচার কাজে কড়ির ব্যবহার খুবই পুরনো, চতুর্থ শতকে যখন গুপ্তসাম্রাজ্যের রমরমা, সুবর্ণ-মুদ্রার প্রাচুর্য, তখনও যে সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন কেনা-বেচার মাধ্যম হিসাবে কড়ি ব্যবহার করত ফা-হিয়েনের বিবরণীতে তার উল্লেখ আছে।

১১। পৃষ্ঠা ১১৮ : 'কর্ণসুবর্ণে গুপ্তবংশীয়

রাজারা বহুদিন রাজত্ব করেছেন, এখানকার মাটি খুঁড়লে বাঙলার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্য জানা যেতে পারে।' 'কর্ণসুবর্ণ' নামের উদ্ভব ও প্রচলন গুপ্তোত্তর যুগে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে গৌড়রাজ শশাঙ্কের রাজ্য ও রাজধানী 'কর্ণসুবর্ণ' নামে খ্যাত ছিল। মুর্শিদাবাদে বহরমপুরের কাছে চিরুটি রেল স্টেশনের অদূরে রাজবাড়িডাঙায় রক্তমৃত্তিকাবিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার সাম্প্রতিক বঙ্গীয় প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা; পূর্বোক্ত বিহারটি কর্ণসুবর্ণের উপকণ্ঠে অবস্থিত ছিল, হিউয়েন সাঙের এই সাক্ষ্য মেনে নিলে বলতে হয়, রাজবাড়িডাঙা অঞ্চলের কাছাকাছি ছিল রাজা শশাঙ্কের রাজধানী।

পরিশেষে, 'মাণিকতলা বোমার মামলা' (১২পৃঃ) বা 'জৈনধর্মের তাম্রলিপ্তি শাখা' (১৯পৃঃ) ইত্যাদি উক্তি অল্পবিস্তর বিশদীকৃত না হলে ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণ পাঠক অসুবিধা বোধ করতে পারেন। পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত পরবর্তী সংস্করণে 'বঙ্গসংস্কৃতি কথা' অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

—ডক্টর কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

শিলং রামকৃষ্ণ মিশন শাখাকেন্দ্রের ১৯৬৩-৬৪ হইতে ১৯৭২-৭৩ সালের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই কেন্দ্রটি ১৯২৯ সালে শিলং-এ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৩৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বীকৃতি লাভ করে। স্থানাভাবে দশ বৎসরের কার্যাবলীর বিবরণ পৃথকভাবে দেওয়া সম্ভব নয় বলিয়া কেবল ১৯৭২-৭৩ সালের কার্যবিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল:

চিকিৎসা: মোট ৩৭,৮৭৩ জন রোগী চিকিৎসিত হন। এক্সরে তোলা হয় ১,০১৯টি, বীক্ষণাগারে পরীক্ষার সংখ্যা: ২,৮৯০, প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয় ৩,৬২৯ জনকে, শল্যচিকিৎসা করা হয় ১১৬ জনের এবং ভ্রাম্যমাণ ডিস্পেনসারির মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী প্রায় ৪০টি গ্রামের ২০,৬০৩ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম: পুস্তকাগার ও পাঠাগারে ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তক সহ ৭,৫৬৯টি বই, ৬টি সংবাদপত্র, ৩৮টি সাময়িক পত্রিকা ছিল। মোট ১,৬৯৩ খানি বই পড়িবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ছাত্রাবাসে ২৯ জন তপসীলভুক্ত জাতি ও উপজাতির ছাত্র ছিল।

২০৫টি ধর্মীয় ও শাস্ত্রীয় আলোচনার মধ্যে ৫৬টি আশ্রমে ও ১৪৯টি বাহিরে হইয়াছিল। আশ্রমে প্রতি একাদশীতে রামনাম সংকীর্তন হয়। বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে আশ্রমে ধর্মসভা ও

ভজনাদি হয়। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলেও রামনাম সংকীর্তন করা হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি এবং জন্মাষ্টমী, শ্রীশ্রীদুর্গা-পূজা, কালী-পূজা, শিবরাত্রি প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানও পালিত হয়।

আশ্রমের মন্দির ও প্রার্থনাগৃহ প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প-পরিসর হওয়ায় উহাদের সংস্কার-সম্প্রসারণ করা হয়। ১৯৭১ সালের ১৮ই ফেব্রুআরি শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী, প্রেসিডেন্ট রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, নবান্বিত মন্দির ও প্রার্থনা-গৃহটি উৎসর্গ করেন। ঐ উপলক্ষ্যে অভিষেক, বিশেষ পূজা এবং হোম অনুষ্ঠিত হয়।

সেবাকার্য: পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু সেবার (৭১-৭২) জন্য আশ্রম খাসি ও গারো পার্বত্য অঞ্চলে ২টি সেবা-কেন্দ্র পরিচালনা করিয়া ২১,৪৭১ জন উদ্বাস্তুর সর্বাঙ্গীণ সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। দুগ্ধ ও বস্ত্রাদি বিতরণ ব্যতীত উদ্বাস্তুদের চিকিৎসা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি মূলক কার্যও করা হয়। মিশন একটি প্রথম হইতে চতুর্থ শ্রেণীর বিদ্যালয়ও স্থাপন করে এবং তাহাতে ৪৩৫ জন বালক-বালিকা পড়িবার সুযোগ পায়।

উৎসব

রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশনে গত ২৩শে মার্চ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। মঙ্গলারতি বেদপাঠ শোভাযাত্রা বিশেষ পূজা হোম কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ উক্ত উৎসবের অঙ্গ ছিল। মধ্যাহ্নে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার নর-নারী বসিয়া খিচুড়ি প্রসাদ পান। বৈকালে ধর্ম-সভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন স্বামী মিত্রানন্দ, স্বামী বিশ্ববেদানন্দ ও স্বামী স্বানুভবানন্দ। সন্ধ্যারতির পর বাউল ও রামায়ণ গান হয়।

মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪০তম জন্মোৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ১লা এপ্রিল আশ্রম-প্রাঙ্গণে বিদ্যালয়গুলির পারিতোষিক বিতরণী সভাতে সভাপতিত্ব করেন স্বামী দিবাকরানন্দ। সভার পরে ছাত্রগণ কর্তৃক "হার্মাদ" নাটক অভিনীত হয়। ২রা পূর্বাহ্ণে আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা হোম ও ভোগারতি হয়। অপরাহ্ণে শোভাযাত্রা গ্রাম পরিক্রমা করে ও পরে ধর্মসভা হয়। সভার পরে প্রায় তিন হাজার ভক্ত প্রসাদ পান। রাত্রে শিক্ষকগণ কর্তৃক "কুরুক্ষেত্রের আগে" যাত্রাভিনয় হয়। ৩রা সুমতিনগর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রগতি সংঘ প্রাঙ্গণে ধর্মসভা হয় ও ৫ই কাকদ্বীপ কিশোর সংঘ প্রাঙ্গণে উৎসব হয়। বিকালে শোভাযাত্রা গ্রাম পরিক্রমা করে ও পরে ধর্মসভা হয়। সভার পরে "রাণী রাসমণি" চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। ৭ই উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জ বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরে পূজা পাঠ বক্তৃতা প্রভৃতি হয়। পরে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত বসিয়া প্রসাদ পান। ৮ই হরেন্দ্রনগরে ধর্মসভার পরে রামায়ণ গান হয়। স্বামী দিবাকরানন্দ, স্বামী পরদেবানন্দ, ব্রহ্মচারী অখণ্ডচৈতন্য ও শ্রীবাসুদেব সাউট্যা বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন।

দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত আমরা দুইজন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ সংবাদ জানাইতেছি।

স্বামী ব্রজেশানন্দ গত ৮ই মে সকাল ৮'২০ মিনিটে বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে ৮৭ বৎসর বয়সে মস্তিষ্ক-প্রদাহ (Encephalitis) রোগে দেহত্যাগ করেন। উক্ত রোগে তিনি সপ্তাহকাল ধরিয়া ভুগিতেছিলেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং বারাণসী সেবাশ্রমে ১৯২২ সালে যোগদান করেন ও ১৯২৭ সালে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন।

স্বামী মহাবিদ্যানন্দ গত ১১ই মে রাত্রি ১১'০৫ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-প্রতিষ্ঠানে ৬৫ বৎসর বয়সে হৃদ্‌রোগে দেহত্যাগ করেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯৩৬ সালে বেলুড় মঠে যোগ দেন ও ১৯৪৮ সালে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। বেলুড় মঠ ব্যতীত তিনি বিভিন্ন সময়ে করাচি, মালদা, নারায়ণগঞ্জ, কনখল এবং বৃন্দাবন কেন্দ্রে সেবা করিয়াছেন। কিছুকালের জন্য তিনি শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দজী মহারাজের সেবক ছিলেন।

ইঁহাদের দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

হুগলী জেলা সারদাপল্লী সারদাপল্লীতে গত ১২ই ও ১৩ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব মহাসমারোহে পালিত হইয়াছে। ১২ই প্রত্যুষে মঙ্গলারতি বৈদিক প্রার্থনা উষাকীর্তন ও ভজন-গানের পর বিশেষ পূজা হোম শ্রীশ্রীচণ্ডী-পাঠ গীতা-পাঠ শ্রীবাণীকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅমর প ডুই কর্তৃক ভক্তিমূলক সংগীত ও পরে সংকীর্তন হয়। দ্বিপ্রহরে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বৈকালে "সুরাঙ্গন"-এর শিল্পিবৃন্দ 'জগজ্জননী সারদাদেবী'-লীলাগীতি পরিবেশন করেন। পরে ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ (সভাপতি), ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ ও স্বামী অচ্যুতানন্দ। সন্ধ্যায় শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও সম্প্রদায় কর্তৃক দেশাত্মবোধক ও ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। রাত্রে শ্রীঅরুণ বিশ্বাস রামায়ণ গান করেন। ১৩ই সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর সুসজ্জিত প্রতিকৃতি লইয়া ব্যাণ্ডবাদ্যসহকারে একটি বিরাট শোভাযাত্রা নামগান করিতে করিতে নগর পরিক্রমা করে। ইহার পর শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি পরিবেশন করেন শ্রীধ্রুব চৌধুরী। দ্বিপ্রহরে প্রায় দুই সহস্র নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালে আনন্দনগর ব্রতচারী সঙ্ঘ ব্রতচারী-নৃত্যাদি পরিবেশন করেন। পরে ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী সম্পর্কে ভাষণ দেন স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ (সভাপতি) ও স্বামী নিত্যানন্দ। সন্ধ্যায় রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের আশ্রমিকগণ 'নদের পাগল' যাত্রাভিনয় করে। উৎসবের দুই দিনই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল।

শিকড়া কুলীন গ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দ আশ্রম স্বামী বিবেকানন্দের ১১৩তম জন্মোৎসব পালনের জন্য একটি কমিটি গঠন করিয়া এই অঞ্চলের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ও প্রতিষ্ঠানে ১৫ই জানুআরি হইতে ৮ই মার্চ পর্যন্ত নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

এই উপলক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে গল্প-বলা, বক্তৃতা, আবৃত্তি ও প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের প্রায় একশত ছাত্র অংশ গ্রহণ করে।

৮ই মার্চ, আশ্রম-প্রাঙ্গণে উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষে দেড় সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রীর কেন্দ্রীয় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন শ্রীমৃগাঙ্ক-মোহন সুর এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রায় সত্তর জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এই অনুষ্ঠান পরিচালনায় সহযোগিতা করেন। শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার ও মানপত্র প্রদান করেন। অনুষ্ঠান-প্রাঙ্গণে স্বামীজীর জীবনী অবলম্বনে অঙ্কিত চিত্র-প্রদর্শনীটি বিশেষ আকর্ষণীয় হয়।

[পুনর্মুদ্রণ]

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ]　　১লা ভাদ্র। (১৩০৬)　　[১৫শ সংখ্যা।]

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান

সংক্রামক রোগ।

(ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

মহামারীর কারণ ; প্রাচীন মত।

মনুষ্য-প্রকৃতি বিভিন্ন হইলেও কি কারণে এক সময়ে একরূপ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া জনপদের উদ্ধংসন হয়, এই প্রশ্নের মীমাংসায় চরকে ভগবান্ আত্রেয় বলিয়াছেন, "বায়ু, জল, দেশ ও কাল বিপরীত গুণসম্পন্ন হইয়া জনপদ ধ্বংস করিয়া থাকে" এবং

বায়ব্াদীনাং যদ্বৈগুণ্যমুৎপদ্যতে তস্য মূলমধর্ম্মঃ তন্মূলঞ্চাসৎকর্ম্ম
পূর্ব্বকৃতং। তয়োর্যোনিঃ প্রজ্ঞাপরাধ এব।

বায়ু প্রভৃতির বৈগুণ্যের মূল অধর্ম্ম, পূর্ব্বকৃত অসৎ কর্ম্ম সেই অধর্ম্মের কারণ এবং জ্ঞানকৃত অপরাধ এই উভয়ের কারণ। সুশ্রুতে উল্লিখিত আছে, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা উপযুক্ত কালে না হইলে ওষধি ও জল বিগুণ হয় ও তাহাদিগের সেবনে রোগ ও মারীভয় উপস্থিত হয়। কখন পিশাচ ও রাক্ষসাদির ক্রোধে বা অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবহেতু দেশ ধ্বংস হয়। বিষাক্ত ওষধি ও পুষ্পের গন্ধ প্রবাহেও দেশ এইরূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে। গ্রহনক্ষত্রের গতি দ্বারা অথবা গৃহ, শয্যা, আসন, যান, বাহন, মণিরত্ন প্রভৃতি মন্দলক্ষণযুক্ত হইলে মারীভয় উপস্থিত হয়। মারীভয় প্রাদুর্ভূত হইলে স্থান-পরিত্যাগ, শান্তিকর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত, জপ, হোম, দয়া, দান প্রভৃতির অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হইয়াছে।

মহামারীর এই সকল কারণ ও নিবারণপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয়, এই সকল রোগের সংক্রামতা স্পষ্ট উপলব্ধি হয় নাই। সুশ্রুত কোন কোন জ্বর, কুষ্ঠ, কাশ, শোষ, নেত্র-রোগ, গাত্রসংস্পর্শ, নিশ্বাস, আলাপ, সহভোজন প্রভৃতি দ্বারা মনুষ্য হইতে মনুষ্যান্তরে সংক্রমিত হয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।—

প্রসঙ্গাদ্গাত্রসংস্পর্শান্নিশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
সহশয্যাসনাচ্চাপি বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ॥
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ।
ঔপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরম্॥

কিন্তু এ সকল রোগ মারীভয় উৎপাদক বলিয়া কোথাও বর্ণিত হয় নাই। এবং যদিও মারীভয়ের প্রাদুর্ভাব হইলে স্থান পরিত্যাগের বিধান করিয়াছেন, কিন্তু তাহা বৈগুণ্যযুক্ত জল ও বায়ু প্রভৃতি সাধারণ নৈসর্গিক কারণ সকলের হস্ত অতিক্রমের নিমিত্ত বলিয়া অনুমিত হয়। চরকের ন্যায় গ্রীক পণ্ডিত হিপোক্রেতিস্ দেশ বায়ু ও জল-বৈগুণ্যে মারীভয়ের উৎপত্তি অনুমান করিয়াছিলেন। সুশ্রুতের পিশাচ ও রাক্ষসাদির ক্রোধের অনুরূপ ইহুদি জাতির ধর্মগ্রন্থে মারীভয় সৃষ্টিকর্ত্তা জিহোবার ক্রোধহেতু বলিয়া উল্লিখিত আছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমকেরা দেবমূর্ত্তি-নির্ম্মাণ, উপবাস, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন দ্বারা মারীভয়ের কারণ দেবক্রোধ উপশমনের চেষ্টা করিতেন। ইউরোপে খৃষ্টধর্ম্মযাজকগণের মধ্যে মহামারী যে ঈশ্বরকোপসম্ভূত এ বিশ্বাস বহুকাল আধিপত্য করিয়াছে এবং ঐশীক্রোধ প্রশমনের নিমিত্ত তাঁহারা মহোৎসব, প্রায়শ্চিত্ত, ধর্ম্মমন্দিরনির্ম্মাণ প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠানের বিধান করিতেন। কোন স্থানে মারীভয় প্রাদুর্ভূত হইলে সহসা এককালে এক রোগে বহুলোক আক্রান্ত হইতে থাকিলে সহজে এই অনুমান হয় যে, কোন একটী সর্ব্বত্র বিস্তৃত কারণ দ্বারা লোকসাধারণ সমভাবে অভিভূত হইতেছে এবং জ্ঞানের তারতম্যে সেই কারণ কথন দেব পিশাচাদি অতীন্দ্রিয় শক্তি, কথন গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডল, কথন বা জল বায়ু প্রভৃতি সাধারণ নৈসর্গিক পদার্থ বলিয়া স্থির হইয়া থাকে। কিন্তু রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যে রোগবিস্তারের মহাকারণ, সংক্রামকতা দ্বারা যে মনুষ্য হইতে মনুষ্যান্তর আশ্রয় করিয়া মহামারী বহু বিস্তৃতি লাভ করে, স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের এই সত্য বহুকাল তমসাচ্ছন্ন ছিল। সংক্রামকরোগোৎপাদক কারণবিশেষ, দেশ জল বায়ু আশ্রয় করিয়া প্রবলতা বা প্রশমতা লাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু কেবল দেশ জল বা বায়ু-বৈগুণ্য, সংক্রামক রোগোৎপত্তির মুখ্য কারণ নহে। জনপদধ্বংসকর রোগগ্রস্ত জীবের দেহমধ্যে সেই রোগবীজ বর্ত্তমান থাকে; দেহাদি সংস্পর্শরূপ সাক্ষাৎসম্বন্ধ দ্বারা বা দেশ জল বায়ুর সাহায্যে সেই বীজ অন্য জীবদেহে সংক্রমিত হইয়া তদনুরূপ রোগ উৎপন্ন করে। আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের এই মত।

মহামারীর কারণ। আধুনিক মত।

অতি প্রাচীন কাল হইতে অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ কোন কোন রোগের সংক্রামকতা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সুশ্রুত কাশ, যক্ষ্মা, জর, চর্ম্মরোগ ও নেত্ররোগ সংক্রামক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ভাবমিশ্র বসন্ত পীড়াগ্রস্ত রোগীকে শুচি থাকিয়া, সর্ব্বপ্রকার সংস্পর্শ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এই সকল রোগবীজ কি পদার্থ, কাহার সংক্রমণ দ্বারা মনুষ্য হইতে মনুষ্যান্তরে তদনুরূপ রোগ উৎপন্ন হয়, সে বিষয়ের কোন আভাস পাওয়া যায় না। ইহার প্রকৃতি বাষ্প বা কোনরূপ সূক্ষ্ম তরল বা কঠিন জড় পদার্থ এ প্রশ্নের মীমাংসায় রসায়নশাস্ত্র উত্তর দিতে অক্ষম। সংক্রামক রোগের বিস্তৃতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, একটী রোগগ্রস্ত ব্যক্তি তৎপল্লিস্থ অপর দশজনকে রোগাক্রান্ত করিয়া থাকে; আবার সেই দশজন শতাধিক লোকের মৃত্যুর কারণ হয়। এইরূপ অল্পাধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্তি সকল সংক্রামক রোগের সাধারণ ধর্ম্ম। সকল দেশে, সর্ব্বকালে সংক্রামক রোগের উৎপত্তি ও প্রবলতা সময়ে এ নিয়মের অন্যথা দেখা যায় না। বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া তাহা হইতে আবার শত সহস্র বীজোদ্ভবের ন্যায় সংক্রামক রোগবীজ শতসহস্রে বিভক্ত হইতে থাকে। জীবশক্তির সহিত উৎপত্তি ও বৃদ্ধির এরূপ সাদৃশ্য দর্শন করিয়া আধুনিক স্বাস্থ্যবিদেরা এই সকল

রোগবীজ সজীব পদার্থ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সুতরাং ঈদৃশ বিচারপথ অনুসরণ করিয়া ইহা সূক্ষ্ম জীবাণুপ্রকৃতিবিশিষ্ট অনুমিত হইয়াছে। ক্রমে পরীক্ষার উৎকর্ষতার সহিত রোগীর রক্তরসাদিতে জীবাণু পরিলক্ষিত হইয়াছিল এবং সম্প্রতি অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে ইহারা উদ্ভিদণুজাতীয় বলিয়া স্থির হইয়াছে। কিন্তু উদ্ভিদণুবিশেষ যে সংক্রামক ব্যাধিবিশেষের মুখ্যকারণ, ইহাদের বর্ত্তমানতা যে রোগবিশেষের কার্য্য নহে, এই বিষয়ে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা কি প্রমাণ প্রয়োগ করেন? প্রথমতঃ, কোন উদ্ভিদণু কোন রোগের কারণ বলিয়া গৃহীত হইবার পূর্ব্বে সেই রোগগ্রস্ত প্রত্যেকের দেহে সেই বিশেষ উদ্ভিদণুর বর্ত্তমানতা প্রমাণ করা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, সেই উদ্ভিদণু অন্য কোন সংক্রামকরোগে বর্ত্তমান থাকিবে না। তৃতীয়তঃ, ইহাকে রক্তরসাদি, সর্ব্বপ্রকার অবান্তর পদার্থ হইতে পৃথক করিয়া কেবল স্বতন্ত্র উদ্ভিদণুমাত্রকে লইয়া বৃদ্ধির উপযোগী ভূমিতে পোষণ করিতে হইবে, অনন্তর পুনরায় দেহান্তরে প্রবিষ্ট করাইলে সেই ব্যাধি-উৎপাদনে সমর্থ হইবে। এবং চতুর্থতঃ, পরীক্ষিত দেহের রসরক্তাদিতে সেই উদ্ভিদণু প্রত্যক্ষ হইবে। এই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইতে পারিলে কোন উদ্ভিদণু রোগবিশেষের কারণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। অবশ্য মনুষ্যদেহ লইয়া এরূপ পরীক্ষা অসম্ভব। কিন্তু যে সকল সংক্রামক ব্যাধি ইতর প্রাণীদিগকে উৎসন্ন করে এবং যাহাদিগের দ্বারা মনুষ্য ও ইতর জন্তু উভয়েই পীড়িত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে এইরূপ পরীক্ষায় সপ্রমাণিত করা অপেক্ষাকৃত সহজ। এই শ্রেণীর অধিকাংশ সংক্রামক ব্যাধি যে উদ্ভিদণুসম্ভূত, তাহা ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ করিয়াছেন। মনুষ্যপীড়ক যে সকল সংক্রামক ব্যাধি এইরূপে প্রমাণিত হইতে পারে না, উদ্ভিদণু বা তৎসদৃশ জীবশক্তি যে তাহাদিগেরও কারণ, তাহার বলবৎ প্রমাণ বিদ্যমান আছে এবং আশা করা যায়, শীঘ্র বা বিলম্বে সকল সংক্রামক ব্যাধি সম্বন্ধে ইহার সম্পূর্ণ সত্যতা প্রতিপাদিত হইবে। উদ্ভিদণুর জীবন-ক্রিয়া, জন্ম স্থিতি ও বৃদ্ধির নিয়ম, ইহাদিগের রোগোৎপত্তিপ্রণালী ও জগৎব্যাপারে ইহাদিগের কার্য্যকারিতা অতিশয় রহস্যজনক। আমরা এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ সার মর্ম্ম অবধারণ করিয়া সংক্রামক রোগের বিস্তারপ্রণালী ও নিবারণোপায় আলোচনা করিব।

জৈমিনি ও কর্ম্মমীমাংসা।

(পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

জৈমিনীর দর্শনের দ্বিতীয় সূত্র পাঠ করিলে কি বুঝা যায়? যেদিন ভারতে বেদের চর্চ্চা বিদ্বৎসম্প্রদায়ের প্রধান অবলম্বন ছিল; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত ও জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে বেদার্থ গ্রহণ করিয়া সংহিতা ও পুরাণ প্রণয়ন করিয়া সমাজের পরম হিতৈষী বেদব্যাস প্রভৃতি মুনিগণ ভারতের গৃহে গৃহে জ্ঞানের আলোক বিস্তার করিতেন, সেই হিন্দুর ধর্ম্মশিক্ষার চরম উন্নতির দিনে জৈমিনির ন্যায় স্বাধীনচেতা সত্যদর্শী সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী মুনি বেদকে হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ

বলিতে একটুমাত্রও ইতস্ততঃ করিতেন না। অগ্র হইতে শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বেদই যে একমাত্র ধর্ম্ম ব্যতিরেকে অন্য কোন বস্তু প্রতিপাদন করে না, ইহাই বুঝাইবার জন্য তিনি এত বড় মীমাংসা-দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন, সংস্কৃতদর্শনশাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট এই বিষয়টী বুঝাইবার জন্য প্রয়াস নিরর্থক।

"চোদনালক্ষণোঽর্থোধর্ম্মঃ" এই কথার দ্বারা বেদের লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়া জৈমিনি বিরত হন নাই; তাঁহার মনের ভাব আরও বিশদ ভাবে বুঝাইবার জন্য আর একটু অগ্রে তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে,—

"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্" (মীমাংসাদর্শন ১ম অঃ ২য় পাঃ ১ম সূঃ)।

অর্থ।—ধর্ম্মসাধন ক্রিয়াই বেদার্থ, এই কারণ ধর্ম্মহেতু যাগাদি কার্য্যব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার অর্থ প্রকাশ করিতে গেলে বেদ অনর্থক হইয়া উঠে।

বিষম সমস্যা! ঊনবিংশ শতাব্দীর সুশিক্ষিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ একবাক্যে আমাদিগকে বুঝাইবার জন্য প্রয়াস করিতেছেন যে, মধ্য এসিয়া হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়া আর্য্যজাতির আদি পুরুষগণ, রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে বিকাশোন্মুখ সভ্যতার অপরিপক্ক অবস্থায় নূতন নূতন দেশে প্রকৃতির নব নব সৌন্দর্য্য বিলোকন করিয়া, নব বিকাশোন্মুখ কল্পনার স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া দিয়া, প্রমোদ ভরে অপরিস্ফুট সভ্যতার সুরে মাতোয়ারা হইয়া, যাহা কিছু গাহিয়াছেন, বেদ তাহারই সংগ্রহ ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে; বেদের অতি প্রাচীনতম ভাগ বিলোকন করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতের আদিম অধিবাসীগণের সহিত অবিশ্রান্ত বিবাদে প্রবৃত্ত প্রাচীন হিন্দুগণ প্রতিদিন নব নব বিজয়লাভে প্রোৎসাহিত হইয়া নূতন নূতন উৎসবের ক্ষেত্রে মিলিত স্বজাতি গৌরবের গীতধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতেছেন, সম্মুখপতিত সুবিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্রের এক প্রান্ত হইতে উদীয়মান উষার সুবর্ণরঞ্জিত আলোকচ্ছটার মনোহর বিকাশে উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইয়া কখনও বা তাঁহারা কল্পনাময়ী কবিতার বিমল রস আস্বাদন করিতেছেন; ইহাই হইল বেদবিষয়ে বর্তমান ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মত। তাঁহাদের মতে বেদ, উদীয়মান প্রাচ্য আর্য্যজাতির প্রাচীন কল্পনাময় সঙ্গীত! কবিতার ভাষায় লিখিত, প্রাচীন হিন্দুর ভারত-প্রবেশের ও ভারতাধিকারের অপরিস্ফুট ইতিহাস। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এইমত ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত তাহার সিদ্ধান্ত করিবার জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা করা হয় নাই। বেদ বলিলে প্রাচীন ভারতের বড় বড় আচার্য্যগণ কি বুঝিতেন, বেদে প্রবেশ করিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে এই বিষয়ে প্রাচীন বেদবিৎ আচার্য্যগণের কি অভিপ্রায়, তাহাই বুঝাইবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা, সুতরাং সেই দিকেই আমাদের এক্ষণে অগ্রসর হইতে হইবে।

সমগ্র বেদ ধর্ম্মকার্য্য ব্যতিরেকে আর কিছু বোধ করাইতে পারে না; হিন্দুজাতির ঐহিক পারত্রিক সুখ বা দুঃখনিবৃত্তির উপায় বুঝিতে হইলে বেদ ও বেদমূলক স্মৃতি বা পুরাণ ব্যতিরেকে অন্য কোন পথ নাই; ইহাই বুঝাইবার জন্য জৈমিনি পূর্ব্বমীমাংসা প্রণয়ন করিয়াছেন; একথা জৈমিনির নিজের সূত্র দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

এই সিদ্ধান্তের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে সকল দোষ আরোপিত হইতে পারে, একে একে

তাহা উল্লেখ করিয়া যুক্তির সাহায্যে মহর্ষি জৈমিনি কেমন সুন্দরভাবে খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার বিশদভাবে অবতারণা করিবার স্থান এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কুলাইবে না, পাঠকের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য দুই একটি বিষয়ের অবতারণা করা যাইতেছে। সমস্ত বেদই ধর্ম্মকার্য্যপ্রতিপাদক এই সিদ্ধান্তের উপর প্রথম দোষ এই হইতে পারে যে, অনেক বেদবাক্য এপ্রকার ভাবে লিখিত হইয়াছে যে, তাহা পাঠ করিলেই স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ সকল বাক্য কোন অংশেই কোন প্রকার কার্য্যের প্রতিপাদন করিতেছে না। কতকগুলি এই প্রকার বাক্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"সোঽরোদীৎ যদরোদীৎ তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্"

(তিনি রোদন করিয়াছিলেন, যে কারণে তিনি রোদন করিয়াছিলেন, এই জন্যই সেই রুদ্রের রুদ্রত্ব।)

"স প্রজাপতিরাত্মনোবপামুদখিদৎ"

(সেই প্রজাপতি নিজের বপা বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরস্থ অংশবিশেষ উৎপাটিত করিয়াছিলেন।)

"দেবা বৈ দেবযজনমধ্যবসায় দিশো ন প্রাজানন্"

(দেবতারা দেবযজন সম্পূর্ণ করিয়া দিগ্ভ্রান্ত হইয়াছিলেন।)

এই প্রকার বহুতর বাক্য বেদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, অল্প সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন যে, এই সকল বাক্য দ্বারা কোন প্রকার যাগ হোমাদি ধর্ম্ম কার্য্য প্রতিপাদিত হইতেছে না। এই সকল বাক্য উদ্ধৃত করিয়া জৈমিনিসূত্রের ভাষ্যকার শবরস্বামী যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল "ইত্যেবং জাতীয়কানি তানি কং ধর্ম্মং প্রমিমীরন্? অথোচ্যেত অধ্যাহারেণ বা বিপরিণামেন বা ব্যবহিতকল্পনয়া বা ব্যবধারণকল্পনয়া বা গুণকল্পনয়া বা কশ্চিদর্থঃ কল্পয়িষ্যতে ইতি কল্প্যমানঃ কঃ কল্প্যেত রুদ্রঃ কিল রুরোদ অতোঽন্যেন রোদিতব্যম্ উচ্চিখেদ আত্মবপাং প্রজাপতিঃ অতোঽন্যোঽপ্যুৎখিদেদাত্মনো বপাম্ দেবা বৈ দেবযজনকালে দিশো ন প্রজ্ঞাতবন্তোঽতোঽন্যোঽপি দিশো ন প্রজানীয়তে ইতি তচ্চাশক্যম্ ইষ্টবিয়োগেন অভিঘাতেন বা যৎ বাষ্পনির্মোচনং তৎ রোদনমিত্যুচ্যতে ন চ তৎ ইচ্ছাতো ভবতি…অত এষামানর্থক্যম্। ইত্যাদি

অর্থ। এই প্রকার যে বাক্যসকল (উদ্ধৃত হইল) তাহা কোন্ ধর্ম্মকে প্রতিপাদন করিতেছে? যদি বল কতকগুলি নূতনপদ সন্নিবেশিত করিয়া অর্থান্তরে পরিণত করিয়া, ব্যবহিত বাক্যের সঙ্গে অন্বয় কল্পনা করিয়া, সাবধারণ অর্থকল্পনা করিয়া, কিম্বা কোন প্রধান কর্ম্মের অঙ্গবোধকত্ব কল্পনা করিয়া, এই সকল বাক্যের কোন কাযরূপ অর্থকল্পিত হইতে পারে; তাহা সম্ভবপর নহে। কারণ, কল্পনা করিতে গিয়া কোন্ অর্থের কল্পনা করিবে?—"রুদ্র কবিয়াছিলেন বলিয়া অন্যেরও রোদন করিতে হইবে," "প্রজাপতি নিজের বপা উৎপাটন করিয়াছিলেন বলিয়া অন্যজনও নিজের বপা উৎপাদন করিবে," "দেবযজনকালে দেবতারা দিশেহারা হইয়াছিলেন এই জন্য (যাগ কালে) অন্যেরও দিগ্ভ্রান্ত হইতে হইবে"; এই প্রকার অর্থই অধ্যাহারাদি দ্বারা কল্পনা করিতে হইবে। কিন্তু, তাহাও ত উচিত নহে। কেন? —প্রিয়বিরহে বা শরীরে আঘাত লাগিলে নয়ন হইতে জল নির্গমকে লোক রোদন বলে। (বেদ বলিতেছে এইজন্য ; ইচ্ছামাত্রেই রোদন হইবে, ইহা হইতে পারে না…এই কারণে বলিতে হইতেছে যে, বেদের এই সকল অংশের কোন প্রকার অর্থ নাই

ইত্যাদি। এই প্রকার দোষ খণ্ডন করিবার জন্য সূত্রকার যে সুন্দর ও সত্য যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।— [ক্রমশঃ।]

অন্নচিন্তা

(৫)

(বাবু প্রবোধ চন্দ্র দে লিখিত।)

আজকালের যেরূপ বিদ্যাশিক্ষা হইয়া থাকে, তাহাতে লোকের আত্মাভিমান হ্রাস না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে এবং এই আত্মাভিমানই অনেক সময়ে যুবকগণের উন্নতির পথে কণ্টক প্রদান করে। যে দেশের লোক বিদ্যাশিক্ষাকে মনুষ্যজীবনের প্রধান কার্য্য ও কর্ত্তব্য মনে করিতে পারে না, সে দেশে বিদ্যার প্রাধান্য নাই। বিদ্যা শিক্ষা এক, এবং ধনোপার্জ্জন অন্য, একথা যদি শিক্ষার্থী বা কার্য্যনবিসের মনে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে, তাহা হইলে কার্য্যনবিস কার্য্যের ইতরবিশেষত্বের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া আপন মনে কার্য্য করিয়া যাইতে পারে এবং শিক্ষার্থীও শিক্ষা শেষ করিয়া—শিক্ষার অভিমান ভুলিয়া গিয়া দেশকালের অধীন হইয়া উপস্থিত মত কার্য্যে নিযুক্ত হইতে সঙ্কুচিত হয় না। এই আত্মাভিমানবশতঃ এদেশে দিন দিন এত বেকার ভদ্রসন্তানের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং এই কারণেই অধিকাংশ গৃহস্থই অভাব অনাটনে দিন যাপন করিতেছেন। যে পাশ্চাত্যশিক্ষায় আমাদিগের চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছে, সেই দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই, সাহেবেরা কার্য্যক্ষেত্রে নিজের জাতিমর্য্যাদা, বংশগৌরব, বিদ্যাভিমান প্রভৃতি ভুলিয়া গিয়া সংসারকুজ্ঝটিকায় যে কোন বন্দরের আশ্রয় গ্রহণ করে, সম্মুখে উপস্থিত যে কার্য্য পায়, তাহাই গ্রহণ করে। যে সে কার্য্য হইলেও কিন্তু তাহাদিগের মনে থাকে যে, উন্নতির পথ অবরুদ্ধ নহে, সুতরাং কার্য্যে তাহাদের চেষ্টা থাকে, যত্ন থাকে; সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন আমাদিগের ন্যায় অধঃপথে না গিয়া, উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে। দরিদ্রের আবার অভিমান কি? অর্থের নিকট সমগ্র সংসার পরাজিত। অর্থ হইলে সমাজ তোমার পদানত হইবে, আত্মীয় স্বজন গুণ গান করিবে। সুসভ্য ইয়ুরোপ ও উন্নত আমেরিকা তাহা বুঝে, সেই জন্য তথায় এত ধনকুবেরের ছড়াছড়ি, আমরা বুঝি না, আমাদিগের দেশে দরিদ্রের ছড়াছড়ি। অনেকের এরূপ ধারণা আছে যে, আসামের চা বাগানে যত মূর্খ ও নীচবংশীয় সাহেবেরা দিন গুজরান করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম। সেখানেও অক্সফোর্ডের উপাধিধারীকে দেখা যায়, সেখানেও উচ্চবংশোদ্ভব সাহেবকে কায করিতে দেখা যায়।

জাতি ও বংশমর্য্যাদা বাঙ্গালী জাতির উন্নতির পথকে একেবারে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উপযোগিতা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে। যাহার যতদূর শিক্ষা, কার্য্যক্ষমতা, তদনুরূপই আশা আকাঙ্ক্ষা করা উচিত; কিন্তু তাহা না করিয়া জাতি ও বংশগৌরবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করা একেবারেই অসম্ভব, একথা বলিলে অন্যায় হয় না। পুরাকালে জাতি-

বিশেষের একটা বিশেষ বিশেষ পেশা নির্দ্দিষ্ট ছিল, সুতরাং প্রত্যেক জাতিই জাতীয় ব্যবসা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত, কিন্তু এক্ষণে শিক্ষার সার্ব্বভৌমিকতাহেতু উচ্চেতরজাতিনির্ব্বিশেষে লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং নীচজাতিগণ স্ব স্ব জাতীয় ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া অপরের ব্যবসায় বা পেশাতে প্রবৃত্ত হইতেছে, অথচ ভদ্রশ্রেণীর লোকেরা এবম্প্রকারে পরিত্যক্ত ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছেন না। ভদ্রলোকদিগের পেশাব্যবসায়সকল অপর জাতিদিগের দ্বারা অধিকৃত হওয়াতে ভদ্রলোকদিগের একদিকে যেরূপ কষ্ট হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি অন্য জাতির শিক্ষিতদিগের মধ্যে জাতীয় পেশা অবলম্বন করিতে সঙ্কুচিত হওয়ায় তাহাদিগেরও কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। জাতিবিশেষ যে, জাতীয় ব্যবসা লইয়া চিরকাল থাকিবে, শিক্ষিত হইবে না অথবা সভ্যসমাজে মিশিবে না, একথা আমরা বলি না। সংসার চিরদিন পরিবর্ত্তনের অধীন। আজ যে জাতি উচ্চ আছে, কাল তাহার অন্যগতি হইতে পারে, কিন্তু এরূপ পরিবর্ত্তনে যে স্থান শূন্য হয়, তাহা পরিপূরণ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। শূন্যস্থান পরিপূরিত না হওয়াতেই এত দুঃখ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে।

সংসারক্ষেত্রে, যে কোন পেশা অবলম্বনেই হউক না কেন, সদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিলে বংশের গৌরব, জাতির গৌরব সবই রক্ষা করিতে পারা যায়। বৃথা অভিমান—বালির বাঁধ ভিন্ন আর কিছুই নহে, সমাজের তরঙ্গে আজ না হয় কাল, না হয় দশ দিন পরে, অবশ্যই তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, কিন্তু পূর্ব্ব হইতে তাহার জন্য প্রস্তুত হইলে, সমাজের গতির মুখ সরল করিয়া দিলে, সমাজের ক্ষতি না হইয়া উপকারই হইয়া থাকে। দারিদ্র্যের প্রপীড়নে, অর্থের অনাটনে, ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে বালির বাঁধ ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা না হইলে আজ ব্রাহ্মণ—শূদ্রের দাসত্ব করিবে কেন? সূত্রধর, স্বর্ণকার, চর্ম্মকার, রজক স্ব স্ব ব্যবসায় ছাড়িয়া রাজদ্বারে চাকরি করিবে কেন? বৈদ্যকুলসম্ভূত ব্যক্তিগণ পৈতৃক ব্যবসায় কবিরাজি পেশা পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য দিকে নিযুক্ত হওয়ায় যে সকল স্থান খালি হইয়াছে, তাহা অগত্যা কায়স্থ ও অপর জাতির দ্বারা পরিপূরিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, ভদ্রলোকে দরজীর কারখানা খুলিতেছে, ভদ্রলোকে মিষ্টান্নের দোকান করিতেছে, ভদ্রলোকে হোটেল করিতেছে! ইতরলোকদিগের অনেক ব্যবসায়ে ভদ্রলোক প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এইরূপে জাতিগত ব্যবসায় জাতি-বিশেষ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় অন্যজাতি দ্বারা সেই সকল খালি স্থান পরিপুষ্ট হইতেছে, তাহাতেই তত অভাব জানিতে পারা যাইতেছে না। আবার নীচ ব্যক্তিগণ স্বীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করায়, অন্যথা জনসমাজের অভাব সম্যক্রূপে মোচন করিতে না পারায় ভদ্রলোক দ্বারা সে কার্য্য হইতেছে এবং সুচারুরূপে হইতেছে, সুতরাং ইহা দ্বারা সমাজের উপকার ভিন্ন অপকার হইতেছে না, ইহা নিশ্চয়।

ইয়ুরোপ, আমেরিকা ও জাপানের দিন দিন ক্রমোন্নতি দেখিয়া লোকে বুঝিয়াছে যে, শিল্প বাণিজ্য ব্যতীত কোন দেশের উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে। এই কারণে বাঙ্গালা দেশের কোন কোন সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগকে ইয়ুরোপ, আমেরিকা বা জাপানে পাঠাইয়া শিল্প বাণিজ্যাদি শিখাইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। উদ্যোক্তাদিগের সঙ্কল্প সাধু হইলেও আমরা কিন্তু তাঁহাদিগের সহিত এক মত হইতে পারি না, তাহার কারণ এই যে, এই সকল শিক্ষার্থী সঙ্কল্পিত বিদ্যালাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে কার্য্যক্ষেত্রে তাহাদিগের কোন উপায় নাই। পরের অর্থের

সাহায্যে যাহারা কোন বিদ্যা শিক্ষা করিতে যাইবে, স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া অর্থাভাববশতঃ তাহারা স্বাধীনভাবে যে কোন কার্য্য করিতে পারিবে,—কোন কলকারখানা স্থাপন করিতে পারিবে, এরূপ আশা নাই। দ্বিতীয়তঃ, সাহেবদিগের যে সকল কলকারখানা আছে, তাহাতে কার্য্যতঃ দেশীয়-দিগের প্রবেশাধিকার নাই ; থাকিলেও, তদ্দ্বারা দেশীয় সাধারণের কি উপকার হইতে পারে ? সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া গিয়া অপরের অর্থে যে বিদ্যাটুকু লাভ হইল, তাহা যদি দেশের আর পাঁচ জন শিক্ষা করিতে না পাইল,—স্বদেশী সাধারণে তাহার ফলভোগভাগী না হইল, তাহা হইলে দাতার অর্থব্যয় ব্যর্থ হইল ; গ্রহীতার শ্রম ও সময় পণ্ড হইল বলিতে হইবে। এই প্রকার দান বা সাহায্য ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয় না, একথা নিশ্চিত ; সুতরাং দাতা ও গ্রহীতার কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। স্বদেশীয় অর্থে যদি দেশমধ্যে কলকারখানা স্থাপিত থাকিত, অথবা সেই সকল প্রত্যাগত শিক্ষালব্ধ ব্যক্তিদিগের প্রত্যাগমনের পরে কারখানাদি সংস্থাপিত হইবার আশা থাকিত, তাহা হইলে আমরা এ সম্বন্ধে নিরুৎসাহজনক কোন কথাই বলিতাম না। আর যদি উদ্যোক্তা-গণের এমনই সঙ্কল্প থাকে যে, উক্ত শিক্ষার্থীগণ নির্দ্দিষ্ট বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আসিলে স্ব স্ব অর্থে কারখানা সংস্থাপন করিবেন ও প্রত্যাগত ব্যক্তিদিগকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিব না। তথাপি কিন্তু আমরা একটী পরামর্শ না দিয়া থাকিতে পারি না। প্রতি বৎসর বা দুই তিন বৎসর অন্তর দুই চারিটী যুবককে বিদেশে পাঠাইতে ও তথায় তাহাদিগের খরচ নির্ব্বাহ করিতে অনেক টাকার আবশ্যক এবং ২০।২৫টী বালকের শিক্ষিত হইয়া আসা বহুদিনসাপেক্ষ। এজন্য আমাদিগের মনে হয়, যুবকদিগকে বিদেশে প্রেরণ না করিয়া অগ্রেই দেশমধ্যে দেশীয় অর্থে যদি দুই একটী কারখানা স্থাপন করা যায় এবং ইয়ুরোপীয় বা মার্কিন দেশীয় কোন কৃতী ব্যক্তির হস্তে কয়েক বৎসরের জন্য তাহার কার্য্যনির্ব্বাহের ভার অর্পিত থাকে, সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় যুবকদিগকে উহাতে শিক্ষানবিসি করিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে কার্য্যটী সুদৃঢ় হয়। আরও এক কথা এই যে, দুই তিন বৎসরে কোন ব্যক্তি কলকারখানা সমুদায় ব্যাপার নিখুঁৎভাবে শিখিয়া আসিতে পারে না। পড়িয়া বা দেখিয়া যে শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা হয়, কার্য্যক্ষেত্রে তাহা কতদূর কার্য্যকারী হইবে, তাহা সন্দেহের কথা, এই জন্যই বলি, দুই তিন বৎসরে কারখানা ব্যাপারের সমুদায় বুঝিয়া উঠা সম্ভবপর নহে। এইরূপে বিলাতীশিক্ষা লাভ করিয়া আসিলে তাহার উপর কোন কারখানার সম্পূর্ণ ভারার্পণ করিতে পারা যায় কিনা তাহাও বিবেচ্য, সুতরাং অস্মৎপ্রস্তাবিত প্রণালীতে (১) এদেশে কারখানা স্থাপন করা, (২) সুযোগ্য ইয়ুরোপীয় বা মার্কিনদেশীয় ব্যক্তির উপর কার্য্যনির্ব্বাহের ভারার্পণ করা, (৩) সেই কারখানাতে দেশীয় যুবকদিগকে কার্য্যকারী (practical, ও বৈজ্ঞানিক (Scientific and theoretical) শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। [ক্রমশঃ]

দিব্য বাণী

যো দেহঃ সুপ্তোঽভূৎ সুপুষ্পশয্যোপশোভিতে তল্পে।
সম্প্রতি স রজ্জু-কাষ্ঠৈ র্নিয়ন্ত্রিতঃ ক্ষিপ্যতে বহ্নৌ ॥
সিংহাসনোপবিষ্টং দৃষ্ট্বা যং মুদমাপ লোকোঽয়ম্।
তং কালাকৃষ্টতনুং বিলোক্য নেত্রে নিমীলয়তি ॥
এবংবিধোঽতিমলিনো দেহো যৎসত্তয়া চলতি।
তং বিস্মৃত্য পরেশং বহত্যহন্তামনিত্যেঽস্মিন্ ॥

—শংকরাচার্য । প্রবোধসুধাকর, ২৫-২৭

সুপ্তি-মগন ছিল যে শরীর কুসুমশয্যা 'পরে,
কাষ্ঠ রজ্জু তারে করে নিয়ন্ত্রিত অন্তিমদাহ তরে।
রাজসিংহাসনে সমাসীন দেহ লোক-নয়নানন্দ—
কালকবলিত হেরি সবে আজি নেত্র করিছে বন্ধ।
যাঁর সত্তায় অনিত্য মলিন দেহ হয় ক্রিয়াবান্
সেই পরমেশে ভুলিয়া মানুষ করে দেহে অভিমান।

কথাপ্রসঙ্গে

বিচারের তীর্থপথে প্রথম পদক্ষেপ

আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের ভাববাদী (idealistic) ঐতিহ্যের জনক বলিয়া অভিহিত, ফরাসী দার্শনিক দেকার্তের কথা অনেকেরই সুবিদিত। 'Cogito ergo sum' (I think, therefore I am—আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি)—তাঁহার এই উক্তিটি প্রবাদ-বাক্যের ন্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তৎকালে প্রচলিত কোন ধ্যান-ধারণাই তিনি বিনা বিচারে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে আমরা যে-জ্ঞান আহরণ করি, তাহাকে নিরঙ্কুশ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ফলে তিনি সকল বিষয়েই সন্দেহ করিতে আরম্ভ করেন। ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য, বাহ্য জগতের অস্তিত্ব, নিজের শরীর, এমন কি যে-গণিতবিদ্যায় তিনি একজন ধুরন্ধর বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তাহার সত্যসমূহকেও তিনি সন্দেহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরিশেষে তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, তিনি যে সন্দেহ করিতেছেন—এই ব্যাপারটি তিনি কোনক্রমেই সন্দেহ করিতে পারেন না, অর্থাৎ সন্দেহের দ্বারা সন্দেহ-ক্রিয়া নিরাকৃত হইতে পারে না—তাঁহার সন্দেহ করা-টি বাস্তব সত্য। কিন্তু সন্দেহ করার অর্থই হইল চিন্তা করা। সুতরাং দেকার্ত বলিলেন : আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি।

যাঁহারা বেদান্তের বিচার-রাগের সহিত পরিচিত, দেকার্তের এই উক্তিটি তাঁহাদের কানে বেসুরো বাজিবে। তাঁহারা বলিবেন, উহা—ইংরেজীতে যাহাকে বলে, 'putting the cart before the horse' তাহার— অর্থাৎ কার্য-কারণের নিয়ম উল্টানোর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বেদান্ত বলেন, আগে আমি আছি, তাহার পর আমি চিন্তা করি— বস্তুতঃ যখন আমি চিন্তা করি না (যেমন সুষুপ্তিতে বা নির্বিকল্প সমাধিতে), তখনও আমি আছি ; আমার চিন্তা করা বা না করার উপর আমার অস্তিত্ব নির্ভর করে না। সুতরাং দেকার্তের 'আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি'— এই কথাটি বেদান্তের সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই আক্ষেপোক্তি দেকার্তের প্রতি প্রযোজ্য নহে। কারণ, তিনি তাঁহার উক্তির ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, উহা ন্যায়শাস্ত্রের হেতু-অবয়ব-বিশিষ্ট একটি বাক্য নহে—'অতএব'-শব্দটি আপাতদৃষ্টিতে হেত্বর্থক প্রতীয়মান হইলেও উহা হেত্বর্থক নহে ; ফলতঃ 'আমি চিন্তা করি'—ইহার অর্থই হইল 'আমি আছি'।

দেকার্তের স্বলিখিত এই ব্যাখ্যা হইতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, দেকার্ত মনকেই নিজ অবিনাশী সত্তারূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ইহাকেই আমরা বলিতে পারি —বিচারের তীর্থ-পথে প্রথম পদক্ষেপ।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে ভগিনী নিবেদিতার কথা। 'The Master as I saw him'-গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন যে, স্বামীজীকে যখন তিনি প্রথম দর্শন করেন, তাহার অনেক বৎসর পূর্ব হইতেই তাঁহার এই দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল যে, শরীরত্যাগের পর মানুষের অস্তিত্ব বজায় থাকে, এইরূপ কল্পনা করার কোনও বাস্তব কারণ থাকিতে পারে না ; যদি মন না থাকিলে আমাদের শরীরানুভূতি না হয়, তাহা হইলে শরীর না থাকিলে মনের অস্তিত্বও কল্পনা করা যায় না। স্বামীজীর সংস্পর্শে আসিয়া নিবেদিতার এই ধারণা পরিবর্তিত হইয়া যায় এবং তিনি লোকেদের সহিত

কথা বলিবার সময়ে প্রথমে নিজেকে এইরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন যে, তিনি যেন তাহাদের ভিতরকার মনটির সহিতই কথা বলিতেছেন। ইহাতে তিনি যে বিপুল সাড়া পাইলেন, তাহাই তাঁহাকে ক্রমশঃ বিচারপথে অগ্রসর করিয়া লইয়া চলিল; অবশেষে দ্বাদশ মাসান্তে শরীরাপেক্ষা মনকেই মুখ্য জ্ঞান করিবার অভ্যাস তাঁহার দৃঢ় হইয়া গেল। তখন আর তিনি শরীরের নাশের সঙ্গে সঙ্গে মনের নাশ কল্পনা করিতে পারিলেন না। দেহত্যাগকালে চিন্তারাজ্যে কোন আকস্মিক মহাপরিবর্তন উপস্থিত হওয়া অসম্ভব মনে হইল।

নিবেদিতা অবশ্য বিচারের তীর্থপথে এই প্রথম পদক্ষেপ করিয়াই থামিয়া যান নাই। থামিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভবই ছিল, কারণ যোগীশ্বর স্বামীজীকে তিনি শ্রীগুরুরূপে লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত এক বৎসরের পর আর দেড় বৎসরের মধ্যেই স্বামীজীর কৃপায় তিনি আত্মার সন্ধান পাইয়া মন ও আত্মার বিবেক করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অবশ্য স্বামীজী নিবেদিতার মনকে পরিশুদ্ধ করিবার জন্য দীর্ঘকাল নানা অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মানসিক গুরুতর যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়া তাঁহাকে লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর একদিন সন্ধ্যায় আলমোড়ায় নতজানু হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে উপবিষ্ট শিষ্যার মস্তকোপরি আপন শ্রীকর স্থাপিত করিয়া স্বামীজী প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন যে, নিবেদিতা যেন নবজীবন লাভ করেন। বাস্তবিকই সেদিন নিবেদিতা একাকিনী ধ্যান করিতে করিতে উপলব্ধি করিলেন যে, তিনি এক অনন্ত কল্যাণ-সত্তায় একেবারে মগ্ন হইয়া গিয়াছেন—যে নৈর্ব্যক্তিক সত্তা সম্বন্ধে তিনি পূর্বে শত অহংকারমূলক বিচারের দ্বারাও কোনও অনুভূতি লাভ করিতে পারেন নাই। এই প্রসঙ্গে নিবেদিতা অনেক পত্রে লিখিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন, এমন দিন আসিবে যখন স্পর্শমাত্রেই অপরকে জ্ঞানদান করিবার যে জন্মগত ক্ষমতা তাঁহার প্রাণপ্রিয় নরেন্দ্রনাথে নিহিত আছে, তাহা বিকশিত হইয়া উঠিবে—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার প্রমাণ আলমোড়ায় সেই সন্ধ্যাকালে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আলমোড়ায় উপরি-উক্ত অনুভূতির অল্প কিছু দিন পরেই নিবেদিতা একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন: 'একটা ব্যাপার অত্যন্ত পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। শরীর এবং আত্মা সম্পূর্ণ বিভিন্ন।…নিজেকে এত সুখী মনে হইতেছে যে, ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে।'

নিবেদিতার প্রাথমিক বিচারধারার উল্লেখ করিতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে আমরা একটু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আমাদের মুখ্য আলোচ্য শরীর ও মনের বিবেকের প্রসঙ্গে ফিরিয়া যাইতেছি। মনের সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটি স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন। আমেরিকায় প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, 'Let us realise we are all mind'—আসুন আমরা সকলে উপলব্ধি করি যে, আমরা মন। স্বামীজী তো চিরকাল আমাদের 'আমি নিত্যমুক্ত আত্মা', এইরূপ চিন্তা করিতে বলিয়াছেন। সুতরাং এই বক্তৃতায় মনের সহিত তাদাত্ম্য করিতে বলার কারণ কী? কারণটি স্বামীজী ঐ বক্তৃতার প্রারম্ভেই বলিয়াছেন: যুক্তিবিচারের দ্বারা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা নির্ণয় করা ও স্বরূপের প্রত্যক্ষানুভূতি—এই দুয়ের মধ্যে সুদীর্ঘ ব্যবধান রহিয়াছে, যেমন একটি বাড়ির নক্সা ও বাস্তব বাড়িটির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য থাকে। বিচারের দ্বারা সরাসরি নিজ আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া খুবই কঠিন। সকলের জন্য এই পথ নয়। স্থূলদেহাসক্ত মনের পক্ষে ইহা ধারণা করা অতীব দুষ্কর।

ইহা নিশ্চিত সত্য যে, যাঁহারা মনের সহিত নিজ তাদাত্ম্য স্থাপিত করেন—'আমি মন', এই-রূপ ধারণা করেন—তাঁহারা সূক্ষ্ম জড়বাদী ভিন্ন আর কিছুই নহেন, কারণ মন জড় বস্তু। এই কারণে ইহারা যে এক শ্রেণীর চার্বাক, তাহাও সত্য, যদিও যাহারা স্থূলদেহের অতিরিক্ত কোনও সত্তা স্বীকার করে না, তাহাদের অপেক্ষা ইহারা অবশ্যই উন্নত শ্রেণীর চার্বাক।

তথাপি এই ধরনের চার্বাকত্বেরও কিছু উপযোগিতা আছেই। মানুষ সোপান-আরোহণ ক্রমেই প্রাসাদশীর্ষাভিমুখে অগ্রসর হয়। 'আমার বাড়ি', 'আমার গাড়ি', 'আমার বাবা', 'আমার মা', 'আমার শরীর', 'আমার মন'—আপাতদৃষ্টিতে একজাতীয় প্রতীয়মান এই সকল কথার প্রত্যেকটিতে যে দুইটি পদ আছে, তাহাদের সামানাধিকরণ্য নাই—অর্থাৎ পদ দুইটি একই বিভক্তি-যুক্ত নয় এবং সেইহেতু তাহাদের অভেদত্ব সিদ্ধ হয় না। 'আমার বাড়ি' 'আমার গাড়ি' বলিলে কাহারও বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে, আমি বাড়ি নই বা আমি গাড়ি নই—বাড়ি বা গাড়ি হইতে আমি ভিন্ন। 'আমার বাবা', 'আমার মা' বলিলে উক্ত ভেদ স্বীকৃত হইলেও, ভেদের তারতম্য হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ পিতা ও মাতার সহিত আমার স্থূলশরীরের সম্পর্ক আছে। এক্ষেত্রে ভেদ বাড়ি-গাড়ির ভেদ অপেক্ষা কম হওয়াই স্বাভাবিক। আবার যখন আমরা 'আমার শরীর' বলি, তখন শরীরের সহিত আমার যে-পার্থক্য সূচিত হয়, তাহা অনেকটা কথার কথা মাত্র, কারণ আমরা মনে প্রাণে বুঝিয়া রাখিয়াছি যে, আমরা আপাদমস্তক শরীরই—স্থূলশরীরের সহিত আমাদের তাদাত্ম্য এতই নিবিড়। যখন আমরা 'আমার মন' বলি, তখন মন হইতে আমার যে-পার্থক্য সূচিত হয়, তাহা বিচারের দিক দিয়া আমাদের আত্মার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেও, বাস্তবক্ষেত্রে উহাও নিছক কথামাত্র— সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাহিরে, কারণ অনুভূতিভিত্তিক নয়। সুতরাং সর্বাগ্রে 'আমার শরীর'-কথাটির ব্যঞ্জনা পরিষ্কারভাবে বোঝা দরকার। আমি আকেশ-পদনখাগ্র শরীর নই— আমি মন, শরীরটি আমার যন্ত্রমাত্র। 'আমার গাড়ি', 'আমার বাড়ি' আর 'আমার শরীর' যে প্রায় একজাতীয় কথা নিরন্তর বিচারের দ্বারা তাহা দৃঢ়রূপে হৃদয়ে অঙ্কিত করা প্রয়োজন। শরীরের সহিত আমার সম্পর্ক বর্তমানে যতই নিবিড় হউক না কেন, কিছুকাল পরে বাড়ি ও গাড়ির মতোই শরীরটিকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে— ইহা অপেক্ষা ধ্রুব সত্য আর কিছুই নাই, এইরূপ বিচারসহায়ে শরীরকে মন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু জ্ঞান করিয়া শরীরের প্রতি নির্মোহ হইতে হইবে।

অনাদিকাল হইতে এই মন বিচিত্র নটের ন্যায় বারংবার দেব মনুষ্য পশুপক্ষী বনস্পতি আদি বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বরঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতেছে। অতি ক্ষণস্থায়ী এই অভিনয়। মনের আয়ুর তুলনায় স্থূলশরীরের আয়ু আর কতটুকু! বলা যাইতে পারে, মন অনন্তকালস্থায়ী, অর্থাৎ যতদিন পূর্ণ জ্ঞান না হইতেছে, ততদিন ইহা[illegible] বিনাশ নাই। গীতায় আত্মা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, আত্মা অচ্ছেদ্য অদাহ্য অক্লেদ্য ও অশোষ্য। এই চারিটি বিশেষণই সম্পূর্ণভাবে মন সম্বন্ধে প্রযোজ্য — কোন শস্ত্র এই মনকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দহন করিতে পারে না, জল ইহাকে আর্দ্র করিতে পারে না, বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। এইভাবে মননের দ্বারা মন সম্পর্কে আমরা একটি পরিষ্কার ধারণায় আসিতে পারি।

বিচারের এই প্রাথমিক স্তরে যদি ঠিক ঠি[illegible] আসা যায়, তাহা হইলে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি[illegible] মায়ামোহ ক্ষীণ হয়, অতি কৃপণেরও সযত্ন-সঞ্চিত

অর্থের প্রতি আকর্ষণ শিথিল হয়, যে-দেহ এত প্রিয় তাহার প্রতি আজন্ম-পোষিত আসক্তি চলিয়া যায়, মৃত্যুকে বিভীষিকার পরিবর্তে নবজীবনের অভিনন্দনীয় দূত বলিয়া মনে হয়। জন্মান্তর নিবারিত না হইতে পারে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি না হইতে পারে, কিন্তু যেটুকু লাভ হয় বাস্তবজীবনে তাহার উপযোগিতা উপেক্ষণীয় নয়। তবে সাধককে সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, শরীর ও মনের এই বিবেকের চরম সার্থকতা আত্মতীর্থে উপনীত হওয়াতেই। প্রথম পদক্ষেপেই রুদ্ধগতি হইলে চলিবে না। বেদের বাণী: 'চরৈবেতি চরৈবেতি'—'এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও' যেন তাঁহাকে সতত উদ্বুদ্ধ করে। উপনিষদের বাণী: 'আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াদ্ অয়মস্মীতি পূরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঞ্জ্বরেৎ' —"যদি কোন ব্যক্তি 'আমি আত্মা' ইহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন, তবে কোন্ কামনায়, কি প্রয়োজনে, তিনি শরীরের দুঃখে দুঃখী হইবেন?" —ইহা যেন তাঁহার নিভৃত মনোমন্দিরে মঙ্গল-ধ্বনির ন্যায় নিরন্তর অনুরণিত হইতে থাকে। তবেই তিনি কৃতকৃত্য হইবেন—'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন', এই মহতী বাণী তবেই তাঁহার মহিমময় জীবনে চির-ঈপ্সিত চরিতার্থতায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

অনুবাদক: স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

টীকা ঃ নন্ন এবম্ অপি স্তোত্রারম্ভঃ ন যুজ্যতে, তস্য বিষয়-প্রয়োজনয়োঃ অভাবাৎ। তথাহি—প্রত্যগভিন্নং ব্রহ্মৈব বিষয়ঃ ইতি ভবতঃ অভিমানঃ, স চ অনুপপন্নঃ, কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-প্রমাতৃত্বেন প্রতীয়মানস্য প্রতীচঃ (আত্মনঃ) তদ্-রহিত-ব্রহ্মণা অভেদানুপপত্তেঃ।

নন্ন প্রতীচ্যধ্যস্তাহংকারঃ এব কর্তৃত্বাদিনা অনুভূয়তে, ন তু প্রত্যগাত্মা ইতি চেৎ, ন; অধ্যাস-কারণাভাবেন কর্তুঃ অধ্যস্তত্বানুপপত্তেঃ। কিং জড়ে বস্তুনি কর্তুঃ অধ্যাসঃ, উত স্বপ্রকাশে? ন আদ্যঃ, কর্তুঃ অভানপ্রসঙ্গাৎ। ভবন্মতে জড়স্য সর্বস্য অধ্যস্তত্বেন অধিষ্ঠানত্বানুপপত্তেশ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ, স্বপ্রকাশকস্য বস্তুনঃ অজ্ঞান-বিষয়ত্বাভাবেন অধিষ্ঠানত্বাযোগাৎ। লোকে অংশতঃ অজ্ঞাতস্য এব শুক্ত্যাদেঃ অধিষ্ঠানত্ব-দর্শনাৎ। অস্য চ সাংশত্বানঙ্গীকারাৎ চ। ন হি প্রকাশমানস্য অপি অজ্ঞানবিষয়ত্বং সম্ভবতি, প্রকাশাপ্রকাশয়োঃ বিরোধাৎ। সাদৃশ্যাদেঃ বিষয়দোষস্য স্বপ্রকাশ-বিষয়-প্রমিতেঃ অসম্ভবেন তৎকরণ-প্রমাণ-দোষস্য চ অভাবাৎ চ। তস্মাৎ ন কর্তুঃ অধ্যাসঃ ইতি তস্য এব আত্মত্বাৎ তস্য বহুদোষবতঃ নির্দুষ্ট-ব্রহ্মণা অভেদাযোগাৎ ন বিষয়ঃ সম্ভবতি। প্রয়োজনম্ অপি ন সম্ভবতি। আত্মনি প্রতীয়মান-কর্তৃত্বাদেঃ অনর্থস্য নিবৃত্তিঃ হি

প্রয়োজনম্ ইতি বক্তব্যম্। তস্য উক্ত-প্রকারেণ অনধ্যস্তস্য জ্ঞানাৎ নিবৃত্ত্যযোগাৎ ইতি আশঙ্ক্য তদুভয়ং প্রতিপাদয়ন্ স্তুতিম্ আরভতে—যস্মিন্ ইত্যাদিনা।

অনুবাদ : (শঙ্কা): তাহা হইলেও (অর্থাৎ লক্ষণ ও প্রমাণ সিদ্ধ হইলেও অথবা ব্রহ্মই জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান কারণ, ইহা সিদ্ধ হইলেও) এই স্তোত্ররচনা আরম্ভ করা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ গ্রন্থের বিষয় ও প্রয়োজন কিছুই দৃষ্ট হয় না। কারণ—তোমাদের মতে বলা হয় যে, প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্মই বিষয়। সেই সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক, কারণ কর্তা ভোক্তা প্রমাতা রূপে প্রতীয়মান প্রত্যগাত্মার কর্তৃত্বাদিরহিত ব্রহ্মের সহিত অভিন্নতা কোনরূপেই উপপন্ন হয় না।

সিদ্ধান্তবাদীর পক্ষ হইতে (পূর্বপক্ষীর বিরুদ্ধে) যদি বলা হয় যে, প্রত্যগাত্মাতে অধ্যস্ত অহংকারই কর্তৃত্বাদি অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে, প্রত্যাগাত্মা নহে (অর্থাৎ অহংকারই কর্তা ভোক্তা প্রমাতা, প্রত্যগাত্মা নহে), তাহা হইলে পূর্বপক্ষী বলিবেন, ইহাও বলিতে পার না,—কারণ অধ্যাসের হেতু বা নিমিত্ত না থাকাতে কর্তাকে (অহংকারকে) অধ্যস্ত বলা যুক্তিযুক্ত হয় না। (কেন যুক্তিযুক্ত হয় না, তাহা পূর্বপক্ষী বিচারপূর্বক প্রতিপাদন করিতেছেন—) অহংকারের অধ্যাস কি জড় বস্তুতে হইয়া থাকে অথবা স্বপ্রকাশ বস্তুতে? প্রথম পক্ষ অর্থাৎ জড় বস্তুতে অহংকারের অধ্যাস হয়, ইহা বলা যায় না, কারণ তাহা হইলে কর্তার অর্থাৎ অহংকারের ভান বা প্রকাশই হইবে না। আরও কথা এই যে, তোমাদের (সিদ্ধান্তীর) মতে সর্ব জড় পদার্থই অধ্যস্ত বলিয়া তাহাদের অধিষ্ঠানত্বও উপপন্ন হয় না। (অর্থাৎ স্বয়ং অনধ্যস্ত বস্তুই অধ্যাসের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় হইতে পাবে।)[১] দ্বিতীয় পক্ষও (অর্থাৎ কোন স্বপ্রকাশ বস্তুও অহংকারাধ্যাসের অধিষ্ঠান) হইতে পারে না। কারণ স্বপ্রকাশ বস্তু অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না বলিয়া তাহার অধিষ্ঠানত্ব (অজ্ঞানকার্য-অধ্যাসাশ্রয়ত্ব) অযৌক্তিক। আর লোকে ইহাই দেখা যায় যে, এক অংশে অজ্ঞাত (অন্য অংশে জ্ঞাত) শুক্তিকাদিই (অধ্যাসের) অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। আর (তোমরা) ইহার অর্থাৎ স্বপ্রকাশ চৈতন্যের অংশও অঙ্গীকার কর না। (কারণ তাহা নিরবয়ব)। (আরও দেখ) প্রকাশমান বস্তু (অপ্রকাশ-স্বভাব) অজ্ঞানের বিষয় হয় না, কারণ প্রকাশ ও অপ্রকাশ পরস্পর বিরোধী। সাদৃশ্যাদি বিষয়দোষেরও স্বপ্রকাশবিষয়ক প্রমাজ্ঞানে অর্থাৎ চিদাত্মাতে থাকা অসম্ভব বলিয়া বিষয়দোষ-উপলব্ধির করণ যে প্রমাণ বা ইন্দ্রিয়সমূহ তাহাদের দোষও কিছু দেখা যায় না। (এই সমস্ত দোষও অধ্যাসের হেতু হইয়া থাকে)।[২] অতএব কর্তার অর্থাৎ অহং-পদার্থের অধ্যাস

---

১ আরোপকেই অধ্যাস বলে। সুতরাং একমাত্র সত্য বস্তুই আরোপের অধিষ্ঠান হইতে পারে। কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তমতে সমস্ত জড় বস্তুই অধ্যস্ত অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া উহারা কোনও অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইতে পারে না। রজ্জু-সর্প প্রভৃতি স্থলেও রজ্জুদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যই সর্পের অধিষ্ঠান হয়।

২ অধ্যস্ত বস্তুর পূর্বানুভবজনিত সংস্কার, অধিষ্ঠানের সহিত তাহার সাদৃশ্য এবং দোষ এই তিনটি অধ্যাসের সাধারণ কারণ। দোষ নানা প্রকারের হইতে পারে—রোগাদিজনিত ইন্দ্রিয়গত দোষ, দূরত্ব, অন্ধকার, এবং মনের অনবধানতা প্রভৃতি। ইহা ভিন্ন অজ্ঞানকেও দোষ বলা হয়। এখানে অজ্ঞান ব্রহ্মে থাকিতে পারে না, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সাদৃশ্য প্রভৃতি এবং ইন্দ্রিয়গত দোষও এখানে সম্ভব নহে, ইহাই পূর্বপক্ষী প্রতিপাদন করিতেছেন।

হয় না (অর্থাৎ অহংকার অধ্যস্ত নহে)। অথচ সেই কর্তা অর্থাৎ অহং-পদার্থই আত্মা। কিন্তু বহুদোষদুষ্ট সেই কর্তা অর্থাৎ অহংকার নির্দোষ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইতে পারে না বলিয়া এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়েরই সিদ্ধি হয় না। আর এই গ্রন্থ-রচনার কোন প্রয়োজনও সম্ভব হয় না। তাহার কারণ এই যে, আত্মাতে প্রতীতিসিদ্ধ কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিরূপ অনর্থের নিবৃত্তিই এখানে (গ্রন্থ-রচনার) প্রয়োজন বলিতে হইবে। কিন্তু পূর্বে প্রদর্শিত প্রকারে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্মের আশ্রয় অহংপদার্থরূপ আত্মা অধ্যস্ত নহে, ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। সুতরাং ঐরূপ অনধ্যস্ত আত্মা জ্ঞানের দ্বারা কখনও বাধিত হইতে পারে না। (সুতরাং বিষয় ও প্রয়োজন—এই উভয়ই অসিদ্ধ হয়।) পূর্বপক্ষীর সম্ভাবিত এই আশংকার সমাধানের জন্য বিষয় এবং প্রয়োজন— এই উভয়ই প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে] যস্মিন্ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা স্তোত্র আরম্ভ করা হইতেছে।

স্বামী সুবোধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

(১)

[তরলাবালা সেনগুপ্তকে লিখিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোজয়তি।

রামকৃষ্ণ মিশন
উয়ারী পোঃ ঢাকা।
২৭শে পৌষ *

মায়ী—

আজ তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। গতকল্য এখানে স্বামিজীর জন্মোৎসব আনন্দের সহিত হইয়া গেল, প্রায় ৩৫০০ লোক বোসে প্রসাদ পাইয়াছে, সমস্ত দিন কীর্তন গান বাজনা ছিল। গতকল্য কলমা হইতে শ্রীমান কার্তিক, সুশীল ও আরো ৫।৬ টি ছেলে এখানে আসিয়াছিল, কলমার সকলে ভাল আছে। সুশীল আমাকে এক পত্র দিল, সে পত্রে সাধনা ও সকল মেয়েরা আমাকে কলমাতে যাবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে। আমি তাহাদের এখনো কিছু উত্তর দেই নাই। মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহে সোনারগাঁ আশ্রমে যাইব ইচ্ছা আছে। উপস্থিত আমার একটু সর্দ্দি কাসি আছে। মহাপুরুষ মহারাজ বেলুড় মঠে ভাল আছেন, শীঘ্রই ৺কাশী যাবেন। শরৎ মহারাজ বাগবাজারে ভাল আছেন। মালতীর পত্র পাইয়াছি, দেওঘরে ভাল আছে। ভূপতিবাবু এখন কলমাতে আছেন। গতকল্য বিনোদেশ্বরবাবুও কলমা হইতে এখানে আসিয়াছিলেন।

আন্তরিক ভালবাসা শুভ ইচ্ছা জানিবে, সকলকে জানাবে।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীসুবোধানন্দ

---

* পোস্টকার্ডটিতে শ্রীনগর (ঢাকা) ডাকঘরের ছাপ আছে: **13 JAN 26 (13th January 1926)**—সঃ

(২)

[শ্রীমতী সাধনা সেনগুপ্তকে লিখিত]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোজয়তি

১৩ আশ্বিন, †
মঙ্গলবার।
বেলুড় মঠ

কল্যাণীয়া স্নেহের সাধনা—

তোমার পত্র অনেক দিন পূর্ব্বে পাইয়াছিলাম, উত্তর দিতে অনেক দেরি হইল। মহাপুরুষ মহারাজ ও মঠের সকলে ভাল আছেন, তোমরা সকলে তাঁর শুভাশীর্ব্বাদ ও ভালবাসা জানিবে। সারদানন্দ স্বামী ৺পূজার পূর্ব্বে কলিকাতা আসিয়াছেন, বাগবাজারে আছেন, সপ্তমীর দিন মঠে এসেছিলেন। এখানে সমারোহের সহিত মাদুর্গার পূজা হইল। শ্রীমতী মালতীর পত্র অনেকদিন পূর্ব্বে একখানা পাইয়াছিলাম, আর পাই নাই, সেখানে যেয়ে ভাল আছে লিখেছিল। আমি ৺কালীপূজা অবধি বেলুড় মঠেই থাকিব, তারপর হয় ভুবনেশ্বর না হয় পাটনার দিকে যাব, গেল অসুখে শরীরে কিছু দুর্ব্বলতা বোধ করি। আন্তরিক ভালবাসা শুভ ইচ্ছা তোমরা বাড়ীসুদ্ধ সকলে জানিবে। আমার গৌরী, শিবু কেমন আছে।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
তোমাদের
শ্রীসুবোধানন্দ

---

† পোস্টকার্ডটিতে ভরাকর (BHARAKAR) ডাকঘরের ছাপ আছে: 1 OCT 25 (1st October 1925)—সঃ

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা

স্বামী সারদেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

নলিনীদিদির ভীষণ শুচিবাই, কখন কি অশুচি স্পর্শ হইয়া যাইবে সেই ভয়ে সদাসর্বদা সন্ত্রস্তা। আর কে কখন ছুঁইয়া দিবে, এই ভাবনা সদাসর্বদা। মাতাঠাকুরানীর এইসব ছোঁয়া-ছুঁয়ি নাই; সেজন্য নলিনীদিদি আপসোস করিয়া বলেন, 'পিসীমা তো এঁটো পাতা মাড়িয়েই চলে যাবেন; আর যেদিন বলেন "নলিনী, হাতে একটু গঙ্গাজল দাও তো," সেদিন আমি বুঝতে পারি ঠিক খুব অশুচি কিছু মাড়িয়েই এসেছেন।' নলিনীদিদির এই শুচিবাই লইয়া মাকে অনেক সহিতে হয়। এক একদিন মাত্রা এমনি বাড়ে যে, বাড়ীশুদ্ধ সকলে অস্থির! আবার কেহ কেহ কটাক্ষ করিয়া বলে, 'আজ নলিনীদির পিসীমার কাছ থেকে কিছু একটা বড় দাঁও মারার মতলব, তাই এই আয়োজন।' মা যেমন করিয়াই হউক তাহাকে শান্ত করিবেনই।

একদিন শীতের সন্ধ্যায় নলিনীদিদি আসিয়া পিসীমাকে দুঃখের সহিত কাঁদো কাঁদো স্বরে

জানাইলেন যে, তিনি ময়লা ছুঁইয়া ফেলিয়াছেন, এখন ঠাণ্ডায় স্নান করা অসম্ভব, আর স্নান না করিয়া ঘরে যাওয়াও চলে না, কাজেই রাত্রে খাওয়াও চলিবে না, শোওয়াও যাইবে না, ঠাণ্ডায় বারান্দায় বসিয়াই রাত কাটাইতে হইবে। মা অনেক বুঝাইলেন—গঙ্গাজল স্পর্শ করিলে, বা কাপড় ছাড়িয়া হাত পা ধুইয়া আসিলেই হইবে। কিন্তু নলিনীদিদি মানিলেন না, দুঃখে অভিমানে নিজের ঘরের বারান্দায় বসিয়া রহিলেন, যেন মায়েরই সকল দোষ! রাত হইল,—উঠিলেন না, সেই ভাবেই বসিয়া আছেন, আর দুঃখ করিয়া চোখের জল ফেলিতেছেন। মা ডাকিলেন, বুঝাইলেন; অন্যেরাও অনেক বলিলেন, কাহারও কোন কথায় কর্ণপাত করিলেন না। সকলে খাইয়া শুইতে গেল এবং নলিনীদিদির প্রতি বিরক্ত হইয়া মাকে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিয়া গেল, তিনি যেন নলিনীর জন্য আর কষ্ট না করেন, তাহাকে সাধ্য-সাধনা না করেন, আজ তাহাকে একটু শিক্ষা দেওয়া ভাল। নলিনীদিদির দুঃখ অভিমান বাড়িতেছে; এবার থাকিয়া থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্না আর বিলাপ আরম্ভ হইল—'সংসারে কেউ দেখবার নেই, স্বামীর ঘরে স্থান হলো না, বাপের ঘরে এলাম; বাপের দ্বিতীয় সংসার, বিমাতা আছেন, তাঁর সঙ্গে কি থাকা যায়? পিসীমা আছেন, স্নেহ করেন, স্থান দিয়েছেন। অন্যেরা হিংসা করে, এখানেও থাকা কঠিন হচ্ছে। ভগবান এমনি নির্দয়! দুঃখে দুঃখেই আমার জীবন যাবে।' খানিকক্ষণ চুপ করেন, আবার বিলাপ আরম্ভ হয়।

সকলে ঘুমাইতেছে—বাড়ী নিস্তব্ধ। মা উঠিলেন, সুমধুর স্বরে ডাকিতে লাগিলেন, 'নলিনী, আয় মা, কেন বারান্দায় শুয়ে কষ্ট পাচ্ছিস। হাত পা ধুয়ে, খেয়ে ঘরে শুবি চল্।' সে মধুর করুণ স্বর কাহারও কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিল—যাহাদের ঘুম এখনও আসে নাই। মা-ও বিলাপ শুরু করিলেন, 'আহা! নলিনী ছেলেমানুষ, বুদ্ধি কম, তাই রাগ করে কষ্ট পায়, আর সকলে বিরক্তও হয় তার উপরে।' মা বারংবার আপসোস করিতেছেন—'নলিনীর বুদ্ধি কম, তাই রাগ করে কষ্ট পায়।'

জনৈক সন্তান শুনিয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছেন, আমরা যখন রাগ করি অপরের উপর, ভাবি সে বুঝিয়া শুনিয়াই, ইচ্ছা করিয়াই বিরুদ্ধাচরণ ও উত্যক্ত করিতেছে। কিন্তু মা দেখিতেছেন—বুদ্ধি কম, বুঝিতে পারে না—তাহার দোষ কি? বুদ্ধিহীন অবোধ শিশুর উপর কি রাগ হয়? মা, তোমার কাছে আমরা সবাই তো অবোধ শিশু, রাগ হইবে কি করিয়া? মা নলিনীদিদির কাছে আসিলেন, কাকুতি মিনতি করিয়া বুঝাইয়া শুনাইয়া শান্ত করিলেন। নলিনীদিদির দুঃখ দূর হইল, তিনি কাপড় ছাড়িয়া খাইয়া ঘরে গিয়া শুইলেন। মার চিত্তও প্রসন্ন হইল। এইরূপ ঘটনা কত ঘটে, মা সব সহ্য করেন, সকলকে শান্ত করেন।

পাগলী মামী নিজে রান্না করিয়া নিজের ঘরেই খান। কিছু ধান-জমি আছে, ভাগে পাইয়াছেন—তাহার উপস্বত্ব; সিংহবাহিনীর মন্দিরের আয়ের অংশও আছে; যজমানের আয়ও সামান্য। সব মিলিয়া একপ্রকার চলিয়া যায়। ব্রাহ্মণের বিধবা কঠোরভাবে জীবনযাপন করেন। রাধু আর জামাই—তাঁহারা তো মায়েরই সংসারে খান, তবে মামীও সাধ্যমত তাঁহাদের ভালমন্দ খাওয়াইতে চেষ্টা করেন। তাঁহার প্রাণ কন্যা ও জামাতার উপরেই পড়িয়া আছে। তাঁহার উভয়-সঙ্কট রাধুকে লইয়া,—মার সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়াই আছে; মা তাঁহার মেয়ে কাড়িয়া লইয়াছেন। মা কখনও উত্যক্ত হইয়া বলেন, 'নিয়ে যা তোর মেয়েকে', তখন পলাইয়া আসেন, জানেন মেয়েও

আসিবে না আর আনিয়া খাওয়াইবার ও পরাইবার সঙ্গতিও তাঁহার নাই। রাধুর গর্ভধারিণীর প্রতি টান আছে; যদিও 'নেড়ী-মা' বলে- মামীর মাথা খানিকটা নেড়া, তাই নেড়ী। নেড়ী-মার প্রতি বিরক্ত হইয়া রাধু তাঁহাকে কখনও দূর দূর করিয়া তাড়ায়, 'মরে যা, মরে যা বলে। পাগলী চোখের জল মুছেন, পিছনে ফিরিয়া চাহিয়া চাহিয়া চলিয়া আসেন। রাধু যখন শ্বশুর ঘরে যায়, তখন স্নেহাতুরা তাহার অদর্শনে কাতর হইয়া সর্বদাই নিজ গৃহ জয়রামবাটী আর জামাইয়ের বাড়ী তাজপুর— তিন মাইলের ব্যবধান — যাওয়া আসা করেন।

পাগলী মামীর অন্তরে বড়ই দুঃখ: এমন সোনার চাঁদ ছেলে সব নিজেদের মাকে ছাড়িয়া মাতাঠাকুরাণীর কাছে আসিয়া সাধু হয়, মা তাহাদের ঘরবাড়ী ছাড়া করেন! কখন কখন অন্তরের শোক সংবরণ করিতে না পারিয়া প্রকাশ্যে বলিয়া ফেলেন কোন কোন ছেলের কাছে, 'তোমাদের মা-ই তো গর্ভধারিনী মার কাছ থেকে ছেলেদের কেড়ে নেয়, আর সাধু করে ঘরবাড়ী ছাড়ায়।' মা শুনেন আর মৃদু হাস্য করেন।

পাগলী ও অপর অনেক লোকের মুখে মায়ের বিরুদ্ধে এই ছেলে কাড়িয়া লইবার কথা শুনা যাইত। জিবটার রায়েরা ধনী তালুকদার। তাঁহাদেরই একজনের একমাত্র ছেলে বয়স হইলে কুসঙ্গে পড়িয়া দুশ্চরিত্র হইয়া উঠিয়াছে। পিতা দুঃখিত, অনেক চেষ্টা করিয়াও শোধরাইতে পারিতেছেন না। একদিন একজন আত্মীয়ের নিকট পুত্রের বিষয়ে আপসোস করিলে তিনি পরামর্শ দিলেন— জয়রামবাটীতে মাতাঠাকুরাণীর নিকটে তাহাকে পাঠাইবার জন্য। শুনিয়াই আতঙ্কিত হইয়া বলিলেন, 'বরং আমি তার বদ্-খেয়ালের জন্য আলাদা করে কিছু বিষয় রেখে যাব, তবু সেখানে পাঠাবো না।'

মায়ের একটি সন্তান মধ্যে মধ্যে মায়ের জন্য জিনিসপত্র লইয়া আসিতেন। তিন ক্রোশের উপর রাস্তা, ভারি বোঝা নিজেই বহন করিয়া আনেন পরমানন্দে। একটি গ্রামের ভিতর দিয়া আসিতে হয়, সেখানকার একজন প্রৌঢ় ব্যক্তির সঙ্গে রাস্তায় মধ্যে মধ্যে দেখা হইত। একদিন তিনি খুব ভারি বোঝা বহিয়া চলিয়াছেন, দেখিয়া সেই ব্যক্তি দুঃখিত হৃদয়ে বলিয়া উঠিলেন, 'কি মোহেই পড়েছে!' মায়ের বাড়ীতে আসিয়া সন্তানটি মাতাঠাকুরাণীর চরণ বন্দনা ও জিনিসপত্র নিবেদন করিলে মা প্রসন্না হইয়া আশীর্বাদ ও কুশল সমাচারাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। যথাযথ উত্তর দিয়া তিনি পথের দেখা সেই লোকটির খেদোক্তি ব্যক্ত করিলেন; শুনিয়া মায়ের মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল এবং একটু পরে সন্তানকে সম্বোধন করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, 'বাবা! এরা সংসারের কীট। ভগবানে ভক্তিভাব এদের হয় না; এরা কেবল সংসারে আসবে আর যাবে, যাবে আর আসবে, সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করবে। এরূপে বহু জন্ম কাটবার পর যদি কোন জন্মে ভগবানের কৃপা হয়, তা হলেই মুক্তি।' মায়ের কথা শুনিয়া সন্তান বিস্মিত, স্তব্ধ।

মায়ের বাড়ীতে, মায়ের কাছে শুধু বেটাছেলেই যে যাতায়াত করে তাহা নহে। মেয়েরাও অনেকে আসে যায়— সব বয়সেরই মেয়ে- তরুণী যুবতী, প্রৌঢ়া বৃদ্ধা— অধিকাংশই সম্ভ্রান্ত ঘরের, সুন্দরী, শিক্ষিতা, কুমারী সধবা বিধবা, সকল জাতির। তখনকার পর্দানশীন রক্ষণশীল সমাজের কাছে অসহ্য এই চালচলন— কারণ তাহা তাঁহাদের কাছে বর্ণাশ্রমধর্মের বিরুদ্ধ আচরণ ও সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দান বলিয়া মনে হইত। মা-ও অত্যন্ত সাবধানে থাকেন যাহাতে কাহারও মনে আঘাত না লাগে, কোন প্রকার সামাজিক বা পারিবারিক গোলমাল না বাঁধে।

কিন্তু অন্তরের টান, তাঁহার স্নেহের আকর্ষণ মানুষকে সর্বপ্রকার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া দিতেছে, যে একবার সে স্নেহপীযূষের আস্বাদ পায় তাহাকে আর বাঁধিয়া রাখা যায় না। ঘরে বাহিরে আপত্তি বাধা-বিপত্তি আসে বই কি! কিন্তু যাহারা সত্যই অনুরাগী তাহাদের কেহ বাধা দিতে পারে না, মায়ের কৃপায় সব বিঘ্ন দূরীভূত, পথ উন্মুক্ত হয়। এইভাবে ধীরে ধীরে লোকের জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে মায়ের প্রভাব নূতন মানুষ নূতন সমাজ নূতন আচার-ব্যবহার-প্রণালী সৃষ্টি করিয়া আগামী বিশ্বভ্রাতৃত্বের বীজ বপন ও সকল মানবের এক পরিবার বন্ধনের গোড়াপত্তন করিতেছিল। মানব-মানবী নূতন জীবনে সচেতন হইয়া হর্ষে উৎফুল্ল!

আরামবাগের উকিল মণীন্দ্রবাবু ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত, ছাত্রাবস্থায় কথামৃতকার মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গলাভে ধন্য হইয়াছেন তাঁহার বিশেষ স্নেহভাজন ও বিশ্বাসপাত্র। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, তৃতীয় ভাগের পাণ্ডুলিপি লিপিবদ্ধ করেন। মাষ্টার মহাশয় বিশেষ পরীক্ষা করিয়া অতি যোগ্য লোককেই এই গুরুভার অর্পণ করিতেন, কাজ অতি কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ—মাষ্টার মহাশয় ভাবতন্ময় নেত্রে প্রাচীন দৃশ্য সকল যেন সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতেছেন,—আর বলিয়া যাইতেছেন, যেমনটি উচ্চারিত হইবে, ঠিক তেমনটি লেখা চাই। প্রশ্ন করার উপায় নাই। দীর্ঘকাল শ্রীম-র সঙ্গে থাকায় মণীন্দ্রবাবু তাঁহার নিকট পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরাণীর মহিমা অবগত হন এবং জয়রামবাটী যাতায়াত আরম্ভ করেন। আরামবাগের একক্রোশ পশ্চিমে বায়ুগ্রামে তাঁহার বাস্তুভিটা; গ্রামের জমিদার, সম্ভ্রান্ত সম্মানিত পরিবারে জন্ম— আবার উকিল, তাই ঐ অঞ্চলে সকলের সুপরিচিত। জয়রামবাটী তাঁহার বাড়ী হইতে মাত্র ছয় ক্রোশ আন্দাজ, কাজেই সেখানকার লোকেরাও তাঁহাদের জানে, সম্মান করে।

মণিবাবুর মা পুত্রের মুখে মাতাঠাকুরাণীর কথা শুনিয়া একবার দর্শন করিতে গেলেন মায়ের বাড়ীতে। দর্শন করিবা মায়ের স্নেহকৃপায় মণিবাবুর মা বিশেষ আকৃষ্টা হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সংসারের টান কমিতে লাগিল। বৃহৎ সংসার—পুত্র, পুত্রবধূ, বিধবা কন্যা, নাতনীগণ, ঝি-চাকর, আত্মীয়-স্বজন, অতিথি-অভ্যাগত, দেবসেবা—তিনিই গৃহকর্ত্রী। সোনার সংসার তিনিই পরিচালনা করেন, পাকা গৃহিণী; সকলের মুখেই তাঁহার দক্ষতা কর্মতৎপরতার প্রশংসা। মায়ের স্নেহকৃপালাভে তাঁহার সংসারের আকর্ষণ দিনে দিনে হ্রাস পাইতে লাগিল আর তিনি মায়ের কাছে ঘন ঘন যাওয়া আসা করিতে লাগিলেন। জয়রামবাটী আসিলে ঘরে ফিরিতে চান না, এখানে পড়িয়া থাকেন, মায়ের ও ভক্তগণের সেবা করিয়া পরম আনন্দ পান তাঁহার সেই দীনহীনার ন্যায় অবস্থান— আর সর্বপ্রকার কাজ করা, ঝি-চাকরাণীর মত সকলকে মোহিত করিত। এই সম্ভ্রান্ত মহিলার এইরূপে মায়ের বাড়ীতে থাকা ও কাজ করার কথা জানিয়া স্থানীয় লোকের বিস্ময়ের অবধি থাকিত না মণীন্দ্রবাবু সংসারের দিকে চাহিয়াই হউক অথবা জননীর সুখ-সুবিধার দিকে চাহিয়াই হউক, গর্ভধারিণীর সদাসর্বদা জয়রামবাটী যাতায়াত ও বেশীদিন সেখানে থাকা পছন্দ করিতেন না বলিয়াই মনে হয়। একবার জনৈক সন্তানের সঙ্গে দেখা হইলে মণিবাবুর মা মায়ের কাছে যাইবার উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'মণি বলেছে শীগ্‌গির পাঠিয়ে দেবে। তা না হলে পালিয়ে যাবো।' প্রৌঢ়া একটি ঝি সঙ্গে করিয়া পায়ে হাঁটিয়া জয়রামবাটী আসিয়া উপস্থিত হইতেন। ইহার অল্পকাল পরেই তিনি পরলোক গমন করেন। শ্রাদ্ধাদি কর্ম সমাপনান্তে

মণিবাবু জয়রামবাটী আসিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে মাতাঠাকুরাণীকে নিবেদন করিলেন, 'মা, আপনার কাছে আসবেন বলে সব ঠিকঠাক, কাপড়চোপড় সব ঠিক করে ব্যাগের ভিতর পুরে রেখেছেন, এরই মধ্যে অসুখ, আসা হলো না, কয়েক দিনের মধ্যেই দেহ গেল।' মা-ও সজল নয়নে কাতর কণ্ঠে খেদ করিতে লাগিলেন, 'বৌমার আমার আসবো আসবো বলে আর আসা হলো না মায়ের বাড়ী।' [ক্রমশঃ

'তস্মিন্ অনন্যতা, তদ্‌বিরোধিষু উদাসীনতা'

অধ্যাপক শ্রীশিবশম্ভু সরকার

ভক্তির রসে আপ্লুত একি অমিত যৌথ বাণী
সীমানার ঘেরে নেমে এল বুঝি অকূলের নিশানী !
ফিরে যেতে গিয়ে বীজে
ছুঁড়ে কি দিয়েছ নিজে
আপন আঁজলা ভরে
নিজেরে উজাড় ক'রে
পুষ্পাঞ্জলি প্রায়
দিলে কি প্রাণেশ-পায় ?
মরণ বাঁচন হোল তর্পণ
উদার আকাশ তলে—
স্মরণ স্বপন শয়ন ভ্রমণ
দোলে জাহ্নবী-জলে !
বন্ধন যদি ভেসে চলে যেতে চায়
বৈরাগ আসি গুছাইয়া নেয় ঠাঁই !
কাম ভেঙে পড়ে—একি বিস্বাদ
ভোগ কথা কয়—আলুনি অসাধ
মানুষ যা পেলে—ভাবে কি ধন্য
ভক্ত-আঁখে সে—অতি নগণ্য
ধূলিকণা সম হায়
খেলে দোলে উড়ে যায় !
তারে ধরা দায় ধরা অসহায়
ডোর সব খসে পড়ে—
মাগে না কিছুই নেবে না কিছুই
চলেছে উদাম ঝড়ে !

ভাগবত-ধর্ম

ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

[পূর্বানুবৃত্ত]

প্রাচীনকালের ভাগবত-ধর্মের কথা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। এখন মধ্যযুগ ও বর্তমান যুগের কথা বলিব। মধ্যযুগ বলিতে আচার্য রামানুজ হইতে বল্লভাচার্য পর্যন্ত ধরিতেছি। এই সময় ভাগবত-ধর্মে চারিটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়।

প্রাচীন ভাগবত-ধর্মে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ছিল না। ক্রমে ক্রমে তাহা বাড়িতে থাকে। মধ্যযুগের বৈষ্ণব-সম্প্রদায় চারি শাখায় বিভক্ত। কালানুক্রমে বৈষ্ণবাচার্য রামানুজ প্রথম। আজ হইতে প্রায় সাড়ে নয় শত বৎসর পূর্বে তিনি আবির্ভূত হন। তিনি বিশিষ্টাদ্বৈত মতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক।

রামানুজের পর নিম্বার্কাচার্য আবির্ভূত হন। কেহ কেহ তাঁহাকে তৎপূর্ববর্তী বলেন। ইনি ভেদাভেদবাদ প্রচার করেন। এখন হইতে ৭৭৫ বৎসর পূর্বে মধ্বাচার্য আবির্ভূত হন। তিনি দ্বৈতবাদ প্রচার করেন। বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য বল্লভ। তিনি ৪৯৬* বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হন।

প্রত্যেক সম্প্রদায়ই মনে করেন যে, তাঁহারা অতি প্রাচীন ও প্রাচীন কাল হইতে গুরুপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছেন। রামানুজ শ্রী বা লক্ষ্মীদেবীর নিকট হইতে উপদেশ প্রাপ্ত হন। এই জন্য তাঁহার সম্প্রদায়ের নাম শ্রীসম্প্রদায়।

শ্রীনিম্বার্কাচার্যের ধারাকে বলে সনকাদি সম্প্রদায়। ব্রহ্মার মানসপুত্র সনক সনন্দ সনাতন সনৎকুমার। তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভার্থ পিতার নিকট উপনীত হন। ব্রহ্মা মহাবিষ্ণুকে স্মরণ করেন। মহাবিষ্ণু হংসরূপ ধরিয়া আসিয়া ভক্তিধর্ম শিক্ষা দেন। পরে ব্রহ্মা উহা সনকাদিকে দান করেন। নারদ উহা সনকাদির নিকট লাভ করেন। নারদ হইতে নিম্বার্কাচার্য উহা প্রাপ্ত হন।

শ্রীমধ্বাচার্যের সম্প্রদায়ের নাম ব্রহ্ম সম্প্রদায়। বিষ্ণু ব্রহ্মাকে ভক্তিধর্ম শিক্ষা দেন। ব্রহ্মা হইতে শক্তি পরাশর ব্যাস পরম্পরায় উহা প্রাপ্ত। মধ্বাচার্য স্বয়ং ব্যাসদেবের নিকট হইতে তাহা প্রাপ্ত হন।

শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সম্প্রদায়ের নাম রুদ্র সম্প্রদায়। ইনি দাক্ষিণাত্যের জনৈক রাজমন্ত্রীর পুত্র। ইনি বিষ্ণুর অবতারতুল্য পুরুষ ছিলেন। রুদ্রদেব তাঁহাকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ শিক্ষা দেন। বিল্বমঙ্গল এই মতের প্রচারক ছিলেন। কালক্রমে এই মত লুপ্তপ্রায় হইলে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের অনুরোধে বল্লভাচার্য উহা পুনরুজ্জীবিত করেন। বিষ্ণুস্বামী ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তিনি নৃসিংহদেবের উপাসনা করিতেন। বল্লভের মতকে শুদ্ধাদ্বৈত বলে। ইনি জ্ঞান- ভক্তি-মার্গ কাহাকেও উৎকৃষ্ট না বলিয়া প্রীতিমার্গকে উৎকৃষ্ট বলেন। বল্লভমতে ভক্তি দ্বিবিধ—মর্যাদাভক্তি ও পুষ্টিভক্তি। প্রীতিভক্তিই পুষ্টিভক্তি। ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহে এই পুষ্টিমার্গ লাভ হয়। কৃষ্ণসুখের জন্য নিখিল চেষ্টা। ভগবান ভক্তকে গ্রহণ করেন। সাধনে নয়, কৃপায় পুষ্টিমার্গে প্রবেশ।

এই চারি সম্প্রদায়ের প্রত্যেক আচার্যই জ্ঞানবাদী

---

* লেখক রামানুজাচার্য ও মধ্বাচার্যের কাল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত ডঃ রাধাকৃষ্ণনের Indian Philosophy, Vol. II-তে প্রদত্ত তথ্যের মিল আছে কিন্তু এখানে মিল নাই। তবে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের Vaisnavism Saivism and Minor Religious System-গ্রন্থে প্রদত্ত তথ্যের সহিত এখানে মিল আছে। রাধাকৃষ্ণনের মতে বল্লভের জন্ম ১৪০১ খৃঃ, ভাণ্ডারকরের মতে ১৪৭৯ খৃঃ।—সঃ

আচার্য শঙ্করের বিরোধী। 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' — এই মতবাদের খণ্ডন ইঁহারা প্রায় সকলেই করিয়াছেন। ইঁহাদের নিজেদের মধ্যে ছোট বড় বিষয় লইয়া অনেক মতানৈক্য আছে। প্রত্যেকের মত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তুলিয়া তুলনামূলক আলোচনা অনেক সময়সাপেক্ষ। তাই শঙ্করকে পার্শ্বে রাখিয়া শ্রীরামানুজ ও মধ্বাচার্যের মতবাদ লইয়া কিঞ্চিৎ তুলনামূলক আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্রুতির 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-মন্ত্র সকলেই মাথা পাতিয়া গ্রহণ করেন, কিন্তু ব্যাখ্যা এক একজন এক এক প্রকার করেন। মন্ত্রের সহজ অর্থ, ব্রহ্ম নিশ্চয়ই এক এবং দ্বিতীয়রহিত। সুতরাং এই মন্ত্রাবলম্বনে অদ্বৈতবাদই আচার্য শঙ্কর সত্য ও সিদ্ধ মনে করেন।

দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য মনে করেন, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-মন্ত্র দ্বৈতবাদ-বিরোধী নহে। ঐ মন্ত্রের অর্থ এই যে, ঈশ্বর হইতে অধিক বা তাঁহার সমান বস্তু জগতে আর কিছুই নাই। ইহাতে জীব ও জগৎ নামক যে আর দুইটি বস্তু নাই, ইহা কিছুতেই বুঝায় না। ব্রহ্ম স্বতন্ত্র, জীব অস্বতন্ত্র। জীব নিয়ম্য, ব্রহ্ম নিয়ামক। জীব আর ঈশ্বর তো সমকক্ষ বস্তু নয় যে, ব্রহ্ম অদ্বিতীয় বলিলে জীবও ব্যাবৃত্ত হইবে।

আচার্য রামানুজ বলেন, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-শ্রুতি স্পষ্টত দ্বৈতবাদবিরোধীই বটে।

আচার্যপাদগণ তিন প্রকারের ভেদ স্বীকার করিয়াছেন স্বজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত। একটি আম গাছের সঙ্গে একটি কাঁঠাল গাছের যে ভেদ বা পার্থক্য, তাহা স্বজাতীয়। একটি আমগাছের সঙ্গে একটি ঘোড়ার যে ভেদ বা পার্থক্য, তাহা বিজাতীয়। এক আমগাছের কাণ্ডে শাখায় পাতায় পাতায় যে ভেদ, তাহা স্বগত।

আচার্য শঙ্কর বলেন, ব্রহ্ম স্বজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদরহিত। ব্রহ্মের স্বজাতীয় কোন ব নাই। কারণ ব্রহ্মতুল্য জগতে কেহই নাই কিছুই নাই। ব্রহ্মে বিজাতীয় ভেদ নাই, কার তদ্ভিন্ন বস্তু আর কোথাও নাই। ব্রহ্মে স্বগ ভেদ নাই, কারণ ব্রহ্ম নির্গুণ নিরাকার নির্বিশেষ—একরস ব্রহ্মে কোনও স্থানের নির্দেশক কিছুই নাই

রামানুজ বলেন, ব্রহ্মে স্বজাতীয় বিজাতীয় ভে নাই, একথা সত্য ; কিন্তু স্বগত ভেদ আছে। ব্র ও জীবের ভেদ স্বগত—স্বজাতীয় বা বিজাতী নহে। চিৎ জীব ও অচিৎ জগৎ ব্রহ্মের শরীরতুল্য। ইহারা ব্রহ্মের দুইটি বিশেষণের মত। সুতরা ব্রহ্মে স্বগত ভেদ আছে।

মধ্বাচার্য বলেন, ব্রহ্মে বিজাতীয় ভেদ আছে—স্বজাতীয় স্বগত ভেদ নাই। ব্রহ্ম এবং জীব ও জগতের মধ্যে ভেদ বিজাতীয় ; স্বজাতীয় বা স্বগত নহে। জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ব্রহ্ম স্রষ্টা, জীব ও জগৎ সৃষ্ট। স্রষ্টা ও সৃষ্ট বস্তুতে কি জাতীয় ভেদ থাকিতে পারে ? একজন কুম্ভকার ও একটা মাটির কলসীর মধ্যে কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে ? সুতরাং স্বগত ভেদ নাই। স্বগত ও স্বজাতীয় কোন ভেদই নাই। একমাত্র জীব ও জগৎ তাঁহার বিজাতীয় ভেদরূপে বিরাজমান।

আচার্য শঙ্করের মতে নির্গুণ ব্রহ্ম কাহারও কারণ নহেন। উপাদান কারণও নহেন। নিমিত্ত কারণও নহেন। জগৎ ব্রহ্মের বিবর্তমাত্র—রজ্জু অধিষ্ঠানে যে সাপটি দৃষ্ট হইতেছে—ঐ সাপের উপাদান বা নিমিত্ত কি রজ্জু?* ব্রহ্ম সত্য—অধিষ্ঠানরূপে সত্য, নিমিত্ত বা উপাদানরূপে নহে।

রামানুজাচার্য বলেন, ব্রহ্ম স্বেচ্ছায় জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন। সুতরাং তিনি উপাদান কারণ। তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিয়াই ঐরূপ হইয়াছেন, সুতরাং ব্রহ্ম নিমিত্ত কারণ। চিদচিৎ

* শাঙ্করমতে রজ্জুই সর্পের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। ইহা দার্ষ্টান্তিকেও প্রযোজ্য।—সং